# রম্য সমগ্র

আহসান হাবীব

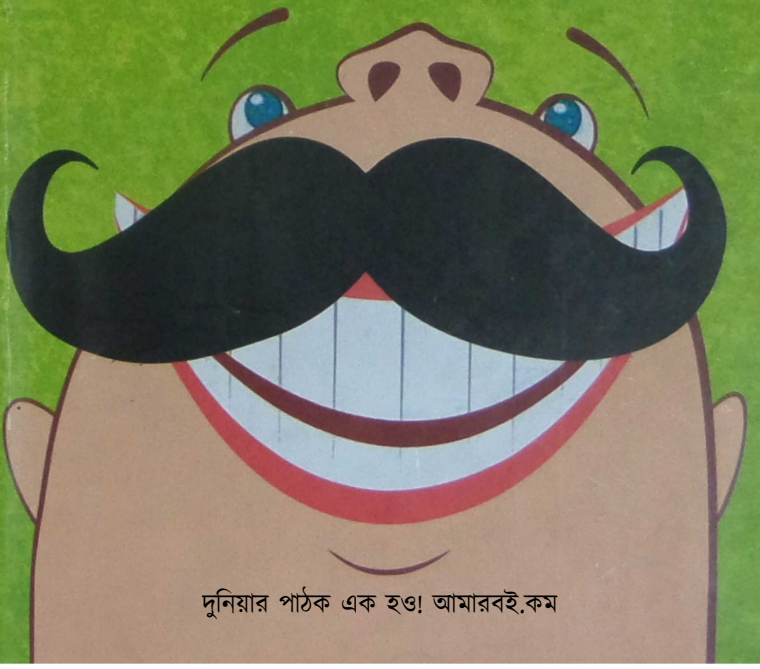

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

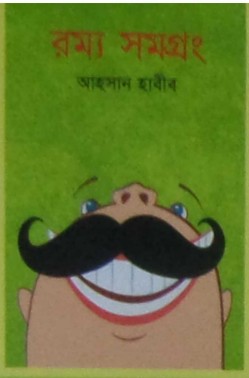


আহসান হাবীবের সর্বশেষ রম্য বইগুলো নিয়ে এই দ্বিতীয় রম্য সমগ্রং... তাঁর সিচুয়েশনাল কমেডি টাইপ রচনা যারা পছন্দ করেন তাদের... বাই এনি চান্স এই মোটাসোটা গ্রন্থটা ভালো লেগে যেতে পারে। তবে অন্য ধরনের রম্যও আছে এই সমগ্রে... বইয়ের ধারাবাহিকতায় রচনার ধরনের ধারাবাহিকতারও কিছু পরিবর্তন হয়তো লক্ষণীয়। লেখক তাই মনে করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রম্য সমগ্রং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# রম্য সমগ্রং

আহসান হাবীব

২

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পূবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
আহসান হাবীব

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8794-09-8

RAMMO SAMAGRANG VOL II (A Collection of Belles-Lettres) by Ahsan Habib
Published by PROTIK. 38/2ka Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100
First Edition : February 2012. Price : Taka 300.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫৩৬৬, ৭১২৫৫০৩
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net

দুনিয়ার পাঠক এক হও আমারবই.কম

উৎসর্গ

মমতাজ শহীদ শিখু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**এ প্রকাশনী থেকে লেখকের অন্যান্য বই**

✓ ৯৯৯টা জোক্স ১টা ফাও
✓ আব্জাব্
✓ ১০০১টা জোক্স ১টা মিসিং
✓ নো মোর জোক্স
✓ রম্য সমগ্রং-১
✓ ফোর টুয়েন্টি ফোর আওয়ার জোক্স
✓ হাই ক্লাস হিউমার লো ক্লাস রাইটার
✓ মেপে হাসুন
✓ শুধু Jokes
✓ শেষ হাসি জোক্সেই
✓ ঞাক্স
✓ ট্র্যাশ্
✓ জোকৌতুক
✓ ডিসকোয়ালিফাইড জোক্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# ভূমিকা

আমার রম্য সমগ্রং-২ বেরুচ্ছে শুনে আমি আতঙ্কিত বোধ করছি। নিজের বই বেশি মোটা-সোটা হলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। এক ধরনের অপরাধ বোধ কাজ করে। মনে হয় আমি কি দেশের সাদা কাগজ শিল্পের অপচয় করছি? এমনিতেই কাগজের দাম নাকি বাড়তি! তবে আশার কথা হচ্ছে ঘরে ঘরে নাকি উইপোকার উপদ্রব বেড়েছে! খাটের পায়া খেয়ে ফেলছে। ফলে খাট ব্যালান্স হারিয়ে ফেলছে...সে ক্ষেত্রে একটি দুটি রম্য সমগ্রং এই সমস্যার সমাধান হতে পারে, কে জানে!
সবাইকে মহান একুশের শুভেচ্ছা!

**আহসান হাবীব**
পল্লবী, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

## সূ চি প ত্র

নয় ছয় নয় ১
আহসান হাবীবের অপ্রকাশিত রচনাবলী! ৫১
পৃথিবীবিখ্যাত সব ফেলটুস ৯৩
নতুন রম্য রচনা ১১৭
অপসন থ্রি ১৫৭
নৈব নৈব চ ২১৫
সায়েন্সটুন ২৬৭
আঁতেঘালেকচুয়াল ৩০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রম্য সমগ্রং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# নয় ছয় নয়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

১

আজকাল যে জায়গাই যাই সে জায়গাতেই যেন একই আলোচনা... গেল গেল! দেশটার কী হল... দেশটা রসাতলে গেল... কোথায় কোন হোমরাচোমরা কী দুর্নীতি করল... এসব... শুনতে শুনতে একঘেয়েমি চলে এসেছে। একবার তো এক আসরে আমি শেষমেশ বিরক্ত হয়ে বলেই ফেললাম—

—ভাইরে নতুন কিছু বলার নাই? এসব তো মাননীয় মেয়রের মশার কামড় খাওয়ার মতোই পুরোনো হয়ে গেছে... নতুন কিছু থাকলে বল।

—নতুন কিছু শুনতে চাও?

—হ্যাঁ, নতুন কিছু মজার থাকলে বল, দেশের গীবত শুনতে আর ভালো লাগে না। আমরা তো ওই একটা কাজই ভালো পারি।

—বেশ তা হলে শোন।

একবার এক লোক সে নিজের জীবন নিয়ে খুব হতাশ। এমএ পাস করেছে অথচ কোনো চাকরিবাকরি নেই। বেকার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে যেন। তো একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে নিজেই নিজেকে গালাগাল করতে করতে চলেছে পথ দিয়ে। ক্ষোভে-দুঃখে একটু উচ্চ স্বরেই গালাগাল করছিল নিজেকে 'ব্যাটা অপদার্থ, কোনো কাজের না... কোনো উন্নতি করতে পারে না... ফাজিলের ফাজিল...' এরকম নানান বিশেষণের অজস্র গালি দিতে দিতে চলছিল সে একা একাই। এসময় হঠাৎ কোত্থেকে একদল পুলিশ এসে হাজির—

—ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!

—মানে?

—মানে তোমাকে এখন থানায় যেতে হবে।

—আমার অপরাধ?

—তুমি প্রকাশ্যে সরকারকে গালাগাল করেছ।

—সে কী, কখন?

—এই যে এতক্ষণ গালাগাল করতে করতে হাঁটছিলে।

—আশ্চর্য আমি তো সরকার শব্দটাই মুখে আনি নি। আমি তো নিজেকেই গালাগাল করছিলাম।

—কিন্তু তুমি যা বলছিলে তার সঙ্গে সরকারের হুবহু মিল... তাই ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

দেখলাম এই আড্ডা আসলে ঘুরেফিরে দেশের গীবত গাওয়ার দিকেই যাচ্ছে। আমি ফুটলাম আরেক আড্ডায়। ভাবচক্কর দেখে বোধ হয় মনে হতে পারে আমার নিজের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাজকাম নেই আড্ডায় আড্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আসলেও তাই। এখন আমার কোনো কাজকাম নেই, এক অর্থে বেকার বসে আছি। উন্মাদ ঈদ সংখ্যা প্রেসে ঢুকিয়ে দিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বন্ধু-বান্ধবের অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমনিতে যাওয়া হয় না।

তো এবারে যে অফিসের আড্ডায় ঢুকলাম দেখি সেখানে দেশ নিয়ে কোনো হতাশাজনক আলোচনা হচ্ছে না। তবে ক্রিকেট নিয়ে আসর গরম। আমি একটু হতাশ হলাম। এক নম্বর কারণ ক্রিকেট আমার খুব একটা প্রিয় খেলা নয়। আমার প্রিয় খেলা ফুটবল, তাও ওয়ার্ল্ডকাপ ফুটবল সিজনে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে এখনো তত আশাবাদী হয়ে উঠতে পারি নি। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের যতগুলো খেলায় আগ্রহ নিয়ে টিভির সামনে বসেছি ততগুলো খেলাতেই মুখ চুন করে উঠে যেতে হয়েছে। অতএব আমি হতাশ হয়ে বসে তাদের ক্রিকেট চর্চা শুনছিলাম। অবশেষে তারা মানে আমার ক্রিকেটপ্রেমিক বন্ধুরা দয়া করে আমার দিকে মনোযোগ দিল—

—কীরে তুই চুপচাপ? কিছু বল।

—কী বলব?

—বাহ আড্ডা মারতে এলি কিছু বলবি না? তবে ফর গডসেক জোক্স বলে মেজাজ খারাপ করবি না কিন্তু...

আমার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। জোক্স ছাড়া আমি লিখতেও পারি না আড্ডাও মারতে পারি না। সেই জোক্স বলাও যাবে না? যাহ শালা, এমন বন্ধুর দরকার নেই। আমি উঠে পড়লাম। তারা হা হা করে উঠল, কোথায় যাস ইফতার করে যা, আমি কোনো কথাই শুনলাম না, চলে এলাম একবারে সোজা রাস্তায়। এখন একটা সিএনজি হলে সোজা বাসায়। কিন্তু কোথায় কী! কোনো সিএনজি নেই, সুনসান রাস্তা। হঠাৎ দেখি একটা সবুজ সিএনজি আসছে। কিন্তু খুবই ধীরগতি। আমি হাত তুললাম। থামল না। চলতেই থাকল ধীরগতিতে। আর কী আশ্চর্য! দেখি সেই সিএনজিতে কোনো ড্রাইভার নেই। তা হলে চলছে কীভাবে? ভূতুড়ে সিএনজি? নাকি ঢাকায় ড্রাইভারহীন অটো সিএনজি নামল? এই ড্রাইভারহীন সিএনজি রহস্য ভেদ না করে বরং শিবরাম চক্রবর্তীর একটা ভৌতিক গল্প শোনাই!

শিবরাম চক্রবর্তী তার জীবনে একটাই সিরিয়াস গল্প লিখেছিলেন। মানে হাসির না গল্পটা, সেটা একটা ভৌতিক অভিজ্ঞতার গল্প। গল্পটা এরকম—'সাইকেলে করে শিবরাম চলেছেন দূরে কোথাও। রাত হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। আবহাওয়াটা যথেষ্ট ভৌতিক। হঠাৎ ভৌতিক গল্পের নিয়মানুযায়ী তার সাইকেলের চাকা ফেঁসে গেল। এখন উপায়! শিবরাম ঠিক করলেন সাইকেলটা এখানে কোথাও ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে যাবেন, পরদিন উদ্ধার করলেই চলবে। সাইকেল লুকালেন। এখন যদি কোনো গাড়ি থামিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু না, হাত দেখাচ্ছেন কোনো গাড়িই থামছে না। শিবরাম ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। রাত বাড়ছে গাড়িঘোড়াও কমে আসছে এখন উপায় কী হবে। হঠাৎ দেখেন একটা গাড়ি আসছে ধীরগতিতে (আমি একটু আগে যে সিএনজির কথা বললাম তার মতো) গাড়িটা কাছে আসতেই শিবরাম চক্রবর্তী ভীষণ ভয় পেলেন! দেখেন গাড়িতে কোনো চালক নেই। আত্মা উড়ে গেল তাঁর। ওদিকে আবহাওয়া আরো খারাপ করেছে। শোঁ শোঁ বাতাস দিচ্ছে। শিবরাম দেখলেন উপায় নেই গোলাম হোসেন। এখন আর ভূতের ভয় করে লাভ নেই। জান বাঁচানো ফরজ! তিনি হুট করে চালকহীন গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি তখনো চলছে ধীরগতিতে। শিবরামের তখন ভয় কেটে গেছে, মোটামুটি একটা ঘুম দিলেন তিনি। ঘণ্টা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দু'য়েক বাদে তার ঘুম ভাঙল। দেখেন তার পরিচিত এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। গাড়ি তখন একটা রেলক্রসিংয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এই ভৌতিক গাড়ি থেকে নেমে রিকশা নিয়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভব। তিনি আর দেরি করলেন না। দরজা খুলে নেমেও পড়লেন। আর তখনই পিছন থেকে আওয়াজ এল—

—এই যে দাদা অনেক তো আরাম করলেন, এবার একটু হাত লাগান না। আমি একা যে আর পারছি না!

হতভম্ব শিবরাম চেয়ে দেখেন এতক্ষণ এই গাড়িটা তার চালক ঠেলে ঠেলে আনছিলেন। প্রিয় পাঠক, আশা করছি আমার চালকহীন সিএনজির রহস্য আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

❑

লাদেন বেঁচে আছে। এক বিদেশি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে বলেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফ। অবশ্য তার আগেই লাদেনকে দেখা গেছে এক বন্ধুর পাহাড়ের গা বেয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে নেমে আসতে। কাঁধে একে ফোর্টি সেভেন! ওদিকে বুশকে হালকার উপর পাতলা জারি দিয়েছেন জাতিসংঘের মহাপরিচালক কফি আনান। অবশ্য লাদেন বেঁচে থাকলেইবা কী আর বুশ জারি খেলেইবা কী... আমাদের কি আদৌ কিছু যায় আসে? আমরা তো সেই যে কে সেই! সেই চাঁদাবাজি, সেই হাইজ্যাক, সেই অপহরণ, খুনখারাবি... অতঃপর হানিফ সংকেতের ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে... বেঁচে থাকার আনন্দ উপাদান খুঁজে নিতে হবে। যেমন হাইজ্যাক বন্ধ হবে না রাস্তাঘাটে নিরাপদে চলতে পারব না—এটা আমরা বুঝে গেছি এর মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, আনন্দের উপাদান খুঁজে নিতে হবে...

হাইজ্যাকাররা নাকি আজকাল স্যামসাং মোবাইল সেট ছাড়া ছিনতাই করছে না এমনও ঘটনা ঘটেছে! এই তো ক'দিন আগে এক ভার্সিটির ছেলেকে পথে পেয়ে হাইজ্যাকাররা আটকাল।

—টাকাপয়সা মোবাইল সব বের কর।

—টাকাপয়সা নাই মোবাইলটা... নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল ভার্সিটির ছেলেটি। সেটটা বেরও করে দিল।

—ধুর এইটা তো ভুয়া সেট... স্যামসাংয়ের ভালো সেট কিনতে পার না?

—আমি ছাত্র মানুষ।

সে যাত্রায় তারা সেটটা না নিয়ে ছেলেটিকে ছেড়ে দিল। মোটকথা আনন্দের সংবাদ হচ্ছে হাইজ্যাকাররা নাকি আজকাল আর সেই আগের মারকুটে ফর্মে নেই, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায় দেনদরবার করা যায়। আমার এক বন্ধু তো দাবি করে হাইজ্যাকারদের সঙ্গে দেন-দরবার করে তার সঙ্গে যা টাকা ছিল তার থেকে পাঁচশ টাকা সে কম দিয়েছে! আরেক বন্ধু দাবি করে সে উল্টো হাইজ্যাকারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। ঘটনাটা এরকম—হাইজ্যাকাররা তার কাছে টাকা চাইলে সে মানিব্যাগ বের করতে গিয়ে দেখে পকেটে মানিব্যাগ নেই! হয় পিক পকেট হয়েছে না হয় বাসায় ফেলে এসেছে। হায় হায় এখন উপায়! হাইজ্যাকারকেই বা কী দেবে আর রিকশার ভাড়াইবা কোত্থেকে দেবে! তার এই পরিস্থিতিতে হাইজ্যাকাররাই দয়াপরবশ হয়ে তাকে রিকশা ভাড়া দিয়ে বিদেয় করে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে হাইজ্যাকাররাও এখন মানুষ। তাদের রাস্তাঘাটে গণপিটুনি দিয়ে মারার কোনো মানে হয় না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শুরুতে লাদেন-বুশ নিয়ে যে ভাবগম্ভীর আলোচনা শুরু করেছিলাম তার কারণ হঠাৎ করে আমি আন্তর্জাতিকভাবে রাজনীতিসচেতন হয়ে উঠি নি। আসলে লাদেন-বুশকে নিয়ে একটা 'কে ও ইউ টি ইউ কে' বলার ক্ষেত্র তৈরি করছিলাম সেটাই বলা যাক এখন। অতীতে দেখা গেছে বিভিন্ন দলের বড় বড় রাজনীতিবিদরা বাইরে বাইরে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে গালাগাল বা উষ্মা প্রকাশ করলেও বাস্তবে ভেতরে ভেতরে নিজেদের মধ্যে খাতির ঠিকই আছে! তো সেরকম লাদেন আর বুশ একদিন এক কফি পারলারে বসা। লাদেন বুশকে বলল—

—গতবার আমি আপনাকে গ্রিন টি পান করিয়েছি আজকে আপনি 'কফি আনান'।

—ঠিক আছে। বুশ কফির অর্ডার দিল। এর মধ্যে হঠাৎ করে তাদের সামনের টেবিল ফুঁড়ে আচমকা ভূশ করে বেরিয়ে এল এক জিনি! লাদেন-বুশ দু জনই আঁতকে উঠল!

—এই তুমি কে?

—আমি জিনি। তোমাদের একটা করে 'বর' দিব। প্রথমে লাদেন, বল তোমার কী চাই?

—সেক্ষেত্রে আমি চাই আফগানিস্তানের চারদিকে একটা শক্ত দেয়াল তৈরি করে দাও। যাতে করে বাইরের শক্তিগুলো ওদের আর ডিস্টার্ব করতে পারবে না।

জিনি চোখ বন্ধ করে তুড়ি দিল। তারপর বলল—

—বেশ তোমার কথামতো সেটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার বুশ, বল তোমার কী চাই? বুশ বলল—

—আমি আগে জানতে চাই তুমি যে আফগানিস্তানের চারদিকে দেয়ালটা দিলে ওটা কেমন মজবুত? উচ্চতা কত?

—ওটা ভালো মজবুত উচ্চতায় প্রায় দুশ ফিট।

—আর চওড়ায়? বুশ জানতে চাইল

—চওড়ায় প্রায় পঞ্চাশ ফিট।

—তা হলে আমি চাইব ওই দুশ ফিট দেয়ালের ভেতরের এলাকাটা পানি দিয়ে কানায় কানায় ভরে দাও!

❑

বেনিআসহকলা। মানে বেগুনি নীল আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল। একসঙ্গে সূর্যের সাত রঙ, স্যার আইজ্যাক নিউটন যে ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছিলেন। আবিষ্কার করেই তিনি আমাদের পুলিশ বিভাগের সর্বনাশটা করে গেছেন। না হলে হয়তোবা আমরা আরেকটু ভালো থাকতাম। শুরুতে পুলিশের ড্রেস ছিল খয়েরি মানে খাকি (হলুদ+লাল), তারপর হল নীল (ঢাকায়), সবুজ (চট্টগ্রামে)। এখন আবার নাকি তাদের ড্রেসের রঙ চেঞ্জ হবে। কী হবে সেটা জানা যায় নি। তবে ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ঠিক রঙটা না হওয়ায় তারা রঙবাজদের ধরতে পারছে না। কে জানে নিউটনের রঙের চার্ট ধরে একে একে সব রঙই হয়তোবা পুলিশ বিভাগ পরীক্ষা করে দেখবে কোনটা তাদের শেষ পর্যন্ত সুট করে! আর কাকতালীয়ভাবেই যেন কুমিল্লায় হয়ে গেল হলুদ রঙের বৃষ্টি! এত রঙ থাকতে হলুদ রঙের বৃষ্টি কেন? এটা যেন অশনিসংকেত। শর্ষে ফুলের রঙও হলুদ। পুলিশের কারণেই জনগণকে হরহামেশা শর্ষে ফুল দেখতে হয়।

লেখাটা পড়ে মনে হতে পারে আমি বোধহয় পুলিশের ওপর মহাখাপ্পা। ধারণা ভুল। আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন সেই কারণে পুলিশ প্রফেশনটির ওপর আমার একটা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সফট কর্নার আছে। আগে বলা হত 'চাকরির মধ্যে পুলিশ মাছের মধ্যে ইলিশ'। এখন আর সেরকম বলার কোনো কারণ নেই! ইলিশের পোনা ধরার কারণে বাজারে ইলিশই নেই আর পুলিশের ড্রেস বহুরূপী গিরগিটির মতো বারংবার চেঞ্জ হচ্ছে বলে পুলিশ শনাক্ত করাও বোধহয় মুশকিল হয়ে উঠবে খুব শিগগির। পুলিশ অবশ্য জনগণের বিপদের বন্ধু। কিন্তু প্রায়ই শোনা যায় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে কিংবা ঘটনা ঘটার বহু পরে গিয়ে হাজির হয়েছে।

তবে পুলিশের রঙ যদি পরিবর্তনই হয় আমি বলব পুলিশের ড্রেসটা হওয়া উচিত সাদা। সাদা হচ্ছে আপস করার রঙ আর পুলিশ তো সব সময়ই আপোস করছে কখনো সরকারদলীয়দের সঙ্গে কখনোবা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে...।

পুলিশ নিয়ে কোনো জোক্‌স মনে পড়ছে না বলে বলা গেল না। তবে পুলিশ নিজেই আমাদের জীবনে একটা 'প্র্যাকটিক্যাল জোক' হয়ে আছে বলাই বাহুল্য!

❑

সোলায়মান সাহেব একজন বিশিষ্ট ক্রিকেটপ্রেমিক। 'ক্রিকেটের আধুনিক কলাকৌশল' নামে তার একটা বইও আছে। বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন। ইতোমধ্যে তার দু বার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে থার্ড স্ট্যাম্প পড়লেই মানে তৃতীয় অ্যাটাক হলেই তাকে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করতে হবে। এ কারণে মিসেস সোলায়মান খুবই সতর্ক থাকেন। কার্ডিওলজিস্টের প্রতিটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেন। ডাক্তার বলেছে, কোনো ধরনের উত্তেজনা টেনশন করা যাবে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টেস্ট ক্রিকেটে যখন অসাধারণ খেলল, পরদিন সত্যিকারের বিজয় হয়েই যাবে, সেদিন দৈনিক পত্রিকায় বিশাল হেডিং বেরুল 'টেস্টে প্রথম জয়ের হাতছানি।' মিসেস সোলায়মান ভাবলেন না জিততেই এত বড় হেডিং! জিতলে তো কাগজে হেডিং লেখার জায়গা হবে না। তিনি ঝুঁকি নিলেন না, পত্রিকা সরিয়ে ফেললেন। এত বড় হেডিং! যদি টেনশনে কিছু হয়।

শুধু তাই না তিনি পরদিন মানে টেস্ট ক্রিকেটের শেষ দিন টিভি তো বন্ধ করলেনই মেইন সুইচও অফ করে রাখলেন। কেউ যদি টিভি অন করে দেয়। কিন্তু সোলায়মান সাহেব সেয়ানা। তিনি খেলার খবর জানতে চাইলেন।

—খেলার খবর কী?

—ভালো, বাংলাদেশ ভালো খেলছে জিতে যাবে! তখন শেষ মুহূর্তের দারুণ উত্তেজনাকর খেলা চলছিল। হঠাৎ মিসেস সোলায়মানের মনে হল বাংলাদেশ জিতলে কিংবা হারলে দুটো সংবাদই সোলায়মান সাহেবের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ! দুটোর যে কোনো একটায় তার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। এখন কী করা! ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল অসাধারণ ভালো খেলেও মাত্র ১ উইকেটে হেরে গেছে। এখন এ খবর সোলায়মান সাহেবকে কীভাবে জানানো যায়? তখন মিসেস সোলায়মান এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। ওদিকে সোলাযমান সাহেব তখন হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছেন।

—খেলার খবর কী?

—খেলার খবর ভালো। তার আগে বল তো বাংলাদেশ যদি এ খেলায় জেতে তুমি কী করবে?

কী আর করব, একটা ভালো খবর শোনার জন্য দু রাকাত নফল নামাজ পড়ব।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আর বাংলাদেশ যদি হারে?

—তা হলে রাগে-দুঃখে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের দশ লাখ টাকা তোমাকে দিয়ে দেব? এ সময় ধুপ করে একটা আওয়াজ হল। সোলায়মান সাহেব বুঝতে পারলেন না শব্দটা কোনদিকে হল! তবে তিনি দেখলেন তার সামনে তার স্ত্রী নেই! মানে দাঁড়িয়ে নেই শুয়ে!

মিসেস সোলায়মানের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে! তবে এটাই প্রথম!

❑

আমার জীবনে সিরিয়াস দু জন কুফা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাদের দু জন আজ এত বছর পর কোথায় আছে কে জানে! হয়তো বিদেশেই চলে গেছে। দেশে থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হত। একজনের কথা মনে আছে। সে ছিল লেখালেখি লাইনে কুফা। সে লেখালেখি করত এবং যে পত্রিকায় লেখা পাঠাত সেই পত্রিকাই ধুম করে বন্ধ হয়ে যেত। তখন ছিল লিটল ম্যাগাজিনের যুগ। প্রত্যেক মফস্বল শহর থেকে দুটা–তিনটা কবিতা বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিন বেরুত এবং বলাই বাহুল্য বলা হয়ে থাকে সেই কুফা কবির কারণে (সে কবিতাই বেশি লিখত) একে একে সব পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কুফা ছিল আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে ছিল মোটামুটি বিশ্বপ্রেমিক। ঘন ঘন মেয়েদের প্রেমে পড়ত। এবং যে মেয়ের প্রেমে পড়ত সে মেয়েরই দু মাসের মধ্যে অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যেত। পরে এমন অবস্থা হল যে পাড়ার কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা সব তার কাছে লাইন দিল। না দিয়ে উপায় নেই কারণ তদ্দিনে এটা পরীক্ষিত সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সে প্রেম করলে দু মাসের মধ্যে সেই প্রেমিকার অন্য কোথাও বিয়ে হতে বাধ্য।

হঠাৎ করে কুফা নিয়ে পড়লাম কেন? আসলে সেদিন একটা দৈনিকে দেখি ইরাকের পবিত্র কুফা নগরীর নামে একটা পানীয় এসেছে বাজারে যার নাম 'কুফা কোলা' এবং এই কুফা কোলা বাজারে নেমেই অন্যসব কোলাকে মানে কোকাকোলা, পেপসি কোলা সবাইকে কাঁচকলা দেখাতে শুরু করেছে। ওখানে অবস্থান করা আমেরিকান সোলজাররা পর্যন্ত নাকি কুফা কোলা বলতে অজ্ঞান! মোটকথা কুফা কোলা আর এখন ওখানে কুফা নয়! মার মার কাট কাট ব্যবসা করছে! তবে কি কুফা শব্দটা শুধু আমাদের দেশের জন্যই কার্যকর! বিদেশের জন্য নয়? তাই বা কী করে বিশ্বাস করি। আরেকটা ঘটনা এটা বিদেশের (কোন দেশের তা অবশ্য মনে পড়ছে না)। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। এক লোক সে পৃথিবীর মাটিতে যে কাজই করতে যায় সেটাতেই ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল সে আর মর্ত্যে থাকবে না মহাকাশচারী হবে এবং বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে মহাশূন্যে। কিন্তু সেখানে সে শারীরিক কারণে বাদ পড়ে গেল। তারপর সে প্যারাশুট ডাইভিংয়ে নাম লেখাল। সেটাতে সে চান্স পেল।

যথারীতি প্লেন থেকে ডাইভিংয়ের সব ট্রেনিং শেষে যখন সত্যি সত্যি ডাইভিং করতে যাবে... সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এল একদিন। প্লেনে চড়ে উঠে গেল হাজার ফুট উপরে। প্যারাশুট নিয়ে লাফও দিল। প্যারাশুটও খুলল... কিন্তু ওই যে সে ছিল আসলে কুফা! তার ভাগ্যের প্যারাশুটটাতেই ছিল একটা ছিদ্র... তিনি মোটামুটি মার্বেলের গতিতে এসে মর্ত্যে ল্যান্ড করলেন, মৃত...

তবে তার মর্মান্তিক মৃত্যু এক বিখ্যাত জোক্‌সের জন্ম দিয়ে গেল। সেটা হচ্ছে—

কনডম আর প্যারাশুটের মধ্যে পার্থক্য কী? প্যারাশুটে ফুটো থাকলে মৃত্যু অনিবার্য আর কনডমে ফুটো থাকলে জীবন অনিবার্য।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Mony

❑

আমার উন্মাদ অফিসের পাশেই 'বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন।' সেই সুবাদেই টের পেলাম দেশের মানুষ মঙ্গল গ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী। তারা তাড়া করা শুরু করে একদল উৎসাহী দর্শককে নিয়ে গেল মেঘনায় মঙ্গলগ্রহ দেখাতে। সেখানে দেখলাম শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই আছে, যাকে বলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা... শুধু তাই না অনেক উৎসাহী তরুণ সাংবাদিকও চলেছে। তাদের মধ্যে পরিচিত কয়েকজনকেও দেখতে পেলাম। যেমন প্রথম আলোর নওরোজ ইমতিয়াজ আর সিমু নাসের। তাদের অবশ্য যাবারই কথা। কারণ তারা সাধারণত তারকাদেরই ইন্টারভ্যু করে থাকে আর মঙ্গল তো এই মুহূর্তে দুই অর্থেই তারকা। একটা হচ্ছে আকাশের তারকা, দ্বিতীয়ত বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেলিব্রেটিও বটে!

সে যাই হোক আমি খুব শিগগিরই আবিষ্কার করলাম যে মঙ্গলের ব্যাপারে সবাব আগ্রহ থাকলেও এক শ্রেণীর মোটেই আগ্রহ নেই। সেই শ্রেণীটা হচ্ছে বাড়িওয়ালা। কেননা আমি যখন নিজের বাসার ছাদ থেকে মঙ্গল গ্রহ আবিষ্কার করলাম (পরে অবশ্য জানতে পেরেছি যেটাকে আমি মঙ্গল ভেবেছিলাম সেটা ছিল শুক্র গ্রহ) তখন অতি উৎসাহে আমার পরিচিত অনেককেই ফোন করে জানালাম কিন্তু সবাই এক বাক্যে বলল,

—এখন মঙ্গল গ্রহ দেখা সম্ভব না (তখন রাত দেড়টা)।

—কেন?

—দুটো কারণ। এক নম্বর কারণ এখন বাজে রাত দেড়টা এত রাতে বাড়িওয়ালাকে ডাকলে পরদিন বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিতে পারে।

—আর দ্বিতীয় কারণ?

—দ্বিতীয় কারণ ছাদের চাবি বাড়িওয়ালার কাছে থাকে।

—আশ্চর্য তোদের বাড়িওয়ালার মঙ্গল গ্রহ নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই?

—মঙ্গল গ্রহ? তুই পাগল হয়েছিস; ওই লোকটা আসলে একটা দুষ্টগ্রহ!

যা হোক সবারই এক কথা ছাদের চাবি বাড়িওয়ালার কাছে। কাজেই আমি সহজেই ধারণা করতে পারি যে এই ঢাকা শহরে বাড়িওয়ালা শ্রেণীটা আসলে মঙ্গল গ্রহ বিরোধী এক দুষ্টগ্রহ বিশেষ! এই ধারণাটাকে যখন আমি পুরোপুরি একটা হাইপোথিসিসে রূপ দিতে যাচ্ছি তখনই ভেটো পড়ল... না ভালো বাড়িওয়ালাও আছে! সেটা কীরকম?

এই বাড়িওয়ালা মানে এই ভালো বাড়িওয়ালা ছয় দুগুণে বারটা ফ্ল্যাটের এক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের মালিক। বলাই বাহুল্য, তিনি বিজ্ঞানমনস্ক। তিনি ছাব্বিশ তারিখ থেকেই ছাদে প্যান্ডেল টানিয়ে টেলিস্কোপ লাগিয়ে তৈরি। নির্দিষ্ট দিনে মানে যেদিন মঙ্গল পৃথিবীর সবচে কাছে আসবে সেদিন রাত দেড়টায় তিনি প্রত্যেক ফ্ল্যাটে ভাড়াটেদেব দরজায় কলিংবেল চেপে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন,

—কী হল আপনারা মঙ্গল গ্রহ দেখবেন না? ছাদে চলে আসুন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই কেসে ভাড়াটিয়ারা আবার অবৈজ্ঞানিক। মঙ্গলের ব্যাপাবে তাদের বিশেষ উৎসাহ নেই, তারা যথেষ্ট বিরক্ত হল এত রাতে ডাকাডাকির জন্য এবং দুএকজন তো জানিয়েই দিল... এরকম চলতে থাকলে তারা এ ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য ফ্ল্যাটে উঠে যেত বাধ্য হবেন। হতাশ বাড়িওয়ালারা পরে... পরে আসলে সে বাড়িওয়ালা কী করেছিল সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে যথারীতি মঙ্গল গ্রহ বিষয়ক একটা জে.ও.কে.ই. (ইয়া আল্লাহ অন্য কোনো রম্য লেখকের সঙ্গে যেন কমন না পড়ে!)।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই জে.ও.কে. ইটা সেই সময়কার যখন মনে করা হত মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে। এখন অবশ্য সে ভুল ভেঙেছে। (তবে এই গ্রহে নদী-নালার যে স্ট্রাকচার দেখা যায় তাতে ধারণা করতে দোষ কোথায় যে একদিন এখানে পানি ছিল এবং প্রাণীও ছিল) তো মঙ্গল গ্রহ থেকে একটা সসার উড়ে এল পৃথিবীতে। তাতে দু জন মার্সিয়ান বসা। তারা রাতে এসেছিল বলে কোনো মানুষকে পাচ্ছিল না। তারা যখন একটা গ্যাস স্টেশনের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন খেয়াল করল দু জন মানুষ দাঁড়িয়ে সম্ভবত গ্যাস স্টেশনটা পাহারা দিচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে তারা গুলি চালাল...

ও দুটো আসলে মানুষ ছিল না। ছিল গ্যাস স্টেশনের মিটার টাওয়ার। স্বাভাবিকভাবেই মার্সিয়ানদের আক্রমণে ভীষণভাবে বিস্ফোরিত হল ওই দুটো। বিস্ফোরণের চোটে সসারটাও ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হল। তখন দু জন মার্সিয়ানের একজন বলল—

—তোমাকে তখনই বলেছিলাম যে প্রাণীরা তাদের পেচ্ছাপ করার যন্ত্র কানে পেঁচিয়ে রাখে, তারা সব সময়ই বিপজ্জনক, ওদের গুলি করে কাজ নেই।

এবার আসা যাক সেই বাড়িওয়ালার প্রসঙ্গে যে মঙ্গল গ্রহের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িওয়ালা পরে তার অবৈজ্ঞানিক ভাড়াটেদের নোটিশ দিয়ে উৎখাত করে টুলেট ঝুলিয়ে দেয়, তবে টুলেটের নিচে লেখা ছিল 'সৌরজগতের যে কোনো গ্রহ দেখতে উৎসাহী বিজ্ঞানমনস্ক ভাড়াটে আবশ্যক'। কে জানে আবার কত বছর পর কোন গ্রহ পৃথিবীর কাছে চলে আসে, তাই পুরো সৌরজগৎ কাভার করে বাড়িওয়ালার বিজ্ঞানমনস্ক টুলেট বিজ্ঞাপন আর কি!

❑

এক নামকরা হাসপাতালে কয়েকজন সার্জন মিলে তাদের অপারেশনের ফাঁকে চা খেতে খেতে গল্প করছিল।

১ম সার্জন : আমি অ্যাকাউনটেন্ট রোগীদের খুলতে বেশি পছন্দ করি (এখানে খোলা বলতে সার্জনরা রোগীর শরীর কেটে অপারেশন করা বোঝাচ্ছে)।

২য় সার্জন : কেন?

১ম সার্জন : কারণ তাদের শরীরের ভেতরে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাম্বারিং করা থাকে।

২য় সার্জন : সেক্ষেত্রে আমি পছন্দ করি লাইব্রেরিয়ান রোগীদের।

৩য় সার্জন : কেন?

২য় সার্জন : কারণ লাইব্রেরিয়ানদের শরীর খুললে তাদের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অ্যালফাবেটিক্যালি নাম্বারিং করা থাকে। খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। অপারেশন করতেও সুবিধা।

চতুর্থ সার্জন চুপ করে বসে আছেন। তিনি বয়সে প্রবীণ, অভিজ্ঞও বটে। অন্য তরুণ সার্জনরা তার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

—স্যার আপনি কিছু বলুন। অবশ্য আমরা জানি আপনি সব সময় দেশের মান্যগণ্য দেশপ্রেমিক নেতাদের অপারেশন করে থাকেন।

—হ্যাঁ, আমি সাধারণত সে ধরনের রোগীদেরকেই বেছে নেই। তারাও আমার কাছে আসেন।

—কিন্তু কেন স্যার?

—ওদের অপারেশনে সুবিধা ওদের শরীর খুললে কিছুই থাকে না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—মানে?

—মানে হার্ট, মেরুদণ্ড এবং ব্রেনের মতো জটিল জিনিসগুলো থাকে না বলে অপারেশন দ্রুত সেরে ফেলতে পারি।

সার্জন প্রসঙ্গ থাক মানে হসপিটাল থেকে আমরা বরং রাস্তায় আসি। মানে সার্জন থেকে সার্জেন্টদের কাছে আসি।

হাসপাতালের সার্জনদের মতোই কয়েকজন সার্জেন্ট ডিউটির ফাঁকে রাস্তার ধারের টং থেকে চা খেতে খেতে খোশগল্প করছিল।

১ম সার্জেন্ট : আমি সাধারণত সাদা গাড়ি থামিয়ে ঘুষ খাই। কারণ আমি দেখেছি সাদা গাড়ির ড্রাইভারের কাছে কাগজপত্র থাকে না।

২য় সার্জেন্ট : আমি লাল গাড়ি থামিয়ে ঘুষ খাই ওদের কাছে কাগজপত্র থাকলেও ওরা নার্ভাস থাকে। তাই আগেই টাকা বাড়িয়ে দেয়।

৩য় সার্জেন্ট : আমি নীল গাড়ি থামাই। আমি দেখেছি নীল গাড়িগুলোতে বু বুকে ভেজাল থাকে। ফলে আমি ব্যাপারটা ধরে ফেলে ঘুষ খাই।

চতুর্থ সার্জেন্ট চুপ। অন্য তিনজন তাকে প্রশ্ন করল।

১ম সার্জেন্ট : তুমি কিছু বলছ না যে?

২য় সার্জেন্ট : তুমি কোন রঙয়ের গাড়ি থামাও?

৩য় সার্জেন্ট : সাদা, লাল, নীল না সবুজ?

চতুর্থ সার্জেন্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি ঘুষ খাই না' অন্য সার্জেন্টরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল

—কী বলছ, ঘুষ খাও না মানে?

—আমি সাদা লাল নীল সবুজ কোনো গাড়িই থামাতে পারি না।

—কেন থামাতে পার না?

—আমি যে কালার ব্লাইন্ড!

❑

এই প্রথম ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে আমরা উন্মাদ নিয়ে গেলাম মেলা করতে। চট্টগ্রামের বইমেলায় উন্মাদের স্টল [সৌজন্যে জাগৃতি প্রকাশনী]। আমার সঙ্গে গেল লেখালেখি বিভাগের তরুণ লেখক মাহবুবুল আলম মাসুদ। এ ছাড়া সঙ্গী হলেন সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন মৌলিকের নির্বাহী সম্পাদক হাসান খুরশীদ রুমী, এস.এফ লেখক আহমেদ শিবলী নোমান ও প্রচ্ছদশিল্পী বিপ্লব। শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হল কার্টুন সিন্ডিকেটের জুবায়ের জাহাঙ্গীর।

যাত্রা হল শুরু। ঢাকা টু বীর চট্টগ্রাম। রাতের ট্রেনে বীরের মতোই আমরা চা চিপস আর চাপাবাজিতে সমস্ত ট্রেন গরম করে তুললাম! যথারীতি ভোরে চট্টগ্রামে পৌঁছলাম! চট্টগ্রামে আপাতত হন্টেজ সিন্ডিকেটের ব্রাঞ্চ অফিস আগ্রাবাদ মতান্তরে ঢাকার গুলশান!

দুপুর দুটায় মেলায় গিয়ে সবাই হতভম্ব! ধু ধু মরুভূমি! শুধু উট চরতে বাকি, দুএকজন প্রস্তাব দিল খেজুর গাছের চারা এনে লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? উন্মাদ স্টলের দায়িত্বে আগে থেকে এসে থাকা জুননুর রহমান চট্টগ্রামের স্টেডিয়াম এলাকার সব মাছি প্রায় মেরে শেষ করে এনেছে! বিক্রি একুনে ১২০ টাকা মাত্র!! [বলা বাহুল্য মেলা হচ্ছিল স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায়] এমতাবস্থায় মেলায় থাকা নিরাপদ বোধ করলাম না। কেননা ক্রেতা হিসেবে ঢাকা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থেকে আসা আমরা মাত্র আটজন!! কাজেই দলবল নিয়ে চলে গেলাম পতেঙ্গা বিচে, পৃথিবীর জঘন্যতম বিচ! সমুদ্রের পানিতে যে লোডশেডিং হয় তা ঐ বিচে গিয়ে টের পাওয়া গেল। আরেকটা মজার ব্যাপার দেখলাম বিচে, সেটা হচ্ছে 'ওপেন এয়ার বার' সবাই সমানে বিয়ার হুইস্কি এন্তার কিনছে এবং বসে দিব্যি খাচ্ছে! দুএকজন পুলিশ ঘুরছে তাদের নাকের ডগায়, কুচ পরোয়া নেহি! এই দৃশ্য দেখে দলের কারো কারো গলা 'শুন্যে' উঠলেও দলের কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে আমি তা নাকচ করে দিলাম। এবার সূর্যাস্ত দেখার পালা! কৃত্রিম পাথরের উপরে বসে সবাই প্রস্তুত সূর্যাস্ত দেখবে। ক্রমে সূর্য লাল টেনিস বলে রূপ নিল। তারপর আচমকা বিনা নোটিশে হুট করে তলিয়ে গেল অতল সমুদ্রে! তার ডোবার ধরন দেখে মনে হল না আগামী কাল আদৌ আবার উঠবে! হতাশ হয়ে দলবল নিয়ে ফিরে এলাম আবার বইমেলায়। এসে দেখি ঢাকা থেকে সাহিত্যালোচনা করতে এসেছেন ড. হুমায়ুন আজাদ। প্রথমে তিনি দেশের জনপ্রিয় লেখককে আক্রমণ করলেন তারপর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে অতঃপর বাঙালি জাতিকে... এ পর্যায়ে বাঙালি জাতিও পাল্টা আক্রমণ করে বসল... এমতাবস্থায় মেলা কমিটির হস্তক্ষেপে সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল!

কিন্তু আমাদের থাকা পর্যন্ত মেলা মোটেই জমল না। বীর চট্টগ্রাম দেখা গেল বই কেনায় কাপুরুষ! তবে কিছু কিছু দর্শক আশ্বাস দিয়ে গেল 'তারা এখন দেখছে পরে কিনবে' সেই 'পরে' যে কবে তা অবশ্য বোঝা গেল না।

পরদিন আবার দুটা থেকে মেলা অতএব তার আগ পর্যন্ত সময় কাটাতে সদলবলে চলে গেলাম ফয়'স লেকে। সিভিকেটের জুবায়ের জানাল দেশের সর্ববৃহৎ সিংহটি রয়েছে ফয়'স লেকের চিড়িয়াখানায়! ক্রমে আলোচনায় সেই বৃহৎ সিংহটি হারকিউলিসের ড্রাগনে রূপ নিল! তবে আমরা চিড়িয়াখানাই খুঁজে পেলাম না! ঠিক হল পাহাড় থেকে লেকটা দেখতে কেমন দেখায় দেখা যাক, যাকে বলে বার্ডস আই ভিউ! দুর্গম নির্জন পাহাড়ে উঠতে নেতৃত্ব দিল ছিপছিপে লেখক মাহবুবুল আলম মাসুদ। তরতর করে সে দিব্যি উঠে গেল পাহাড়ের চূড়ায়, এ এলাকা নাকি তার পদনখদর্পণে!

বার্ডস আই ভিউ বাস্তবিকই চমৎকার!! মনে হল মেলার ব্যর্থতা এই লেক দেখায় অনেকখানিই পুষিয়ে দিল। পাহাড়কে অবশ্য যতটা নির্জন ভেবেছিলাম বাস্তবে তা নয়, প্রতিটি গুহায় মানব-মানবী! না কোনো গুহা মানব-মানবী নয় চট্টগ্রামের রোমিও-জুলিয়েট! অতঃপর পাহাড় থেকে মেলায় মানে ফ্লপ মেলায়!

অতঃপর ব্যাকটুদা প্যাভেলিয়ন। ফেরার পথে যে ট্রেনে এলাম সেখানে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে! এক. চা প্রতি কাপ ২০২ টাকা! দুই. বিপ্লবের 'কানা বিপ্লবে' রূপান্তর! চা প্রতি কাপ ২০২ টাকার শানে-নযুল হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা বগি হওয়ায় চা খেতে হলে ট্রেনের চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দোকান থেকে ২ টাকা দিয়ে চা কিনে খাওয়া! তার মানে চেন টানার জন্য ২০০ টাকা জরিমানা আর চা ২টাকা একুনে ২০২ টাকা! কানা বিপ্লবের শানে-নযুল হচ্ছে ট্রেনের বাইরে থেকে ছুটে আসা ঢিল লেগে তার এক চোখ সাময়িকভাবে স্থগিত। এর মধ্যে সঞ্জীবের গান ধরল চন্দন 'তোর ভিন্ন চোখে ভিন্ন ছবি...'

চট্টগ্রাম ভ্রমণে এক ফাঁকে আমরা দলের কিয়দংশ গিয়েছিলাম 'ওয়ার সিমেট্রিতে' সেখানে আঠার বছর বয়সি এক সোলজার জন্মের এপিটাফে লেখা... 'হি গেভ হিজ টুডে ফর আওয়ার টুমোরো...' কী চমৎকার কথা! জনের উৎসর্গীকৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রইলাম সুন্দর আগামীর অপেক্ষায়...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

❑

নিচের ভ্রমণ রম্যটি আমারই লেখা। উন্মাদে কী এক রহস্যময় উদ্দেশ্যে অন্য নামে ছেপেছিলাম এ বইয়ে স্বনামেই গেল।

উন্মাদের ধানমণ্ডি অফিসে গিয়ে একদিন আহসান ভাইকে বললাম, 'আহসান ভাই উন্মাদ অফিস থেকে একটা পিকনিক করা জরুরি, দরকার হলে সবাই চাঁদা দেই।' তিনি বললেন, 'চাঁদা? উন্মাদ অফিসে চাঁদাবাজি?? হাউ ডেয়ার ইউ...? তুমি জান মানি ইজ নো প্রবলেম?' উন্মাদে যখন কেউ বলে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' তখন বুঝতে হবে 'মানি ইজ বিগ প্রবলেম!!' তবু যাহোক বহু দেনদরবার করে আমরা একদিন এক কাকডাকা ভোরে [মানে সকাল ৯টায়] একটি ভাঙাচোরা মাইক্রোবাস ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম উন্মাদসংশ্লিষ্ট ১১জন [অবশ্য আমি বাদ! তা হলে এ গল্প কীভাবে লিখছি? সে আরেক রহস্য!!]। জার্নির একটা নাম দেয়া হল 'জার্নি টু দা সেন্টার অফ দা আর্থ'। হ্যাঁ আমরা ১১ জন আহসান ভাই [সম্পাদক], সাগর ভাই [ব্যবস্থাপনা সম্পাদক], রুমী ভাই [মৌলিকের নির্বাহী সম্পাদক], তাপস ভাই [উন্মাদের নির্বাহী সম্পাদক], মুস্তাফিজ ভাই [উন্মাদের সহযোগী সম্পাদক], নোমান [এস.এফ.লেখক], সুজন হায়দার [টেলিফোন গাইড বাদে দেশের আর সব পত্রিকার লেখক], জুন্নুন 'দি বস' [কম্পিউটার বিশারদ], ছড়াকার ডা. রোমেন রায়হান, রাজন ও আমাদের স্পেস শিপের পাইলট শাহীন মোট ১১ জন অর্থাৎ ওরা ১১ জন! এ ছাড়াও আমাদের সঙ্গে চলেছেন ৫ জন মুরগি—তিনজন জীবিত, দু জন মৃত [রোস্টের জন্য!]

সায়েদাবাদের কাছে এসে গাড়ির থুড়ি স্পেস শিপের পাইলট জানতে চাইল এবার কোনদিকে যাব? আহসান ভাই বললেন, 'কেন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে' আরেকজন বললেন, 'যেদিকে দু চোখ যায়...' পাইলট বিরক্ত হয়ে জানাল, 'জলদি কন জলদি কন নাইলে কইলাম গাড়ি ঘুরায়া গ্যারেজে ঢুকায়া দিমু...' জুন্নুনও [সে আবার ব্ল্যাক বেল্ট!] হুমকি দিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিসিশন না নিলে সেও নেমে যাবে কারণ অলরেডি আরো দুটো পিকনিকে চাঁদা দিয়ে রেখেছে দরকার হলে ওগুলোতে অ্যাটেন্ড করবে...।

যাহোক শেষ পর্যন্ত গাড়ি ছুটল সিলেটের দিকে [পৃথিবীর কেন্দ্র বোধ করি সিলেটের দিকেই! ড. নোমান কী বলেন?] সিলেটের চা বাগানের মধ্য দিয়ে যখন ছুটে চলেছি... দু পাশের চমৎকার দৃশ্যে আমরা সবাই ভাবগম্ভীর মুডে... ঠিক তখন... বুম!! আমরা আঁতকে উঠলাম! শান্তিচুক্তির পর কি শান্তিবাহিনী চা বাগানে ঘাপটি মেরেছে?! না! টায়ার বাস্ট! গাড়ি হুড়মুড় করে পাশের এক চা বাগানে ঢুকে পড়ল যেন চা খেতে।

ড্রাইভার গম্ভীরভাবে জানাল, 'চিন্তার কিছু নাই দুইটা স্পেয়ার চাকা আছে'। গাড়ির পিছনের বনেট খুলে দেখা গেল উন্মাদের চশমার মতো দুই স্পেয়ার চাকাই পাশাপাশি বিদ্যমান তবে একটা লিক আরেকটার ভিতরে টিউবই নেই... অতঃপর ঠেলা ইনজিন!! প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ঠেলার পর টায়ার-টিউবের দোকান পাওয়া গেল [ঠেলা ইনজিন জুন্নুন ও নোমানের কাছে কৃতজ্ঞ]।

চাকা ঠিক করে সিলেটের মাধবকুণ্ড ঝরনায় পৌছতে পৌছতে বিকাল চারটা! দেশের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক ঝরনা! অপূর্ব দৃশ্যের সামনে গিয়ে আমরা ১১ জনই মোহিত! আমরা প্রত্যেকে একটি করে ঝরনা দেখে মোহিত হলেও একজন কিন্তু দুটা ঝরনা দেখল [কেননা গাড়িতে বসে সে হালকার উপর দিয়ে চিকনে কিছু 'পান' করেছিল, সে আরেক বিরাট ইতিহাস!]।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এ প্রসঙ্গে বলা যায় এই চমৎকার প্রকৃতিটিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছে পর্যটন কেন্দ্র! তারা কাছেই [এত কাছে না হওয়াই উচিত ছিল] কুৎসিত একটা ভবন তৈরি করছে [তাও অসম্পূর্ণ] যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছোটখাটো নানান কিসিমের দোকানপাট... মোটামুটি ছোটখাটো বাজার গড়ে উঠেছে... অপূর্ব এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট তারপরও পিকনিক পার্টি আসছে দলবেঁধে মুরগির হাড্ডি চিবিয়ে ফেলে যাচ্ছে ঝরনার টলমলে জলে...

ছবি তোলার দায়িত্ব যাকে দেয়া হয়েছিল সে বলেছিল সে ভি.ডি.ও থেকে শুরু করে এস.এল.আর, টি.এল.আর সব ধরনের ক্যামেরাই সঙ্গে নিয়েছে... বাস্তবে দেখা গেল কুল্লে একটি খেলনা ক্যামেরাই সঙ্গে এসেছে! তাই দিয়ে গ্রুপ ছবি। বাই দিস টাইম তিন জন কাপড় খুলে নাগা সন্ন্যাসীর মতো ঝরনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল... তাপস ও রোমেন মিসিং... তারা চলে গেছে ঝরনার উৎস সন্ধানে...।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে কিন্তু রান্নার খবর নেই, হঠাৎ খেয়াল হল সবার! ঝরনার কাছে পিঠেই তৈরি করা হল আগুন, ঢাকাতে গার্মেন্টসে যেভাবে ধুপধাপ আগুন লেগে যায় বাস্তবে দেখা গেল আগুন জ্বালানো বোধ করি পৃথিবীর কঠিনতম কাজ! যাহোক আগুন জ্বলল বহু কষ্টে [পৃথিবীর প্রথম আগুন জ্বলতেও বোধ করি এত কষ্ট হয় নি!]। এবার রান্নার পালা। নানা মুনির নানা মত, কেউ বলে পানি কম চাল বেশি, কেউ বলে চাল বেশি—এই নিয়ে মারামারি লাগার উপক্রম। অবশেষে জুন্নুন দি বস আর রাজনের হস্তক্ষেপে সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল। এর মধ্যে আরেক সমস্যা মুরগি জবাই করতে গিয়ে এক মুরগি ছুটে গেল... তার পিছে ছুটতে ছুটতে একজন প্রায় সোজা সিলেট মূল শহরে পৌঁছে যাওয়ার অবস্থা। রোস্টের জন্য যে দু জনকে ঢাকা থেকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল দেখা গেল তারা দু জনই বয়সে যথেষ্ট প্রবীণ হেতু কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছেন না! 'দাঁড়ান আমি ব্যবস্থা করতেছি' বলে আমাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাগর ভাই দাঁতে টেনে ছিঁড়তে গিয়ে দুই দাঁত নড়িয়ে ফেললেন কিন্তু কোনো ব্যবস্থা হল না...

যাহোক শেষ পর্যন্ত জুন্নুন দি বিগ বস ও রাজনের কল্যাণে শেষ পর্যন্ত প্রবীণ মুরগি ও নবীন টমেটো দিয়ে কোনোমতে খাবারদাবার শেষ করে আমরা যখন গাড়িতে ওঠার পরিকল্পনা করছি তখন দেখা গেল সিলেট থেকে ধাওয়া করে মুরগি ধরে এনেছেন ড. নোমান!

খাওয়াদাওয়া শেষ এস.এফ. লেখক রুমী ভাই ঘোষণা দিলেন পুরস্কারের... এবার পুরস্কার দেয়া হবে সবাইকে... ঝরনার উৎস বিজয়ের জন্য রোমেন ও তাপস পেল দুই সুদৃশ্য বদনা! মনের ময়লা দূর করতে একজন পেল ধুন্দুলের ছোবা [যদিও তার শরীরে ঈশ্বরের কৃপায় ময়লার অভাব নেই]। বিশালদেহী ড. নোমান পেল শিশুদের বিব... [অন্যান্য পুরস্কারের কথা এখানে লেখা সম্ভব হচ্ছে না]।

ঢাকা ফিরতে ফিরতে রাত দুটা। অবশ্য পথে রোমেনের বদনা বিশেষ কাজে লেগেছে! ওরা ১১ জনের মধ্যে ওরা দু জন ঘন ঘন গাড়ি থামিয়ে...। যাহোক আমরা সুস্থ দেহে ঢাকায় পৌঁছেছি শেষ পর্যন্ত এটাই বা কম কী!

❑

উন্মাদের স্টাফ আর বন্ধুবান্ধব মিলে একটা ভাড়া মাইক্রোতে করে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম কক্সবাজার। মাঝ পথে প্রবল বর্ষণ শুরু হল। কক্সবাজার যখন পৌঁছলাম তখন দেখি হোটেলের বারান্দায় সমুদ্র চলে এসেছে কষ্ট করে আর সমুদ্র দেখতে বিচে যেতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না। হোটেলে ঢুকে আমরা আটকে গেলাম। কোথায় ঘোরাঘুরি করব তা নয় হোটেল রুমে 'নিজ গৃহে পরবাসী...'। অবশ্য দুএকবার বৃষ্টিতে ভিজে বেরুলাম কিন্তু কাঁহাতক আর বৃষ্টিতে ভেজা ভালো লাগে। একজন আবার বুদ্ধি করে বার্মিজ ছাতা কিনে নিয়ে এল। সেই রঙচঙে ছাতা যারাই ব্যবহার করেছে তাদের জামাকাপড়ই ঐ ছাতার মতো বৃষ্টির পানিতে রঙ উঠে রঙচঙে হয়ে উঠেছিল।

সম্ভবত ভ্রমণের ইতিহাসে সবচাইতে জঘন্যতম ভ্রমণ ছিল আমাদের ঐ ট্যুরটা। প্যাচপেচে বৃষ্টিতে সবাই বোর হয়ে উঠেছিলাম ক্রমশই। আমি একঘেয়েমি কাটানোর জন্য প্রস্তাব করলাম চল প্ল্যানচেট করা যাক। সবাই হইহই করে উঠল 'ঠিক ঠিক এটাই উপযুক্ত কাজ' শুধু একজন বেঁকে বসল 'এসব দুই নাম্বারি কাজে সে নাই'। বলাই বাহুল্য তার নিজের রুম নম্বরটাই কিন্তু ছিল 'রুম নং ২'। সে যাই হোক দুই নম্বর রুমের সেই বিদ্রোহীকে বাদ দিয়েই আমরা এক বৃষ্টিস্নাত রাতে হোটেলের সবচেয়ে বড় রুমটায় সমবেত হলাম। শুরু হল প্ল্যানচেট। ঘড়িতে তখন রাত দুটো।

ঘণ্টাখানেক কুস্তি করেও আমরা কোনো আত্মার সন্ধান পেলাম না। একজন প্রস্তাব করল একটু রেস্ট নিয়ে আবার ট্রাই করা হোক। তা সিগারেট খেয়ে তিনটার দিকে আমরা আবার বসলাম। প্রত্যেকেই বাম হাতের উপর ডান হাত দিয়ে। একজন বলল, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আত্মাকে ডাকা হোক, কেননা কবিগুরু নিজেও শেষ জীবনে প্ল্যানচেট করতেন এবং যারা প্ল্যানচেট করে তাদের ডাকে নাকি এখনো সাড়া দেন। খালি ডাকার অপেক্ষা মাত্র।' ঠিক হল তাকেই ডাকা হবে। শুরু হল সেকেন্ড রাউন্ড—

এই সময় হঠাৎ কোথাও বজ্রপাত হল। সেই সঙ্গে দমকা হাওয়ায় ঘরের মোমটা গেল নিভে। ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠল সবাই 'তবে কি কবিগুরু চলে এলেন?' ঠিক সেই সময় একটা আর্তচিৎকার, না আমাদের ঘরে না পাশের কোনো রুম, সম্ভবত নং ২ থেকে। আমার প্ল্যানচেট বিরোধী বন্ধু গোঁ গোঁ করছে, মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে! তবে চক্রে না বসেও সে মিডিয়া হয়ে গেল? তার উপরই আত্মা ভর করেছেন কবিগুরু? একজন আবার ফিসফিস করে প্রশ্ন করল, 'গুড সউল হ্যাভ ইউ কাম?' আরেকজন দাঁত কিড়মিড় করে উঠল, 'গাধা কবিগুরুকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করছিস তোর সাহস তো কম নয়...' বলে সে বাংলায় প্রশ্ন করল, 'হে মহান আত্মা আপনি কি এসেছেন?' কবিগুরু তখন ধাতস্থ হয়ে উঠে বসেছে। পরে তার কাছে যা শুনা গেল সে নাকি শুয়েছিল। দরজা বন্ধ। হঠাৎ দেখে দরজার কাছে কালো আচকান পরা একজন দাঁড়িয়ে। লম্বা সাদা দাড়ি... তারপর আর তার কিছু মনে নেই। যাহোক সে রাতটা অবশ্য আমাদের ভালোই কাটল। কবিগুরু যে সত্যিই এসেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভুল করে অবশ্য অন্য রুমে ঢুকে পড়েছিলেন সেটা তার দোষ নয়, বয়স হয়েছে। পরদিন আমাদের ফেরার পালা। সবাই একে একে মাইক্রোতে উঠে বসেছি। এসময় হোটেলের রুম এটেনডেন্ট এসে হাজির বকশিশের জন্য। সবাই খেয়াল করে দেখলাম লোকটা লম্বা একটা কালো আচকান পরে আছে। আগে খেয়াল করি নি তার সাদা দাড়িও বেশ লম্বা। আমরা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। গাড়ি তখন স্টার্ট নিয়েছে ঢাকা ফেরার জন্য।

❑

একটা সময় ছিল যখন বলা হত 'চাকরির মধ্যে পুলিশ আর মাছের মধ্যে ইলিশ।' তখন চাকরির মধ্যে পুলিশ বাক্যটির মধ্যে ঘুষ, চাঁদাবাজি, টাকাপয়সা ছিল না। তখন পুলিশ ছিল


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটা সম্মানজনক পেশা। সবাই ভয়ও পেত সমীহও করত। আর মাছের মধ্যে ইলিশ তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঐ দুটি বিষয়ই এখন বিলুপ্তির পথে। নদীর নাব্যতা হ্রাস, জাটকা ধরা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণে ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র নাকি বাংলাদেশ সীমানায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ইলিশের স্রোত এখন আর ডিম পাড়তে দল বেঁধে বাংলাদেশ সীমানায় ঢুকছে না। আর 'সেই পুলিশ' মানে জনগণের বিপদের বন্ধু পুলিশ তো সেই কবেই উঠে গেছে!

আরেকটি জিনিস উঠে গেছে যেটা আমি জানতামই না। সেটা হচ্ছে পাঠ্য তালিকা থেকে 'পাটিগণিত'। আমার এক বন্ধুকে ব্যাপারটা বলতেই সে হায় হায় করে উঠল

—তা হলে সেই বাঁদরের কী হবে?

—কোন বাঁদর?

—সেই যে পাটিগণিতের অঙ্কের তৈলাক্ত বাঁশের বাঁদর?

তাই তো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি নি! সেই তৈলাক্ত বাঁশের বাঁদর তো তা হলে একদম বেকার হয়ে গেছে!

বরং একটা গল্প শোনা যাক। অঙ্কের তৈলাক্ত বাঁশের বানর বেকার হওয়ার পর একদিন গেল সেই জ্ঞানী তিন বানরের কাছে। গিয়ে দেখে তাদের সবাই আগের মতোই আছে। একজন চোখে হাত দিয়ে (সি নো এভিল), একজন কানে হাত দিয়ে (হিয়ার নো এভিল), একজন মুখে হাত দিয়ে (স্পিক নো এভিল)। সে তাদের কাছে যেয়ে বলল

—তোমরা তো তবু একটা কাজের মধ্যে আছ আমি তো বেকার হয়ে গেলাম।

—কেন?

—বাহ পাটিগণিত উঠে গেল না? তৈলাক্ত বাঁশের সেই অঙ্কও নেই।

—ও, তবে কী জান... মুখ খোলা বানরটি বলতে শুরু করল। আমরা কাজের মধ্যে আছি ঠিক কিন্তু তোমার মতো বেকার থাকাই বোধ হয় ভালো ছিল। অন্তত সৎ থাকতে পারতাম।

—কেন?

—আমাদের তিন জ্ঞানী বানর বলা হলেও আমরা আসলে তিন পাপী বানর।

—কীরকম?

—তোমাকে সত্যি কথাটাই বলি সেই আদি যুগ থেকেই কিন্তু আমরা স্থান বদল করে আসছি।

—মানে?

—মানে আমি এখন ধর চোখ ঢেকে আছি কাল দেখবে আমি কান ঢেকে থাকব আর যে কান ঢেকে ছিল সে মুখ ঢেকে থাকবে আর মুখ ঢেকে ছিল যে সে চোখ ঢেকে ফেলবে। তিনজনই একরকম বলে কেউ বুঝতে পারে না।

—বল কী তা হলে তো ঘুরেফিরে তোমরা আসলে যুগ যুগ ধরে সবই শুনছ দেখছ এবং হয়তো বলছও।

—ঠিক তাই!

কিংবদন্তির তিন জ্ঞানী বানরের নির্মম সত্য জেনে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে ফিরে চলল অবসরপ্রাপ্ত ক্লান্ত তৈলাক্ত বাঁশের বানর!

—কোথায় চললে? চেঁচিয়ে জানতে চাইল একজন।

—যাই কোনো চিড়িয়াখানায়, খাঁচায় ঢুকে বসে থাকি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তার দরকার কী? আমাদের এক পাশে বসে পড় না কেন।

—তোমরা না হয় একজন চোখে একজন কানে একজন মুখে হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছ। আমি কী ঢাকব?

ফিক করে হেসে ফেলল তিন বানর! 'সেটাও তোমাকে বলে দিতে হবে? তুমি না তৈলাক্ত বাঁশের বানর!'

❑

ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল এ প্রসঙ্গে লেখার আগে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া প্রসঙ্গে লিখি। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কথাটা বিপজ্জনক প্রসঙ্গে। কিন্তু এই দৃশ্য আমি দেখেছিলাম চিড়িয়াখানায়। ব্যাপারটি আমার কাছে তত বিপজ্জনক মনে হয় নি। তখন মিরপুর চিড়িয়াখানায় জিরাফ ছিল। দেখি জিরাফ আর ঘোড়া এক খাঁচায়। জিরাফ তার লম্বা গলা ঘোড়ার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা উঁচু টেবিলে রাখা ঘাস খাচ্ছিল। অর্থাৎ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছিল। ঘোড়াটি যথেষ্ট ভদ্র সে কিছুই বলছিল না। দর্শকরাও যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে দেখছিল এই দৃশ্য। হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে হাউকাউ লেগে গেল! কী ব্যাপার এক দর্শক দেখি চিৎকার করে উঠল।

—ঐ মিয়া ঘোড়া ডিঙায়া ঘাস খান, দেহেন না আমি এই খানে খারাইছি... ইত্যাদি ইত্যাদি মানে ব্যাপারটা হল কী এক লোক সপরিবারে জিরাফ-ঘোড়ার ঘাস ভক্ষণ দেখছিল। তাদের ডিঙিয়ে আরেক লোক সেও সপরিবারে তাদের গলা বাড়িয়ে দিয়েছে তাই নিয়ে ঐ উষ্ণ বাক্যালাপ।

এক লোকের ছিল এক বোকা চাকর। চাকর এতই বোকা যে, ঠিকমতো কাজ করত না উল্টাপাল্টা করে ফেলত। তো লোকটি তার বোকা চাকরের হাতে একটা লিস্টি ধরিয়ে দিল।

—এখন থেকে এই লিস্ট ধরে ধরে কাজ করবি।

—জে আজ্ঞে।

তো একদিন ঐ লোক ঘোড়ায় চড়ে বাজার করে ফিরছিল। পিছনের ঘোড়ায় মালপত্র নিয়ে আসছিল বোকা চাকর। বাড়ি এসে মালপত্র নামানোর পর দেখা গেল পিছনের ঘোড়ায় একটা বস্তা নেই।

—বস্তা কই গেল?

—রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল।

—রাস্তায় পড়েছিল তুই উঠালি না কেন?

আপনার লিস্টিতে তো মাল উঠানোর কথা লেখা ছিল না।

হতাশ মালিক এবার চাকরের লিস্টিতে আরেকটি লাইন সংযোগ করলেন, 'ঘোড়া থেকে কিছু মাটিতে পড়লে উঠাতে হবে'।

এর ক'দিন পর চাকরকে পাঠালেন বাজারে চালের দর কেমন জেনে আসতে। চাকর ঘোড়া নিয়ে ছুটল বাজারে চালের দর জানতে। ঘণ্টা দুয়েক পর হন্তদন্ত হয়ে ফিরল সঙ্গে বিরাট এক বস্তা। বস্তা থেকে অবশ্য প্রচুর বাজে গন্ধ বেরুচ্ছিল।

—এটা কিসের বস্তা?

—ঐ যে আপনে বললেন না ঘোড়া থেকে মাটিতে যা পড়বে তা তুলতে হবে। তুলে নিয়ে এসেছি।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কিন্তু ঘোড়ায় তো কোনো বস্তাই ছিল না।

—জি ছিল না, কিন্তু সারা রাস্তাই বদমাশটা বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে হুজুর, সবই তুলে এনেছি।

তবে এটা স্বীকার করতেই হবে প্রাণী হিসেবে ঘোড়া একটি অতি বুদ্ধিমান প্রাণী। এই বুদ্ধিমান প্রাণী নিয়ে আরেকটি গল্প শোনা যাক। অবশ্য এই গল্পে একটু ফ্যান্টাসির গ্যাটিস আছে।

এক লোক গাড়িতে করে চলেছে হঠাৎ গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল। সে নেমে দেখে রেডিয়েটরে পানি নেই আগুনের মতো গরম হয়ে আছে। কী করা। আশপাশে কোনো মানুষজন নেই। হঠাৎ দেখে একটা সাদা ঘোড়া ছুটে আসছে সে ভাবল নিশ্চয়ই ঘোড়ার উপর মানুষও থাকবে তার কাছ থেকে জেনে নেয়া যাবে পানি কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘোড়াটা কাছে আসার পর দেখা গেল শুধুই একটা সাদা ঘোড়া কোনো মানুষ নেই! কিন্তু ঘোড়াটা গাড়ির কাছে এসে থেমে গেল এবং পরিষ্কার মানুষের গলায় বলে উঠল

—পানি ঐ সামনে গিয়ে ডানের রাস্তায় গেলে পাবেন।

—ঘোড়ার গলায় মানুষের কথা শুনে লোকটি ভয়ে আতঙ্কে ছুটতে লাগল গাড়ি ফেলে। ঘণ্টাখানেক দৌড়ানোর পর একটা লোকালয়ে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। আশপাশ থেকে লোকজন এসে ভিড় করল।

—কী হয়েছে ভাই, এত হাঁপাচ্ছেন কেন?

—দৌড়েই বা এলেন কোথা থেকে?

—আরে বলবেন না একটা ঘোড়া মানুষের গলায় কথা বলল আমার সাথে।

—কী রঙের ঘোড়া বলেন তো?

—সাদা।

—সাদা ঘোড়ার কথা বিশ্বাস করবেন না, সাদা ঘোড়াগুলো সব মিথ্যা কথা বলে। লোকটির কথায় অন্য সবাই সমর্থন জানাল, 'ঠিক ঠিক সাদা ঘোড়াগুলো সব মিথ্যাবাদী।'

শুরুতে ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল প্রসঙ্গে লিখতে চেয়েছিলাম। ক্ষমা করবেন পাঠক এ প্রসঙ্গে আমি আসলে কিছু জানি না।

❑

সোলায়মান সাহেব বাংলার শিক্ষক। স্থানীয় একটি সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা পড়িয়ে আসছেন। প্রায় তের বছর। আজ মাসেরও তের তারিখ। পকেটে হাত দিয়ে টের পেলেন, যে কটা টাকা অবশিষ্ট আছে গুনলে বোধ করি ঐ তেরই হবে। গোনাগুনিতে আর গেলেন না, ফের সেই গল্পটি মনে পড়ল তাঁর। সেই যে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা'... গ্রামের এক পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে গল্প, পণ্ডিত মশাই ছাত্রদের একটি অনুপাতের অঙ্ক কষতে দিয়েছেন। অঙ্কটি হল ইংরেজ সাহেবের তিন ঠ্যাংওয়ালা কুকুরের পিছনে মাসিক খরচ পড়ে ৭৫ টাকা আর পণ্ডিত মশাই পান ২৫টাকা তবে পণ্ডিত মশাইয়ের আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার কুকুরের কয় ঠ্যাং–এর সমান হবে?

ঐ অঙ্কটি বোধ করি করার সময় এখন উপস্থিত। না করেই বা উপায় কী। তার ঘরেও যে পণ্ডিত মশাইয়ের মতো আট সদস্য। বৃদ্ধ বাবা, মা, বেকার ভাই, বিবাহযোগ্য বোন, স্ত্রী, দুই সন্তান আর তিনি নিজে। মাস শেষে বেতন পান কুল্লে সাড়ে চার হাজারের মতো। টিনশেড দুই রুমের বাড়ি ভাড়া পনেরশ [বাড়িওয়ালা অবশ্য মধুর হাস্যে জানিয়েছেন


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিরেই শ তিনেক ঐ সঙ্গে ধরে না দিলে হেঁ হেঁ এই বাজারে, ইত্যাদি ইত্যাদি]। এক মন ল ৬০০ (মোটাই সই) এক টিন দুধ ২৫০ [বৃদ্ধা মা অভিযোগ করেন 'তোর বাবা আমাকে ব সময় খাঁটি গরুর দুধ খাওয়াত আর তুই আমাকে কী খাওয়াস?']।

এক ভাগ কুচো চিংড়ি ১০টাকা [ও নামেই ভাগা] আর পুঁইশাকের কেজি ৫টাকা। বৃদ্ধ তো মাঝে মধ্যে অনুযোগ করেন 'আর কিছু না পারিস' ছেলেপুলেকে ডালটা অন্তত খাওয়াস 'র উপরে আমিষ নেই। তো সেই আমিষ ১ কেজি ২৮টাকা। চাল তো আর শুধু চিবিয়ে াওয়া যায় না। চালকে ভাতে পরিণত করতে এবং শুধু শাক, কুচো চিংড়ি ও মসুরির ডালকে াকস্থলীর গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রয়োজন আগুন ও পানি। সেটাও সোলায়মান সাহেবকে গদ মূল্যে ক্রয় করতে হয়। সোলায়মান সাহেবের মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয় দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরের দরদি বিজ্ঞানীদের কাছে অনুরোধ করেন তাদের ঐ একমাত্র মহতী আবিষ্কার' ঊর্ধ্বমুখী কুপির পর এমন একটা কিছু আবিষ্কার করুন যাতে আগুন ও পানি ছাড়া াকস্থলী চাল ডাল কুচো চিংড়ি ও পুঁইশাককে গ্রহণ করতে পারবে। আলু, মরিচ, মশলাপাতি বই না হয় বাদ দিলেন। বাদ না দেবেনই বা কেন?

নুন—সে তো রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে।

তৈল—ভেজাল তৈল না খাওয়াই মঙ্গল। আর্থিক সাশ্রয় তো আছেই উপরন্তু রক্তের লাহিতকণিকারা ধারেকাছেও ভিড়তে পারবে না।

হলুদ ধনিয়া মরিচ—অহেতুক কেন পেপটিক আলসারের শিকার হবেন।

পেঁয়াজ রশুন—কেন উত্তেজিত হবেন?

শিক্ষকদের সর্ব অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা থাকা দরকার।

কাঁচা মরিচ—বাহুল্য খরচ...

তা হলে হিসেবটা কী দাঁড়াল? মনে মনে হিসেব করতে করতে ঘর্মাক্ত সোলায়মান াহেব গলিতে ঢোকেন? গলিই বটে, সরু নোংরা যার আরেক মাথায় সোলায়মান সাহেবের টনশেড। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার। তাতে তার ক্ষোভ নেই কারণ শিক্ষকতা মহান পেশা। এ পশার লোকরা চিরকাল অন্ধকারে থেকে জ্বালিয়ে যাবেন আলোর মশাল।

মশাল না হয় জ্বালাবেন কিন্তু আপাতত ঘরের যে একটি হারিকেনও জ্বলছে না। তলহীন শূন্য হারিকেন হাতে সোলায়মান সাহেব ছুটলেন গলির মোড়ের মুদির দোকানে। ছলেকে পাঠাবেন সে উপায় নেই। এই সময়টা সে টিউশনি করে (তারও তো হাতখরচ াই)। বেকার ভাইটা নির্ঘাত কোনো অফিস-আদালতে ধন্না দিয়ে ফেরার পথে মুচির কাছে ুতো জোড়া হাফসোল করাচ্ছে।

—স্যার হারিকেন হাতে আপনি?

সংবিৎ ফেরে সোলায়মান সাহেবের—তার কোনো ছাত্র হবে হয়তো।

—হ্যাঁ হারিকেন।

স্বীকার করেন সোলায়মান সাহেব, 'হ্যাঁ ওটা আমার হাতেই বটে।' তেলহীন শূন্য ারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে সোলায়মান সাহেব হাসেন। বড় অমায়িক হাসি।

*[জনৈক সরকারি প্রতাষকের খোলা চিঠি অবলম্বনে]*

ী

দেশের অবস্থা ভালো না' সবার মুখেই এক কথা। কিন্তু কতটা ভালো না? বরং চলুন একটা াল্প দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যে কতটা খারাপ। জাহাজডুবিতে বাংলাদেশের এক লোক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনোমতে সাঁতরে এক নির্জন দ্বীপে আশ্রয় নিল। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপে কোনো জনমনুষ্য নেই। মাত্র সেই নিঃসঙ্গ বাংলাদেশের নাগরিক। তো দিন যায়... মাস যায়... বছর যায়... লোকটার দাড়িগোঁফ গজিয়ে প্রায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। কেউ উদ্ধার করতে আসে না। একদিন হঠাৎ একটা জাহাজ দেখা গেল। বাংলাদেশের লোকটি লাফিয়ে কুঁদিয়ে চিৎকার করে জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হল। জাহাজ দ্বীপটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে এসে থামল। জাহাজ থেকে চিৎকার করল এক নাবিক।

—তোমার দেশ কোথায়?

—বাংলাদেশ।

—একটু অপেক্ষা কর।

—আচ্ছা।

একটু পর জাহাজ থেকে একটা ছোট্ট নৌকা নামানো হল। একজন মাত্র নাবিক বৈঠা বেয়ে দ্বীপে এসে নামল। তার হাতে একটা কাগজপত্রের প্যাকেট। সে কাগজপত্রের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল বাংলাদেশের লোকটার দিকে।

—এটা কী? বাংলাদেশের লোকটা প্রশ্ন করল।

—এটাতে তোমাদের দেশের গত এক সপ্তাহের পত্রিকাগুলো আছে।

—এগুলো দিয়ে আমি কী করব?

—ক্যাপ্টেন তোমাকে অনুরোধ করেছে এগুলো পড়ে দেখতে তারপরও যদি তোমার দেশে ফেরার ইচ্ছে থাকে তা হলে এই দ্বীপ থেকে তোমাকে উদ্ধার করা হবে।

তো শেষ পর্যন্ত দ্বীপের সেই বাংলাদেশের তরুণ দেশে ফিরে গিয়েছিল কি না জানা যায় নি। তবে কল্পনা করতে দোষ কী! ধরে নেই পত্রিকায় ভয়াবহ খুন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পুড়িয়ে হত্যা এ সংবাদ পড়েও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। দেশপ্রেমের তাগিদে সে ফিরে গিয়েছিল নিজের মাতৃভূমি বাংলাদেশে।

তবে বিধাতার কী খেলা সে দেশের সীমান্তে পা রাখা মাত্র গ্রেফতার হল টপ টেরর জনৈক 'কনুই ছিলা বক্কর' সন্দেহে। এবং ১১টা খুনের দায়ে তার ফাঁসিও হয়ে গেল একদিন। মৃত্যুর পর তার কাছে দেবদূত এসে হাজির। দেবদূতের হাতে কিছু কাগজপত্র। দেবদূত বলল

—তুমি নিরপরাধ হয়েও ফাঁসিতে মরেছ। তোমার জন্য স্বর্গ বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এগুলো দেখতে পার।

—এগুলো কী?

—এগুলো স্বর্গ থেকে প্রকাশিত গত এক সপ্তাহের দৈনিক পত্রিকা।

—মাফ করবেন আমি ওসব পড়তে চাই না, আমি নরকেই থাকতে চাই...! গল্প এখানেই সমাপ্ত... দ্য এন্ড!

❑

আমার পরিচিত একজন আছে যে কোনো পাখির নাম শুনতে পারে না! পাখি দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তৎক্ষণাৎ হুস-হাস শব্দ করে তাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে কাককুলের ওপর তার ক্ষোভ যেন অপরিসীম। এর কারণ হচ্ছে পাখিকুল এক রহস্যময় কারণে তার শার্টের উপরই নিয়মিত বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাকে আড়ালে 'ভ্রাম্যমাণ পক্ষী টয়লেট' বলে ডাকে বলে শুনেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ আমারবই.কম

তো এর রহস্য কী? এ নিয়ে তার পরিচিতজনরা বহু গবেষণা করেও কোনো কূলকিনারা রতে পারে নি! একজন অবশ্য বলেছে পাখিকুল সাধারণত যে কোনো ভাস্কর্যের মাথায় বা াধে তাদের প্রাকৃতিক কার্যটি সারতে পছন্দ করে থাকে। এর কারণ কী? যে কোনো াস্কর্যই স্থির, নড়ে না চড়ে না, এ কারণেই বোধ হয় পাখিকুল নিরাপদ বোধ করে। মাদের পরিচিত ভ্রাম্যমাণ পক্ষী টয়লেটের মধ্যেও ঐরকম কেমন একটা রোবট রোবট বা াস্কর্য টাইপ একটা ভাব আছে। এ কারণেই বোধ হয় পাখিকুল নিরাপদ বোধ করে। সে ারণেই কি পাখিরা তাকে তাদের প্রাকৃতিক কার্যাদি সারার স্থান বলে নির্বাচন করেছে? কে ানে।

তো ব্যাপারটা হাসিঠাট্টার মধ্যেই ছিল। কিন্তু যেদিন ঐ 'চলমান পক্ষী টাট্টি'র (সংক্ষেপ রার জন টাট্টি শব্দটি ব্যবহার করলাম)' বাসার বুয়া ঘোষণা দিল সে আর এ বাসায় কাজ রবে না সেদিনই গোলমালটা লাগল। তার স্ত্রীর সঙ্গে নিম্নরূপ কথাবার্তা হল বুয়ার।

—কেন কাজ করবে না?

—খালাম্মা খোকা বাবুর পায়খানা সাফ করি এতে কোনো সমস্যা নাই সে ছোট বাচ্চা কিন্তু সাহেবেরটা করতে পারমু না... গরিব বইলা কি আমরা মানুষ না?

—সাহেবেরটা মানে? স্ত্রী আকাশের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তর থেকে আছড়ে পড়লেন যেন।

—কেন আপনে জানেন না সাহেবের সব শার্টে পাখির পায়খানা থাকে!

ব্যস একটি সুখী পরিবারে শুরু হয়ে গেল কেয়ামত! স্ত্রী তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করল।

—সব শার্টে পাখির পায়খানা? বান্ধবী উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম সব শার্টেই।

—তা হলে সর্বনাশ।

—সর্বনাশ কেন?

—বাহ্ তুই গাধা নাকি? বুঝতে পারছিস না?

—কী বুঝব?

—তোর বর প্রেম করছে অন্য কারো সাথে। নিশ্চয়ই পার্কে বসে প্রেম করে। আর পার্কে গাছগাছালির পাখি...

—ব্যস ব্যস আর বলতে হবে না। স্ত্রী ঝপ করে ফোন রেখে দিল। এখন তার কাছে সব পরিষ্কার।

তারপর ঐ পরিবারে কী হল তা বলার আগে পার্ক আর পাখি নিয়ে একটা গল্প বলে নেয়া জরুরি—এক পার্কে মুখোমুখি দুটো ভাস্কর্য। যথারীতি দু জনের মাথায় কাঁধে প্রচুর পরিমাণে পাখিকুলের 'ইয়ে'। একদিন ঈশ্বরের কী মনে হল তিনি ঐ ভাস্কর্য দুটোকে প্রাণ দিলেন। প্রাণ পেয়ে দু জনই বেদি থেকে নেমে এল। নেমে এসে একজন আরেক জনকে বলল

—আমরা এখন কী করব?

—প্রথমেই সেই কাজটি পাখিদের মাথায় করব যে কাজটি ওরা এতদিন আমাদের মাথায় করেছে।

এবার আবার 'চলমান পক্ষী টয়লেট' পরিবারে ফিরে যাওয়া যাক। সেই পরিবারে তখন যুদ্ধংদেহী অবস্থা। স্বামী বেচারা কিছুতেই বোঝাতে পারছে না স্ত্রীকে সে পার্কেও যায় না প্রেমও করে না পাখিরা এমনি এমনিই তার শার্টে প্রাকৃতিক কাজ করে। কাকতালীয় ব্যাপার।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—এমনি কেন করবে? আর লোক নেই?

—সেটা আমি কী করে বলব পাখিদের জিজ্ঞেস কর?

—পাখিদের জিজ্ঞেস করব মানে?

... তারপর আর কি স্ত্রী 'এই আমি বাপের বাড়ি চললাম দেখি কে ফেরায়' বলে বেরুতে গিয়ে দেখেন ঐ দিন হরতাল। গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ। ব্যস শুধু হরতালের কারণে সে যাত্রা একটি সুখী পরিবারের ভাঙন কোনোক্রমে রক্ষা পায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে 'চলমান পক্ষি টাট্টি' সব সময় মাথার উপরে একটা ছাতা ধরে রাখে কি রোদ কি বৃষ্টি কি ছায়ায়।

❑

এক কাকডাকা ভোরে (অবশ্য যখন রওনা হই তখন কোনো কাক চোখে পড়ে নি) চৌদ্দ জন মহিলা আর আমি একমাত্র পুরুষ রওনা হলাম সুন্দরবনের উদ্দেশে (আসলে খুলনার উদ্দেশে কিন্তু খুলনার বদলে সুন্দরবন লিখতেই যেন রোমাঞ্চ হয়)। মনে হতে পারে আমি বোধ হয় কোনো মহিলা স্কুল, কলেজ বা ভার্সিটির শিক্ষক, শিক্ষা সফরে একদল ছাত্রী নিয়ে বেরিয়েছি। ব্যাপারটা আসলে তা নয়। পারিবারিক সফর। চৌদ্দ জন মহিলা হওয়ার কারণ সর্বোচ্চ বয়সের আমার মা যার ক'দিন আগেই ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে আর সর্বনিম্ন বয়সের আমার সাত বছরের ভাগ্নি। মাঝখানে নানা বয়সের মামাতো বোন খালাতো বোন, বাবাতো বোন... মানে আপন বোনের ছড়াছড়ি। মোট কথা চৌদ্দ জন মহিলার এক বিশাল দল নিয়ে আমি রওনা হলাম। এ ভ্রমণের একটু পূর্ব কথা আছে সেটা না বললেই নয়।

আমার মামা রুহুল আমিন শেখ মংলা পোর্টের বোর্ড মেম্বার (পরে চেয়ারম্যান)। অসম্ভব একজন ভালো মানুষ। তিনি বহুবার বলেছিলেন, 'আমি খুলনা থাকতে থাকতে তোমরা একবার বেড়িয়ে যাও' কিন্তু আমাদের আর সময় হয়ে উঠছিল না। শেষ পর্যন্ত আমার মা'ই সোচ্চার হলেন। পূজার ছুটিতে তিনি যাচ্ছেন তার ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে একা হলেও যাবেন। এখন একজন বাইপাস সার্জারি হওয়া হার্টের রোগীকে তো আর একা ছাড়া যায় না। তাকে দেখভাল করার জন্য একে একে তের জন নানা বয়সী মহিলা জুটে গেল। আর একজন পুরুষ না থাকলেই নয়। অতএব সঙ্গে চললাম আমি।

বহু বছর আগে একটা রাশিয়ান ছবি দেখেছিলাম নাম ছিল 'হোয়াইট সান অফ দ্য ডেজার্ট'। সেই ছবিটিতে ছিল একজন রাশান যোদ্ধা (পুরুষ)। প্রায় ১০/১২ জন বিভিন্ন বয়সী মহিলা নিয়ে মরুভূমির উপর দিয়ে চলেছে। পথে নানা বিপদ ঘটে কিন্তু সেই অকুতোভয় যোদ্ধা শেষ পর্যন্ত তাদের সবাইকে মরুভূমি পার করাতে সমর্থ হয়। তো এ ভ্রমণেও একই অবস্থা। আমি যেন এক অকুতোভয় যোদ্ধা, চৌদ্দ জন মহিলা নিয়ে চলেছি খুলনা!

মানুষ আমরা মোট পনের জন হলেও বিমানবন্দর স্টেশনে ভাইয়ের মাইক্রোবাস থেকে মাল নামানোর পর দেখা গেল সুটকেস আর ব্যাগ মিলিয়ে মোট বত্রিশটা লাগেজের কেওক্রেডাং পর্বত! ক'দিন আগেই ইসিজি করিয়েছি। ডাক্তার বলেছে আমার হার্ট ঠিক আছে। কিন্তু আমার মনে হল বত্রিশটা লাগেজ গোনার পর আমার বুকের বাঁ দিকে কেমন যেন চিনচিন করে উঠল! কিন্তু চিনচিন ব্যথাটা ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই ঝনঝন করে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল ট্রেন! অতঃপর বত্রিশটা লাগেজ আর চৌদ্দ জন মহিলাকে নিয়ে আমি যে কীভাবে ট্রেনে চড়ে বসলাম তা জানে উপরে এক আল্লাহতালা। আর নিচে আমি আর তিন জন তরুণ কুলি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ট্রেনে স্থিত হয়ে বসে নিশ্চিত হলাম—যাক আর চিন্তা নেই এখন সোজা খুলনা। খুলনা পৌঁছে বাকিটা মামার ঘাড়ে ফেলা যাবে। কিন্তু তখন বোধ হয় ঈশ্বর গোপনে অট্টহাস্য করেছিলেন!

ঢাকা-খুলনায় ট্রেনটা নতুন চালু হয়েছে। এ ট্রেনটার অতিরিক্ত আকর্ষণ হচ্ছে এটা যমুনা ব্রিজ দিয়ে যায়। নতুন ট্রেন তার ওপর যমুনা ব্রিজ দিয়ে যাবে এ কারণেই ট্রেন জার্নিটাই সবাই প্রিফার করেছিল। কিন্তু একটু পর আমি বিপদ টের পেলাম। ট্রেন জয়দেবপুর গিয়ে থেমে গেল! এ ট্রেন আর যাবে না। এটা আসলে একটা 'শাটল ট্রেন'। এখন আমাদের ব্রডগেজ লাইনের বিশাল ট্রেনে উঠতে হবে, সেটাই যাবে খুলনা। ট্রেন যে বদল করতে হবে এটা আমার মাথায়ই ছিল না। আবার বত্রিশটা লাগেজের সেই কেওক্রেডাং পর্বত নিয়ে... চৌদ্দ জন মহিলা নিয়ে নামতে হবে, আবার আরেকটা ট্রেনে উঠতে হবে এটা চিন্তা করেই আমার মাথায় 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' হল বললে কম বলা হয়... বলা উচিত... আসলে কী যে বলা উচিত সেটা ভাবারও সময় ছিল না। কেউ বলেও নি! আবার আমি দু-তিন জন কুলি ভাড়া করে হুড়মুড় করে নামা শুরু করলাম... মানে নামার চেষ্টা শুরু করলাম... যত তাড়াতাড়ি নামা যায় সময় কম! ব্রডগেজ লাইনের খুলনাগামী ঝকঝকে নতুন ট্রেন তখন ঘন ঘন হুইসেল দিতে শুরু করেছে। মালপত্রের কেওক্রেডাং পর্বত কুলিরা তখন ডেভিড ব্লেইনের (চ্যানেল এএক্সএন দ্রষ্টব্য) ম্যাজিকের মতো কীভাবে কীভাবে যেন এক ট্রেন থেকে নামিয়ে আরেক ট্রেনে উঠাতে শুরু করেছে। তরুণী ও শিশু অভিযাত্রীরা রীতিমতো ছুটছে খুলনাগামী ব্রডগেজ লাইনের ট্রেনের দিকে। আমি আমার বৃদ্ধ মা আর খালাদের তাড়া দিতে দিতে যত দ্রুত সম্ভব এগুনোর চেষ্টা করেছিলাম। বলাই বাহুল্য ট্রেনটাও ছিল বেশ একটু দূরেই!

আমি খেয়াল করলাম আমার বৃদ্ধা মা এমনিতেই ছোটখাটো মানুষ হাঁটেনও টুকটুক করে কিন্তু এখন মনে হল তিনি যেন এক পা এগুতে গিয়ে দু পা করে পিছাচ্ছিলেন। যাহোক শেষ পর্যন্ত ট্রেনের কাছে কোনোরকমে পৌঁছানো গেল। কিন্তু ট্রেনের দরজা দিয়ে মা-খালাদের উঠাতে গিয়ে টের পেলাম বিপদ কত প্রকার ও কী কী! ব্রডগেজ লাইনের বিশাল ট্রেনের সিঁড়ির নিচের প্রথম ধাপটিই আমার মার মাথার কাছে। এখন তাকে উঠাই কী করে! আমি আশপাশে মসজিদ খুঁজলাম, অন্তত কাছেপিঠে কোনো মসজিদে গিয়ে দু রাকাত নফল নামাজ পড়লে যদি আল্লা আমাকে উদ্ধার করেন। শেষমেশ আমার বড় বোন নিচ থেকে ঠেলে আর আমি উপর থেকে টেনে এক অদ্ভুত কায়দায় মা আর খালাদের উঠালাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আশপাশে অনেকে দাঁড়িয়ে এই সার্কাস হাসিমুখে দেখছে!

ট্রেনে উঠার আগে অবশ্য আরেকটা খণ্ডকালীন প্যাকেজ নাটক ঘটে যায় যা উল্লেখ না করলেই নয়! ট্রেনের কাছে যখন দলবল নিয়ে হাজির হলাম দেখি আমাদের 'ঙ' বগি নেই, মানে খুঁজে পাই না। গার্ডকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উদাস হয়ে বললেন, 'ঙ' গেছে 'ঘ'কে আনতে। আমি তার কথা শুনে হতভম্ব! পরে বুঝলাম ট্রেনের ইঞ্জিন 'ঘ' বগিকে সঙ্গে নিয়ে 'ঙ' বগিকে আনতে গেছে। যাহোক শেষ পর্যন্ত 'ঙ' পাওয়া গেল। কুলিদের সহযোগিতায় আমরা যার যার সিট নিয়ে বসলাম। এবার মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেল।

বাকি জার্নিটা ভালই হল। নতুন ট্রেন। যাত্রীও বেশি না। বেশিরভাগ সিটই খালি। আমার বোন, ভাগ্নি, কাজিনরা বুফে কারের সব চিকেন, মানে চপ, চা চিপসের স্টকে মোটামুটি ধস নামিয়ে দিল।

খুলনা পৌঁছে আমি নিশ্চিত। বাকিটা মামার উপর। মামা চারটা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে ছিলেন। মামার বাড়ি গিয়ে দেখি মোটামুটি সেটা একটা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বখতিয়ার খিলজির রাজপ্রাসাদ! কী নেই সেখানে। ছোটখাটো একটা পুকুর ভর্তি মাছ, বাচ্চারা মাছ ধরতে লেগে গেল বড়শি দিয়ে। আরেকটা মিনি পুকুর সেটা আবার গোসলের জন্য। ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম 'তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই... মামি এল লাঠি নিয়ে পালাই পালাই...' এখানেও যেন তাই হল মামি একটা ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা। তিনি সন্ধ্যায় এলেন লাঠি নিয়ে... হ্যাঁ লাঠিই বটে ব্যাপারটা লাঠিই ছিল মানে ইক্ষু আর কি। ওটাকে কেটে ছিলে ছোট টুকরো করে পরিবেশন সাথে অন্যান্য ফলাহার তো আছেই... যাহোক মামাবাড়িতে খাবারদাবারের বিবরণে যাব না, সে আরেক ইতিহাস। শুধু একটা কথাই বলা যায় যে ক'দিন ছিলাম চাবাতে চাবাতে চাপা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল...। ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসেছি ভ্রমণের মধ্যেই থাকি...।

অচিরেই ঠিক হল পরদিন আমরা সুন্দরবনে যাচ্ছি। পরদিন ভোরে আবার যথারীতি চারটা গাড়িতে করে প্রথমে মংলা পোর্ট। সেখানে পোর্ট পরিদর্শন। অতঃপর ছোট একটা লঞ্চে করে সুন্দরবন অভিমুখে যাত্রা। আমরা যে নদীটা দিয়ে সুন্দরবনের দিকে যাচ্ছিলাম সেটার নাম পশুর নদী। বিশাল নদী, সেখানে বিশাল বিশাল সব বিদেশি জাহাজ মধ্য নদীতে নোঙর করা। মাল উঠানামা চলছে। এর মধ্যে দেখি বিশাল একটি জাহাজ নাম 'তারামন বিবি'। খুব ভালো লাগল দেখে, দেশের একটি বিশাল জাহাজ বীরবিক্রম তারামন বিবির নামে রাখা হয়েছে। আরেকটি ইন্টারেস্টিং জাহাজ দেখলাম। এটাও বিশাল। এটা হচ্ছে ড্রেজিং শিপ। দেশে এরকম জাহাজ মাত্র একটিই। এটার মূল্য ১৫০ কোটি টাকা এবং এটা দিয়ে নদী ড্রেজিং করা হয়। বর্তমানে মংলা বন্দর জাহাজটি ভাড়া এনেছে চট্টগ্রাম থেকে পশুর নদী ড্রেজিং করতে। এর জন্য এই জাহাজকে ভাড়া দিতে হচ্ছে প্রতিদিন দুই লক্ষ টাকা!

অচিরেই আমরা সুন্দরবন এলাকায় ঢুকে গেলাম। আমরা যে চ্যানেলটায় ঢুকলাম সেটার নাম 'করমজল' চ্যানেল। লঞ্চ থেকে নেমে দেখি এক জায়গায় লেখা 'স্বাগতম'। বাঘের পেটে ঢোকার স্বাগতম নাকি কে জানে! যাহোক ব্যবস্থা দেখলাম সুন্দর। একটা কাঠের ব্রিজ সরাসরি ঢুকে গেছে গহিন বনে। ব্রিজটা মাটি থেকে বেশ উঁচুতে। তিন জন মানুষ পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে। তো সেই ব্রিজ ধরে আমরা পনের জন অভিযাত্রী মামা-মামি ও অন্যান্যদের নিয়ে আরো পাঁচ জনসহ মোট বিশ জনের দলটি ভাগে ভাগে হেঁটে চলেছি বনের গহিনে ব্রিজ ধরে। হঠাৎ বাচ্চারা হইহই করে উঠল! কী ব্যাপার বাঘ নাকি? পরে দেখা গেল বাঘ না কুমির... না কুমিরও না একটা বড় ধরনের গিরগিটি। সুন্দরী গাছের মাটি থেকে উঠে আসা সুচালো খাড়া শিকড়গুলোর পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে গদাই লস্করী চালে!

ব্রিজের শেষ প্রান্তে একটা মাচার মতো বিশ্রামস্থল। বয়স্করা বসে পড়লেন বিশ্রামের জন্য। বিশ্রাম না করেও উপায় নেই ব্রিজটি অনেকই দীর্ঘ। শেষ প্রান্তে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে সরাসরি মাটিতে আর সেখানেই লাল কালিতে ভয়ংকর এক সাইনবোর্ড তাতে বড় বড় করে লেখা 'সাবধান! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'। সেই সাইনবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়েই ছবি তোলার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে গেল! ভাবখানা এমন যেন ঐ সাইনবোর্ডটাই সুন্দরবনের জ্যান্ত বাঘ!

ঐ ব্রিজ থেকেই আমরা বন্য হরিণ দেখলাম। একটা কুমিরও দেখলাম হুট করে নদীতে নেমে যেতে। এবার চললাম কুমিরের খামার দেখতে। জঙ্গলের ভিতরেই একটা জায়গায় কুমিরের চাষ করা হয়। ব্রিজ থেকে একটু দূরে খামারটি। সেই খামারের ক্রোকোডাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ট্রেনার অস্ট্রেলিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। তিনি নিজেই হাত দিয়ে ধরে ধরে কুমিরের ছানা দেখালেন। অবশ্য শেয়ালের কুমির ছানা দেখানোর মতো একটাই বারবার দেখালেন না। যে যেটা দেখতে চাইল সেটাই ধরে দেখালেন। আমাদের দলের অনেকেই কুমির স্পর্শ করে দেখল। ট্রেনারের কাছেই গল্প শুনলাম, গতকালই নাকি একটা বাঘ এসেছিল এখানে। তার ছেলে তখন কলে কী একটা ধুচ্ছিল। হঠাৎ দেখে তার মাথার উপর দিয়ে কী একটা লাফিয়ে গেল। সে ভেবেছে কোনো বন্য পাখিটাখি। তাকিয়ে দেখে বাঘ! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কী করবে বুঝতে না পেরে! বাঘটা তাকে দেখল একনজর (চোখ দিয়ে হয়তো তার শরীর-স্বাস্থ্য টিপেটুপে দেখল খাওয়া যায় কি না!)। তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল কুমিরের খামারের দেয়ালের উপর। আর ঐ ফাঁকে ছেলেটি দৌড়ে উঠে পড়ল তিন তলা সমান উঁচু কাঠের একটা ওয়াচ টাওয়ারে! বাঘটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দেয়ালের উপর তারপর হঠাৎ লাফিয়ে হারিয়ে গেল গহিন অরণ্যে! ছেলেটির ভাগ্য ভালো বলতে হবে, বাঘটি আসলে ঠিক 'নর ভক্ষণ'-এর মুডে আসে নি সেদিন।

তো সেই দার্শনিক বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে কেউ কেউ ছুটল ট্রেনারের পিছনে। আমি উৎসাহ পেলাম না। আমি আরেক দল নিয়ে উঠে পড়লাম সেই তিন তলা সমান উঁচু কাঠের ওয়াচ টাওয়ারে। উঠে দেখি দুটি ছেলে ক্যামেরা, বাইনোকুলার আর খাবারদাবার নিয়ে বসে আছে সেই ভোর থেকে। তাদের প্ল্যান বাই হুক অর ক্যাপ্টেন জেমস কুক বাঘ তারা দেখেই ছাড়বে! সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে তারা ওখানে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়' প্রবাদ বাক্যটি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে নেমে এলাম ওয়াচ টাওয়ার থেকে। নেমে এসে দেখি আমাদের সর্বকনিষ্ঠ অভিযাত্রী তিথি তারস্বরে কাঁদছে! কান্নার ধরন দেখে মনে হল তার মাকে বাঘ বোধ হয় এইমাত্র উঠিয়ে নিয়ে গেছে। পরে জানা গেল তার মা বহাল তবিয়তেই আছে তবে তার হাতের চিপসের প্যাকেটটি মিসিং! তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এই 'অরণ্যে রোদন' করে লাভ নেই। যা গেছে গেছেই। পরে আরেকটা কিনে দেয়া যাবে!

এবার ফেরার পালা! ফিরে আসা সব সময়ই বেদনাদায়ক। সন্ধ্যার আলো-আধারিতে নিস্তব্ধ গহিন সুন্দরবন পিছনে ফেলে আবার এগিয়ে চললাম লঞ্চে। সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। মোহনীয় এক পরিবেশ; সবাই যার যার ক্যামেরায় ঐ দৃশ্য বন্দি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমি ভাবলাম কোনটা ঠিক? ঐ গহিন বন্য অরণ্যে যাদের রেখে এলাম তারা ঠিক নাকি সভ্য নগরীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এই যে আমরা... আমরা ঠিক? কে জানে!

❑

গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। গোপাল ভাঁড় দাবা খেলছিলেন এক পড়শির সঙ্গে, এ সময় এক মুসলিম মহিলা তার ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে ছুটে এলেন গোপাল, গোপাল, আমার ছেলে মোল্লাকে খুঁজে পাচ্ছি না। খেলতে খেলতেই গোপাল ভাঁড় অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলেন—মসজিদে খুঁজেছিলে?

—কেন? মসজিদে কেন?

—আরে মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্তই।

গোপাল ভাঁড়ের গল্পের মতনই আমাদের দৌড়ও, মানে যখন ভ্রমণের কথা ওঠে তখন, ঐ কক্সবাজার পর্যন্তই। লেবু কচলালে তিতে হয়, আবার বেশি কচলালে নাকি আস্তে আস্তে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মিষ্টি হতে শুরু করে। সেরকম কক্সবাজার যেতে যেতে তিতে হয়ে উঠছিল, এখন যেন ফের মিষ্টি হয়ে উঠতে শুরু করেছে...

তবে এটা ঠিক, আমরা 'উন্মাদ'-এর পক্ষ থেকে যখন কাছে-ধারে যেখানেই যাই তখন চেষ্টা করি একটা সাধারণ ভ্রমণকে কী করে অসাধারণ করা যায়।

**যাত্রা হল শুরু**

এবারের ভ্রমণের নামকরণ করা হল 'অপারেশন : ম্যাড সি'। এই নামকরণের কারণ— আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন মাঘী পূর্ণিমা এবং সমুদ্রে ১নং বিপদ সংকেত। মানে দুইয়ে দুইয়ে মিলে সমুদ্র উত্তাল... মানে ম্যাড... উন্মাদ! আর আমরা তো পুরান উন্মাদ আছিই?

১৮ জনের অভিযাত্রী দল নিয়ে রওনা হলাম নাইট কোচে 'ঢাকা টু কক্সবাজার'। রাত ১১.৩০ মিনিট। নাইট কোচের ড্রাইভাররা নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাড়ি চালায়। ব্যাপারটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। আমার সিট ছিল ড্রাইভারের পেছনেই, দেখলাম ড্রাইভার মাঝে মাঝে 'মুরগি ঘুম' দিয়ে নিচ্ছিল, মানে দুএক স্লিপ ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। তো কোনো এক ব্রেকে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এ প্রসঙ্গে। বয়স্ক ড্রাইভার একগাল হেসে বলল দুর্ঘটনা হবে না, কারণ এই রাস্তা তার মুখস্থ। গত ১০ বছর ধরে সে এই রুটে গাড়ি চালায়, কাজেই সে জানে এ রাস্তায় কটা গর্ত আছে, কটা মোড় আছে, কটা ঢাল আছে। মোট কথা চোখ বন্ধ করে চালানোও তার জন্য কোনো বিষয় নয়! ড্রাইভারের কথায় খুব একটা ভরসা পেলাম না। আমি তাকে বললাম মহিলারা আছে, বাচ্চারা আছে যাতে দয়া করে একটু না ঘুমিয়েই গাড়ি চালায়।

তবে এবার ড্রাইভার ঘুমানোর আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, যা হয় ঘুমের মধ্যেই হোক। আমার কাণ্ডকারখানা দেখে নিশ্চয়ই ঈশ্বর মুচকি হেসেছিলেন। ভোরবেলাই তার প্রমাণ পেলাম। ড্রাইভার বদল হয়েছে, তরুণ এক ড্রাইভার বিশাল বাসটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, বাসের দু দিকে দুটি ডানা থাকলে দিব্যি প্লেনে করে কক্সবাজার গিয়েছিলাম বলে চালিয়ে দেয়া যেত। সে যাই হোক, আমাদের বাস ছুটছে... সামনে থেকে ছুটে আসছিল আরেকটি বাস, দুরন্ত বেগে আমাদের বাসটি সাইড দিল, আর তখনই বাসের সব যাত্রী দেখল সাইড দেয়া বাসটার পেছন থেকে হুট করে বেরিয়ে এলো একটা বিশাল ট্রাক, একদম আমাদের বাসের মুখোমুখি, ডানে বামে কাটানোর এক ইঞ্চি জায়গাও নেই! সময় থেমে যাওয়া বোধ হয় একেই বলে। সব যাত্রী ফ্রিজ!! আমি চকিতে ঘড়ির দিকে তাকালাম, সময়টা দেখে নিই ঠিক কটার সময় মারা গেলাম। সময়টা অন্তত জেনে যাই! আর তখনই আবিষ্কার করলাম ভালো ঘড়িটা বাসায় ফেলে নষ্ট ঘড়িটা পরে এসেছি। সময় আক্ষরিক অর্থেই থমকে গেছে। মন্দের ভালো, ভালো ঘড়িটা তো বাঁচল...।

ভ্রমণের গল্প বলতে বসে দুর্ঘটনার গল্প বলে লাভ নেই, তবে এটুকু সত্যি আমরা সুস্থ দেহেই সবাই শেষ পর্যন্ত কক্সবাজার পৌছতে পেরেছিলাম। শুধু বাসের প্রচণ্ড হাইড্রোলিক ব্রেকের কারণে আমার পাশে বসা সাজ্জাদ প্রায় সুপারম্যানের মতো উড়ে গিয়ে মাথায় সামান্য ফ্র্যাকচার নিয়ে ঢাকায় ফিরে এসেছিল। যাহোক, আমরা যে হোটেলে উঠলাম সেটার নাম 'অবকাশ'। বোধকরি কক্সবাজারের একমাত্র হোটেল, সামনে বিরাট জায়গা— লন, বাগান। আমরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম যে যার রুমে। রুম আগেই বুক করা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

## প্রথম দিন : আবিষ্কারের নেশায়

এবারের ভ্রমণে সবচে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে—আমরা বহু কিছু আবিষ্কার করেছি। পৃথিবীর বিখ্যাত সব আবিষ্কারকরা বেঁচে থাকলে নির্ঘাত লজ্জা পেতেন, কেননা এত অল্প সময়ে এত বেশি আবিষ্কার এর আগে পৃথিবীতে ঘটেছে কি না সন্দেহ। আমাদের প্রথম আবিষ্কার হচ্ছে দেশের দীর্ঘতম বৃক্ষ আর প্রশস্ততম বৃক্ষ। দুটোই রামুর জঙ্গলে। দুটোই গর্জন বৃক্ষ, প্রায় ২০০ বছর বয়স বলে স্থানীয় লোকজন জানালেন। প্রশস্ততম বৃক্ষটির কাণ্ড এতই মোটা যে আমরা পাঁচজনে মিলে হাতে হাত ধরেও ঠিকমতো কাণ্ডটি ধরে উঠতে পারি নি। আর দীর্ঘতমটি যে কত দীর্ঘ তা মাপার প্রশ্নই ওঠে না। ঐ বৃক্ষটি পরিদর্শনের সময় আমরা দেখলাম একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছিল উপর দিয়ে এবং আমরা শিউরে উঠলাম প্লেনটা ঐ গাছের মগডালে বাড়ি খেয়ে না পড়ে। ঈশ্বরের অসীম কৃপায় সেটা শেষ পর্যন্ত ঘটে নি।

আমাদের দ্বিতীয় আবিষ্কার বঙ্গোপসাগরের সর্ববৃহৎ জেলি ফিশ। ইনানী বিচে এই জেলি ফিশটা হাঁসফাঁস করছিল। আমাদের কোনো একজন ক্ষুদে অভিযাত্রী জানতে চাইল এই জেলি ফিশ থেকেই জেলি তৈরি হয় কি না। আমি তাকে বললাম, যদি হয় তুমি কী করবে? সে জানাল তা হলে সে আর সকালের নাস্তায় কখনোই জেলি দিয়ে পাউরুটি খাবে না।

আমাদের তৃতীয় আবিষ্কারটি সত্যিই চমকপ্রদ। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে উখিয়া বিচে, আবিষ্কারক মিসেস হাসান খুরশীদ রুমী। বিচের ছড়ানো-ছিটানো অজস্র পাথরের মধ্যে হঠাৎ একটা ছোট্ট অংশ ফাঁকা এবং সেখানে যে-ই দাঁড়াচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে দেবে যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য আমাদের দেখা প্রথম চোরাবালি—থলথলে ভেজা এই বালির স্তরকে দেখে বোঝার উপায় নেই কী ভয়ঙ্কর বিপদ সে ঘটিয়ে ফেলতে পারে মুহূর্তে।

আমাদের চতুর্থ আবিষ্কার সৈকতের সর্ববৃহৎ প্রবাল প্রস্তর খণ্ডটি। এটা যে সর্ববৃহৎ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা ১১৬ কিলোমিটার বিচের পুরোটা ভ্রমণ করে এত বড় প্রস্তর খণ্ড আর পাই নি?

আমাদের সবচে ভয়ঙ্কর আবিষ্কারটি হয়েছে... না এটা বিচে বা জঙ্গলে নয়, হোটেলেই... আবিষ্কারক এই ট্যুরের মহাব্যবস্থাপক হাসান খুরশীদ রুমী। তিনি হোটেলে ফিরে আবিষ্কার করলেন আমাদের ভ্রমণফান্ড তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সে আরেক কাহিনী।

## সৈকতে ১১৬ কিলোমিটার

আমাদের আবিষ্কারগুলো ছিল সবই সর্ববৃহৎ, কিন্তু ১১৬ কিলোমিটার বিচ ভ্রমণের জন্য যে জিপটি ভাড়া করা হল সেটা সর্বক্ষুদ্র। ঐ ক্ষুদ্র জিপে ১৮ জন অভিযাত্রী, ভাবা যায়? এ ছাড়া উপায় ছিল না। ভ্রমণের সিজন বলে সবকিছুই এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছিল।

ঐ ১৮ জনকে নিয়ে যখন হলুদ জিপটি সমুদ্রের সৈকত ধরে ১০০ কিলোমিটার বেগে ধাওয়া শুরু করল, সে এক সিন বটে। একদিকে উত্তাল সমুদ্র অন্যদিকে স্তম্ভিত পর্বতমালা, আর উপরে গনগনে রোদে...। হলুদ জিপে বসে আমরা চোখে নীল সমুদ্রের পাশাপাশি হলুদ শর্ষেফুলও দেখছিলাম। না দেখে উপায় ছিল না, গাদাগাদি করে ১৮ জন এক জিপে... শর্ষেফুল না দেখে উপায় কী? মাঝে মধ্যে নিজেদেরও ছিটকে পড়ার অবস্থা, তাতেও কিন্তু মজা কম হয় নি।

পৃথিবীর দীর্ঘতম বিচটি এই নিয়ে দু'বার দেখলাম আমরা। এই দীর্ঘতম বিচের বৈশিষ্ট্য এর একেক জায়গায় একেক ধরনের পরিবেশে। কোথাও প্রবাল পাথরের ছড়াছড়ি, মনে হবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা সেন্টমার্টিন দ্বীপে; কখনো বা নারকেল গাছের ছড়াছড়ি, মনে হবে আমরা বুঝি কুয়াকাটা বিচে; কখনো বা লাল কাঁকড়ার কারণে টকটকে লাল বিচ। তবে এবারের দেখায় বিশেষত্ব হল জিপে ছুটতে ছুটতেই আমরা দেখলাম এক অসাধারণ সূর্যাস্ত। টকটকে লাল একটা টেনিস বল আচমকা ধুপ করে বঙ্গোপসাগরে ডুপ খেয়ে আর উঠল না। তবে ডোবার আগে এক ড্রাম লাল রঙ সমুদ্রের নীল পানিতে ফেলে যেতেও ভুলল না।

## আমাদের বুদ্ধ দর্শন

এবার আমরা ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে সবগুলো বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন করেছি। বিশাল বিশাল সব বুদ্ধমূর্তি। সবচে বৃহৎটি বোধ করি উখিয়ায়। এরকম একটি প্রাচীন মন্দিরে ঢুকছি এমন সময় একজন আমাদের আটকাল—'জুতা খুলে ঢুকুন।'

আমরা জুতা খুলে ঢুকলাম। কক্সবাজারের সবচে বড় ক্যাং ঘর। জায়গাটা রামুর কাছাকাছি কোথাও, এখানে আছে ২৫০ বছরের পুরোনো একটা সপ্তধাতুর বুদ্ধমূর্তি। বিশাল এই ভাস্কর্যটি তৈরি করেছিল মগ জমিদাররা। ক্যাং ঘরটিও দেখার মতো। অসম্ভব কারুকার্য। সেখানে দুটি বিশাল ঘণ্টা ঝুলছে বাইরে, দু তিন জনে মিলে ধাক্কা দিয়েও নড়ানো গেল না। সব দেখে আমরা যখন বেরিয়ে আসছি, দেখি আমাদের যে জুতা খুলতে বলেছিল সে নিজে দিব্যি জুতা পরে আমাদের সঙ্গে ঘুরছে। আমি কড়া গলায় বললাম, অ্যাই তুমি যে জুতা পরে ঘুরছ?

—আমি তো মুসলমান।

—মুসলমান তো আমরাও।

—আমি এলাকার মুসলমান।

আরেকটি বুদ্ধমূর্তি দেখলাম একদম ভিন্ন ধরনের। মহামতি বুদ্ধ শুয়ে আছেন, তার প্রথম পাঁচ শিষ্য তাকে প্রণাম করছে। শোয়া অবস্থায় বুদ্ধকে খুব একটা দেখা যায় না। পরে জেনেছি বুদ্ধের ঐ ভঙ্গিটি তার শোয়ার ভঙ্গি, তিনি সমস্ত জীবন ঐভাবেই ঘুমিয়েছেন এবং তার মৃত্যুও ঐ একই ভঙ্গিতে হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়—গৌতম বুদ্ধের কানের লতি সব সময় তার কাঁধ স্পর্শ করে থাকে। এর দুটো ব্যাখ্যা আছে, এক হচ্ছে—সে সময় জ্ঞানীদের বোঝাতে বড় কান বোঝানো হতো, শিল্পী-ভাস্কররা সেটাই বোঝাতে চাইতেন। আরেকটি ব্যাখ্যা আছে, সেটা হচ্ছে—বুদ্ধের কানে সমস্যা ছিল, তার কান দিয়ে পুঁজ পড়ত, কিন্তু মহামতি বুদ্ধ ধ্যানে এতই মগ্ন থাকতেন যে পুঁজ যে তার কাঁধ স্পর্শ করেছে তিনি তা টেরই পেতেন না।

## ম্যাজিক, লেজার এবং হরর নাইট

সারা দিন ভ্রমণ করে রাতে আমরা একেক সময় একেক প্রোগ্রাম করতাম, যেমন দ্বিতীয় রাতে আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল ম্যাজিক শো। ম্যাজিশিয়ান আসরার মাসুদ। সে শৌখিন ম্যাজিশিয়ান। প্রথম ম্যাজিকেই সে আমাদের তাক লাগিয়ে দিল—আচমকাই তার সারা গায়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। বাচ্চারা মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে, তবে ব্যতিক্রম ডা. কল্লোল। লাইটার ছিল না বলে সে আসরারের গা থেকে সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার গোঁফ পুড়িয়ে ফেলল। দ্বিতীয় ম্যাজিক আরো চমকপ্রদ—শূন্য থেকে ডিম নিয়ে এলো আসরার, তারপর সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে কিচকিচ করতে লাগল হোটেলময়। শব্দ শুনে ছুটে এলো হোটেলের এটেনডেন্টরা, পরদিন লাঞ্চের জন্য কেনা তাদের মুরগি নাকি ছুটে গেছে... কিন্তু সাইজ এত ছোট হল কী করে... তারা হতভম্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ম্যাজিকের পর হরর নাইট। সত্যি ভূতের গল্প। বানানো গল্প নয়। কার ঝুলিতে কী গল্প আছে সব একে একে বেরুতে লাগল। দুএকটা উদাহরণ দেয়া যাক। রোমেন রায়হানের গল্পটা এরকম : সে তখন ময়মনসিংহে মেডিক্যালের ছাত্র, তার শখ হল একদিন রাতে সেকেন্ড শো সিনেমা দেখবে, কোনো পার্টনার না পেয়ে একাই রওনা দিল। ছবিটা ইংরেজি একটা ভূতের ছবি। ছবি দেখে যতটা না ভয় পেল তার চেয়ে বেশি ভয় পেল ফেরার সময় রিকশায় উঠে। সে দেখে রিকশাওয়ালার পা দুটো উল্টো। নিশ্চয়ই জন্মগত ত্রুটি, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কম্পিত বুকে হোস্টেলে ফিরে ভাড়া দেয়ার জন্য হাত বাড়াল। রোমেন দেখে রিকশাওয়ালার হাতের তালুতে গিজগিজ করছে চুল!

কিংবা তরুণ লেখক মোকারম হোসেনের গল্পটাই বা মন্দ কী? ছোটবেলায় গ্রামের একটা মাঠে ফুটবল খেলত মোকারম আর তার বন্ধুরা। সবচে বাজে খেলত মানিক। কিন্তু একদিন দেখা গেল সেই মানিক দুর্দান্ত খেলছে। সবাই অবাক। এমনকি খেলতে খেলতে সে তার পা ভেঙে ফেলল। কোত্থেকে দু জন লোক ছুটে এসে মানিককে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ছুটল... হয়তো ডাক্তারের কাছেই। ওদিকে মোকারমের দল ছুটল মানিকের বাসায় খবর দিতে। মানিকের বাসায় গিয়ে তারা হতভম্ব। মানিক তো বাসায় শুয়ে, দিব্যি সুস্থ। আজকে খেলতেই যায় নি। সে রাতে মোকারমসহ সবার প্রচণ্ড জ্বর উঠেছিল।

হরর নাইটের পর কথা ছিল সবাই মিলে সমুদ্রসৈকতে যাবে শেষ বারের মতো মাঘী পূর্ণিমার সমুদ্র দর্শনে। কিন্তু ভৌতিক গল্পের কারণেই কাউকে আর হোটেল থেকে টেনে বের করা যায় না। শেষ পর্যন্ত হাতে পায়ে ধরে সবাইকে নেয়া হল উদ্দেশ্য—আমাদের শেষ আকর্ষণ 'লেজার শো'। এখানে বলে নেয়া ভালো, ঢাকা স্টেডিয়ামে ২০০ টাকায় টিকিট কেটে লেজার শো দেখতে গিয়ে আমরা ক'জন বেজার হয়ে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সমুদ্রসৈকতে এই জিনিস করে দেখিয়ে দেব। তারই ফলশ্রুতিতে এই 'উন্মাদীয় লেজার শো'।

আচমকা আলোকিত হয়ে উঠল বিচ, শূন্যে উঠে গেল আলোকচ্ছটা, একদিকে অন্ধকার সমুদ্রের ফেনার মাথায় জ্বলজ্বলে ফসফরাস অন্যদিকে মাঘী পূর্ণিমার উজ্জ্বল জোছনা আর মাঝখানে ফায়ারওয়ার্কসে করা আমাদের লেজার শো। অসাধারণ এক দৃশ্য! বিচে আমরা ছাড়াও আরো যারা ছিলেন তারাও মুগ্ধ।

### ব্যাক টু দ্য প্যাভেলিয়ন

ফেরার পথে চট্টগ্রামের হল্টেজ। রাতে ট্রেন। সময় কাটানোর জন্য এই মার্কেট সেই মার্কেট ঘুরে সোজা বাটালি হিলে। বীর চট্টলার স্কাই ভিউ দেখা যাক। সেখানে গিয়ে দেখি বিশাল মোবাইল টাওয়ার, সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, টাওয়ারের পাশে মোবাইলের নেটওয়ার্ক কেমন দেখা যাক! কিন্তু না, ভুল ভাঙল একটু বাদেই, এতক্ষণ সবাই যেটাকে মোবাইল টাওয়ার ভাবছিল সেটা আসলে স্মৃতিসৌধ। লোহালক্কড় দিয়ে যে কেউ স্মৃতিসৌধ বানানোর দুঃসাহস দেখাতে পারে চিটাগাং-এ এসেই টের পেলাম!

চারদিন ধরে দেশের খবর পড়ি না। একটা পেপার কিনলাম। ট্রেন ছুটছে ঢাকার দিকে। পেপার খুলে দেখি দিনে দুপুরে ব্যাংক ডাকাতি, ১৭ লাখ টাকা লুট... প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা... ধর্ষিত কিশোরীর আত্মহত্যা... আবার এসিড...। মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। এত ভয়ঙ্কর অবস্থা দেশের! আর আমরা সমুদ্রের হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছি? কিছুই কি করণীয় নেই আমাদের? এভাবেই চলবে দেশ? ঠিক তখনই যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ফরাসি দার্শনিক রম্যাঁ রল্যাঁ। তাঁর একটা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উদ্ধৃতি মনে পড়ল, 'তুমি সমাজকে কী দিবে তা তোমার ব্যাপার, কিন্তু তার আগে তোমার হৃদয়টাকে প্রশস্ত কর সমুদ্রের মতো, আর চিত্তকে দৃঢ় কর পর্বতের মতো...।' বলাই বাহুল্য আমরা ১৮ জুলাই সমুদ্র আর পর্বত স্পর্শ করে এসেছি...।

❑

ছড়াকার কাম ডাক্তার রোমেন রায়হান সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে বাচ্চাদের বর্ণমালার ওপর একটা পাঠ্যবই লিখবে। যেখানে ঐ-তে ঐরাবত থাকবে না কিংবা উ-তে উর্ণনাভ থাকবে না, থাকবে বাচ্চাদের জন্য সহজবোধ্য প্রচলিত শব্দ। অতি উত্তম সিদ্ধান্ত। আমরা সবাই তাকে উৎসাহিত করলাম। এ ধরনের ভালো বই একটা হওয়া দরকার। হাতিকে কখনোই আমরা ঐরাবত বলি না বা মাকড়সাকে উর্ণনাভ বলি না। তা হলে ওই শব্দগুলো বাচ্চাদের কোমল মগজে ঢুকানোর কোনো যুক্তি আছে!

এখন নতুন কী শব্দ হতে পারে এটা নিয়ে আমরা রোমেনকে সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম। যদিও রোমেন আদৌ আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে বলে নি! এর মধ্যে একজন ঠাট্টা করে বলল

—ক-তে কমলা বা কলা না দিয়ে তসলিমা নাসরিনের 'ক' হলে কেমন হয়?

—তাতে একটা সুবিধা হবে 'থ'-ও চলে আসবে। আরেকজন বলে। আমি জিজ্ঞেস করি

—থ আসবে কেন?

—বাহ্ 'ক' পড়ে তো দেশের অনেক লেখক কবি প্রকাশক এখন 'থ' হচ্ছেন।

এর মধ্যে আরেকজন 'হাওয়া থেকে পাওয়া' জাতীয় খবর দিল যে তসলিমা নাসরিন নাকি আরেকটা বই লিখবেন যার নাম 'খ' এবং এই 'খ'-তে থাকবে ওপার বাংলার দাদাদের কেচ্ছা-কাহিনী। থ না হলেও এই খবরে তাদের মধ্যে নাকি থরথরি কম্প শুরু হয়ে গেছে!

ডা. তসলিমার বই থাক আমরা বরং আবার ডা. রোমেনের বই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মুশকিল হচ্ছে ঐ-তে ঐরাবত দিব না, তা হলে দিবটা কী? ঐ দিয়ে বাংলা ভাষায় নতুন প্রচলিত কী শব্দ হতে পারে? এই নিয়ে গবেষণা করে যখন কিছুই পাচ্ছি না তখন একজন বলল

—আচ্ছা এটা লিখলে কেমন হয়?

—কোনটা?

—কী-বোর্ডে জে সিফট সি টিপলে হচ্ছে 'ঐ'। আমি দেখলাম একটা মহৎকর্ম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করেছে সবাই। রোমেনও যথেষ্ট গম্ভীর। আলোচনা এখানেই স্থগিত। বরং একটা গল্প শোনা যাক, ঐ ক খ গ বিষয়কই।

ছোট বাচ্চাকে বাবা ক খ গ ঘ পড়াতে বসিয়েছেন। ছেলে পড়ছে 'ক খ গ ঘ...।' বাবা কী একটা কাজে উঠে গেছেন। একটু পর কাজ সেরে এসে দেখেন ছেলে বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। বাবা ছেলেকে ডেকে তুললেন।

—সে কী বাবা তুমি পড়তে বসে ঘুমুচ্ছ কেন?

—পড়ে কী হবে?

—বাহ্ পড়া শিখে তুমি স্কুলে ভর্তি হবে।

—তারপর?

—তারপর স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে কলেজে ঢুকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তারপর?

—তারপর ভার্সিটিতে ঢুকবে।

—তারপর?

—তারপর ভার্সিটির পড়া শেষ করে চাকরি করবে কোনো অফিসে।

—অফিসে গিয়ে নাকি সবাই ঘুমায়, সেই ঘুমটাই তো ঘুমাচ্ছি বলে ছেলে ফের ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা যথারীতি থ!!

□

অনেকের অনেক রকম হবি থাকে। আমার হবি জোক্‌স পড়া। এই হবিটা অবশ্য গত কয়েক বছর ধরেই হয়েছে। আগে আমি অত জোক্‌স পড়তাম না। জোক্‌স ব্যাপারটা এখন আমি মোটামুটি গবেষণা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছি।

জোক্‌স পড়তে গিয়ে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। সেটি হচ্ছে ডাক্তার আর মেয়েদেরকেই যেন বেশি ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে জেনারেল জোক্‌সে। মেয়েদের প্রসঙ্গ থাক (তসলিমা নাসরিন বর্তমানে কাছেই মানে কলকাতায় অবস্থান করছেন বিধায়...) ডাক্তার নিয়ে দুএকটা জোক্‌স বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

প্রথম জোক্‌সটা এরকম—ডাক্তার চেম্বারে চলেছেন পথে দেখেন এক লোকের স্মৃতিফলকের দোকান। অজস্র স্মৃতিফলকে লোকদের নাম জন্ম তারিখ লেখা মৃত্যু তারিখটা খালি। ডাক্তার তখন জিজ্ঞেস করলেন

—কী হে মৃত্যুর তারিখ যে লেখ নি?

—জি আপনি রোগী দেখে ফিরলেই লেখা শুরু করব।

এরকম অজস্র জোক্‌স আছে ডাক্তার নিয়ে। তবে দুটো সত্যি ঘটনা বলি তাও ডাক্তার সম্পর্কিত। ঘটনা মার্ক টোয়েনকে নিয়ে। তিনি তখনো জীবিত। একদিন তাঁর কাছে এক উদ্ধত তরুণ এল।

—কী ব্যাপার?

—আমি আপনার একজন ভক্ত।

—কী চাই?

—আমি চাই দেশ ও জাতিকে কিছু দিতে অর্থাৎ সেবা করতে।

—ভালো কথা সেবা কর।

—আমি আসলে মেডিক্যালের ছাত্র। মেডিক্যালের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—কেন?

—আমি আপনার মতো সাহিত্যচর্চা করে দেশ ও জাতির সেবা করতে চাই।

মার্ক টোয়েন তরুণকে কিছুক্ষণ জরিপ করে ঠাণ্ডা গলায় বললেন।

—তুমি চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়া ছেড়েই জাতির বিরাট সেবা করেছ। এখন নতুন করে সাহিত্যচর্চা করে জাতির জন্য সর্বনাশ ডেকে আনার কোনো কারণ দেখছি না।

আরো কয়েকশ বছর পিছিয়ে আরেকটা ঘটনা... সম্রাট ফ্রেডারিকের সময়। তিনি আবার চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। নিজেও টুকটাক চিকিৎসা করতেন বলে শোনা যায়। তো ভয়াবহ 'রোজব্যাক যুদ্ধ' শুরুর আগে তিনি তাঁর সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন—



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—সেনাপতি তোমার কী মনে হয় এ যুদ্ধে আমাদের ফলাফল কী দাঁড়াবে?

—জাঁহাপনা বলা কঠিন। জেতা বা হারার সম্ভাবনা পঞ্চাশ ভাগ। সম্রাট তখন বললেন

—যদি আমি পরাজিত হই তা হলে আমি ভেনিস শহরে ফিরে যাব।

—ফিরে গিয়ে কী করবেন কিছু ভেবেছেন কি মহামান্য সম্রাট?

—হ্যাঁ, আমি নিজেকে একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব।

শুনে সেনাপতি মন্তব্য করলেন

—মহামান্য সম্রাট ফ্রেডারিক, আপনি কি সারা জীবন নরহত্যাই করে যাবেন?

এই মন্তব্যের পর সেনাপতির ঘাড়ের উপর মস্তকটি সম্রাট ফ্রেডারিক শেষ পর্যন্ত রেখে ছিলেন কি না তা অবশ্য জানা যায় নি।

তবে ডাক্তারদের নিয়ে সবচে মর্মান্তিক উক্তিটি করেছেন যিনি তিনি হলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তাঁর বাক্যটি হচ্ছে, 'রোগী ভালো করেন ঈশ্বর আর ডাক্তাররা তার ফিসটা নিয়ে নেয়'। তবে এটা ঠিক মানুষের সরাসরি সেবা কিন্তু একজনই করতে পারেন তিনি হলেন ডাক্তার। যদিও পেশাটি যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ আর এজন্যই বোধ হয় সবাই বলে কেউ স্বর্গে গেলে ডাক্তারই যাবেন সবার আগে। আর কেউ নরকে গেলেও সেই ডাক্তারই যাবেন সবার আগে।

একটা বিখ্যাত জার্মান প্রবাদ নিয়ে শেষ করি 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, আর ওষুধ না খেলে সারে মাত্র এক সপ্তায়।'

❑

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এই ঢাকা শহরটা যেন অভিভাবকহীন। যে ছেলেটা হেরোইন খেয়ে নেশা করছে, কিংবা যে সন্ত্রাস করছে তাদের কি অভিভাবক নেই? অভিভাবক থাকলে কি এমনটা হতে পারত?

এই উচ্চাঙ্গের বাক্যটি অবশ্য আমার নয় আমার এক বন্ধু স্থানীয় সাংবাদিকের। তিনি দেশ নিয়ে এই শহর নিয়ে সব সময়ই ভাবেন। এবং ভাবতে ভাবতে এই সত্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন যে এই দেশটি হচ্ছে মাথায় জাতীয় ফল ভাঙার দেশ মানে মাথায় কাঁঠাল ভাঙার দেশ। যে যত কাঁঠাল ভাঙতে পারবে সে তত দ্রুত উন্নতি করতে পারবে।

এ পর্যন্ত শৈত্য প্রবাহ, (মানে সত্য আর কি) এবার আমরা মিথ্যা প্রবাহে ঢুক... তো মাথায় জাতীয় ফল ভাঙার এই দর্শন মাথায় নিয়ে এক লোক সরকার থেকে নিরানব্বই বছরের জন্য বিশাল জমি লিজ নিয়ে প্রায় নিরানব্বইশ কাঁঠাল গাছ লাগাল (আসলে ১০,০০০টাই লাগানোর প্রজেক্ট ছিল কিন্তু সরকারের ছাগল প্রকল্পের ১০০ ছাগল জনপ্রতি ১টা করে কাঁঠাল চারা খেয়ে ফেলে!) সে যাই হোক লোকটির প্ল্যান হচ্ছে ঐ গাছে কাঁঠাল ধরবে পাকবে সেই পাকা কাঁঠাল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফ্রি ফ্রি পাঠানো হবে। যেন যে কেউ এই কাঁঠাল অন্যের মাথায় ভেঙে দ্রুত উন্নতি করতে পারে। আর বলাই বাহুল্য জনগণ উন্নত হলেই দেশ উন্নত এ তো সোজা হিসাব।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বিরুদ্ধ রাজনীতির আরেক লোক সেও বিশাল জমি লিজ নিয়ে হেলমেট তৈরির ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে বসে। তার দর্শন হচ্ছে দেশীয় হেলমেট কিনলে বিদেশী মোটরসাইকেল ফ্রি দেয়া হবে। তার এই ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ করে ধুপধাপ সব হেলমেট বিক্রি হল... কারো মাথায় কাঁঠাল ভাঙা যাচ্ছে না। প্রত্যেকের মাথায় যে মিথ্যা আশ্বাসের দেশীয় হেলমেট। কাঁঠাল ভাঙলেও হেলমেটের কারণে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস। ওদিকে

ফ্রি বিদেশী মোটরসাইকেলের মূল্য ঝুলিয়ে হেলমেট বেচে কোটি টাকা নিয়ে শিল্পপতি পগার পার।

শুরুতে অভিভাবক প্রসঙ্গে বলছিলাম। এ প্রসঙ্গে দুটো চমৎকার কোটেশন এখানে ধার করা যেতে পারে। যেমন শেখ সাদী বলেছেন—'অভিভাবকহীন হয়ে বেঁচে থাকা যেন মৃত্যুর শামিল'। আবার এইচ.ডি.ডনের একটি বিখ্যাত কোটেশন এরকম 'মরে যাওয়াটাই শেষ কথা নয়, তার পরেও বেঁচে থাকা সম্ভব', আর সেই রকম বেঁচে থাকতে হলে যে কোনো রকম মৃত্যু থেকে দূরে থাকুন। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো জীবিত মানুষেরই মৃত্যুর কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

❑

নিজের ভালো তো সবাই করে বা করতে চায় কিন্তু অন্যের ভালো কে করে? কাজেই অন্যের ভালো করা বা চাওয়াটাই হচ্ছে আসল করা। প্রতিটি পরিবারে যদি এরকম একজন থাকে যে শুধু অন্যের ভালো চায় বা করে তা হলে আমাদের দেশ আজকে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরের এই দর্শন আমার না। আমার আরেক পরিচিতজনের। তো এরকম একটি পরিবারের সন্ধান আমি পেয়েছি, যে পরিবারের বড় ছেলে অন্যের উপকার করে বা করতে চায়। মোট কথা অন্যের জন্য ভালো চায়। নিজের জন্য কিছুই চায় না। তো সেই পরোপকারী বড় ভাই একদিন ছোট ভাইকে নিয়ে গেল এক মাজারে। ছোট ভাই খেয়াল করল বড় ভাই অত্যন্ত আবেগ বিহ্বল হয়ে কান্নাকাটি করে দু হাত তুলে আকুল গলায় খোদার কাছে প্রার্থনা করল। মাজার থেকে ফেরার পথে ছোট ভাই বড় ভাইকে প্রশ্ন করল

—তুমি আল্লার কাছে কী চাইলে ভাইয়া? খুব দেখলাম কান্নাকাটি করলে?

—তোরা তো আমাকে চিনিস। লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় ভাই বলতে লাগল, 'আমি কি কখনো নিজের জন্য কিছু চাইতে পারি?'

—তা অবশ্য। স্বীকার করল ছোট ভাই।

—এবারও তোদের জন্যই কিছু চেয়েছি।

—সেটা কী?

—তোর জন্য একটা 'ভাবি' আর বাবা-মার জন্য 'বউমা'।

এবার চাওয়া-পাওয়ার একটা টিপিক্যাল গল্প। এক লোক হঠাৎ করে আলাদীনের চেরাগ পেল। যথারীতি ঘষা দিতেই দৈত্য এসে হাজির।

—হুকুম করুন মালিক কী চাই?

—আমার আরেকটা আলাদীনের চেরাগ লাগবে।

দৈত্য তো অবাক। মালিক কী বলেন? আমি তো আছিই আপনার কী লাগবে বলুন সব এনে দিচ্ছি। আরেকটা চেরাগ দিয়ে কী হবে। কিন্তু চেরাগের মালিক নাছোড়বান্দা। আরেকটা চেরাগ তার লাগবেই। বিরস বদনে প্রথম চেরাগের দৈত্য আরেকটা চেরাগ এনে হাজির করল। সেটাতে ঘষা দিতেই বেরিয়ে এল দ্বিতীয় দৈত্য।

—হুকুম করুন মালিক, বলল দ্বিতীয় দৈত্য। (প্রথম দৈত্য মন খারাপ করে পাশে দাঁড়ানো)

—এখন তোমরা দু জন রেসলিং শুরু কর।

—কী বলছেন মালিক?? দুই দৈত্য হতভম্ব!


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—যা বলছি কর।

বাধ্য হয়ে দুই দৈত্য বিরসবদনে কুস্তি শুরু করল। আর তাদের মালিক বাইরে প্যান্ডেল টাঙিয়ে টিকিট কাউন্টার বসিয়ে মাইকিং শুরু করে দিল... "আয়া পড়েন আয়া পড়েন... রেসলিং... w w w ফেল..."

❑

নক্ষত্রের বেগে যদিও ছুটেছে সময়, পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয়! সময় নিয়ে একটা ঘটনা রিপ্লে করা যাক। এক লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। রাস্তার পাশে এক মুষ্ক পালোয়ান দাঁড়িয়ে হাতে দামি ঝকঝকে নতুন রোলেক্স ঘড়ি। নতুন ঘড়ি বলেই বোধ হয় ঘন ঘন সময় দেখছিল লোকটি। তো আমাদের প্রথম লোকটি মুষ্ক পালোয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল

—ভাই কটা বাজে?

মুষ্ক পালোয়ান কথা নাই বার্তা নাই গদাম করে এক ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটির নাকে। রক্তারক্তি ব্যাপার। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে লোকটি কোনোরকমে বলল

—ভাই এটা কী করলেন?

—কিছু মনে করবেন না, এখানে বেশি না দশ মিনিট হল দাঁড়িয়েছি এর মধ্যে মোট বারজনকে সময় বলেছি... আপনি হলেন তের নম্বর। তাই মেজাজ ঠিক রাখতে পারি নি বলেই মুখে না বলে একটা মাত্র ঘুসি দিয়ে আপনাকে জানালাম এখন একটা বাজে।

ঘুসি খাওয়া লোকটি কোনো কথা না বলে সোজা পাশেই এক মসজিদে ঢুকে গেল। চট করে দু রাকাত নফল নামাজ পড়ে বেরিয়ে এল। তখনো মুষ্ক জোয়ান দাঁড়িয়ে। এবার তার অবাক হবার পালা!

—আশ্চর্য আমি আপনাকে ঘুসি মারলাম আপনি কোনো প্রতিবাদ না করে মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়লেন?

—আল্লাহর কাছে আমি শোকর আদায় করলাম।

—কেন?

—আর এক ঘণ্টা আগে যদি আপনাকে টাইম জিজ্ঞাসা করতাম!

রোলেক্স ঘড়ির আরেকটা ঘটনা। মানে রোলেক্স ঘড়ির আরেক মালিকের ঘটনা। এই মালিক অবশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই। একটা দামি গাড়িতে করে চলেছেন। নিজেরই গাড়ি। হঠাৎ সামনে দিয়ে আসা সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ। দুমড়ে-মুচড়ে গেল তার গাড়িটা। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কোনোমতে। ছুটে এল ট্রাফিক সার্জেন্ট।

—দেখলেন আমার গাড়িটার কী হাল করেছে। সমগ্র বাংলাদেশ ততক্ষণে ছাপ্পান্ন হাজার গজ সটকে পড়েছে। সার্জেন্ট চেঁচিয়ে উঠল

—আরে রাখেন আপনার গাড়ি। আপনার হাতটা তো শেষ... জলদি হাসপাতালে চলুন।

লোকটি হাতটার দিকে তাকাল। আসলেই তার হাতটা কনুই থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এক টুকরো চামড়ায় উপর কোনোমতে ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখে গাড়িওয়ালা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'আমার রোলেক্স ঘড়িটাও শেষ'। বলাই বাহুল্য হাতের সঙ্গে ঘড়িটাও দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।

উপসংহারে হেক্টর বায়ালিওজের সময় সংক্রান্ত বিখ্যাত বাক্য 'সময় হচ্ছে সেই বিরাট শিক্ষক যে তার সব ছাত্রকেই এক সময় হত্যা করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও!·আমারবই.কম

]

াসে করে যাচ্ছিলাম। সিটিং সার্ভিস বাস। যত সিট ঠিক ততজন যাত্রী। তো বাস একটা ঁগন্যালে থামতেই এক তরুণ জানালার কাছে ছুটে এল। মাথায় টুপি

—ভাই একজন মারা গেছেন তার জন্য কিছু সাহায্য।

—কে মারা গেছে?

—আমি চিনি না রাস্তার ঐ পাশে লাশ।

আমি আর সহযাত্রী রাস্তার ঐ পাশটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আরেকটা বাস াড়িয়ে থাকার কারণে দেখা যাচ্ছিল না। তরুণটি জানাল বাসটি সরে গেলেই লাশটা দেখা াবে। আমার বৃদ্ধ সহযাত্রী কিছু সাহায্য করলেন। আমিও কিছু দিলাম। তারপর াসের অন্যান্য যাত্রীরা কমবেশি দিল। ব্যাপারটা ভালোই লাগল। এই ঢাকা শহরে চেনা লাককেই কেউ সাহায্য করে না, আর অচেনা এক লাশের দাফন-কাফনের জন্য সাধারণ ানুষ এগিয়ে এসেছে... তারুণ্যের এই যে প্রয়াস... ভিতরে ভিতরে আমি একটা বক্তৃতা রডি করতে লাগলাম। অফিসে গিয়ে তরুণ স্টাফদের উদ্দেশে ঝাড়ব। আর তখনই ঁগন্যাল ছেড়ে দিল। আমাদের পাশের বাসটি হুশ করে চলে গেল। কিন্তু আমাদের বাসটির ার্টে কী সমস্যা হল, তখনো দাঁড়িয়ে। আমরা দুই দাতা তখন রাস্তায় পাশের লাশ খুঁজছি কিন্তু কোথায় লাশ? রাস্তার ওপাশে ফুটপাত শূন্য। ফুটপাতের পাশের দেয়ালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার জন্মদিনের বেশ কিছু পোস্টার। আমরা সেই দরদি তরুণকে খুঁজলাম। তার কিও দেখলাম না কোথাও। তবে কি সে প্রেসিডেন্ট জিয়াকেই ইঙ্গিত করেছে? মানে াশের রাজনীতি বিষয়ক কিছু? আমরা সাধারণ বাস যাত্রীরা বুঝতে পারি নি বা ধরতে পারি ি?

আসলে এদেশের রাজনীতি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বহু আগেই চলে গেছে। বে গেছে? সেই তখন যখন রাজনীতির মধ্যে পলিটিকস ঢুকল তারপর পলিটিকসের মধ্যে কল ট্রিকস। এখন এই ট্রিকসের মধ্যে যে কী ঢুকছে তা জানেন উপরে এক ঈশ্বর (অবশ্য শ্বরও ইতোমধ্যে রাজনীতি শুরু করে দিয়েছেন কি না তাই বা কে জানে!) আর নিচে াজনীতিবিদরা।

রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ আসলে কী ভাবে আজকাল? এ প্রসঙ্গ থাক রং একটা জোক্স শোনা যাক। দুই প্রতিবেশী।

—ওহে তোমার ছেলেটা নাকি বখে গেছে?

—হ্যাঁ।

—তা কী করে সে? হেরোইন ধরেছে নাকি?

—তার চেয়েও খারাপ।

—ছিনতাই রাহাজানি শুরু করেছে?

—তার চেয়েও খারাপ।

—খুন-খারাপি করেছে?

—তার চেয়েও খারপ।

—তার চেয়েও খারাপ আর কী হতে পারে? খোলাসা করে বল না। তুমি তো দেখছি াজনীতিবিদদের মতো রহস্য করে কথা বলছ।

—হ্যাঁ... এতক্ষণে ধরতে পেরেছ। সে রাজনীতিতে ঢুকেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চৌদ্দ সংখ্যাটির গাণিতিক মূল্য কী আছে জানি না তবে বাংলা ভাষায় কিন্তু এর ব্যবহার বহুমুখী। যেমন বাঙালি যখন টিপিক্যাল ঝগড়া শুরু করে তখন ঝগড়ার দ্বিতীয় 'ফেজ'-এ যে বাক্যটি বলে সেটা হচ্ছে 'তোর চৌদ্দ গুষ্টির... ইত্যাদি ইত্যাদি' এই ঝগড়া যখন খুনোখুনি পর্যায়ে চলে যায় তখন আবার ঐ চৌদ্দ সংখ্যাটি আসে। কীভাবে? যে কোনো এক পক্ষকে চৌদ্দ শিকের ভিতর ঢুকতে হয়। মানে জেলখানায় ঢুকতে হয় আর কি। আর অন্য পক্ষ মানে ঝগড়ায় জেতা পার্টি আনন্দে উল্লাসে যে কাণ্ডটি করে সেখানেও চৌদ্দ সংখ্যা পুনরায় আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ তারা জিতে গিয়ে যে পার্টি থ্রোর করে সেখানে চৌদ্দ পদ না থেকেই যায় না। আর ঐ চৌদ্দ পদ খেয়ে কারো না কারো পেট নামবেই এবং চৌদ্দবার টয়লেটে না দৌড়ে আর উপায় থাকে না। তো হঠাৎ করে চৌদ্দ সংখ্যাটা নিয়ে পড়লাম কেন? নিউমোরালজিক্যালি এ সংখ্যা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? ১৪কে পাশাপাশি যোগ করলে হয় ৫। অর্থাৎ বৃহস্পতি। অর্থ ও সাফল্যের গ্রহ। এই সংখ্যায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কি জন্মেছেন মানে সেলিব্রেটি কেউ! তবে আমার প্রিয় কেউ কেউ এই সংখ্যায় জন্মেছেন তারা অবশ্য আমাকে মনে রাখেন নি আমি রেখেছি। সংখ্যাতত্ত্বের ওপর আগ্রহের কারণেই হোক কিংবা যে কারণেই হোক এই মনে রাখা।

চৌদ্দ সংখ্যা আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ১৪ ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে। এই ফাঁকে একটা ভ্যালেন্টাইন জোক্স শোনানো যাক।

চৌদ্দ ফেব্রুয়ারিতে প্রেমিক-প্রেমিকা রমনা পার্কের এক গহিন ঝোপের ভিতর রোমান্টিক ভঙ্গিতে বসে...প্রেমিক বলছে

—তোমাকে আমার জীবনে পাশে না পেলে প্রশিকা ভবনের চৌদ্দ তলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব।

—এ কথাটা গত এক বছরে তুমি কম করে হলেও চৌদ্দবার বলেছ আমাকে... বেশ তো চল আমরা বিয়ে করে ফেলি।

—ওফ দিলে তো মুডটা অফ করে।

—কেন?

—এই যে প্রেমের মধ্যে বিয়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে!

চৌদ্দ সংখ্যার শেষ গল্পটি দিয়ে শেষ করি এই চৌদ্দ রকম প্যাঁচাল! সেই যে পুরান গল্প। এক লোক সব সময় টাকা জাল করে। অবশ্য সে কখনো বড় নোট জাল করে না। ছোট ছোট নোট জাল করে। বিশ টাকা অথবা দশ টাকা এর বেশি নয়। কিন্তু একদিন কী যে হল ভুলে একটা চৌদ্দ টাকার নোট বানিয়ে ফেলল। এখন উপায়? এক একটি টাকা তৈরি করতে তার যথেষ্ট শ্রম আর মেধা খরচ হয়। তাই সে টাকা বাজারে চালানোর সিদ্ধান্ত নিল।

তো সেই চৌদ্দ টাকার নোটটা নিয়ে সে বেরুল এক সন্ধ্যায়। এক মুদির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—ভাই এই নোটটার ভাংতি দিতে পারেন বড় বিপদে পড়ছি।

মুদি দোকানি চৌদ্দ টাকার নোটটা হাতে নিল। একনজর দেখল তারপর বলল

—ভাংতি হবে।

ভিতরে ভিতরে দারুণ চমকে উঠল চৌদ্দ টাকার মালিক। ততক্ষণে মুদি দোকানি দুটো নোট বাড়িয়ে ধরেছে। চৌদ্দ টাকার মালিক কোনো ঝুঁকি নিল না। নোট দুটো হাতে নিয়েই সরে পড়ল। একটু দূরে এসে নোট দুটো খুলে দেখল। দেখে দুটো সাত টাকার নোট!!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

❑

দেশে ইদানীং আলোচনার জন্য নতুন নতুন বহু বিষয় এসেছে যেমন ডা. বি চৌধুরীর তৃতীয় ধারা, হুদার বেহুদা উক্তি, সংসদে আসন বাড়ানো, পুলিশের পোশাক বদল এত নতুন বিষয়ের মধ্যে একটা পুরান বিষয় মাঝখান থেকে চাপা পড়ে গেল। মানে যাচ্ছে। বিষয়টা মশা, মশক... দি মসকিউটো।

মশা কিন্তু একটুও কমে নি। কিন্তু এ নিয়ে এখন আর কেউ লেখালেখি করেন না! জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট রনবী একবার কোনো এক পত্রিকার সাক্ষাৎকারে তার প্রিয় কার্টুন সম্পর্কে বলেছিলেন মশা নিয়ে যে কোনো কার্টুনই তার প্রিয়। সেই রনবীও এখন আর মশা নিয়ে কার্টুন আঁকেন না। নীরবে-নিভৃতে মশা এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। মশার কামড় এখন কোনো বিষয় না। আগে ঘুম না আসলে ভেড়ার পাল গুনতাম এখন আমরা ঘুমের আশা বাদ দিয়ে মশার পাল গুনি।

প্রতিদিন টন টন রক্ত পাচার হচ্ছে মশার পেটে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে। যেন এটাই স্বাভাবিক। চিরন্তন সত্য। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলে গান গাইত যে পাখি তাকে আর গান গাইতে দেখা যায় না কোথাও। বোধ করি লজ্জায় গা ঢাকা দিয়েছে। এক 'খোকার' জন্য যত মশা! আবার নতুন নতুন খোকা হবে গৃহস্থের? পাগল? না উন্মাদ?

তবে মশা এখন যেন ক্রমেই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে আমাদের জীবনে। কীভাবে? কয়েকটা পয়েন্টস দেয়া যাক—

১। গালে বিউটি স্পট দিবেন? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে থাবড়া মারুন। একটা না একটা মশা বিউটি স্পট হয়ে গালে সেঁটে যাবে।

২। আঙুল ফুটো করে রক্ত দিতে হবে প্যাথলজিতে টেস্টের জন্য? তার দরকার কী! নিজের মশারি থেকে একটা মশা ধরে পাঠিয়ে দিন নাম-ধাম লিখে।

৩। লোডশেডিং চলছে টিভি বন্ধ সব বিনোদন বন্ধ তাইবা বলেন কীভাবে? নন স্টপ মসকিউটো কোরাস কনসার্ট তো অব্যাহত...

এরকম অজস্র 'মশক টিপ্‌স' আছে। কোনটা ফেলে কোনটা বলব? তাই আসুন আমরা নগরবাসীরা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি

'মশা মশা মশা
(তুই) না থাকলে যে কী হত দশা'

❑

সেদিন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে গিরগিটির ওপর একটা দুর্দান্ত প্রোগ্রাম হচ্ছিল। ছেলেবেলায় রক্তচোষা গিরগিটি দেখলে আমরা ঐ রাস্তা দিয়ে যেতাম না। ঐ গিরগিটি নাকি শরীরের সব রক্ত ফান্টা খাওয়ার মতো চো চো করে টেনে নেয়। তখন বুঝতাম না। এই অ্যাদ্দিনে এসে বুঝলাম ঘটনা, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি দেখে। এই ধরনের গিরগিটিরা নিজের প্রয়োজন অনুসারে শরীরের রঙ পরিবর্তন করতে পারে। যেমন প্রেমিককে আহ্বান করার জন্য সবুজ গিরগিটি বিশেষ এক ধরনের রঙ তৈরি করে তার গায়ে, মানে তার চামড়ার পিগমেন্টে। তা দেখে প্রেমিক প্রবর ছুটে আসে। আবার মুখোমুখি সংঘর্ষের সময় দুজন প্রতিপক্ষ যুদ্ধংদেহে রঙ ধারণ করে। কিংবা শত্রুর মুখে পড়লে আত্মগোপন করার জন্য গাছের ছালবাকলের রঙ ধারণ করে গাছের সঙ্গে একদম মিশে যায়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হঠাৎ গিরগিটি নিয়ে পড়লাম কেন? আসলে পুলিশের ঘন ঘন ড্রেস চেঞ্জ হওয়ার কারণেই ঘটনাটা মনে পড়ল। পুলিশও যেন একের পর এক গিরগিটির মতো ড্রেস চেঞ্জ করে চলেছে। আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁর গায়ে দেখেছি খয়েরি ড্রেস। স্বাধীনতার পর হল নীল, এখন সবুজ। আবার সম্ভবত দাঙ্গা পুলিশের গায়ে আরেক ড্রেস। সেদিন বাণিজ্যমেলার কাছে রাস্তায় দেখি তিন পুলিশ পাশাপাশি তিন ড্রেসে দাঁড়িয়ে। একজন ট্রাফিক পুলিশ গায়ে নিল ড্রেস, নতুন পুলিশ সবুজ ড্রেস, দাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্বেট ড্রেস। যেন স্কুলের ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক শুরু হয়েছে।

নাই কাজ তো খই ভাজ। ইদানীং খই ভাজার কাজও নেই। কারণ বিদেশ থেকে পপকর্ন প্যাকেট অবস্থায় আসে। কাজেই কী আর করবে পুলিশের ড্রেসই চেঞ্জ করা যাক।

সেদিন চট্টগ্রামের কার্টুনিস্ট টিপুর একটা কার্টুন দেখলাম। পুলিশ নতুন দেয়া ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে আর পাশে পথচারী বলছে

—কী ভাই, ড্রেস চেঞ্জ হওয়ায় কি লাভ হল কিছু? ক্রিমিনাল ধরতে পারছেন?

—নাহ। পুলিশের হতাশ উত্তর।

—কেন?

—মনে হয় ক্রিমিনালরাও ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলেছে!

সবচে মজার খবর ছেপেছে প্রথম আলো। চট্টগ্রাম–ফেনী রোডে দু'জন নতুন ড্রেসের পুলিশকে জনগণ ডাকাত সন্দেহে পিটিয়ে দিয়েছে! সেই চিরন্তন সমস্যা তৈলধার পাত্র না পাত্রধার তৈল... সর্প ভ্রমে রজ্জু না রজ্জু ভ্রমে সর্প!... পুলিশ ভ্রমে ডাকাত না ডাকাত ভ্রমে পুলিশ! পুলিশরা ডাকাত? না ডাকাতরা পুলিশ! এই ধাঁধার উত্তর দেবে কে?

❑

ইদানীং রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে গিয়ে আমাদের প্রায় প্রতিদিন 'সরি' শব্দটা বলতে হয় গোটা বিশেক বার। আমার এক সতীর্থ হিসেব করে বের করেছে সে নাকি গত বছর মানে ২০০৩ সালে কম করে হলেও ১০,০০০ বার সরি বলেছে। তার মধ্যে মোবাইল ফোনেই বলেছে ৫,০০০ বার। হয়তো ফোন চলে গেছে রঙ নাম্বারে বাধ্য হয়ে বলতে হল 'সরি'। রাস্তা পার হতে গিয়ে আরেকজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগল বলতে হল 'সরি'। তো ঐ ১০,০০০ বার সরি বলায় কখনোই কোনো সমস্যায় পড়তে হয় নি। একবার শুধু সমস্যা হয়েছিল। রাস্তায় এক বৃদ্ধের সঙ্গে হালকা একটু ধাক্কা লাগলে সে বলল, 'সরি'। বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামতে বললেন

—কী বললে?

—না মানে বললাম সরি।

—ঐ শব্দটা তুলে নাও।

—জি, মানে? সতীর্থ ঘাবড়ে গেছে।

—বললাম ঐ শব্দটা তুলে নাও।

—জি?

—বলছি তোমার ঐ শব্দটা উইথড্র কর।

—জি করলাম।

—এবার বল দুঃখিত।

—দুঃখিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ধন্যবাদ। তবে আমিও তোমার কাছে দুঃখিত 'উইপড্র' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য। বলে বৃদ্ধ হাঁটা দিল।

বৃদ্ধ একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজির শিক্ষক। 'HOW TO SPEAK ENGLISH' গ্রন্থের লেখক। বইটি বাজারে চলে নি বলে ইংরেজি শব্দ শুনলে মাথায় ফ্যাগোসাইট উঠে যায় (বৃদ্ধদের রক্তে হিমোগ্লোবিন কম থাকে)।

এ তো গেল বাস্তব জীবনের সরি মানে দুঃখিত হওয়ার বিড়ম্বনা। এবার আসুন অবাস্তব জীবন...

দুই প্রতিবেশী মুখোমুখি

—দুঃখিত যে আমার মুরগিটা আপনার ফুলের বাগান নষ্ট করেছে।

—আমিও দুঃখিত যে আমার কুকুরটা আপনার মুরগিটা খেয়ে ফেলেছে।

—সেক্ষেত্রে আমিও দুঃখিত যে পশু ক্লেশ সালিশ কেন্দ্রের লোকজনদের খবর দিয়েছি।

—সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো জানেন না... আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মানে জানাতে বাধ্য হচ্ছি পশু ক্লেশ সালিশ কেন্দ্রের লোকজন এসেছিল। তাদের নগদ ৫০০ টাকা দিয়ে বিদায় করেছি।

—সেক্ষেত্রে আমিও পুনরায় দুঃখিত যে ইতোমধ্যেই আমি এন্টি-করাপশনে ঘুষের ব্যাপারটা জানিয়েছি...

তো এই দুঃখিত দুই প্রতিবেশীর দুঃখিত হওয়ার সিরিয়াল এত দীর্ঘ যে এখানে লিখতে গেলে শেষে আমাকেও পাঠকের কাছে সরি মানে দুঃখিত বলতে হবে।

তবে সেরা 'দুঃখিত' বলেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট লুই দ্বিতীয় (সম্ভবত) তাঁকে যখন গিলোটিনে উঠানো হল তখন তিনি কোনো কারণে দেরি করছিলেন একটু। গলা গিলোটিনে ঢুকানোর আগে জল্লাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাকে দেরি করলাম সে জন্য দুঃখিত'।

❑

ভাড়া বাড়িতে থাকার অনেক বিড়ম্বনা। আমি কিছুদিন ভাড়া বাড়িতে ছিলাম তখন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। সে অভিজ্ঞতায় পরে আসছি।

আগে বাড়ি ভাড়ার জন্য গেলে বলত বাচ্চাকাচ্চা আছে কি না।

—হ্যাঁ আছে।

—না, তা হলে দিব না।

—কেন দিবেন না?

—বাচ্চাকাচ্চা ঘরবাড়ি নষ্ট করে।

—বাহ তা হলে আমার বাচ্চাকাচ্চা কই যাবে?

—সেটা আমি জানি না। বলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল বাড়িওয়ালা।

এ তো গেল কিছু দিন আগের বাড়িওয়ালাদের রকমসকম। এখনকার বাড়িওয়ালারা তো আরো এক ডিগ্রি সরেস। হয়তো আপনি গেলেন বাড়ি ভাড়া নিতে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করবে, যেমন :

—বাড়ি ভাড়ার জন্য এসেছেন?

—জি।

—ফটো তোলার অভ্যাস আছে?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—মানে?

—বাহ সোজা প্রশ্নটা ধরতে পারছেন না? বলছি ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলেন কি না?

—হ্যাঁ মাঝে মধ্যে তুলি, কেন?

—তা হলে হবে না।

—মানে?

—মানে বাড়ি ভাড়া দিব না আপনাকে।

—কেন?

—ছবি তোলেন তার মানে ছবি বড় করে বাঁধাবেন। তারপর দেয়ালে পেরেক ঠুকে ঝুলাবেন... আমার দেয়ালে পেরেক টুকতে দিব না, সরি। যথারীতি মুখের উপর দরজা বন্ধ।

তো এই পেরেক না ঠুকতে দেয়া বাড়িওয়ালার কাছে শেষ পর্যন্ত এক ভাড়াটিয়া এসে যে কথা দিল কখনো কোনো পেরেক ঠুকবে না দেয়ালে। ছবি তো তুলবেই না এমনকি বাড়িওয়ালার বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য তার দামি নাইক্কন এসএলআর ক্যামেরাটা পর্যন্ত বাড়িওয়ালার কাছে জমা রাখল। তো দিন যায়, একদিন ভাড়াটিয়া দেখল বাড়িওয়ালার ছেলে একটা ছবির ফ্রেম নিয়ে বাড়ি ঢুকছে। সে ছুটে গেল বাড়িওয়ালার কাছে

—কী ব্যাপার?

—না, দেখলাম আপনার ছেলে একটা ছবির বড় ফ্রেম নিয়ে ঢুকল।

—হ্যাঁ, তাতে সমস্যা কী?

—নিশ্চয়ই দেয়ালে ঝুলাবেন ফ্রেমটা?

—অবশ্যই, আমার দেয়ালে আমি পেরেক ঠুকে ঢুকাব সেটা আমার ব্যাপার, আপনার সমস্যা কী?

—না না কোনো সমস্যা নেই... আপনার বাড়ি আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন শুধু একটা অনুরোধ।

—কী অনুরোধ?

দেয়ালে তো পেরেক ঠুকবেন তো আমার এই পেরেকটা যদি ঠুকতেন—বলে চার ইঞ্চি লম্বা একটা পেরেক এগিয়ে দিল।

—কেন এত বড় পেরেক ঠুকব কেন?

—আপনার দেয়াল তো সাড়ে তিন ইঞ্চি যদি এটা ঠুকেন তা হলে দেয়াল ফুঁড়ে আমার ঘরে আধা ইঞ্চি পরিমাণ বেরুলে এ পাশে আমিও একটা ছবি ঝুলাতাম।

তবে কথায় বলে না এক মাঘেই কিন্তু শীত যায় না। কিংবা আরো পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন! সেই একদিন এসে হাজির হল বাড়িওয়ালার দুয়ারে।

—কী ব্যাপার?

—বাড়ি ভাড়া হবে?

—হ্যাঁ, আপনারা ক'জন?

—আমরা স্বামী-স্ত্রী।

—বাচ্চাকাচ্চা নেই তো?

—জি না। বাড়িওয়ালা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার ভাড়া, অগ্রিম ইত্যাদি আলাপ-আলোচনা হল। বাড়িওয়ালা খুশি মনে কন্টাক সই করলেন। তবে আপাতত মাত্র এক বছরের জন্য। কারণ এর মধ্যে যদি বাচ্চাকাচ্চা হয়ে যায় তা হলে পত্রপাট বিদায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও? আমারবই.কম

তো যাহোক। একদিন ভাড়াটিয়া মালামাল নিয়ে উঠলেন। একতলায় দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালা তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন বেশি ভারী মাল উঠছে না তো। ভাড়াটিয়া থাকবে দোতলায়।

ক'দিন পর বাড়িওয়ালা আবিষ্কার করলেন দোতলায় বাচ্চার চেঁচামেচি চিৎকার ধুপধাপ লাফালাফি। তিনি ছুটে গেলেন দোতলায়। দরজা খুলল ভাড়াটিয়া।

—কী ব্যাপার আপনি?

—বাচ্চার চেঁচামেচি শুনলাম।

—বাচ্চা? কী বলছেন আপনি?

বাড়িওয়ালা ঠেলে ঢুকে পড়লেন ঘরে, সারা বাড়ি প্রধানমন্ত্রীর ডগ স্কোয়াডের মতো সার্চ করলেন। না কোনো বাচ্চা নেই। শুধু ড্রইংরুমে একটা জাপানি পুতুল দেখে মুগ্ধ হলেন, কী জীবন্ত।

—এটা পুতুল?

—হ্যাঁ এটা একটা জাপানি পুতুল। আমি জাপান থেকে ফেরার সময় নিয়ে এসেছিলাম।

—ও আচ্ছা বাড়িওয়ালা বিষণ্ন মনে নেমে যেতে যেতে ফিসফিস করে বললেন, 'কিন্তু আমি যে স্পষ্ট নিজের কানে শুনলাম বাচ্চার গলা।'

—কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি।

—বলুন।

—আপনার বয়স হয়েছে তো... এটা এক ধরনের হ্যালুসিনেশন।

—হ্যালুসিনেশন?

—হ্যাঁ এক ধরনের রোগ, কঠিন রোগ। সময়মতো চিকিৎসা না করালে ভয়ঙ্কর হতে পারে।

বাড়িওয়ালা তখন ঘাবড়ে গেছে। আর ভাড়াটিয়াও হাত-পা নেড়ে রোগের ভয়াবহতা বোঝাতে লাগল এবং এও বলল যে তার পরিচিত একজন নামকরা ডাক্তার আছেন এ লাইনে এবং তিনি চাইলে তার চেম্বারেও নিয়ে যেতে পারেন। বাড়িওয়ালা রাজি হলেন।

সেই ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে বাড়িওয়ালা মুগ্ধ। A B C D .... X Y Z হেন ডিগ্রি নেই যে তার নামের শেষে নেই। ডাক্তার বাড়িওয়ালাকে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন

—এই রোগটা আসলে হঠাৎ করেই শুরু হয়... তারপর আস্তে আস্তে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

—যেমন?

—যেমন আপনার যখন মনে হচ্ছে আপনার মাথার উপর মানে দোতলায় একটা বাচ্চা খেলছে চিৎকার করছে... হাসছে... কিছু দিন পর হয়তো আপনি বাচ্চাটাকে সত্যি সত্যি দেখবেন... কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো বাচ্চারই অস্তিত্ব নেই ওখানে... এটা এক ধরনের অপটিক্যাল ইলিউশন... হ্যালুসিনেশনের সেকেন্ড ফেজ তবে ভয় পাবেন না ওষুধ দিচ্ছি নিয়মিত খান... রোগটা হঠাৎ করে যেমন শুরু হয়েছে হঠাৎ করেই দেখবেন ভালো হয়ে যাবেন একদিন।

বাড়িওয়ালা বিষণ্ন মুখে বাড়ি ফিরলেন। দিন যায় মাস যায়। ভাড়াটিয়া মাঝে মাঝে খোঁজ নেন।

—কী আঙ্কেল কেমন বোধ করছেন? এখনো বাচ্চার আওয়াজ পান?

—হ্যাঁ, অবস্থা মনে হয় আরো খারাপ হয়েছে।

—কীরকম?

—গতকাল বাচ্চাটাকে যেন দেখলাম।

—তাই নাকি?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—হ্যাঁ একদম আপনার বাসার জাপানি পুতুলটা যেন আমার সামনে দিয়ে গেল... কাঁধে একটা স্কুল ব্যাগ!

—বলেন কী?

—হ্যাঁ হ্যালুসিনেশনের সেকেন্ড ফেজ শুরু হয়েছে বোধ হয়...

ভাড়াটিয়া বাড়ি ঢুকে পকেট থেকে চকোলেট বের করে বাড়িয়ে দেয় জাপানি পুতুলটার দিকে

—বাবা বাড়িওয়ালা আমাকে স্কুলে যেতে দেখে ফেলেছে।

—দেখুক আর সমস্যা নেই... তোমারও আর পুতুল সাজার দরকার নেই।

রান্নাঘর থেকে ভাড়াটিয়া স্ত্রী চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার ডাক্তার বন্ধুকে একটা থ্যাংকস জানাও... সে ফোন করেছিল খবর জানতে'।

—খবর আর কী ও ফোন করলে জানিয়ে দিও আমাদের বাড়িওয়ালার হ্যালুসিনেশন সেকেন্ড ফেজ শুরু হয়েছে!

❑

আজকালকার বাবা-মা'রা খুবই সিরিয়াস। অঞ্জন দত্তের সেই গানটার মতো। শুধু পড়ালেখা করিয়েই তারা ক্ষান্ত নন, ছবি আঁকা, গান শেখা, খেলাধুলা, কোচিং বাচ্চাদের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা যেন। আমার অফিস ধানমণ্ডি মাঠের কাছাকাছি। ফলে প্রায়ই ওদিক দিয়ে যেতে হয়। তখন প্রায়ই দেখি মায়েরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে চলেছেন ক্রিকেট কোচিংয়ে কিংবা কোচিং সেরে ফিরছেন... এমনি একদিন দেখি এক মা তার ক্ষুদে ক্রিকেটার পুত্রকে শাসাতে শাসাতে নিয়ে চলেছেন।

—আজ তোমার বাবাকে বলবই... তুমি যা কাণ্ড করেছ না, দেখো ঠিক তোমার বাবাকে বলব।

আমি ভাবলাম হয়তো বাচ্চাটি স্কুলে কোনো অঘটন ঘটিয়ে এসেছে বা নম্বর কম পেয়েছে বা হোমওয়ার্ক না করার শাস্তি পেয়েছে... এজন্য মা ক্ষেপা। আমি কান খাড়া করলাম হাঁটতে হাঁটতে। বাচ্চাটা স্কুলে ঠিক কোন কাণ্ডটি ঘটিয়ে এসেছে জানা যাক না। মা তখনো বলছিলেন... মানে বলেই চলছিলেন, 'তুমি যা কাণ্ড করেছ আজ... আমি তোমার বাবাকে বলবই বলব... কী করে পারলে তুমি একের পর এক একই ভুল করতে...।'

আমার এবার ধারণা হল বাচ্চাটি নিশ্চয়ই অঙ্ক ভুল করে এসেছে। আর ঠিক তখনই মা আসল কাণ্ডটি উচ্চারণ করলেন... 'তুমি কী করে বারবার অফ স্ট্যাম্পে খোঁচা দিচ্ছিলে বলটাকে?'

হায় ঈশ্বর! আমি কোন জাগতে আছি আর বাচ্চার মা কোন জগতে! এই যে বাচ্চাদের উপর এত প্রেসার! খেলাধুলা, লেখাপড়া, নাচ, গান, ছবি এর আলটিমেট ফলাফল কী? ভালো? নাকি তারা একাডেমিক জোক্‌সের জন্য দিচ্ছে একের পর এক?

বরং কয়েকটা একাডেমিক (!) জোক্‌স শুনি।

—মা আমি অঙ্কে মাত্র ১ কম ১০০ পেয়েছি।

—গুড, ৯৯ পেয়েছ?

—না ০ ০ পেয়েছি।

—বাংলা ইংলিশে আমি ১০০ পেয়েছি।

—তাই নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—হ্যাঁ ইংলিশে ৫০ বাংলায় ৫০।

শুধু মা'দের কাছেই বা যাবে কেন বাচ্চারা? এবার বাবার কাছে যাওয়া যাক।

—ডেকেছ বাবা?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—দেখি তুমি অঙ্কে কতটা ইমপ্রুভ করলে, বল তো ৫০ যোগ ৩০ কত হয়?

—৭০।

—গুড, এই নাও দশ টাকা, দোকান থেকে একটা মিমি চকোলেট কিনে খেও। বাবার পাশেই বসে ছিলেন বাবার বন্ধু তিনি যথেষ্ট অবাক হলেন!

—সে কী তোমার ছেলে তো ভুল উত্তর দিল তারপরও গুড বলে টাকা দিলে?

—আগের বার বলেছিল ৬০। ইমপ্রুভ করেছে না?

গার্জেনদেরই বা দোষ দিয়ে কী হবে? তারা কী আর খামাখা খামাখাই ছেলের ঘাড়ে বইয়ের বস্তা চাপিয়ে কোচিংয়ে যান? স্কুল-কলেজে পড়াশুনা হয় না দেখেই যান। এই প্রসঙ্গে একটা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন—এক বাচ্চা স্কুল থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে বাসায়।

—বাবা আমাদের স্কুলে তো স্যাররা কিছুই পড়ান না, তা হলে আমি স্কুলে যাচ্ছি কেন?

—যাচ্ছ কারণ কেউ যখন আমাকে প্রশ্ন করবে আমার ছেলে কী করে? তখন যাতে আমি বলতে পারি তোমার স্কুলটার নাম আর তোমার ক্লাসটার নাম... ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

বলাই বাহুল্য সেই হতাশ ছেলের কাছে এটুকু অন্তত ক্লিয়ার হয়েছে যে পড়াশুনাটা তাকে নিজের উদ্যোগেই করতে হবে স্কুলের টিচার তাকে পড়াক আর না পড়াক। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

❑

একবার একটা লেখায় লিখেছিলাম 'বিদেশি উপহারে প্রবাসী বন্ধুর পরিচয়'। ঐ লেখার পরই কি না কে জানে প্রবাসী বন্ধুরা টুকটাক যাও জিনিসপত্র আনত আমার জন্য এখন মোটামুটি ডেড স্টপ।

আসলে উপহার দিয়ে কিন্তু অনেক না বলা কথা বলে ফেলা সম্ভব। যেমন সেই যে ক্রিকেট খেলায় কমন উপহারের গল্প। মানে ক্রিকেটের আম্পায়াররা সবাই একবার না একবার তার আম্পায়ারিং জীবনে হেরে যাওয়া দলের পক্ষ থেকে 'সাদা ছড়ি' উপহার পেয়েছেনই। কিংবা ফুটবলের সেই বিখ্যাত গল্পটা... ব্রাজিলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় পিনেইরো গোল করে এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এক মৌসুমে তিনি গোল করেন দশটি। তবে সবগুলো গোলই ছিল আত্মঘাতী। পরের মৌসুমে তাঁকে নামানো হয় স্ট্রাইকার হিসেবে। প্রথম খেলাতেই গোল করে বসলেন পিনেইরো এবং এবারও আত্মঘাতী।

তাঁর পঁচিশতম জন্মদিনে সতীর্থ খেলোয়াড়রা তাকে একটা কম্পাস উপহার দেয়। সেটার গায়ে খোদাই করে লেখা ছিল—'মনে রেখো বিপক্ষ দল অপর প্রান্তে'।

সেই গল্প তো সবার জানা সেই যে শিল্পী ভ্যান গ্যা প্রেমিকার বিয়েতে নিজের কান কেটে উপহার পাঠিয়েছিলেন, ফলে বাকি জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে রক্তাক্ত মাফলার পরে। উপহারে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন মহান শিল্পী ভ্যান গ্যা আর উপহারে 'পৌবনীতি' সৃষ্টি করেছিল এক অখ্যাত কার্টুনিস্ট (!) তার বন্ধুর বিয়েতে উপহার দিয়েছিল এক জোড়া বক্সিং গ্লাভস!? সেই উপহার পেয়ে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে... যাক সে এক করুণ ইতিহাস!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবার উপহার সংক্রান্ত খুব একটা কমন গল্প বলছি। পড়তে শুরু করে... 'আরে এ তো জানি' বলে ছেড়ে দেবেন না, শেষটা কিন্তু একটু ভিন্ন রকম! বন্ধুর জন্মদিনে বন্ধু দাওয়াত করল।

—তুই চলে আসিস, চার তলায় উঠে ডান দিকের ফ্ল্যাটের কলিংবেলটা কনুই দিয়ে চাপিস।

—কনুই দিয়ে কলিংবেল চাপব কেন? তুই কি ভেবেছিস তোর জন্য আমি উপহার আনব? মানে হাতে উপহার থাকবে? সরি সে গুড়েবালি!

—না না... তুই যে উপহার আনবি না সে আমি ভালো করেই জানি।

—তবে? কনুই দিয়ে বেল চাপার কথা বললি যে?

—আরে গাধা তাও বুঝলি না? নিচ তলায় ডেকোরেটর পঞ্চাশটা চেয়ার রেখে যাবে সকালে। ওরা বলেছে চার তলায় উঠাতে বেশি চার্জ দিতে হবে। তাই আমি ঠিক করেছি বন্ধুদের দিয়ে চেয়ার উঠাব তুই উপরে আসার সময় দু হাতে অন্তত গোটা চারেক চেয়ার হাতে করে... তাই বলছিলাম কনুই দিয়ে...

❑

ঢাকা টু নিউইয়র্ক বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চলছে। এক ভদ্রলোক তার সিট থেকে উঠে টয়লেটে গেলেন। গিয়ে দেখেন আরেক জন হাই কমোডে গম্ভীর হয়ে বসে পেপার পড়ছে। ভদ্রলোক খুবই বিরক্ত হলেন। দরজা খোলা রেখে কেউ টয়লেট করে? এ ধরনের মূর্খ লোকেরাই বিদেশে গিয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে।

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার টয়লেটে গেলেন। গিয়ে দেখেন একই অবস্থা। সেই লোক এখনো হাই কমোডে বসে। তবে পেপার পড়ছে না কফি খাচ্ছে, এয়ার হোস্টেসের সার্ভ করা কফি।

তৃতীয়বার উঠে গিয়ে যখন দেখলেন ঐ একই ব্যক্তি তখনো টয়লেটের হাই কমোডে বসে তখন আর তিনি মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। বিমানের ক্রুকে ডেকে আনলেন।

—এর মানে কী?

—জি কোন ব্যাপারে বলতে চাচ্ছেন?

—আমি তিন তিনবার টয়লেটে গিয়ে ঘুরে এলাম। একজনই যদি এতক্ষণ টয়লেটে বসে থাকবে তা হলে অন্যরা কখন যাবে?

—ও উনার কথা বলছেন তো? ক্রু টয়লেটের দিকে নির্দেশ করে বলে।

—হ্যাঁ তার কথাই বলছি।

—কিন্তু উনি তো উঠবেন না।

—উঠবেন না মানে?

—আজকের ফ্লাইটে খুব রাশ তো... তাই ওটাই উনার সিট।

হঠাৎ করে মারমুখী প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোক যেন আচমকা চুপসে গেলেন। তারপর মিনমিন করে বললেন, 'সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে একটা স্পেয়ার প্যান্ট হবে?' আশা করি পাঠক ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন।

তো বাংলাদেশ বিমানের অনেক বদনাম তারা নাকি কনফার্ম টিকিট দেয় চান্সে। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো অভিযোগ নেই। কারণ বিমানের প্লেনে খুব একটা চড়া হয় নি। যারা চড়ে তাদের থেকে শোনা। আরেকটা গল্প ঐ বিমান নিয়েই, তবে বাংলাদেশ বিমান নয়।

প্লেন ল্যান্ড করতে যাচ্ছে... এয়ারপোর্টে। পাইলট রহস্য করে কন্ট্রোল রুমে যে দায়িত্বে ছিল তাকে বলল, 'গেজ হু' যে দায়িত্বে ছিল তার পরিচিত বলেই এই রহস্যটা করল পাইলট।

—গেজ হু।

—গেজ হু।

বারবার 'গেজ হু' শুনে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা লোকটি বিরক্ত হয়ে গেল। সে তখন এয়ারপোর্টের সব লাইট অফ করে পুরো এয়ারপোর্ট অন্ধকার করে দিল তারপর বলল, 'গেজ হোয়ার?'

প্লেন নিয়ে সবচেয়ে ক্ল্যাসিক জোকটা না শোনালেই নয়। প্লেন উড়ে যাচ্ছিল হিথরো বিমানবন্দরের দিকে। এসময় হঠাৎ পাইলট তার মাথার পাশে পিস্তলের খোঁচা অনুভব করলেন। হাইজ্যাকার।

—সোজা হিথরো বিমানবন্দর নিয়ে চল।

—তাই তো যাচ্ছি। কম্পিত গলায় বলল পাইলট।

—ওসব বুঝি না গত দু বার হিথরো যাব বলে প্লেনে চড়েছি একবার হাইজ্যাকাররা নিয়ে গেছে সাইপ্রাস, আরেকবার নাইজেরিয়া... এবার আমি সোজা হিথরোতেই নামতে চাই!

হঠাৎ প্লেন নিয়ে এত প্ল্যান করে জোক্স শোনানো কেন? রাইট ব্রাদার্সের বিমান আবিষ্কারের ১০০ বছর গেল যে কদিন আগে!

❑

এক লোক, লোক না বলে তরুণ বলাই ভালো, গেছে থার্টি ফার্স্টের এক পার্টিতে। সেখানে দেশি-বিদেশি নানান সব মদের ছড়াছড়ি। কিন্তু তরুণ এক গ্লাস পানি চাইল।

—প্লিজ আমাকে এক গ্লাস পানি দিন কেউ।

—সে কী পানি কেন? হোস্ট ছুটে এসে জানতে চাইল। যে কোনো মদ আপনি পান করতে পারেন এখানে।

—তা পারি... ইন ফ্যাক্ট মদ পান করতেই এখানে এসেছি। তবে পার্টি শেষে আমার এমন অবস্থা হবে যে তখন হয়তো এক গ্লাস পানি খেতে চাইব... কিন্তু সেটা বলার ক্ষমতাও থাকবে না। তাই আগেই পানি খেয়ে নেই...

আরেক পার্টি... এটা অবশ্য রেস্টুরেন্টে অন পেমেন্ট পার্টি। তবে এটাও থার্টি ফার্স্ট পার্টি মানে নিউ ইয়ার পার্টি। এক তরুণ, তরুণ না বলে এক্ষেত্রে লোক বলাই ভালো। লোকটি আসন গ্রহণ করে বলল

—আজ মদ পান করে আমি সব ভুলে যেতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে রেস্টুরেন্টের বয় বিল নিয়ে ছুটে এল।

—সে কী বিল কেন? আমি তো এখনো পানই শুরু করি নি।

—ঐ যে বললেন আজ আপনি সব ভুলে যেতে চান... তাই আগে বিলটা দিয়ে নিলে ভালো হয়।

আরেক রেস্টুরেন্ট, রেস্টুরেন্ট না বলে এক্ষেত্রে 'বার' বলি। বারে এক যুবক ঢুকল। বেয়ারাকে মদ দিতে বলল। বেয়ারা মদের বোতল গ্লাস টেবিলে রেখে চলে যাচ্ছিল যুবক ডাকল

—ওহে শোন।

—বলুন।

—আমি যখন সবকিছু দুটো দেখতে শুরু করব তখন আমার মদ্যপান বন্ধ করে দিবে।

—কিন্তু আপনি সবকিছু দুটো দেখছেন এটা বুঝব কীভাবে?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তুমি একটু পরপর আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, আমি তোমাকে দু জন দেখলেই বুঝে যাব প্রচুর নেশা হয়েছে।

—ঠিক আছে স্যার।

যুবকটি আধা পেগ খেয়েছে মাত্র। এ সময় তার সামনের টেবিলে দুই যমজ ভাই এসে বসল। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি উঠে গেল কাউন্টারে বিল দিতে।

—সে কী স্যার আজ এত দ্রুত উঠে গেলেন যে?

—আজকের জিনিসটা খুব কড়া... মাত্র আধা পেগেই ধরে গেছে... সবকিছু দুটো দেখছি!

বারে দু জন মুখোমুখি বসে মদ্যপান করছে।

—আপনি পান করতে আসেন কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় লোকটি বলল

—কারণ আমি প্রেমে ব্যর্থ। সীমা নামের এক নারী আমাকে তিন বছর ল্যাজে খেলিয়ে ছ্যাঁক দিয়েছে... সেই কষ্ট ভুলতে... আপনি?

—আমি এখনো ল্যাজে খেলছি।

—কার?

—ঐ যে সীমা, ঐ আমার স্ত্রী।

মদ্যপান নিয়ে একটা বিখ্যাত প্রবাদ 'মাতাল হচ্ছে একটা হুইস্কির বোতল বিশেষ যার গলা আর পেট আছে, কিন্তু মাথা নেই'।

অথবা আরেকটা বিখ্যাত প্রবাদ 'একটি গ্লাস অর্ধেক খালি না অর্ধেক ভরা তা নির্ভর করে গ্লাসের ভিতর কী আছে তার উপর। যদি কুইনিন থাকে তবে অর্ধেক ভরা, আর যদি মদ থাকে তবে অর্ধেক খালি।'

❑

বিয়ে করেছেন অথচ 'জামাই আদর' পান নি শ্বশুরবাড়িতে, এমন জামাই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে আমি একজন জামাই পেয়েছি যিনি শ্বশুরবাড়িতে জামাই আদর পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু...

ঘটনাটা বরং খুলে বলি। ধরা যাক এই জামাইয়ের নাম মি. জ। তিনি প্রথমবারের মতো শ্বশুরবাড়ি গেছেন বেড়াতে। মফস্বলে শ্বশুরবাড়ি। প্রথমবার বলে কথা হুলস্থুল পড়ে গেল সবার মধ্যে। জামাই বাবাজির পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। যত্নআত্তির ঠেলায় অস্থির হয়ে জামাই এক ফাঁকে বাড়ি থেকে হাঁটতে বেরুলেন। কিছু দূর গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় সিগারেট ধরালেন। এ সময় কয়েক জন তরুণ এগিয়ে এল তার কাছে। একজন প্রশ্ন করল

—আপনি শিউলির বর না? (ধরা যাক মি. জ-এর স্ত্রীর নাম শিউলি)

—হ্যাঁ, আপনারা?

—আমরা পাড়ারই ছেলে, চলুন ওপাশটা থেকে হেঁটে আসবেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন। জামাইও খুশি মনে চললেন। সমবয়সি কয়েক জন তরুণ পাওয়া গেছে। শিউলির পাড়ার ছেলে মন্দ কী।

কিন্তু তার পরের ঘটনা মর্মান্তিক। ঐ তরুণদের দলের একজন ছিল শিউলির ব্যর্থ প্রেমিক। তারা জামাইকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা মতো ধোলাই দিল। জামাই বেচারা যেন বুঝতেও পারলেন না ঠিক কী কারণে ধোলাই খাচ্ছেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মারধর খেয়ে বেচারা যখন বাড়ি ফিরলেন তখন সবার চোখ কপালে উঠল বললে কম বলা হবে সবার চোখ কপাল পেরিয়ে চুলের জঙ্গলে আত্মগোপন করল যেন। কে করেছে এই কাজ, কথাবার্তায় তখন বেরিয়ে গেছে পাড়ার ছেলেদের কাজ। স্ত্রী মিসেস শিউলি ঠিকই বুঝে গেছেন কার কাজ। সেই রাতেই জামাই বাবাজি প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে মাইক্রোবাস ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে সোজা ঢাকায়। মাইক্রোবাসে স্বামী-স্ত্রী কোনো কথা হল না। শুধু বুদ্ধিমান স্বামী ফিসফিস করে স্ত্রীকে বললেন

—পাড়ায় যে তোমার একটা প্রেম ছিল আমাকে বলে রাখলে তো বাড়ি থেকে বেরুতাম না মারও খেতাম না।

বাকি জীবন মি. জ সুখে-শান্তিতে কাটিয়েছেন স্ত্রী নিয়ে। স্ত্রীর বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা মুখেও আনেন নি। শ্বশুরবাড়ির জামাই আদর তিনি ঘরে বসেই পেয়ে গেছেন বাকি জীবন।

'শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি' বাক্যটা কিন্তু শুধু এটুকু নয়, এর পরেও আরেকটা লাইন আছে 'যদি না ভাঙে হাটে হাঁড়ি'। যাহোক দেশীয় শ্বশুরবাড়ির গল্প থেকে এবার বিদেশি শ্বশুরবাড়ির দিকে যাওয়া যাক—

উইনস্টন চার্চিলের মেয়ে সারা নিজে পছন্দ করে যে ছেলেটিকে বিয়ে করেছিল চার্চিল তাকে কোনো কারণে দু চোখে দেখতে পারতেন না। কেন পারতেন না সেটা অবশ্য জানা যায় নি।

তো একদিন জামাই শ্বশুরবাড়িতে এল। খাওয়াদাওয়ার পর হাঁটতে বেরুনো চার্চিলের স্বভাব। তিনি বেরুলেন সঙ্গে জামাইও চলল সঙ্গ দিতে। তো এ কথা সে কথার পর জামাই হঠাৎ জানতে চাইল

—আচ্ছা যুদ্ধে আপনি প্রশংসা করার মতো কাউকে মনে করেন কি? জামাইয়ের এই প্রশ্নে প্রায় গর্জন করে উঠলেন চার্চিল

—হ্যাঁ একজন আছেন মুসোলিনি।

—কেন তাকে মনে করেন?

—কারণ তিনিই একমাত্র লোক যে কিনা নিজের মেয়ে-জামাইকে গুলি করে মারার সাহস দেখিয়েছিলেন।

অবশ্য শুধু মুসোলিনি নয় শ্বশুর হিসেবে সাদ্দাম হোসেনও কম যান না। মুসোলিনির খবর জানি না তবে খারাপ শ্বশুর হওয়ার ফল যে শেষ পর্যন্ত সুবিধার হয় না তা সাদ্দাম হোসেন এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

যথারীতি একটা প্রবাদ দিয়ে শেষ করা যেতে পারে 'দুটো বিয়ে ভাগ্যবানরাই করে, তবে এটাও মনে রাখতে হবে তাদের সেই সুবাদে দু জন শ্বশুর এবং দু জন শাশুড়িও পেতে হয় তাকে'।

❑

রাস্তায় দুটো ছোট বাচ্চা কথা বলছে। তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা কুকুর ছানা। এ সময় তাদের স্কুলের ধর্ম শিক্ষক যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে ওদের দেখে থামলেন।

—কীরে তোমরা এখানে কী করছিস?

—আমরা স্যার মিথ্যা বলার প্রতিযোগিতা খেলছি। যে সবচে বেশি মিথ্যা বলতে পারব সেই এই কুকুরছানাটা নিব।

স্যার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গেলেন। 'ছি ছি তোরা এই বয়সে মিথ্যা কথা বলা খেলছিস? জানিস মিথ্যা বলা মহাপাপ! তোদের বয়সে মিথ্যা বলা তো দূরে এখন পর্যন্ত আমি একটাও মিথ্যা বলি না'।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্যারের কথা শুনে বাচ্চা দুটো একসঙ্গে বলে উঠল

—স্যার আপনিই জিতলেন কুকুরটা আপনিই নিন।

এই হাইটেক মোবাইল ফোনের যুগে যে আমরা ক্রমশই মিথ্যাবাদী হয়ে উঠছি। এর থেকে বড় সত্য আর হতে পারে না। সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে বরং কিছু বিখ্যাত প্রবাদ শোনা যাক। একটা ইংলিশ প্রবাদ এরকম 'ব্যাপারটা সত্য' এ বাক্যটিই একটি নিরাপদ মিথ্যা! কিংবা ডাচ প্রবাদ 'মিথ্যার পাগুলো এত ছোট যে সত্য তাকে ধরে ফেলে অনায়াসে'। মিথ্যা নিয়ে ছালাকির বাক্যটিও চমৎকার কম না 'মিথ্যাবাদী এবং মৃত ব্যক্তি একই রকম। মৃত ব্যক্তি কিছু বলে না। আর মিথ্যাবাদীর কথা কেউ শোনে না'।

কেউ যদি বলে ঘটনাটা অর্ধেক সত্য তা হলে বুঝতে হবে ঘটনাটা পুরোটাই মিথ্যা। তা হলে কেউ যদি বলে অর্ধেক মিথ্যা তা হলে কী ব্যাপারটা হবে পুরোটাই সত্য?

বরং একটা অর্ধেক সত্য এবং অর্ধেক মিথ্যা গল্প শোনা যাক—

তিন বছর বিদেশে কাটিয়ে স্বামী দেশে ফিরে দেখে স্ত্রীর কোলে ফুটফুটে এক বাচ্চা। স্বামীর মাথায় রক্ত উঠে গেল।

—এ বাচ্চা কার?

—কার আবার, আমার।

—কী! বল তার নাম বল! কে আমার এত বড় সর্বনাশ করল এ সত্য আমাকে জানতে হবে।

বউ চুপ। স্বামী হুঙ্কার দিয়ে উঠল

—কী কথা বলছ না কেন? এ কাজ কে করেছে? আমার বন্ধু লেনিন?

—না।

—তা হলে নিশ্চয়ই বদমাশ সাঈদ?

—না।

—তা হলে নির্ঘাত বজ্জাত মেহেদির কাজ?

—না, তাও না।

—তা হলে কে? জলদি বল। এ সত্য আমাকে জানতেই হবে।

—বলব?

—হ্যাঁ, বল।

—সত্যি বলব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি বল।

—তুমি শুধু তোমার বন্ধুদের কথাই বলছ আমার কি কোনো বন্ধু থাকতে পারে না?

'সত্য কথা বলা' নিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাতরা সবাই ভালো ভালো কথা বলেছেন বা বলে গেছেন। একজন শুধু বলেছেন উল্টো। তিনি জন লিলি এভিমিওন। তার কথা হচ্ছে, 'এ পৃথিবীতে কেবল শিশু আর বোকারাই সত্য কথা বলে থাকে'।

❑

প্রতি বছর কোরবানি ঈদে গরু কেনার দায়িত্ব পড়ে বাড়ির বড় ছেলের ওপর। বড় ছেলে কাজটা আগ্রহ নিয়েই করে কেননা গরু কেনার সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু টু-পাইস ইনকামও হয়ে যায়। কিন্তু এ বছর কী মনে করে কোরবানির গরু কেনার দায়িত্ব দেয়া হল ছোট ছেলের ওপর। বলাই বাহুল্য বড় ছেলে কিঞ্চিৎ নাখোশ হল, কিন্তু উপায় নাই গোলাম হোসেন ঐ পরিবারে বাবার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তো ছোট ছেলে দায়িত্ব পেয়ে গরু কেনার দশ হাজার টাকা নিয়ে রওনা দিল গরুর হাটে। এ বছর গরুর দাম কম, ছোট ছেলে বেশি ঝামেলায় গেল না, কাছাকাছি একটা হাটে ঢুকে পড়ল।

সকালে গিয়ে বিকেল নাগাদ ছোট ছেলে নয় হাজার টাকা দিয়ে একটা গরু কিনে ফিরল। গরু দেখে সবাই হতভম্ব! কোনো গুণাবলিই তাকে দেয়া যাবে না! দেখে-শুনে বাবা ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন!

—এটা কী গরু এনেছিস হারামজাদা?

—কেন সমস্যা কী?

—তুই চোখে দেখিস না? রোগা, শুকনা এক চোখ কানা...।

বড় ছেলে গায়ের ঝাল মেটানোর চান্স পেল। ফট করে বলে বসল

—বাবা, অত জোরে চেঁচিয়ে গরুর গুণাবলি বোলো না, বেচারা গরুটা শুনলে লজ্জা পাবে।

—না না অসুবিধা নেই। ছোট ছেলে আশ্বাস দিল, 'এ গরু কানেও শোনে না'।

কোরবানির গরু কেনা নিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা। পাড়াতো দুই বন্ধু। কোরবানি ঈদের আগে আগে দেখা।

—কীরে তোরা গরু কিনেছিস?

—হুঁ।

—তা কেমন কিনলি? দেখলাম না তো!

—এই তো... আমাদের গরুটা বেঁটে, শিং ভাঙা, কুঁজ নেই, কানও একটা ছেঁড়া।

—বলিস কী?

—অবশ্য এগুলো সবই কিন্তু ওর গুণ... দোষগুলো বলব?

এবার অন্য প্রসঙ্গে। কোরবানি ঈদের সিজনের ঘটনা। এক লোকের রাতে ঘুমের সমস্যা হচ্ছিল। সে গেল ডাক্তারের কাছে।

—ডাক্তার সাহেব রাতে ঘুম আসে না, ঘুমের ওষুধ খেয়েও দেখেছি কাজ হয় না, কী করি?

—সেক্ষেত্রে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে পাঁঠার পাল গুনুন, কী আর করবেন!

—না ডাক্তার সাহেব পাঁঠার গায়ে বড্ড গন্ধ।

—আরে বাবা আপনি তো আর সত্যি সত্যি পাঁঠা গুনছেন না কল্পনায় চোখ বন্ধ করে গুনছেন।

—তাতে কী, পাঁঠায় আমার অ্যালার্জি আছে... অন্য কোনো বুদ্ধি দিন।

—তা হলে আর কী গরুর পাল গুনুন।

পরদিন সেই রোগী আবার এসে হাজির।

—কী ঘুম হয়েছিল? গরুর পাল গুনেছিলেন?

—গুনতে তো চেয়েছিলাম, কিন্তু গরু পাব কোথায়?

—মানে?

—মানে গরু তো এখন সব গরুর হাটে, ওখান থেকে একেকটা গরু বের করতে... বাপরে যা দাম তার উপর হাসিল... লোকাল চাঁদা...

ঐ একই ডাক্তারের কাছে আরেক ইনসমোনিয়া রোগী এল। তারও পাঁঠা গুনায় সমস্যা। গন্ধ লাগে, তবে গরু গুনতে আপত্তি নেই। যখনকার ঘটনা বলছি তখন কোরবানির সিজনও ছিল না যে গরু পাওয়া যাবে না। কিন্তু ক'দিন বাদে সে লোকও এসে হাজির।

—ডাক্তার সাহেব ঘুম তো আসে না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কেন গল্প পান না?

—পাই, কিন্তু দশ পর্যন্ত শুনলে যে ঘুম আসে না।

—কেন মাত্র দশ পর্যন্ত শুনবেন কেন?

—বাহ্ আমি যে মাত্র ঐ দশ পর্যন্তই শুনতে জানি।

—মানে? আপনি কী করেন? আপনার পেশা কী?

—আমি যে বক্সিংয়ের রেফারি।

কোরবানি সবাই দিতে পারে না। এর নাকি অনেক নিয়মকানুন আছে। যেমন কেউ যদি ঋণগ্রস্ত থাকে তা হলে সে কোরবানি দিতে পারবে না অর্থাৎ তার কোরবানি কবুল হবে না। তো আমাদের দেশে তো সব চুটকি নিয়েই চলে। ঋণকোপিরাই সবচে বড় পরগাছাদের ছিঁড়ে ফেলে বাজার থেকে। এই নিয়ে একটা ঘটনা। এ অবশ্য ঋণকোপি না সাধারণ একজন মানুষ, তবে তিনি এ বছর কোরবানি দিচ্ছেন না। তাই শুনে আরেক প্রতিবেশী এগিয়ে এলেন,

—সে কী আপনি নাকি কোরবানি দিচ্ছেন না এ বছর?

—না।

—কেন?

—ঋণগ্রস্তদের কোরবানি দেবার নিয়ম নেই।

—আপনি আবার কখন ঋণ করলেন?

—কেন গত বছর দশ হাজার টাকা ধার করে গরু কোরবানি দিলাম না? সে টাকা তো এখনো শোধ করতে পারি নি!

শেষ একটা ঘটনা দিয়ে শেষ করা যাক—এটা কোরবানির গরু ভাগাভাগির সংক্রান্ত গল্প। এক ধুরন্ধর লোক তার প্রতিবেশীর সঙ্গে গরুর তিন ভাগ নিয়ে আলোচনায় বসেছিল।

—আমি অবশ্য তিন ভাগের কাজেলার হই না।

—কীরকম?

—দু ভাগ করি। এক ভাগ নিজের কাছে রাখি বাকি ভাগ—

—বাকি ভাগ?

—বাকি ভাগ আল্লাহ রাস্তায় দান করি।

—কীভাবে?

—ঐ একটা চামড়ার টুপির মধ্যে রাখি ঐ টুপিটা আবার চামড়ার দু দিকে দু ভাগ করা টুপির দিকে ছুড়ে দেই... আল্লাহ রাস্তায় যেটুকু যাওয়ার চলে যায়, বাকিটা... আমি... মানে আমার... হে... হে...

কোরবানির ব্যাপারটা টুপিশাহীর মতো। টুপির টুপিতে টুপিশাহী করা। এই নিয়ে আমার একটা কোটেশন আছে নিজেকে টুপিশাহী কর টুপির প্রহার করলে ভালো, না করলে জনসংখ্যা একজন কমল এই যার কি!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# আহসান হাবীবের অপ্রকাশিত রচনাবলী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

]

ামার এক মালদার বন্ধু একবার আমাকেসহ কয়েক বন্ধুকে খাওয়াতে এক ফাইভ স্টার হোটেলে নিয়ে গেল। (উপলক্ষটা কী ছিল এখন আর মনে পড়ছে না।) যথারীতি আমরা টবিলে বসলাম, মানে ঠিক টেবিলের উপরেই বসলাম না, টেবিল সামনে নিয়ে চেয়ারে াসলাম। কিছুক্ষণ পর ফাইভ স্টার হোটেলের ওয়েটার কী সব খাবারদাবার দিয়ে গেল। ামি লক্ষ্য করলাম প্লেটে গোল একটি বস্তু। হাত দিয়ে বুঝলাম সেটা একটি রুটি! ওটাই ইড়ে ছিঁড়ে খাওয়া শুরু করলাম। খেয়ে যখন প্রায় শেষ করে এনেছি তখন আমার মালদার ন্ধু আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল—

'করছিস কী? ওটা তো হাত মোছার জন্য দিয়েছে, তুই ওটাই খেয়ে ফেললি? আসল াবার তো আসছে!'

এ তো গেল বড়লোকি হোটেলে খাওয়ার বিড়ম্বনা। এবার যাওয়া যাক এক ফাইভ স্টার াসায়। মানে অত্যন্ত ধনী এক বাসায় গেলাম যথারীতি আমার সঙ্গে সেই বন্ধু। কিছুক্ষণ র প্রায় অতি রূপসী এক তরুণী একটা ট্রলি জাতীয় কিছুতে করে ঠেলে প্লেট, কাঁটা চামচ ত্যাদি নিয়ে এল। আমি তরুণীকে সালাম টালাম একটা কিছু দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি, তখন আমার স্মার্ট বন্ধু ঠেলা দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিল এ মেয়ে এ বাড়ির বুয়া! আমি সাবধান য়ে গেলাম। মেয়েটি আমাদের দুজনের সামনে কাঁটা চামচ ছুরি আর ত্রিকোনাকার একটা স্তু (সম্ভবত কেকটেক একটা কিছু হবে) সাজিয়ে দিয়ে গেল। যথারীতি আমার বন্ধু আমাকে াবধান করল—

'দেখিস ক্ষ্যাতের মতো আবার হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করিস না। ডান হাতে ছুরি বাম াতে কাঁটা চামচ ধরিস কিন্তু।'

'ঠিক আছে।' আমিও ফিসফিস করি। তবে এবার আর আমি আগে আগে শুরু করি না। বন্ধুই ছুরি, কাঁটা চামচ বাগিয়ে ধরে ঐ ত্রিকোনাকার বস্তুটি কাটার চেষ্টা করতে লাগল এবং অচিরেই আমরা দু'জনেই আবিষ্কার করলাম ঐ ত্রিকোনাকার বস্তুটি কেক বা কোনো খাদ্য বস্তু নয় ওটি বিশেষ কায়দায় ভাঁজ করা একটি ন্যাপকিন। আসল খাবার এল একটু পরে।

যা হোক খাওয়া খাদ্যের গল্পই যখন হচ্ছে এবার ঐ সংক্রান্তই একটা গল্প শোনানো যেতে পারে।

এক লোক গেছে দামি একটা রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট করতে। ওয়েটার ছুটে এল—

'কী লাগবে স্যার?'

'তোমাদের আজকের স্পেশ্যাল মেনু কী?'

'স্যার আমরা মুরগির জিহ্বা দিয়ে বিশেষ ধরনের একটা সুপ করেছি...'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'ছি. ছি. কী বলছ? মুরগির জিহ্বা? ব্যাপারটা তো নোংরা, মুরগি জিহ্বা দিয়ে কত নোংরা খাবার খায়, লালাটালা লেগে থাকে, ভাবতেই কেমন লাগছে।'

'তা হলে কী দেব স্যার?'

'তুমি দশ মিনিট পরে এসো আমি ভেবে দেখি।'

ওয়েটার সালাম দিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন।

দশ মিনিট পর ওয়েটার এল,

'কী দেব স্যার?'

'একটা মুরগির ডিমের ওমলেট!'

❑

সেদিন খবরে দেখি কল্যাণপুরে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে বস্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ঐ বস্তির পনের হাজার দরিদ্র মানুষ ছোটাছুটি করছে, তাদের মালপত্র নিয়ে। বড্ড করুণ দৃশ্য। তার পরের খবরটা বিশ্ব এস্তেমার খবর। সাত লাখ মুসলিমকে টঙ্গিতে কোথায় জায়গা দেওয়া হবে তাই নিয়ে ছোটাছুটি করছেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উপরের দুটি ঘটনা একটি ইহলৌকিক, আরেকটি পারলৌকিক। একটা নিশ্চিত অন্যটি অনিশ্চিত। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মহান বাণী মনে পড়ছে, "যে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আমাকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান দেন নি তিনি যে স্বর্গে আমাকে মহাসুখে রাখবেন তা আমি কখনোই বিশ্বাস করি না!"

বস্তি উঠিয়ে দেওয়াটা অবশ্য আমাদের দেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। কখনো আগুন ধরিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়, কখনো বা বুলডোজার দিয়ে ধসিয়ে দেওয়া হয়। তো এমনি এক বুলডোজার যে বহু বস্তি ভাঙার সাক্ষী তাকে নেওয়া হল নরকে।

'হুজুর আমার কী দোষ? আমি তো যন্ত্র মাত্র। মানুষই আমাকে চালায়। সাজা দিলে মানুষকে দিন।' বলল বুলডোজার।

'আরে স্বর্গ-নরকের নিয়মকানুন আজকাল বদলে গেছে। যন্ত্রদেরও সাজা পেতে হয় এখন। বল কী সাজা চাও তুমি?'

'হুজুর সে আপনি ঠিক করে দিন।'

'এক কাজ কর তুমি নরকটা ঘুরে দেখ, তারপর তোমার পছন্দমতো একটা সাজা বেছে নাও।'

'বেশ।'

বুলডোজার বিষণ্ন বদনে নরক পরিভ্রমণে বের হল। কিছুদূর গিয়ে দেখে একটা ট্রাক বিশাল এক পর্বতকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার... কারবুরেটর গরম হয়ে গেছে, গোঁ গোঁ করছে।

'এ কী অবস্থা তোমার?'

'আর বলো না হে। পৃথিবীতে থাকতে কত মানুষ চাপা দিয়েছি তাই এখন এই শাস্তি... সকালে এই পাহাড়টাকে টেনে নিয়ে যাই স্বর্গে, বিকালে ফের টেনে নিয়ে আসি... গত বিশ বছর ধরে এই চলছে... ওফ!'

'আচ্ছা তোমার জানা মতে হালকা ধরনের কোনো সাজা আছে এখানে?'

'আছে।'

'কী বল তো?' খুশি হয়ে উঠল বুলডোজার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ আমারবই.কম

'যেয়ে দেখ ঐ সামনে ডান দিকে।'

বুলডোজার যেয়ে দেখে ওটা কোনো শাস্তিই না। একটা সদ্যপ্রসূত বাচ্চা শুয়ে, তাকে ডোজার দিয়ে ঠেলে খাদে ফেলে দিতে হবে।

'ওটা কোনো শাস্তি হল?'

'হ্যাঁ ওটাই শাস্তি।' বলল নরকের রক্ষী।

বুলডোজার গর্জন করে ছুটে গেল বাচ্চাটাকে ঠেলে ফেলে দিতে কিন্তু আশ্চর্য এক চুলও নড়াতে পারল না। দিন যায়, বছর যায় ডোজারের চাকা বসে গেল মাটিতে, সামনের স্টিলের পুশিং বাম্পার ভেঙে পড়ল, কিন্তু সদ্য জন্মানো বাচ্চাটিকে এক চুলও নড়ানো গেল না।

'এ বাচ্চাটি কে?' ঘামতে ঘামতে চিৎকার করে উঠল ক্লান্ত শ্রান্ত বুলডোজার। নরকের রক্ষী রহস্যময় হাসি হাসল।

'এ আর কেউ নয় মানুষের অমর মৃত্যু!'

মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে না। তারপরও পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষ মৃত্যুকে জয় করেন। এমন একজন মানুষ মৃত্যু সম্পর্কে একটা মজার উক্তি করেছিলেন, "মৃত্যুকে আমার ভীষণ ভয় তাই ঐ ব্যাপারটা যখন আমার বেলায় ঘটবে তখন আমি তার থেকে একশ হাত দূরে থাকব।"

❑

সাদ্দাম হোসেনকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল তখন তাকে দাড়ি-গোঁফে দেখাচ্ছিল যেন অনেকটা টলস্টয়ের মতো। রবার্ট ফিস্ক অবশ্য বলেছেন, তার চোখ যদি হয় চে গুয়েভেরার তবে দাড়ি যেন ফিদেল ক্যাস্ট্রোর। তবে তাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বিশেষ করে চোখ দুটি...যেন তিনি এখন সেই বিখ্যাত কবিতার দুটি লাইন...

'ক্লান্ত চোখ ক্লান্ত চোখের পাতা
তার চেয়ে ক্লান্ত আমার পা...'

তো বিশ্ব দরবারে সাদ্দামকে নিয়ে এখন দেনদরবার চলছে। তার মৃত্যুদণ্ড যেন এখন স্টেশনারি দোকানের সামান্য পেন্সিলের গায়েই লেখা আছে 'টু বি... অর নট টু বি...' মৃত্যুদণ্ড হোক আর না হোক, সাদ্দাম হোসেনকে একদিন স্বাভাবিকভাবেই মারা যেতে হবে। বুশকেও। তারপর কী হবে। চলুন দেখা যাক...

নরকের তিন নম্বর সেকশনে আপ সাইট ডাউন অবস্থায় ঝুলছে প্রেসিডেন্ট বুশ। আর এক মুক্কো জোয়ান একটা মুগুর দিয়ে ধুমসে পিটাচ্ছে তাকে। বুশ পরিত্রাহি চিৎকার করে বলল—

'এর মানে কী? আমি সারা জীবন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে কাজ করলাম আজ এই তার পুরস্কার?'

'তোমার কী পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল?' মুগুরবাজ ক্ষণিকের জন্য প্যাঁদানি থামিয়ে প্রশ্ন করল।

'অবশ্যই স্বর্গ।' হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল বুশ।

'হ্যাঁ, স্বর্গেই তো তুমি এসেছ।'

'স্বর্গে এসে থাকলে এই নরকে আমাকে... ওরে বাবাগো...' (আবার মুগুর ধোলাই শুরু হয়েছে!)

'কেন তোমাকে পেটানো হচ্ছে?' মুগুরবাজ তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আমি এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা চাই... এই প্রহসনের মানে কী?'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'প্রহসন না, আসলে পৃথিবীতে এখন ফ্রি মার্কেটের যুগ চলছে... তার উপর সব জায়গায় চলছে "ফ্রি কালচার"... দেখছ না কিছু কিনতে গেলেই সাথে একটা কিছু ফ্রি...'

'এর সাথে আমার এই নরক নির্যাতনের সম্পর্ক কী?'

'ওই যে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছ তুমি স্বর্গই... কিন্তু সাথে ফ্রি এই নরকের প্যাঁদানি...' বলেই সে ফের মুগুর চালাতে শুরু করল ধুপধাপ।

এতো গেল বুশের প্রসঙ্গ, কিন্তু সাদ্দামের লুক এলাইক যারা ছিল তাদের কী হবে? তারা কোথায় যাবে, স্বর্গে না নরকে?

এ নিয়ে আবার সওয়াল জবাব শুরু হল—

'আচ্ছা সাদ্দামের লুক এলাইকরা কোথায় যাবে? স্বর্গে না নরকে?'

'অবশ্যই নরকে।'

'কেন?'

'তারা বিশ্ববাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাদের সাদ্দাম ভেবে সবাই বারবার ভুল করেছে!'

'এতে তাদের দোষ কী? তাদের হয়তো বাধ্য করা হয়েছিল...'

'না না তাদেরকে নরকেই যেতে হবে।'

'অন্তত তাদের স্বর্গ-নরকের নো ম্যানস ল্যান্ডে...'

যা হোক, শেষ পর্যন্ত নানান দেনদরবার করে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের নরকেই নেওয়া হল। তবে তাদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। নরকে সাজাপ্রাপ্ত বিখ্যাত এক পরিচালক তাদের নিয়ে ক্লোনের উপর একটা ডুকুড্রামা করছেন। এসব ক্রিয়েটিভ কাজ তো আর স্বর্গে থাকলে করা যেত না।

❑

'যত যাই বলিস বাংলা ভাষাকে সত্যিকার অর্থে টিকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।'

'মানে?'

'মানে তুই দ্যাখ বাংলা ভাষায় অনেক অক্ষর আমাদের লেখালেখি থেকে উঠে গেলেও রেলওয়ে কিন্তু ঠিক ধরে রেখেছে।'

'কীরকম?'

'যেমন ধর রেলওয়ের বগিগুলোর নাম "ঞ" "ঊ" "৯" (লি) ইত্যাদি বর্ণগুলো রেলওয়ে বগি ছাড়া আজকাল আর কোথাও ব্যবহার হতে দেখিস?'

'সে ক্ষেত্রে ক্রেডিট শুধু বাংলাদেশ রেলওয়ের নয় আরেক জনকেও ক্রেডিট দিতে হবে।'

'কাকে?'

'মেট্রিক্স ছবির হিরোকে। তিন পর্ব ধরেই তার নাম "ঞ"।'

বলাই বাহুল্য বাংলা ভাষা নিয়ে এরকম উচ্চমার্গীয় আলাপ হচ্ছিল আমার অফিসেই। আলোচক দু জনেই ইংরেজিতে মাস্টার্স করে এখন বেকার। হঠাৎ কেন বাংলা ভাষা নিয়ে পড়লাম সে গল্পে পরে আসছি তার আগে একটা আরবি গল্প বলে নিই। আরবি গল্প মানে মূল গল্পটা আরবি ভাষায় আমি বাংলায় ভাবানুবাদ করছি মাত্র।

ওয়াজ হচ্ছে। ওয়াজের একদিকে বসেছে নারীরা মানে স্ত্রীরা আরেক দিকে স্বামীরা মানে পুরুষরা। তো বয়ান করছিলেন এক মৌলানা। তিনি বলেছিলেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও!আমারবই.কম

'যে পুরুষ পৃথিবীতে সৎ থাকবে সৎ জীবন যাপন করবে সে বেহেস্তবাসী হবে এবং সেখানে তাকে সত্তর জন হুর পরী সঙ্গ দান করবে।'

বয়ানের এই পর্যায়ে এক নারী উঠে বললেন—

'আর একজন নারী যদি পৃথিবীতে সৎ জীবন যাপন করে?'

'সে ক্ষেত্রে সেই নারী স্বর্গে তার নিজের স্বামীকে ফিরে পাবে।'

'ওফ সেখানেও ঐ মিনশে জ্বালাবে।' বলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ঐ মহিলা। তবে আমার ধারণা আরবি এই গল্পটির বাস্তব প্রয়োগটা হবে ভিন্ন রকম।

যেমন ধরুন এরকম—

এক মহিলা সারা জীবন পৃথিবীতে সৎ জীবন যাপন করলেন, একদিন মারা গেলেন, যথারীতি তাঁকে স্বর্গে নেওয়া হল। সেই বয়ানের নিয়মানুযায়ী তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে ফিরে পাওয়ার দাবি জানালেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি তোমার স্বামীকে ফিরে পাবে অপেক্ষা কর।'

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো লাভ হল না, তাঁর স্বামীর কোনো খবর নেই।

'কী হল আমার স্বামী কোথায়?' অস্থির স্ত্রী জানতে চাইল।

'একটু মুশকিল হয়েছে।'

'কী মুশকিল?'

'তোমার স্বামীও তোমার মতো পৃথিবীতে সৎ জীবন যাপন করেছিলেন বলে তাঁকে সত্তর জন হুর পরী দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি ঐ হুর পরী ছেড়ে তোমার কাছে আসতে চাচ্ছেন না!'

❑

মাঝে মাঝেই আমার স্ত্রীর এক বান্ধবী ফোন করেন। যখন আমি ফোন ধরি তখন নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়—

'হ্যালো আহসান ভাই? কেমন আছেন?'

'ভালো, তুমি ভালো? ওকে দেব?'

'হ্যাঁ।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীকে ডেকে দেই। এই রকমই চলছিল। তো একদিন আমার স্ত্রী বলল, 'তুমি আমার বান্ধবীর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বললেই পার, ও বলছিল তুমি ফোনে নাকি খুব চাঁছাছোলা। কখন আমাকে ফোনটা দিয়ে বাঁচবে এমন ভঙ্গি কর?'

আমি ভাবলাম ঠিক আছে এরপর ফোন করলে একটু রং ঢং করতে হবে স্ত্রীর গ্রিন সিগন্যাল যখন পাওয়া গেছে মন্দ কি?

তো সত্যি সত্যি বেশ কিছুদিন পর সেই বান্ধবীর ফোন। ধরলাম আমিই।

'হ্যালো আহসান ভাই?'

'হ্যাঁ, আরে কী খবর তোমার? তারপর কেমন চলছে?'

'হ্যাঁ, ইয়ে মানে...'

'তারপর তোমার সাহেব কেমন আছেন? আচ্ছা তোমাদের বিয়ের কত বছর হল বল তো? প্রেমের বিয়ে ছিল না?'

আমার ব্রেনে তখন জটিল ক্যালকুলেশন চলছে কী করে কথাবার্তায় অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে একটু রং ঢং করা যায় যাতে পরে, আমি 'চাঁছাছোলা' এ বদনাম আর আমাকে পেতে না



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়! কিন্তু আমার মনে হল ঐ প্রান্ত থেকে ঠিক ততটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না... শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে স্ত্রীকে ডেকে দিলাম।

পরে স্ত্রী আমাকে একচোট নিল। তার বন্ধবীর বাবা মারা গেছেন। সেই খবরটা দেওয়ার জন্যই নাকি সে ফোন করেছিল, আর আমি কী সব 'ফ্যাদরা প্যাঁচাল' পেড়েছি তার সাথে!

এই ঘটনার পর থেকে আমি স্ত্রীর বান্ধবীদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলি।

এবার এক লোকের ঘটনা বলি। ঐ লোকের স্ত্রীর বান্ধবীরা বাসায় এলেই লোকটি ড্রইংরুমে ওদের চারপাশে ঘুরঘুর করত। তো স্ত্রীর বান্ধবীরা ব্যাপারটা ঠক পছন্দ করে না বলে একদিন আকার-ইঙ্গিতে ব্যাপারটা লোকটির স্ত্রীকে মানে তাদের বান্ধবীকে জানিয়ে দেয়। যথারীতি স্ত্রীও তার স্বামীকে হুঁশিয়ার করে দেয়।

'দেখ আমার বান্ধবীরা এ বাসায় বেড়াতে এলেই তুমি ওদের চারপাশে ঘুরঘুর করবে না, খবরদার!'

'তা হলে কী করব?' নিরীহ মুখে স্বামী জানতে চায়।

'কী করবে না করবে সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু ওরা এ বাসায় এলে তুমি ঘুরঘুর করবে না।'

'বেশ!'

কিন্তু ক'দিন পর স্ত্রীর বান্ধবীরা ফোন করে স্ত্রীকে মানে তাদের বান্ধবীকে জানাল, 'তোর বর আগে তোর বাসায় আমরা গেলে আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করত, সেটাই ভালো ছিল রে।'

'কেন? কেন?'

'এখন যে আমাদের প্রত্যেকের বাসায় আলাদা আলাদাভাবে ঘুরঘুর করা শুরু করেছে।'

❑

ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে একটা শ্রেণী বি. বাড়িয়া বলে। মুসলিমপ্রধান দেশে হিন্দু নাম থাকবে এটা বোধ হয় তাদের সহ্য হয় না। ধরে নিলাম একশ্রেণীর মৌলবাদীদের এটা একটা চিকন ষড়যন্ত্র! কিন্তু বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে বি চৌধুরী বলার যুক্তি কী! একজন অবশ্য মন্তব্য করল একজন সম্মানিত চিকিৎসকের নামের আগে বদ শব্দটা থাকবে এটা এড়ানোর জন্যই বোধহয় ঐ সংক্ষিপ্তকরণ। আসলে নাম রাখার ব্যাপারে আমাদের আরো সাবধান হওয়া দরকার। ছোটবেলায় আবেগে বাবা-মা তাদের সন্তানদের এমন সব নাম রাখেন যে পরে বড় হয়ে বিপদে পড়তে হয়। যেমন একটা বিদেশী ঘটনা শুনেছিলাম, এক বাবা ঠাট্টা করে তার ছেলের নাম রেখেছিল 'কাউডাং'। সেই ছেলে বড় হয়ে বাবার নামে কেস করে দিল, পরে তো বাবার আক্ষরিক অর্থেই লেজে গোবরে অবস্থা।

আমাদের দেশে এক বাবা-মা তার কন্যা সন্তানের নাম রেখেছিল 'চুম্বন' সেই শিশু কন্যা একদিন তরুণী হল, তার পরের ইতিহাস আর এখানে না লেখাই উত্তম। সেই তরুণী তার বাবা-মার বিরুদ্ধে কেস করেছিল কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি।

নাম নিয়ে যে দেশের মধ্যেই ভেজাল হয় তা না, দেশের বাইরে যেতেও ভেজাল কম হয় না। যেমন ২০০৫ এর ডিভি ফরম ফিলাপ করে সবাই উন্মাদের মতো পাঠাচ্ছে। শুধু দেখেছি আশফাক নামের লোকজন মানে যাদের নামের মধ্যে আশফাক শব্দটি আছে তাদের ডিভি ফরম পূরণে বিশেষ আগ্রহ নেই। কেন নেই তা আশা করি ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই।


দুনিয়ার পাঠক এক হও, আমারবই.কম

মোল্লা বংশের একজনকে চিনি যে ব্যক্তিগত জীবনে খুবই আধুনিক। কিন্তু তার বাবা ঐ শব্দটি নামের আগে পার্মানেন্টলি বসিয়ে দেওয়ায় বেচারার আমেরিকা যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমেরিকা যাওয়া তার খুবই দরকার। তার স্ত্রী যে ঐখানেই থাকেন! টেলিফোনে বিয়ে! এখন তিনি কিছু দিন পরপর ভিসা অফিসে যান ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কে জানে ভিসা অফিসের মোটা মাথা লোকজনের ধারণা তিনি বোধহয় মোল্লা ওমরের কাষ্ঠ কাজিন।

সব নামেই যে বিপদ তা নয়। কিছু নামে আবার সুবিধাও আছে। যেমন ১৯৭১ সালের সেই বিখ্যাত গল্প। বিহারি লাল নামের এক হিন্দু ভদ্রলোককে পাকিস্তানি আর্মি ধরে নিয়ে গেল গুলি করে মারতে। পরে শুনল সে বিহারি (মানে তার নাম) সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ!

নাম নিয়ে সবচেয়ে কমন জোক্‌সটা তো বোধহয় সবারই জানা। সেই যে একজন পাঁচকড়ি দত্তকে ডেকে আনতে গিয়ে পাঁচকড়িকে না পেয়ে দুইকড়ি আর তিনকড়ি দত্তকে নিয়ে হাজির। সেই লোককেই এবার পাঠান হল আটকড়ি দত্তকে ডেকে আনতে। বাই দিস টাইম পাঁচকড়ি দত্ত ডিভি লটারিতে আমেরিকা প্রবাসী। তিনকড়ি মারা গেছে, দুইকড়িও এলাকায় নেই! ডেকে আনতে যাওয়া লোকটি কী করবে? আটকড়িকে না পেয়ে এলাকার নিঃসন্তান একজনকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল।

'এ কী একে এনেছে কেন? এত আটকড়ি নয়?'

'আটকড়িকে পাই নি তাই একে আনছি, এ আঁটকুড়া!'

❑

এ বছর হ্যাপি নিউ ইয়ারে এক পার্টিতে গিয়েছিলাম। পার্টিটা একটা বাসায়। বিশাল এক কেক আনা হয়েছে। বারোটা এক মিনিটে কেক কাটা হবে। সবাই অপেক্ষমাণ। বারোটা বাজল, বাড়ির কর্তা কেক কাটলেন আর কী আশ্চর্য কেকটা গান গেয়ে উঠল, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার....' সবাই অবাক, 'বাহ! কেক কথা বলে এমন কেক তো আগে দেখি নি,' কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই কেক আর কেউ খেতে চায় না। কেকের টুকরো পেটের ভিতরে গিয়েও যদি গান গাইতে থাকে তা হলে তো বিপদ! টুকরো টুকরো করে কাটা কেক অবশ্য তখনো গান গেয়েই চলেছে... পার্টি শেষে আমি বাড়ির কর্তাকে ঐ কেকের গান গাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি মুচকি হেসে বললেন—

'গান কিন্তু আসলে কেক গায় নি।'

'তা হলে?'

পরে বোঝা গেল ছুরিটা বিশেষভাবে তৈরি। নানান অপশন আছে তাতে। হ্যাপি নিউ ইয়ারে কেক কাটলে 'হ্যাপি নিউ ইয়ারের গান গেয়ে ওঠে', আবার জন্মদিনের কেক কাটলে গেয়ে ওঠে, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইয়্যু'। আমি তখন জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা ঐ ছুরি দিয়ে যদি মৌলবাদীরা রগ কাটে তা হলে কী গাইবে?'

আমার প্রশ্ন শুনে মি. হোস্ট অগ্নিদৃষ্টি হেনে শটকে পড়লেন। আমিও কেটে পড়লাম।

ইদানীং হ্যাপি নিউ ইয়ারে গিফট, কার্ড ইত্যাদি দেওয়া নেওয়ার একটা চল হয়েছে। বাজারে গিফট শপেরও কোনো অভাব নেই। নানান সব সুন্দর সুন্দর গিফট আইটেম আছে। কিন্তু কেউ কি কখনো শুনেছেন হ্যাপি নিউ ইয়ারে বছরের পর বছর নারকেল গিফট করতে? এমনি এক ঘটনাই ঘটেছে সাগরের এক দ্বীপে। সেই দ্বীপে একটি মাত্র নারকেল গাছ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাজেই তাদের নতুন জীবনে স্ত্রীর জন্মদিন, ম্যারেজ ডে, কিংবা হ্যাপি নিউ ইয়ারে স্বামী বেচারা স্ত্রীকে শুধু নারকেল গিফট করে! তো প্রতি বছর নারকেল উপহার পেতে পেতে একদিন স্ত্রী বিদ্রোহ করে বসল, 'এ বছরে যদি তুমি নারকেল গিফট কর আমি সাগরে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করব', শুনে হতাশ স্বামী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভাগ্যের কী খেলা ৩১ ডিসেম্বর ঐ দ্বীপে ভেসে এল একটা সুন্দর বোতল। স্বামী বেচারা মহা খুশি এবার স্ত্রীকে আর নারকেল গিফট করতে হবে না।

যা হোক নতুন বছরে বোতল পেয়ে স্ত্রীও মহা খুশি। বোতলের ছিপি খুলতেই ফুরফুর করে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল। যথারীতি এক ভীষণ দর্শন জিন বেরিয়ে এল—

'হুকুম করুন মালিক।'

'আ-আমাদেরকে জলদি লোকালয়ে পৌঁছে দাও।'

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আমি সামুদ্রিক জিন। আমি এক দ্বীপ থেকে বড় জোর আরেক দ্বীপে নিয়ে যেতে পারি। লোকালয় আমার এক্তিয়ারের বাইরে।'

'বেশ তাই কর, অন্য কোনো দ্বীপে নিয়ে যাও।'

তাদেরকে খুব শীঘ্রই নতুন একটা দ্বীপে নেওয়া হল। বলাই বাহুল্য আগের দ্বীপে ছিল একটি মাত্র নারকেল গাছ, এই দ্বীপে বারোটি!

❑

পনেরজন সেনা কর্মকর্তা বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। খুবই মর্মান্তিক একটি ঘটনা। জাতীয়ভাবে একদিন শোক দিবস ঘোষণা করা হল। আর এই শোক দিবসের ঘটনাটি পড়েই এক তরুণ কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল একটি অংক করতে। পাশেই ছিল তার এক বন্ধু, সে জিজ্ঞেস করল—

'কী রে, কী করছিস?'

'অংক করছি।'

'কী অংক?'

'একটা ঐকিক নিয়মের অংক।'

'আরে পাটিগণিত থেকে ঐকিক নিয়মের অংক তো সেই কবেই উঠে গেছে!'

'তাতে কী, জাতির কোনো কোনো সন্ধিক্ষণে সেই ঐকিক নিয়মের অংক কখনো কখনো আবার দরকার হয়ে পড়ে। যেমন এখন হয়েছে।'

'তা ঐকিক নিয়মে তুই কী বের করার চেষ্টা করছিস?'

'আমি বের করার চেষ্টা করছি... পনের জন সেনা কর্মকর্তা বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলে জাতীয়ভাবে একদিন শোক দিবস হলে চারশজন সাধারণ মানুষ লঞ্চ দুর্ঘটনায় মারা গেলে কত দিন জাতীয় শোক দিবস হওয়া উচিত ছিল?'

মানুষের কোন মৃত্যুটি বেশি কষ্টের, আগুনে পুড়ে মৃত্যু নাকি পানিতে ডুবে মৃত্যু? সব মৃত্যুই কষ্টের। আর এ জন্যই বোধহয় মানুষের মৃত্যুভয় প্রবল। অবশ্য কিছু কিছু বীর শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা মৃত্যুকে তাঁদের জীবনে তোয়াক্কা করেন নি। তাঁদের সংখ্যা নগণ্য, তবে একজনকে পাওয়া গেছে যে বীরটির কিছু নয়। সাধারণ মানুষ, তারপরও তাঁর মৃত্যুভয় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও আমারবই.কম

'সে কী আপনার মৃত্যু ভয় নেই?'

'না।'

'মানে?'

'মানে আমার নাম অমর নাথ!'

এটা অবশ্য নিছকই একটা ঠাট্টা। মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। তারপরও একটা ঠাট্টা না করে পারছি না।

এক লোক ঠিক করল মৃত্যু ব্যাপারটাকে সামনে রেখে জীবন যাপন করা তার জন্য কষ্টকর। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল সে মৃত্যু ব্যাপারটিকে আগেভাগে চুকিয়ে ফেলে জীবন শুরু করতে চায়। ঈশ্বর বললেন—

'এটা কী করে সম্ভব? জন্ম হবে তারপর না মৃত্যু।'

'হে ঈশ্বর আমি এসব বুঝি না, আপনি সব পারেন আপনি অন্তত একটি ক্ষেত্রে মানে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টে দিন। আমি মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি আগে ঘটিয়ে রাখতে চাই। তারপর জন্মাব। ঈশ্বর ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে।'

ধরা যাক এই লোকটির নামই অমর নাথ। ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করলেন মৃত্যু দিয়ে। সে এখন আর মরবে না। কখনোই মরবে না। অমর। শুধু জন্মাবে! কিন্তু অচিরেই দেখা গেল এ ব্যাটা ক্রমে ক্রমেই হয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। সে যেহেতু জানে তার মৃত্যু নেই, সেহেতু হেন অপকর্ম নেই যা সে না করল। ঈশ্বর দেখলেন এ তো মাহাবিপদ হল দেখছি! এখন একে মারাও যাচ্ছে না যেহেতু তার মৃত্যু আগেই হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ঈশ্বর তাকে ডেকে পাঠালেন—

'তুমি যা শুরু করেছ তাতে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।'

'কিন্তু আমি তো অমর, আমার মৃত্যু আগেই হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার জন্ম সামনে তোমাকে আবার জন্মাতে হবে।'

'তাতে আপত্তি নেই, মৃত্যু না হলেই হল।'

অবশেষে যেহেতু তার মৃত্যু নেই তাকে তিনি আবার জন্মালেন। অমর নাথ এবার জন্মাল নরকে, এখানেও সে মৃত্যুহীন। অমর।

মৃত্যু নিয়ে একটা চমৎকার বাক্য না লিখলেই নয়। বাক্যটির উৎস অবশ্য অজানা—

"কবরের চারপাশে বেড়া দেবার মতো বোকামি আর নেই। কারণ যারা কবরের ভিতরে তারা কখনোই বাইরে আসতে পারবে না, আর যারা বাইরে তারা কেউই ভিতরে যেতে চায় না।"

বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটা একবার বলেছি। ভাষা নিয়ে আরো কিছু বলা যেতে পারে মানে বাংলা ভাষা নিয়ে। যেমন সেদিন একটা মজার কথা শুনলাম যেমন বাংলা ভাষা নাকি প্রথম বাধাগ্রস্ত হয় নোয়াখালিতে, তারপর আহত হয় সিলেটে এবং অবশেষে নিহত হয় চট্টগ্রামে। তবে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত আবুল ফজল কি একটা প্রসঙ্গে নিজেই একবার বলেছিলেন—

"বাংলা ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামের ভাষার সামান্য কিছু মিল আছে।"

আমি যেহেতু কোনো ক্রমেই ভাষাবিদ নই, সেহেতু ভাষা নিয়ে বেশি স্পর্ধা দেখানো উচিত নয়। তবে যেহেতু নিজের মাতৃভাষা তখন একটা ফান করতে দোষ কী? বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক একঁ হও! আমারবই.কম

আঞ্চলিক ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ভাষা হচ্ছে কুষ্টিয়া এলাকার ভাষা। খুবই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন তাঁরা। তো একদিন গুলিস্তান থেকে বাসে উঠেছি মিরপুর যাব। বাসের মধ্যে হঠাৎ করে এক তরুণ উঠল। তার গলার স্বর কান্না কান্না, সে বলতে শুরু করল, সে কুষ্টিয়া থেকে এসেছে ঢাকায় চাকরিবাকরির আশায়। এসে যেখানে উঠবে সে ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। টাকাপয়সাও পকেটমার গেছে। এখন সে কুষ্টিয়ায় ফিরে যেতে চায়। বাসের ভাড়া হলেই ফিরে যাবে... ইত্যাদি ইত্যাদি। তার কথায় অনেকেই দেখলাম দু'একটাকা করে দিল। দিব্যি বেশ কামিয়ে নেমে গেল সে। হয়তো পরবর্তী কোনো বাসে উঠবে। আর ঠিক তখনই আমার মাঠায় ক্লিক করল, আরে এতো মহা চিট করল আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ! কীভাবে? সে বাসে যতক্ষণ কথা বলেছে, পরিষ্কার বরিশালের ভাষায় কথা বলেছে! তার বাড়ি আসলে বরিশাল! আমরা কেউই খেয়াল করলাম না!

বরিশালের প্রসঙ্গই যখন আসল একটা গল্প এখানে না বললে নয়! গল্পটা বলেছেন আমার এক বরিশালের বন্ধুই! গল্পটা একটু 'ইয়ে' আছে। এক কঠিন রাজনীতিবিদ। বাড়ি যেহেতু বরিশাল, তিনি বক্তৃতাও করেন বরিশালের ভাষায়। তো একবার তিনি বক্তব্য রাখছিলেন এক জনসমাবেশে।

'ঐ মিয়ারা বাংলাদেশ জাগবে কবে? নেপাল জাগছে, বার্মা জাগছে, ভারত তো জাইগাই রইছে, বাংলাদেশ জাগবে কবে?'

আশা করছি ইতোমধ্যেই আপনারা বুঝে গেছেন কোন গল্পটি আমি বলতে যাচ্ছিলাম! বরং অন্য গল্প শোনা যাক— অন্য ভাষার গল্প। এ গল্পের শুরুটা অবশ্য সবার জানাই— সেই এক ছাত্রী তার হোম টিউটরের প্রেমে পড়ে গেল। তো একদিন আবেগ-বিহ্বল গলায় বলল,

'স্যার আপনি কি আমার চোখের ভাষাও বোঝেন না?'

স্যার খিচিয়ে উঠলেন, 'রাখ তোমার চোখের ভাষা। হাতের লেখাই বুঝি না।'

তো শেষ পর্যন্ত সেই স্যারের সঙ্গেই ছাত্রীর বিয়ে হল। বাসর রাত, এবার স্যারের বলার পালা।

'মলি আমার চোখের দিকে তাকাও... দেখ সেখানে তোমাকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন বাসা বেঁধেছে...'

এবার ছাত্রী মানে নববধূ খিচিয়ে উঠল, 'রাখ চোখের স্বপ্ন! জলদি একটা চাকরি জোগাড় কর আগে, দুঃস্বপ্নে তো রাতে আমার ঘুম আসবে বলে মনে হয় না।'

❑

থার্টি ফার্স্টে হঠাৎ করে 'ভেতো বাঙালি' যেন 'মেদো বাঙালি' হয়ে ওঠে। মানে ভাত খাওয়া বাঙালির গলা 'শুক্যে' ওঠে বিশেষ তরল পানীয়ের জন্য। সন্ধ্যার পর থেকেই যেন কোনো তরুণকেই আর ঘরে আটকে রাখা যায় না। বেশিরভাগ তরুণই খোঁজে থাকে কে কোন পার্টিতে যাবে! বিনা পয়সায় মদ খাবে। বিনা পয়সার মদে যতটা নেশা হয় নিজের পয়সায় কেনা মদে অতটা হয় না। অতএব খোঁজ খোঁজ খোঁজ কোথায় কোন পার্টি হচ্ছে! এমনি এক তরুণ প্রতি বছর গন্ধ শুঁকে শুঁকে বিভিন্ন পার্টিতে গিয়ে হাজির হয়। এ বছর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যখন প্রশ্ন করল—

'কোন পার্টিতে যাচ্ছিস এ বছর?'

'কোনো পার্টিতে যাচ্ছি না। বাসাতেই থাকব।'

'বলিস কী, কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বন্ধু দীর্ঘশ্বস ফেলল, কিছু বলল না। পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চাপাচাপিতে ঘটনা খুলে বলল, কেন এ বছর যাচ্ছে না। গত বছর যখন সে একটা পার্টিতে যাচ্ছিল তখন রাস্তায় টহল পুলিশ আটকায়—

'কই যাও?'

'বন্ধুর বাসায়।'

'এত রাতে কেন? থার্টি ফার্স্ট করতে?'

ছেলেটি কিছু বলে না, ওদিকে আরেক পুলিশ তাকে সার্চ করতে শুরু করেছে। পকেটে সন্দেহজনক কিছু নেই, মানি ব্যাগে ৫০ টাকার একটা নোট। পুলিশ এই অবস্থা দেখে খিচিয়ে উঠল—

'ফকিন্নির পুত! ৫০ টাকা দিয়া থার্টি ফার্স্ট করতে বাইর হইস? গেলি।'

অত্যন্ত অপমানিত সেই তরুণ এর পরপরই সিদ্ধান্ত নেয় আর কোনো বছরই সে পার্টিতে যাবে না, মাতাল হবে না।

তো সে মাতাল না হলেও রাত দুটার দিকে অন্য দুই তরুণ পার্টি শেষ করে পাঁড় মাতাল হয়ে বেরুল। টলটলায়মান অবস্থায় দুজনে হেঁটে চলেছে। অন্ধকার রাস্তা, ভাগ্যে একজনের হাতে টর্চ ছিল। সেটা জ্বেলে কোনোমতে পথ চলেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, দুজনেরই মেজাজ ফুরফুরে। আকাশে একটা ঝকঝকে চাঁদও উঠেছে! একজন বলল—

'দোস, চাঁদটা দেখেছিস? ইচ্ছে হচ্ছে ঐ চাঁদটায় উড়ে চলে যাই।'

'যা না, অসুবিধা কী?'

'কিন্তু যাব কীভাবে?'

'আমি টর্চটা জ্বেলে ধরছি চাঁদের দিকে, তুই বেয়ে উঠে যা না।'

'এ মাঝপথে টর্চের সুইচ বন্ধ করে দিবি তখন আমি মাটিতে আছড়ে পড়ে মরি আর কি।'

'না না সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আমি টর্চের সুইচটা পার্টিতে ফেলে এসেছি ভুলে।'

মাতালরা কেন মদ খায়? কারণটা খুব সহজ, মদ না খেলে যে তারা মাতাল হতে পারে না!

❑

বাংলা ভাষায় যে কটি শব্দ আমার অপছন্দ তার মধ্যে একটা শব্দ হচ্ছে 'বেহুদা'। সম্প্রতি বিএনপির যোগাযোগ মন্ত্রী একটি বেহুদা উক্তি করেছেন।। পাঠককে নিশ্চয়ই নতুন করে আর বলার নেই তিনি কী বেহুদা উক্তি করেছেন। তার 'চুম্বক ট্রেন দর্শন' এর পর এটি দ্বিতীয় দর্শন! এই দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তার দলেরই আরেক তরুণ এম.পি. তার পদত্যাগ দাবি করেছেন। দলে নাকি এ ধরনের লোক থাকা বিপজ্জনক!

এ প্রসঙ্গে রাজা ফ্রেড্রিকের একটি গল্প শোনা যেতে পারে। ষোড়শ শতকের ঘটনা, রাজা ফ্রেড্রিক একবার গেছেন জেল পরিদর্শনে। ঘুরে ঘুরে কয়েদিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনছিলেন। সবাই তাকে জানাল যে সে আসলে নির্দোষ। অন্যায়ভাবে তাকে বন্দি করে আনা হয়েছে... ইত্যাদি ইত্যাদি। জেলখানার ভিতর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক কয়েদিকে পেলেন একটু অন্যরকম।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'তুমিও নির্দোষ নাকি?' ফ্রেড্রিক জানতে চাইলেন।

'না, জাঁহাপনা।'

'তুমি তা হলে দোষী মনে কর নিজেকে?'

'জি জাঁহাপনা, আমি অপরাধ করেছি, আমি সাজা পাওয়ার যোগ্য।'

তখন সম্রাট ফ্রেড্রিক ক্ষেপে গেলেন। জেলারকে ডেকে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'অন্যান্য নির্দোষ লোকগুলোকে খারাপ করার আগেই তুমি এই বদমাশটাক জেলখানা থেকে বের করে দাও!'

ঐতিহাসিক গল্পের পর একটা সাম্প্রতিক (তাও বছর পাঁচেক আগের) গল্প শোনা যাক। ঢাকা শহরের ইংলিশ রোডের ব্রোথেলে একবার হঠাৎ করে পুলিশ রেইড দেয়। সমস্ত খদ্দেরকে গ্রেফতার করে। পরে খদ্দেরদের বসিয়ে রেখে একজন একজন করে জিজ্ঞেস করা হয় তারা কেন এখানে এসেছে। বেশিরভাগ খদ্দেরই বলে, তারা ভুল করে এখানে ঢুকে পড়েছে...তারা জানত না এখানে ব্রোথেল নারীরা থাকে... ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে গোটা চারেক খদ্দের স্বীকার করে তারা আসলেই এখানে জৈবিক তাড়নায় এসেছে এবং পুলিশ সেই চারজনকেই তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেয়।

দেখা যাচ্ছে মিথ্যার চেয়ে সত্য বলায় কখনো কখনো কিছু সুবিধা কিন্তু পাওয়া যায়। আর সে কারণেই বোধহয় এক বিখ্যাত দার্শনিক বলেছিলেন... মানে ব্যাপারটা তিনি কিন্তু একটু কায়দা করে ঘুরিয়েই বলেছিলেন যে '...আর এ কারণেই আমি সব সময় মিথ্যা উপদেশ দিয়ে থাকি, আর এটা তো সবাই মানে মানুষ সব সময় উপদেশের উল্টোটাই করে।'

❑

আমি এক ভদ্রলোককে চিনি, যিনি পরপর তিন সন্তান নিয়েছেন। তিনজনই ছেলে। তো আমি তাকে একদিন বললাম, 'তুমি একজন আধুনিক যুগের লোক হয়ে পরপর কেন তিনটি বাচ্চা নিলে, এটা তোমার স্ত্রীর শরীরের জন্যও তো ক্ষতিকর। সে বলল, 'আমি আর আমার স্ত্রী প্ল্যান করেই নিয়েছি।'

'মানে?'

'মানে সোজা, আমারা দু জন প্ল্যান করেই পরপর বাচ্চা নিয়েছি। যেন একজনের কাপড় পরে অন্যের চলে যাবে, একজনের বই অন্যজনে পড়বে।'

পরে বোঝা গেল তার ইকোনোমি চিন্তা। তাদের প্ল্যান হচ্ছে তারা শুধু বড় জনের জামা জুতা কিনবে এবং পরের বছর বড়র জামা মেজ জন পরবে, মেজ জনের জামা ছোটটা পরবে। এমনকি তারা যখন স্কুলে পড়বে তখন পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে, শুধু বড় জনের পাঠ্যবই কিনলেই হবে। আমি দেখলাম বুদ্ধি খারাপ নয়। যথেষ্ট ইকোনমিক চিন্তা। কিন্তু পরে শুনেছি ঐ পরিবারে বিরাট ঝামেলা হয়েছে। ঐ তিন ক্রমিক পুত্র যখন ছোট ছিল তখন সমস্যা হয় নি, কিন্তু ওরা যখন বড় হল মানে যে বয়েসে ছেলেরা পোশাকআশাকে একটু 'তাঁজ' মারতে চায় সেই বয়সে পৌছাল, তখনই শুরু হল সমস্যা। ছোট দুই ভাই পুরোনো কাপড় পরতে আর রাজি নয়। ছোটটা মেজটার পরতে রাজি নয়, মেজটা বড়টার পরতে রাজি নয়। ব্যাপারটা ইকোনোমি বাবা-মার কানে গেল। বাবা-মা তিনজনকে ডেকে কড়া ধমক দিলেন। তারা তাদের 'ইকোনোমি চাইল্ড প্রজেক্ট' এর নিয়মকানুন ভাঙতে রাজি নন। কদিন পর ঘটল আরেক দুর্ঘটনা, ছোট আর মেজ মিলে বড়টাকে আচ্ছাসে পিটিয়ে দিল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বড়জন হাসপাতালে না থাকলেও বিছানায় শোয়া, ছোট দুজন

পলাতক। অবশ্য পালিয়ে বেশি দূর যেতে পারে নি, নানা বাড়িতেই আত্মগোপন করেছে তারা।

বহু বছর বাদে সেই ইকোনোমি চাইল্ড প্রজেক্টের বাবার সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা—

'কী হে তোমার ছেলেরা কে কেমন আছে?'

'বড়টা তো ব্যাংকে ছিল, তো ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে একটা এনজিওতে ঢুকেছে।'

'মেঝোটা?'

'ও তো ব্যবসা করত... হঠাৎ একটা প্রাইভেট ব্যাংকে ভালো সুযোগ পেয়ে ঢুকে পড়েছে।'

'ছোটটা?'

'ওটাকে নিয়েই চিন্তায় আছি। কিছু করে না তবে আপাতত মেজ'র ব্যবসায় ওকে ঢুকিয়ে দিয়েছি... বেকার বসে না থেকে লেগে থাকুক কী বলেন?'

আমিও মাথা নেড়ে সায় দেই! 'অবশ্যই লেগে থাকলে যে কোনো বিষয়েই সাফল্য আসতে পারে, হোক না সেটা 'ইকোনোমি চাইল্ড প্রজেক্ট'-এর মতো কোনো প্রকল্প।'

❑

এবার ঢাকা বইমেলায় গিয়ে প্রথমে ভাবলাম হতবাক হই পরে ঠিক করলাম না বরং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই... শেষ পর্যন্ত 'তবদা' লেগে গেলাম (আমি এখনো শিওর না এই শব্দটি বাংলা ভাষায় আছে কিনা)। কেন তবদা লাগলাম? মেলায় ঢুকেই দেখি গান হচ্ছে, 'খোদা তোমারি মেহেরবান...' ভাবলাম বোধহয় ভুল করে ইসলামিক গান ছেড়েছে। পরে দেখলাম না একের পর এক ইসলামিক গান হচ্ছে। আমার একবার সন্দেহ হল, তবে কি আমি ভুল করে ঢাকা মেলায় না এসে বায়তুল মোকাররম সংলগ্ন ইসলামিক বইমেলায় ঢুকেছি? আমার ধারণা আরো দৃঢ় হল, যখন দেখি কামিয়াব নামে এক স্টলে গোলাম আযমের সচিত্র বই বিক্রি হচ্ছে। আমি আমার সঙ্গে আসা রম্য লেখক সাজ্জাদ কবীরকে জিজ্ঞেস করলাম—

'আপনি শিওর আমরা ঢাকা মেলায় এসেছি?'

'অ্যাঁ... ইয়ে তাই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু...'

এ সময় ইসলামিক গান বন্ধ হয়ে নতুন বইয়ের প্রচার শুরু হল। প্রথম বইটির নাম 'পাক সার জামিন সাদবাদ' (পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত) বইটি যদিও রাজাকার বিরোধী লেখা বলেই শুনেছি, কিন্তু সিচ্যুয়েশন এমন দাঁড়াল যে আমি যেন পাকিস্তানের কোনো বই মেলায়।

যা হোক মেলা কোনো মতে ঘুরেফিরে বাইরে এসেছি। বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত। দেখি এক বয়স্ক লোক কিছু সাদা কালো ক্যালেন্ডার বিক্রি করছেন। ক্যালেন্ডারগুলোতে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি। আমি একটি ক্যালেন্ডার কিনলাম। সাজ্জাদও কিনল। বিক্রেতা খুব খুশি হলেন, মনে হল বোধহয় আমরাই প্রথম ক্রেতা। কথা প্রসঙ্গে বিক্রেতা জানালেন তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমরা ভাবলাম সেটাই স্বাভাবিক, নইলে এই মেলার বাইরে জবুথবু হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কেনইবা এই ক্যালেন্ডার বেচবেন তিনি?

এখন অবশ্য মেলার সিজন চলছে। বাণিজ্য মেলা, বইমেলা, কম্পিউটার মেলা সব মেলা একসঙ্গে যেন সেশনজট লাগিয়ে দিয়েছে! সন্ধ্যার পর যাকেই ফোন করি সে-ই দেখি মেলায়। একদল মেলায় যাচ্ছে, একদল যাচ্ছে না। ব্যাপারটা মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কে চিন্তা করলে এমন দাঁড়ায়...


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কী রে তুই কোথায়?'

'আমি তো মেলায়।'

'কোন মেলায়?'

'বইমেলা শেষ করে বাণিজ্য মেলায় ঢুকেছি, আসবি নাকি?'

'না, আমিও আরেক মেলায়?'

'কোন মেলায়? কম্পিউটার মেলায়?'

'না, আমি আছি 'ঝামেলায়।'

❑

আমার সাত বছরের ভাগ্নি তিথির ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। সম্ভবত পরদিন বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। সে উচ্চৈঃস্বরে, 'পাট বাংলাদেশের সোনালি আঁশ' রচনা পড়ছে। এক জায়গায় দেখি সে পড়ছে এভাবে... 'পাট বাংলাদেশ, ভারত, থু! থাইল্যান্ড ও বার্মায় বেশি জন্মায়...' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—

'ওটা কী পড়লে?'

'কোনটা?'

'ঐ যে থু বললে।'

'ওখানে পাকিস্তান লেখা যে!'

আমি তো অবাক। বললাম, 'তুমি কি পরীক্ষাতেও 'থু' লিখবে নাকি?

'না পরীক্ষাতে ঠিক লিখব। তবে পড়ার সময় আমি এভাবেই পড়ি। বলে সে আবার উচ্চঃস্বরে রচনা মুখস্থ করতে লেগে গেল। 'পাট বাংলাদেশের সোনালি আঁশ... অ্যাঁ অ্যাঁ... পাট বাংলাদেশের সোনালি আঁশ...।

অবশ্য পাট আর নাকি বাংলাদেশের সোনালি আঁশ নেই। এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাদামি বাঁশ। তবে বাঁশ কিন্তু এখনো বাঁশই আছে। ইদানীং এক একটি বাঁশের যা দাম! আমার এক বন্ধুর কাছে শুনে তো আমার চক্ষুস্থির! শুধু তাই নয়, সেদিন এক চায়নিজের দাওয়াতে 'বেঝু সুপ' খেতে গিয়ে মেনুতে সুপের দাম দেখে আমার আবারো চক্ষুস্থির... না এবার আর স্থির নয়। বলা উচিত অস্থির!

পাকিস্তান প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমার ভাগ্নির যেমন ঘৃণা জন্মেছে পাকিস্তানের প্রতি এই বয়সেই। এই রকম এক তরুণকে নিয়ে আমি গেলাম একবার এক ফাস্টফুডের দোকানে ঠাণ্ডা কিছু খেতে।

'ঠাণ্ডা কিছু আছে?'

'জুস আছে।'

'কী জুস?'

'সেজান, পাকিস্তানের জুস।'

দোকানদার 'পাকিস্তান' শব্দটির প্রতি বিশেষ জোর দিল যেন। আমার সঙ্গের তরুণটি বলল, 'না পাকিস্তানের জুস খাই না।'

দোকানদার সেজান জুস বের করে ফেলেছিল। 'খাই না' শুনে ফ্রিজে রাখতে রাখতে বিড়বিড় করে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরেই বলল—

'আপনের মতো দু'একজন কাস্টমার' ৭১ সালে থাকলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে নয় মাসও লাগত না।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমার সঙ্গের তরুণটি দেরি করল না। খুব চমৎকার একটি চড় কষাল দোকানদারের গালে। চড়ের শব্দটা হল চমৎকার। অন্যান্য কাস্টমাররা সবাই ঘুরে তাকাল ঘটনার দিকে। হতভম্ব দোকানদার কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

এবার একটা জোক শোনা যাক, পাকিস্তানিদের নিয়ে ইন্ডিয়ান জোক!

এক পাকিস্তানিকে একটা থার্মোফ্লাস্ক উপহার দিল একজন ইন্ডিয়ান। পাকিস্তানি বলল, 'এটা কী?'

'এটা থার্মোফ্লাস্ক।'

'এটা দিয়ে কী হয়?'

'এটাতে যদি ঠাণ্ডা জিনিস রাখ ঠাণ্ডাই থাকবে।'

'আর যদি আমি গরম জিনিস রাখি?' জানতে চাইল পাকিস্তানি।

'গরম জিনিস রাখলেও গরম থাকবে।'

'তাই নাকি!'

পাকিস্তানি খুশি মনে থার্মোফ্লাস্কটি গ্রহণ করল। কিন্তু দুদিন পর ফ্লাস্কটি ফেরত নিয়ে এল।

'কী হল?' ইন্ডিয়ান জিজ্ঞেস করল।

'তোমার এটা কাজ করে না!'

'কেন কাজ করবে না!'

'আমি গরম চা আর ঠাণ্ডা আইসক্রিম রেখেছিলাম। দেখ তার বদলে এসব কী বেরুচ্ছে!'

দেশপ্রেম নিয়ে ব্রাউডিনের একটি কোটেশন এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না— "একমাত্র নিজের দেশকেই অন্ধের মতো ভালবাসা যায়।"

❑

এক চিরকুমার সভায় জরুরি মিটিং ডাকা হয়েছে। সভার সব সদস্যের মুখ থমথমে। ফিসফাস চলছে। সবাই অপেক্ষা করছে সভার প্রবীণতম চিরকুমার সদস্যের জন্য। তিনি আসলেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উত্থাপন করা হবে।

কিছুক্ষণ বাদেই এলেন তিনি। তিনিই এই সভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সভাপতি আসন গ্রহণ করলেন। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করলেন—

'সভাপতি আশা করি ইতোমধ্যে সমস্যাটি আপনি অবগত হয়েছেন।'

'কোন সমস্যাটি বলো তো?'

'ঐ যে আমাদের চিরকুমার সভার একজন অন্যতম সদস্য সভার আইন ভঙ্গ করে গত সপ্তাহে বিয়ে করেছে।'

'হুম।'

সভাপতি মুচকি হেসে গম্ভীর হয়ে গেলেন যেন।

'এখন তার কী শাস্তি হওয়া উচিত?'

সভায় থমথমে নীরবতা নামল। তাই তো কী শাস্তি হতে পারে? কেউ বলল, এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হোক। কেউ বলল, সভায় ডেকে এনে নাকে খত দেওয়া হোক। কেউ বলল, দশবার কান ধরে উঠ বস... ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রবীণ সভাপতি চুপ। তিনি কোনো মন্তব্যই করলেন না। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি কী শাস্তির কথা বলেন। অবশেষে তিনি মুখ খুললেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'ওর কোনো শাস্তির প্রয়োজন নেই।'

'কেন? কেন?'

সবাই হা হা করে উঠল। তখন সভাপতি মুচকি হেসে বললেন—

'ওর শাস্তির প্রয়োজন নেই। কারণ বিয়েটাই ওর জন্য একটা শাস্তি।'

বাস্তবেই কি চিরকুমার সভার সেই দলছুট চিরকুমারের শাস্তি হয়েছিল? সেটা বুঝতে হলে পাঁচ বছর পর যেতে হবে সেই দম্পতির কাছে, দেখি কী শাস্তি চলছে।

সেই দলছুট চিরকুমার, অবশ্য তখন আর কুমার নয়। সে একজনের স্বামী। তো সেই স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে অনেক দিন ধরে কথা বন্ধ। বিছানাও আলাদা।

এক দুপুরে হঠাৎ সেই স্বামী অফিস থেকে ফিরে দেখল স্ত্রী শুয়ে আছে এক যুবকের সাথে। স্বামী রেগেমেগে গালিগালাজ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল— স্ত্রী কৈফিয়ত দিল—

'আগে আমার কথাটা শোন। তারপর যা ইচ্ছে হয় কর।'

'শোনার দরকার নেই। যা দেখেছি তাই যথেষ্ট।'

'শোনই না। আমি দুপুরে খেয়ে একটু শুতে যাচ্ছি, এমন সময় লোকটি এল ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে, এক টুকরো রুটি চাইল। তাকে ঘরে বসিয়ে খাওয়াতে গিয়ে দেখলাম, তার পায়ের জুতো ছেঁড়া। তোমার ব্যবহার না-করা পুরোনো জুতো থেকে এক জোড়া তাকে দিলাম। জুতো জোড়াটা দেবার পর দেখলাম, তোমার জুতোর সাথে ওর প্যান্টটা ঠিক মানাচ্ছে না। তখন তোমার পুরোনো একটা প্যান্ট তাকে দিলাম। তারপর দেখলাম, প্যান্ট-জুতো মানালেও ওর ছেঁড়া শার্টটার সঙ্গে সবকিছু বেমানান দেখাচ্ছে। তাই তোমার সেই কবেকার কেনা একটা শার্ট ওকে পরতে দিলাম।'

'কিন্তু ও তোমার বিছানায় কেন?'

'সে কথাই তো বলছি। জামা-জুতো-প্যান্ট পরার পর লোকটি আবদার করল—

'তোমার স্বামী দীর্ঘদিন ব্যবহার করে না এমন আর কী আছে, দাও না!'

পুন : তবে এখানে বলে নেওয়া বাঞ্ছনীয় যে স্ত্রীর কাছে ছেঁড়া জামা-জুতো পরে যে লোকটি এসেছিল সে কিন্তু বলাই বাহুল্য চিরকুমার সভার একজন স্পাই!

পুনঃপুনঃ যথারীতি একটা বৈবাহিক কোটেশন! চিরকুমাররা আসলে কেন চিরকুমার থাকে? এর একটা ব্যাখ্যা আছে একটি বিখ্যাত কোটেশনে। কোটেশনটি শোপেন হাওয়ারের— "বিয়ে করার অর্থ অধিকারকে অর্ধেক করা এবং কর্তব্যকে দ্বিগুণ করা"। ঐ দুটোর কোনোটাই হয়তো মানতে বা করতে রাজি নয় চিরকুমাররা! কে জানে!

❑

বাসর রাতে স্ত্রী গদগদ স্বরে সদ্য বিবাহিত স্বামীকে বলল, 'ওগো এমন অদ্ভুত চুমু খেতে শিখলে কোথায় তুমি?'

'এক সময় আমি নিয়মিত পুলিশ বিভাগের ব্যান্ড পার্টিতে বিউগল বাজাতাম যে।'

এটি পুরোনো গল্প। কিন্তু এই পুরোনো গল্পটা যেন আমাদেরকে নতুন করে ভাবনায় ফেলল। সেদিন পেপারে দেখি এক পুলিশ কনস্টেবল যে পুলিশ বিভাগে ব্যান্ড পার্টিতে বিউগল বাজাত প্রতিদিন ভোরে, সে রাতে... না পাঠক যা ভেবেছেন তা নয়, শুরুর গল্পটি সে করত না সে নিয়মিত রাতে ছিনতাই করত। দিনে ফুলটাইম বিউগল বাদক আর রাতে পার্ট টাইম হাইজ্যাকার। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! যেন 'টু ফেসেস অফ ড. জ্যাকেল'!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ আমারবই.কম

❑

আমি যে বাজার থেকে বাজার করি সেখানে অনেক মাছওয়ালাই আমাকে চেনে। যাদের কাছ থেকে আমি নিয়মিত পচা মাছ কিনে থাকি। মানে তারাই আমাকে পচা মাছ গছিয়ে দেয় আর কি! তো একদিন বাজারে গেলাম, গিয়ে দেখি সব মাছওয়ালাই পারলে বিনা পয়সায় সব মাছ দিয়ে দেয় আমাকে। শুধু আমাকে না যারাই বাজার করতে এসেছে তাদেরকেই। তাদের কথা হচ্ছে মাছ নিয়ে যান, দাম পরে দিয়েন।

কিছুক্ষণ পর রহস্য ভেদ হল। ঐ বাজারের মালিক দুই ভাই। তারা দুই দল করে। একজন আওয়ামী লীগ, একজন বিএনপি। আজ এক দলের মিছিল আছে। মানে এক ভাইয়ের দলের মিছিল আছে সবাইকে ১২টার মধ্যে যেতে হবে! কাজেই ১২টার মধ্যে সব মাছ যেভাবে হোক বেচে শেষ করতে হবে! মন্দের ভালো সেদিন আমি একপাদা তাজা মাছের মিছিল নিয়ে বাসায় ফিরলাম। পয়সা ছাড়াই (অবশ্য পরে পয়সা দিতে হবে)।

তো মৎস বিক্রেতারা মিছিলে যাক। এদিকে আমরা আরেকটা মৎস কাহিনী শুনি—

এক লোক বাজার থেকে আমার মতো পচা মাছ কেনায় বিশ্বাসী নয়। সে বড়শি নিয়ে গেল এক পুকুরে। সকাল থেকে বড়শি ফেলে বসে থাকল সন্ধে পর্যন্ত, মাছ তো দূরে বড়শি ফাতনা নড়ল না এক বিন্দু। লোকটি মহাবিরক্ত হয়ে বড়শি গুটিয়ে উঠে পড়ল। যাওয়ার আগে পকেট থেকে দুটো পাঁচ টাকার কয়েন বের করে পুকুরে ছুড়ে দিল, তারপর চেঁচিয়ে বলল—

'শালারা আমার টোপ যখন খাবিই না, তা হলে বাজার থেকে কিছু কিনে খাস, না হলে তো না খেয়ে মরবি তোরা!'

এবার লোকটি একটা মাছ বাজারে ঢুকল। অনেক টিপেটুপে একটা মাছ কিনল। দাম দেওয়ার পর মাছ বিক্রেতাকে বলল, 'মাছটা তার দিকে ছুড়ে দিতে।'

মাছ বিক্রেতা তাই করল।

লোকটি ক্রিকেট বলের মতো মাছটি ক্যাচ ধরে ব্যাগে ভরে বাড়ি রওনা দিল। বাড়িতে কথা দিয়ে এসেছে পুকুর থেকে মাছ ধরে আনবে। পুকুর থেকে না ধরলেও বাজার থেকে যে 'ধরে' এনেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

❑

বাংলাদেশে বাস দুর্ঘটনা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। পাঠকদের মনে আছে নিশ্চয়ই আমেরিকা যখন ইরাক আক্রমণ করে, প্রথম দিনের আক্রমণে একজন ইরাকি মারা না গেলেও বাংলাদেশে ঐ একই দিনে টাঙ্গাইলের এক বাস দুর্ঘটনায় বাইশ জন সাধারণ যাত্রী মারা যান। টিভির খবরে তাদের বিকৃত লাশ আমাদের দেখতে হয়। এ বিষয়টা প্রায়ই হচ্ছে, এখনো হচ্ছে।

বাস দুর্ঘটনা যে শুধু বাংলাদেশেই ঘটে তা নয়, বিদেশেও ঘটে। এমনি একটি ঘটনা নিয়ে একটা গল্প। বিদেশের হাইওয়ে দিয়ে একটা বাস ছুটে চলেছে (কোন দেশ এটা এখানে জরুরি নয়)। বাসের ভিতর পঁচিশজনের মতো যাত্রী। যাত্রীরা সবাই কাকতালীয়ভাবে বিকৃত কুৎসিত দর্শন। তো সেই বাসটি হঠাৎ একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়ল। যথারীতি নিয়মানুযায়ী ড্রাইভার দুর্ঘটনার দশ মিনিট আগে বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু বাকি পঁচিশ জন যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তৎক্ষণাৎ তাদের স্বর্গে হাজির করা হল। ঈশ্বর বললেন, এরা নির্দোষ যাত্রী। এদের স্বর্গে পাঠিয়ে দাও আর স্বর্গের ১০ মিলিয়ন বছর পূর্তি উপলক্ষে ওদের একটা করে ফ্রি বর দেওয়া হবে। ঐ পঁচিশ জন তো মহা খুশি। পঁচিশ জন লাইন ধরে দাঁড়াল। প্রথম জন বলল—

'ঈশ্বর আমি সারা জীবন কুৎসিত ছিলাম, আমাকে বদলে দাও, সুদর্শন করে দাও।'

'বেশ তাই হবে'। তাই হল।

দ্বিতীয় জনেরও ঐ একই ইচ্ছে। তার বেলায়ও তাই হল। এই করতে করতে চব্বিশজন বদলে গেল। কিন্তু পঁচিশতম জন হো হো করে হেসে উঠল—

'সে কি, হাসির কী হল?'

'ঈশ্বর, সাধারণত মানুষ দুর্ঘটনায় বিকৃত হয়ে যায় আর আমরা তো আগেই বিকৃত ছিলাম। দুর্ঘটনায় সুদর্শন হয়েছিলাম ওরা বর নিয়ে আবার বিকৃত ও কুৎসিত হল।'

'তা হলে তোমার কোনো বরের প্রয়োজন নেই?'

'আছে।'

'কী?'

'আমি ঐ বদমাশ ড্রাইভারটার সাজা চাই। ও এত রাফ চালায় তার অন্তত সাজা হওয়া দরকার।'

'বেশ তাকে কঠিন সাজা দিলাম।'

'কী সাজা?'

'তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলাম।'

কিন্তু ভাগ্যের কী খেলা! বছর পাঁচেক পর দেখা গেল সেই রেকলেস ড্রাইভারও স্বর্গে। তখন ঐ পঁচিশজন যাত্রী হাউ হাউ লাগিয়ে দিল।

'ঈশ্বর এর মানে কী?'

ঈশ্বরকে একটু দ্বিধান্বিত মনে হল! তিনি বললেন—

'দেখ সমস্যা হয়েছে কি ঐ লোকটা বাংলাদেশেও এত রেকলেস গাড়ি চালাত যে বাসের হাজার হাজার যাত্রী ভয়ে বারবার আমার নামই জপ করত কেবল। আর যে লোকটার কারণে আমার এত 'নাম জপ' তাকে নরকে পাঠাই কী করে!'

❑

ধরা যাক এক তরুণ ঢাকায় এসেছে ভাগ্যান্বেষণে। এম.এ. পাস, ননস্টপ বেকার। বাবা-মার বড় সন্তান। এইবেলা আয় রোজগার করে বাড়িতে টাকা না পাঠালে আর চলছে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঢাকা শহরে কোথাও থেকে তো চাকরি-বাকরির চেষ্টা করতে হবে নাকি! কিন্তু কম ভাড়ার কোনো বাড়িই পাওয়া যাচ্ছে না। যাও বা পাওয়া যাচ্ছে ব্যাচেলরকে থাকতে দেবে না। এই নিয়ে এক বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে—

'ব্যাচেলরকে ভাড়া দেবেন না কেন?'

'দেব না আমার ইচ্ছে, ব্যাস।'

তরুণের মাথায় হিমোগ্লোবিন উঠে গেল। এ সময় তরুণ দেখল পিছন দিয়ে এক তরুণী হেঁটে গেল।

'ঐ যে হেঁটে গেলেন উনি নিশ্চয়ই আপনার মেয়ে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'এই জন্যই, এই জন্যই আমি কোনো ব্যাচেলরকে বাড়ি ভাড়া দিই না... এর মধ্যে ওদিকে চোখ চলে গেছে।'

'আহ্ হা বলুন না উনি আপনার মেয়ে কিনা?'

'হ্যাঁ আমার মেয়ে, তাতে কী হয়েছে তোমার?'

'উনি কি অবিবাহিতা?'

'খবরদার আর একটা কথা বললে আমি কিন্তু পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।'

'আহ্ হা আমি তো আপনার বাড়ি ভাড়া নিতেও যাচ্ছি না। শুধু জানতে চাচ্ছি আপনার মেয়ে অবিবাহিতা কিনা।'

'হ্যাঁ অবিবাহিতা, তাতে তোমার সমস্যাটা কী?'

'আমার কোনো সমস্যা নয়, শুধু একটা অনুরোধ করব আপনাকে?'

'বটে আমার মেয়েকে বিয়ে করে ঘর জামাই হয়ে থাকার অনুরোধ করবি? পেলি হারামজাদা...।' ক্ষিপ্ত বাড়িওয়ালা তখন তুমি থেকে তুইতে নেমে এসেছে।

'ছি ছি গালাগালি করছেন কেন। আমি ভদ্রলোকের সন্তান। আমার অনুরোধ একটাই সেটা হচ্ছে দয়া করে আপনার মেয়েকে কোনো ব্যাচেলরের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। ব্যাচেলররা খুব খারাপ!'

বলে তরুণ হাঁটা দিল। নাটক উপন্যাস হলে এ সময় আড়াল থেকে তরুণী বেরিয়ে এসে বলত—

'বাবা উনাকে ফেরাও... আমি উনাকেই বিয়ে করব।'

'তুই কী বলছিস মা?'

'হ্যাঁ, তার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি! যাকে বলে দেখামাত্র প্রেম নয়, শোনা মাত্র প্রেম।'

বাবার একমাত্র আদরের কন্যা। বাধ্য হয়ে ছুটে গিয়ে বাবা তরুণকে বললেন—

'দাঁড়াও।' তরুণ দাঁড়াল।

'আজ থেকে তুমি আমার এখানেই থাকবে।' তরুণ হাতের ব্যাগ নামিয়ে রেখে বাবার পায়ে ধরে সালাম করতে যেতেই বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন! দুজনের চোখেই আনন্দাশ্রু!

কিন্তু যেহেতু গল্প উপন্যাস না সেহেতু বাড়িওয়ালা হাঁকিয়ে দিল তরুণকে। ঘুরতে ঘুরতে তরুণ এক বুড়োর ছাপড়া দোকানে বিষাক্ত ঠাণ্ডা চা খেতে বসল। চা খেতে খেতে চাওয়ালার কাছে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারল এখানে ধারেকাছেই একটা দোতলা বাড়ি আছে। পুরোটাই খালি বাড়ি। কেউ থাকে না। সেই বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, গ্যাস নেই, কিছুই নেই, শুধু একটা জিনিস আছে—

'কী আছে?'

তরুণ ব্যাগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল।

'ভূত আছে।'

'মানে?'

'মানে ওটা একটা ভুতুড়ে বাড়ি। কয়েকটা ভূত থাকে ওখানে।'

'কুচ পরোয়া নেহি, আমি ঐ বাড়িতেই উঠব। দয়া করে আমাকে ঠিকানাটা বলুন।'

চাওয়ালার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে সেই তরুণ চলল সেই ভুতুড়ে বাড়িতে। একটা মোম কিনে নিতে ভুলল না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভুতুড়ে বাড়ির দরজায় নক করতেই, কেউ একজন দরজা খুলল—

'কাকে চান?'

'এটা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কে?'

'আমি ভূত।'

'দেখি সরেন আমাকে ঢুকতে দিন। আমি এখানে থাকব কিছু দিন।'

'আমি যে ভূত আপনার বিশ্বাস হল না? আশপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখুন আমি ৫০ বছর আগে মারা গেছি।'

'বিশ্বাস হয়েছে। ভুতুড়ে বাড়ি জেনেই এসেছি।'

'না এখানে থাকা চলবে না।'

ততক্ষণে তরুণ ভূতের শরীর ভেদ করে অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। ভূত দেখল এ তো মহা জ্বালা! তখন বাধ্য হয়ে তরুণের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসল। যাকে বলে, ফ্ল্যাগ মিটিং আর কি!

'দেখ তুমি এখান থেকে না গেলে আমি কিন্তু তোমাকে এখন ভয় দেখাতে বাধ্য হব।'

'যতই ভয় দেখাও লাভ নেই। তিন বছর ধরে বেকার। বাবা-মার বড় সন্তান। সব ভয়ভীতির উর্ধ্বে চলে গেছি। বলে সে ফস করে ম্যাচ জ্বালিয়ে মোম জ্বালাল। ভূত লাফ দিয়ে তিন ফুটে এক গজ দূরে সরে গেল!'

'দেখ ভাই মানুষ, তোমাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে চলে যাও।'

'কেন আমি এখানে থাকলে তোমার সমস্যা কী? তুমিও থাক আমিও থাকি, মানুষ আর ভূতের সহাবস্থান... খারাপ কী?'

'সমস্যা আছে, আমার ছোট একটা বাচ্চা আছে, সে মানুষ ভীষণ ভয় পায়!'

'ও এই কথা, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস আমি ওর ভয় দূর করে দিচ্ছি... চাইল্ড সাইকোলজি আমি ভালো জানি। এম.এস.সি.তে আমার টার্ম পেপারই ছিল চাইল্ড সাইকোলোজির উপর। অবশ্য ঘোস্ট চাইল্ড সাইকোলোজি...'

এই সময় ভূতটা হঠাৎ বাতাসে মিলিয়ে গেল। তরুণ ততক্ষণে বিছানা করে ফেলেছে। শরীরটাও বেশ ক্লান্ত, শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকালে তরুণ উঠে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে দেখল। দোতলায় ঘরের এক কোণে তিনটা মার্বেল পড়ে থাকতে দেখল শুধু, দুটো বড়, একটা ছোট! আর কিছু নেই, সব ফাঁকা!

সে রাতে ভূতের কোনো উপদ্রব হল না। সে রাতে কেন তার পরের রাতেও কোনো উৎপাত নেই। সত্যি কথা বলতে কি, আর কোনো ভূতের উপদ্রবই হল না ঐ বাড়িতে। তবে একদিন সেই তরুণ রাতে ঘুমুচ্ছে হঠাৎ শোনে কয়েকজন মানুষের গলা। ঠিক তার পাশের রুমেই যেন। বিছানা থেকে উঠে উঁকি মেরে দেখে তিনজন লোক একটা কুপি জ্বালিয়ে এক গাদা টাকা গুনছে! তরুণ ছোট করে একটা কাশি দিল। কাশির শব্দে তিনজন লোকই বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকাল একবার। তারপর তিনজনই 'বাপরে' বলে এক সাথে লাফিয়ে উঠে দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ছুটে পালাল! দৌড়াতে দৌড়াতে একজনকে শুধু বলতে শোনা গেল, 'তখনি কইছি এই বাড়িতে ভূত আছে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!আমারবই.কম

তরুণ ধীরে সুস্থে টাকাগুলো তার নিজের ব্যাগে ভরল। একবার ভাবল গুনে গুনে ঢুকাবে, পরে বাদ দিল, কাল পরশু পেপারে উঠবে নিশ্চয়ই কোন ব্যাংক থেকে কত খোয়া গেছে। তখনই জেনে নেওয়া যাবে।

এই প্রায় গল্পের একটা ম্যরাল আছে সেটা হচ্ছে 'দেয়ার ইজ এ স্টোরি (নট ফ্রাইম) বিহাইন্ড এভরি সাকসেস।'

পুনঃ একটা তথ্যও দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে ভূত মরলে দাঁড়কাক হয়। আর দাঁড়কাক মরলে হয় মার্বেল।

❑

ভ্যালেন্টাইন ডে। ভালবাসাবাসির দিবস। ভালবাসা বলতে আগে হৃদয় দেওয়া নেওয়া বোঝাত। আজকাল মনে হচ্ছে ধারণা বদলেছে! মানে হৃদয়ে দেওয়া নেওয়া বন্ধ, অন্য কিছু দেওয়া নেওয়া চলছে! যেমন সেদিন এক খবরে পড়লাম সিঙ্গাপুরের এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে হৃদয় না দিয়ে লিভার দিয়েছে। ব্যাপারটা আরেকটু খোলাসা হওয়া দরকার। সিঙ্গাপুরে প্রেমিকার লিভার নষ্ট হয়ে গেছে, সে জন্য প্রেমিক তার লিভারের কিয়দংশ দান করেছে। ব্যাস এখন প্রেমিকের লিভারের কিয়দংশ নিয়ে প্রেমিকা ক্রমে ক্রমেই বেঁচে উঠছে। তাদের প্রেম আরো গভীর হয়েছে এবং এই লিভার দান করার কারণে তারা সেখানে এখন সেলিব্রেটি প্রেমিক-প্রেমিকা।

আগেই বলেছি ভালবাসাবাসিতে আজকাল হৃদয় দেওয়া নেওয়া বন্ধ। তার আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এটা অবশ্য ভয়ংকর। ঘটনা ভারতের। স্বামীকে ভালবাসে স্ত্রী। কিন্তু সেই স্বামী নেশাখোর। এখন স্ত্রী বহু চেষ্টা করেও স্বামীকে নেশার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হল। সন্ন্যাসী পরামর্শ দিল তাদের একমাত্র শিশু সন্তানকে বলি দিতে হবে। স্বামীর প্রেমে অন্ধ স্ত্রী তাই করল! ভালবাসার কি ভয়ংকর নমুনা!

এবার আসা যাক বাংলাদেশে। প্রেম করে বিয়ে করেছে তরুণ-তরুণী। সুখি সংসার। ভালবাসার কোনো কমতি নেই। একদিন তাদের ঘরে এল নতুন অতিথি। (না শাশুড়ি এসে হাজির হলেন না) এল নতুন শিশু। ভালবাসার বন্ধন যেন আরো দৃঢ় হল স্বামী-স্ত্রীর। কিন্তু হঠাৎ সমস্যা!

একদিনকার ঘটনা। স্বামী অফিসে। স্ত্রী বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। হঠাৎ কাজের বুয়া এসে ঘোষণা দিল—

'খালাম্মা আমারে বিদায় দেন।'

'কেন? কী হল আবার?'

'দেখেন খালাম্মা বাবুর পায়খানা পেশাপ সাফ করি তাতে কোনো সমস্যা নাই। পোলাপান মানুষ কিন্তু সাহেবের...'

'কী বলছ তুমি? সাহেবের কাপড়ে ইয়ে মানে...?'

স্তম্ভিত স্ত্রী বাচ্চা রেখে উঠে এলেন ব্যাপার বুঝতে। ব্যাপার আসলেই সিরিয়াস। তার স্বামীর (না প্যান্টে নয়) প্রতিটি শার্টের উপর পাখির 'ইয়ে'। আশ্চর্য এর কী ব্যাখ্যা? হতভম্ব স্ত্রী বুয়াকে দুদিনের ছুটি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে ফোন দিলেন। সব খুলে বলল। সব শুনে চিন্তিত বান্ধবী বলল—

'সব শার্টেই পাখির ইয়ে?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'হুঁ।'

'তা হলে তো ব্যাপার সিরিয়াস। তুই বুঝতে পারছিস না?'

'না, কী?'

'তোর স্বামী অন্য কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে।'

'তুই কীভাবে বুঝলি?'

'এ তো সোজা। নির্ঘাৎ তোর বর প্রতিদিন পার্কে কোনো গাছের নিচে বসে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে... আর পার্কের গাছের পাখিরা...'

স্ত্রীর কাছে ঘটনা তখন পরিষ্কার হয়ে গেল। যাকে বলে মিনারেল জলবৎ তরলং। ব্যাস সে রাতেই বাসায় ঢোকা মাত্র স্ত্রী চার্জ করে বসল—

'দেখি তোমার শার্টটা।'

স্বামী খুশি মনে শার্ট খুলে দিল। তার মনে আছে ছোটবেলায় বাবা অফিস থেকে এলে মা এগিয়ে এসে বাবার খুলে দেওয়া শার্ট আলনায় রেখে লুঙ্গি গামছা এগিয়ে দিতেন। তারপর বাবা গোসল করে এসে দেখতেন চা রেডি। সেই চিরন্তন শ্বাশত ভালবাসা এতদিন পর পুরোনো স্টাইলে ফিরে এসেছে তা হলে। কিন্তু হঠাৎ স্ত্রীর হুঙ্কার।

'এই তো পেয়েছি।'

'কী পেয়েছ?'

'আজকেও পাখির ইয়ে তোমার শার্টে। বলো আজ কোন পার্কে প্রেম করতে গিয়েছিলে? মেয়েটা কে?'

স্বামী তো হতভম্ব! স্বামী যতই বোঝানোর চেষ্টা করে সে প্রেম তো দূরে পার্কেই যায় নি গত দুই বছরে। পাখি বেছে বেছে তার শার্টে ইয়ে করলে তার কী দোষ, কিন্তু স্ত্রী বুঝলে তো! শেষ পর্যন্ত রক্ষা হল স্ত্রীর ঐ অতি বুদ্ধিমান বান্ধবীকে তার স্বামী যদি বোঝাতে পারে যে আসলেই প্রেম করছে না অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তা হলে সে ক্ষমা করবে।

তো একদিন সেই স্বামী তার স্ত্রীর বান্ধবীকে নিয়ে সে যে আসলেই প্রেম করছে না বোঝাতে গেল রমনা রেস্তরাঁয়... তারপর রমনা পার্কে... ঘটনাক্রমে দিনটা ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি (যদিও যখনকার ঘটনা তখনো 'ভ্যালেন্টাইন ডে' ব্যাপারটা বাংলাদেশে শুরু হয় নি)। তারপর আর কি মানুষ খাল কেটে কুমির আনে। আর আমাদের সন্দেহপ্রবণ স্ত্রী খাল কেটে হাঙর আনল যেন। স্বামী আগে পার্কে যেত না, এখন যায় সঙ্গে থাকে স্ত্রীর সেই ঘনিষ্ট বান্ধবী। তবে তারা গাছতলায় বসে না। রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। পাখিদের বিশ্বাস কি!

❑

ভ্যালেন্টাইন ডে, মানে বিশ্ব ভালবাসা দিবসে আসলে ঠিক কী হয়? পুরাতন প্রেম ধুয়ে মুছে যায়? নতুন প্রেম আসে? নাকি ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বোটল? আমি একজনকে চিনি যার কাছে প্রেম ভালবাসা মানেই সুচিত্রা-উত্তম। তার বুকের গভীরে সুচিত্রা-উত্তম যেন ভালবাসার 'আইকন' হয়ে আইকা দিয়ে পারমানেন্টলি সাঁটা! তো সেই সুচিত্রা-উত্তম আইকন বন্ধু একদিন আমাকে অনুরোধ করল।

'আচ্ছা তুই আজেবাজে এসব কী লিখিস বল তো?'

'আজেবাজে না 'আবজাব'।'

'ঐ হল, যাহা বাহান্না তাহাই তেপ্পান্ন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও আমারবই.কম

'ওটাও হল না, ওটা হবে যাহা বাহান্না তাহাই চুয়ান্ন নহে।'

'স্টুপিড, আমি তোমার বইয়ের নামের বিজ্ঞাপনে নামি নি, আমি বলতে চাচ্ছি একটা ভালো কিছু লেখ—

'যেমন?'

'ভালবাসা নিয়ে ভীষণ রোমান্টিক কিছু।'

'তাও আছে ভ্যালেন্টাইন জোক্স।'

'আরে ধুৎ, আমি বলছি সুচিত্রা-উত্তমকে নিয়ে নতুন করে কিছু লেখা যায় না? যেমন ধর তারা এ প্রজন্মের তরুণ-তরুণীর কাছে এল...'

তো সেই বন্ধুর আইডিয়াটা নিয়ে এভাবে লিখলে কেমন হয়? যেমন ধরুন...

ঢাকা এয়ারপোর্টে উত্তম-সুচিত্রা নেমে হতাশ হলেন। তাঁদের রিসিভ করতে কেউ নেই। উল্টো কয়েকটা সিএনজি ড্রাইভার তাঁদের ব্যাগ ল্যাগেজ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। উত্তম অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন ওদের। সুচিত্রা বললেন—

'আশ্চর্য তুমি প্রেসকে জানাও নি?'

'জানিয়েছি তো... কিন্তু কেউ তো এল না?'

'তখনি বলেছিলাম, ঢাকায় এসে কাজ নেই। তোমার আমার সেই ক্রেজ এখন আর এখানে নেই...'

'আবে না আছে, এখনো অনেক ফটো স্টুডিওতে নাকি তোমার আমার যুগল ছবি ঝুলছে... আমি শুনেছি।'

'আরে রাখ, এখন "টিন এজ প্রেমের" প্যাকেজ নাটকের যুগ চলছে, তোমাব আমার মতো বুড়োবুড়ির...'

এ সময় এক তরুণ ছুটে এল। হাতে একটা খাতার মতো কিছু।

'আপনি সুচিত্রা সেন না?'

'হ্যাঁ।'

উত্তম কুমার ফিসফিস করে বললেন, 'দেখলে তো ঠিক চিনে ফেলেছে, এখন অটোগ্রাফ দিতে দিতে...।' সুচিত্রা সেন বললেন, 'দেখুন আমার কাছে কলম নেই।'

'আরে রাখুন কলম, আপনি আন্ডার অ্যারেস্ট। আপনার ব্যাগে ইন্ডিয়ান শাড়ি পাওয়া গেছে।'

'আমি তো ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান শাড়িই থাকবে।'

'ও সব বুঝি না... চলুন...'

তো এয়ারপোর্টের ঐ ঝামেলা মিটিয়ে উত্তম-সুচিত্রা এসে নামলেন রমনা রেস্তরাঁয়।

'আমরা কোনো হোটেলে না উঠে রমনা রেস্তরাঁয় কেন?' সুচিত্রা সেন জানতে চাইলেন।

'এখানেই আমি একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি।'

'প্রেস কনফারেন্স কেন?'

'আরে আমরা দুই বিখ্যাত জুটি ঢাকায় এলাম, আর এমন একটা দিনে এলাম ভ্যালেন্টাইন ডে তে... বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা?'

'আর বোঝাবুঝি, আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না এয়ারপোর্টে কেউ রিসিভ করল না, উল্টো কত ঝামেলা... এখানেও তো কাউকে দেখছি না।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'আসবে আসবে দেখবে পুরো ঢাকা শহর ভেঙে পড়েছে এখানে। পুলিশ আসবে, বি.ডি.আর. আসবে আমাদের প্রোটেক্ট করতে...'

'ঐ যে পুলিশ এসে গেছে।'

বলতে না বলতেই দুজন কনস্টেবল এসে উত্তম-সুচিত্রার পাশে দাঁড়াল।

'আপনাদের থানায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'আপনাদের আপত্তিকর ভঙ্গিতে পার্কে বসে থাকতে দেখেছি।'

'কী বলছেন আপনারা? আমরা দুজন দুবেঞ্চে বসে আছি... আর তা ছাড়া আমরা কে জানেন, আমরা উত্তম-সুচিত্রা... প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে এখনো ভালবাসার আইকন হয়ে...'

'কী আইগন বাইগন শুরু করেছেন, জলদি থানায় চলুন। উপর থেকে নির্দেশ আছে... আজ ভ্যালেন্টাইন ডে। পার্ক থেকে কম করে হলেও একশ জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা আপত্তিকর আচরণের অপরাধে লক আপে ঢুকাতে হবে... আপনাদের দিয়েই শুরু করলাম আর কি।'

হাজতের ভিতর সুচিত্রা সেন কাঁদছেন। আর উত্তম কুমার তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য! থানার ওসি হঠাৎ খেয়াল করল 'আরে এরা তো সেই বিখ্যাত উত্তম-সুচিত্রা!' ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে সারা ঢাকা শহর খবর হয়ে গেল। দলে দলে ছুটে এলেন সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, ভক্তকুল, সিনেমার লোকজন। এন টিভি, চ্যানেল আই, এটিএন সবাই এল, এল না শুধু বিটিভি (তারা তখন ক্ষমতাসীন এক নেতার শালার বউভাতের অনুষ্ঠান কাভার করছিল)।

ঝপাঝপ ছবি উঠতে লাগল। পুলিশ বিভাগের লোকজন লজ্জায় গা ঢাকা দিয়েছে। সেই দুই কনস্টেবল সাসপেন্ড। খবর পেয়ে আমার 'উত্তম-সুচিত্রা আইকন বন্ধু' আমাকে ফোন দিল—

'শুনেছিস? উত্তম-সুচিত্রা রমনা থানার হাজতে, লাখ লাখ মানুষ জড়ো হয়েছে ওখানে... আমিও যাচ্ছি, তুই চলে আয়। আর আরেকটা কথা উত্তম-সুচিত্রা নিয়ে তোকে লিখতে বলেছিলাম, তার দরকার নেই, ওটা আমিই লিখব।'

তারপরের ঘটনা মর্মান্তিক। চর্ম চক্ষে উত্তম-সুচিত্রাকে দেখে উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে বন্ধুটির হার্ট অ্যাটাক হল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! পরদিন প্রথম আলোতে বক্স নিউজ 'হাজতে উত্তম-সুচিত্রাকে এক নজর দেখতে গিয়ে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে একজনের মৃত্যু।'

প্লেনে ফেরার সময় উত্তম কুমার হাসিমুখে সুচিত্রাকে বললেন—

'দেখলে তো ঢাকার সবাই এখনো কেমন পাগল আমাদের জন্য?'

'হ্যাঁ দেখলাম, ভালোই লাগল এখানো আমরা ওদের কাছে ভালবাসার আইকন হয়ে আছি।'

'তবে মন খারাপ হচ্ছে ঐ লোকটার জন্য, যে আমাদের দেখতে এসে ভিড়ের চাপে মারা গেল।'

'হ্যাঁ, সত্যি বেচারা!'

লেখাটা আরেকটু বড় করা যেত, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাকে লেখা বন্ধ করে যেতে হচ্ছে সেই বন্ধুর কুলখানিতে! খোদ হাফেজ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও৬আমারবই.কম

❑

বছরের শুরুতেই ভর্তির সিজন শুরু হয়ে যায়। বাচ্চা নিয়ে গার্জেনদের দৌড়াদৌড়ি, টেনশন সব মিলিয়ে যাকে বলে হচপচ অবস্থা। অবশ্য যাদের বাচ্চা একেবারেই ছোট প্লে গ্রুপে ভর্তি হয় তাদের টেনশন কিছু কম। প্লে গ্রুপে কোনো ভর্তি পরীক্ষার ঝামেলা নেই, শুধু বাচ্চা না কাঁদলেই হল। ওখানে ভর্তি হওয়ার প্রথম এবং একমাত্র শর্ত বাচ্চা মা ছাড়া থাকতে পারে কিনা এবং কাঁদে কিনা।

কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেনে অবশ্য শিক্ষকরা আরো ছাড় দেন। প্রথম প্রথম প্লে গ্রুপে মাকেও বাচ্চার সঙ্গে থাকতে দেন। তারপর আস্তে আস্তে বাচ্চা অভ্যস্ত হলে মা সরে পড়েন।

কিন্তু একবার সমস্যা হল, এক মা কিছুতেই তার বাচ্চাকে ক্লাসে রেখে বেরুতে পারেন না। বাচ্চা শক্ত করে মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকে। প্রায় ছ'মাস চলে গেল, সব মাই তার বাচ্চাকে ক্লাসে রেখে সরে পড়তে পারলেও ঐ মা কিছুতেই পারছেন না। স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছুটা বিরক্ত।

শেষ পর্যন্ত ঐ মাকে স্কুল থেকে একসেট স্কুল ড্রেস দেওয়া হল এবং মাকে বলা হল, এখন থেকে তাকেও স্কুল ড্রেস পরে ক্লাসে আসতে হবে এবং ভর্তি ফি দিয়ে রীতিমতো ক্লাস করতে হবে। নইলে স্কুলের শৃংখলা ব্যাহত হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ঐ মা কী করেছিলেন জানি না। তবে আরেক মাকে জানি তারও একই অবস্থা। তবে তিনি স্কুল থেকে স্কুল ড্রেস পাওয়ার আগেই নিজেই প্রস্তাব করেন প্লে গ্রুপের টিচার হওয়ার।

স্কুল কর্তৃপক্ষ সানন্দে রাজি হয়ে গেল। বিনা বেতনে এই বাজারে টিচার পাওয়া তাইবা মন্দ কি!

❑

ঢাকা শহরে নিয়মিত গাড়ি চালায় এমন একজন আমাকে বলেছিল, 'এই শহরে গাড়ি চাপা দিয়ে মানুষ মেরে ফেললেও সামলানো সম্ভব। কিন্তু অন্যের গাড়িতে ঘষা লাগানো বা ধাক্কা লাগানো মানে আপনার খবর আছে!'

আমরা বরং একটা গল্প শুনি। হঠাৎ বড়লোক হয়েছে এক লোক। ধুপ করে একটা গাড়ি কিনে ফেলল। তাও আবার যে সে গাড়ি নয় মার্সিডিজ বেঞ্জ। তো মার্সিডিজের মালিক গাড়িতে চড়ে বেরিয়েছে প্রথম দিন।

'আচ্ছা ড্রাইভার, গাড়ির সামনের ঐ গোল ওটা কী?'

মার্সিডিজের সামনের গোল মনোগ্রামটা দেখিয়ে জানতে চাইল নতুন গাড়ির মালিক। ড্রাইভারটা ছিল ধুরন্ধর। সে বলল—

'স্যার বন্দুকের নলের সামনে নিশানা করার জন্য যেমন মাছি থাকে এ গাড়ির মাছি এইটা।'

'তাই নাকি?'

'জি স্যার, যেমন ধরেন আপনে কেউরে চাপা দিবেন ঐটা দিয়ে টার্গেট করে এগুবেন... দাঁড়ান স্যার আপনেরে দেখাই...'

ড্রাইভার রাস্তা পার হচ্ছে এমন একটা লোককে টার্গেট করে এগুতে লাগল। তার প্লান হচ্ছে শেষ মুহূর্তে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যাবে, বোকা মালিকের সঙ্গে একটু মজা করা আর কি!


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তো ড্রাইভার গাড়ির মাছি টার্গেট করে দ্রুত এগুচ্ছে, শেষ মুহূর্তে লোকটাকে বাঁচিয়ে গাড়ি বাঁয়ে কাটিয়ে নিল। কিন্তু কী আশ্চর্য ধাম করে একটা শব্দ হল আর রাস্তার লোকটা ছিটকে পড়ল ফুটপাতে। ভয়াবহ দুর্ঘটনা!

'এটা কী হল?' হতভম্ব ড্রাইভার।

'যখন দেখলাম তুমি মিস করলে, সঙ্গে সঙ্গে আমি দরজা খুলে ব্যাটাকে এক বাড়িতে...' নির্বিকার মালিকের উত্তর।

মসজিদের মাইক যেমন খাঁচার ভিতর থাকে সে রকম অনেক গাড়ির ব্যাক মিররও আজকাল চেইন দিয়ে বাঁধা থাকে। কারণ আর কিছু নয়, গাড়ির পার্টস চুরি যে আজকাল একটা মহান শিল্প হয়ে উঠেছে। এই নিয়ে একটা সত্য ঘটনা...

আমার এক গাড়িওয়ালা বন্ধু নিউ মার্কেটের গেটে গাড়ি পার্ক করে কেনাকাটা করতে গেল ভিতরে। বেশি নয় আধা ঘণ্টা পরে এসে দেখে এক লুঙ্গি পরা তরুণ তার গাড়ির একটা চাকা প্রায় খুলে ফেলেছে শৈল্পিক দ্রুততায়, মানে শেষ নাটটা সে তখন খুলছে। বন্ধুটি যে পিছে এসে দাঁড়িয়েছে শিল্পী তখনো টের পায় নি। বন্ধুটি আস্তে করে বলল—

'গাড়িটা আমার। যে কটা নাট খুলছিস টাইট করে লাগা, তোকে কিচ্ছু বলব না।'

'জি স্যার।' ঘামতে ঘামতে পুনরায় নাটবল্টু লাগাতে লাগল শিল্পী। পরে বন্ধুটি ঐ চাকাটা তো ঠিকমতো লাগিয়ে নিলই গাড়ির অন্য তিনটি চাকার নাট বল্টুও আচ্ছা মতো সেট করিয়ে নিল, শুধু তাই নয়, গাড়ির খুঁটিনাটি কিছু সমস্যাও ঠিকঠাক করে নিল ঐ অটোমোবাইল শিল্পীকে দিয়ে।

এ ঘটনা গাড়িওয়ালা বন্ধু তার আরেক গাড়িওয়ালা বন্ধুকে জানাল যে, সে কী কায়দায় গাড়ি ফ্রি সার্ভিসিং করিয়ে নিয়েছে। শুনে দ্বিতীয় গাড়িওয়ালা একদিন গিয়ে নিউ মার্কেটের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি পার্ক করল; এবং নিউমার্কেটের ভিতর ঢুকে গেল আধা ঘণ্টার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় গাড়িওয়ালার ঘড়ি ছিল বিশ মিনিট লেট! সে আধা ঘণ্টা পর এসে দেখে তার গাড়ি জায়গা মতোই আছে তবে চারটি চাকা হাওয়া! পুরো গাড়ি চার চারে ষোলটি থান ইটের উপর দাঁড়িয়ে আছে! (প্রতিটি চাকার নিচে চারটি করে ইট)

কাজেই প্রিয় পাঠক যারা গাড়ি কিনবেন ভাবছেন তাঁদের জন্য সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, 'গাড়ির স্পেয়ার চাকা একটি নয় চারটি রাখুন'।

❑

আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর মানুষ আছেন। এক শ্রেণী হচ্ছে এরা ঘুষ খায় এবং কাজ করে দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এরা ঘুষ খায় না এবং কাজও করে না। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এরা ঘুষও খায় কাজও করে না! এখন আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন শ্রেণীটি উত্তম। দ্বিতীয় শ্রেণীটি সৎ শ্রেণী, এরা ঘুষ খায় না কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যেহেতু ঘুষ খায় না অতএব কাজও করে না। আবার এই শ্রেণীটি সততার অহঙ্কারে সব সময় নাক উঁচু করে ঘুরে বেড়ায় আর আশপাশে ঘুষখোরদের গালিগালাজ করে চব্বিশ ঘণ্টা। এটাই যেন তার কাজ। তৃতীয় শ্রেণীটি সবচেয়ে ওয়ার্স্ট, ঘুষ খায় কিন্তু কাজও করে না। দেখা যাচ্ছে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় উত্তম শ্রেণী হচ্ছে যে ঘুষ খায় এবং কাজও করে।

তার মানে কী দাঁড়াল, 'ঘুষ' ব্যাপারটা এখন আমাদের জীবনে একটা গ্রহণযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে আর কোনো রাখঢাক নেই। ঘুষ যে খায় সে তো খায়ই। কিন্তু ঘুষ দেওয়াটা একটা বিষয়। ঘুষ দেওয়াটা একটা শিল্পকলা বিশেষ, সবাই পারে না। তো এরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও~ আমারবই.কম

এক লোক জীবনে কখনো ঘুষ দেয় নি। ঘুষ দেওয়ার অভিজ্ঞতাও নেই কিন্তু টেন্ডার দিয়ে বড় কাজ পেয়েছে, এখন ফাইল ছুটাতে গেল একদিন সরকারি অফিসে।

'ভাই সাহেব, আমার ফাইলটা কি এসেছে?'

'আরে ভাই, ফাইল কি আর এমনে এমনে আসে? চাকা লাগাইতে হয়! চাকা লাগানোর ব্যবস্থা করেন যান।'

লোকটি যেহেতু কখনো ঘুষ দেয় নি কাজেই ঘুষ চাওয়ার ভাষাও বুঝতে পারে নি। ফাইলে চাকা লাগানোর কথা শুনে সে খুশি হয়ে ফেরত গেল। খুশি হওয়ার কারণ তার আবার বল-বিয়ারিংয়ের ব্যবসা। সে বল-বিয়ারিং লাগানো চারটা চাকা নিয়ে পরদিন ঐ ঘুষখোরের টেবিলে রাখল।

'এসব কী?'

'ঐ যে কাল ফাইলে চাকা লাগানোর কথা বললেন, চাকা নিয়ে এসেছি!'

এ তো গেল বোকা অনভিজ্ঞ ঘুষদাতার গল্প, চালাক ঘুষদাতার গল্পও কম ইন্টারেস্টিং নয়।

যথারীতি চালাক ঘুষদাতা এসেছে ফাইলের খোঁজে। কর্মকর্তা মেঘস্বরে বলল, 'কী ফাইলের ব্যাপারে এসেছেন?'

'না স্যার ছি ছি' জিভে কামড় দিল চালাক ঘুষদাতা। 'একটা দৃশ্য দেখে স্যার মনটা খারাপ হল তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'কী দৃশ্য?'

'দেখলাম স্যার আপনার মিসেস বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন রিকশা করে... বুকটা, স্যার, ভেঙে গেল। একটা গাড়ি...'

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্মকর্তা। 'আর গাড়ি!'

'কী বলছেন স্যার? আপনার জন্য একটা ইকনোমিক গাড়ি দেখে এসেছি তেল কম খাবে।'

কর্মকর্তা তখন চুপ। চোখ আধাবোজা কল্পনায় গাড়ির পিছনের সিটে বসে গা এলিয়ে দিয়েছেন... একটা হাত কখন যে চলে গেছে ড্রয়ারে... সইয়ের অপেক্ষায় মূল্যবান ফাইলটার দিকে নিজেও জানেন না। ততক্ষণে চালাক ঘুষদাতা উঠে দাঁড়িয়েছে।

'স্যার আজ আসি, আগে একটা ভালো ড্রাইভারের খোঁজ করি।'

'বসেন বসেন চা খেয়ে যান। যাওয়ার সময় ফাইলটাও নিয়ে যেয়েন!'

❑

ঢাকা শহরে প্রায় প্রতিদিনই নানা রকম গবেষণা, রিসার্চ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে থাকে। তবে যেটা নিয়ে রিসার্চ বা সেমিনার হওয়া উচিত... মানে হওয়া বিশেষ জরুরি সেটা হচ্ছে না। সেটা কোনটা? সেটা হচ্ছে ঢাকা শহরে কোন বাস কোন দিকে যায়? কেন যায়, আদৌ যায় কিনা, এর ওপর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপক গবেষণা। কেন এই গবেষণা আবশ্যক? আসলে রাস্তায় নামলেই আমার মনে হয় প্রায় প্রতিদিনই নিত্যনতুন বাস সার্ভিস নামছে! কোনোটা ইন্টার ডিস্ট্রিক কোনোটা বা সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক... মানে সেন্টারের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে সব সার্ভিসের সেরা সার্ভিস বোধ হয় এখন পর্যন্ত বিআরটিসির দোতলা ভলভো বাস সার্ভিস। তার আগে বরং ভলভো বাসের একটা গল্প বলে নেই... বেসড অন এ ট্রু স্টোরি...



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অফিস টাইমের পরপর ভলভো বাস ছুটছে মিরপুর থেকে মতিঝিলের দিকে। বাস মোটামুটি খালি। নিচতলায় সব ডাবল সিটেই একজন করে বসা। বেশিরভাগই পুরুষ যাত্রী। এর মধ্যে এক মহিলা উঠলেন বাচ্চা নিয়ে। এগিয়ে গেলেন একজন স্যুটেড-বুটেড পুরুষ যাত্রীর দিকে।

'আপনি কি দয়া করে সামনের সিটটায় যাবেন?'

'কেন বলুন তো।' সাদা স্যুটে সুসজ্জিত স্মার্ট পুরুষ যাত্রী জানতে চাইলেন।

'তা হলে আমি আর আমার বাচ্চা পাশাপাশি এক সিটে বসতে পারতাম।'

'আরে আপনার বাচ্চা তো আমার বাচ্চার মতোই... ও তো আমার পাশেই বসতে পারে। সমস্যা কী? আস বাবু... বস আমার পাশে বস।'

সফেদ স্যুটেড-বুটেড পুরুষ যাত্রীর আন্তরিক আহ্বানে বাচ্চাটি বাধ্য হল তার পাশে বসতে আর মহিলা বসলেন ঠিক পিছনের সিটেই আরেকজন পুরুষ যাত্রীর পাশে। বাস চলছে। আচমকা হর হর শব্দ! তাকিয়ে দেখি বাচ্চাটি বমি করে তার পাশের সাদা স্যুট-প্যান্ট ভাসিয়ে দিয়েছে। সাদা স্যুট... থুড়ি তখন হলুদ... স্যুটেড-বুটেড লোকটির টিকিট ছিল বোধ হয় মতিঝিলের কিন্তু তিনি হুড়মুড় করে নামলেন ফার্মগেটে! বাসে তখন গবেষণা শুরু হয়ে গেছে বমির ঐ হলুদ দাগ সাদা স্যুটের ওপর থেকে উঠবে কি উঠবে না! একদল বলছে উঠবে আরেক দল এর ঘোর বিরোধী... মানে উঠবে না!

একেক বাসে যেন একেক ধরনের গল্প। এবার মেট্রো লিংক বাসের ঘটনা। এটা সম্ভবত মোহাম্মদপুর-মতিঝিলের বাস। তো মেট্রো লিংকের একটি বাস শংকর স্টপেজে থামতেই বেশ একটা চেঁচামেচি শুরু হল। কী ব্যাপার? এক লোক মাল নিয়ে উঠবে কিন্তু কন্ডাক্টর উঠতে দেবে না। এক ঢাকাইয়া মুক্কো জোয়ান মালবাহী যাত্রীর সমর্থন দিল।

'ঐ কেলা মাল লয়া উঠবার পারব না কেলা? দশ কেজি পর্যন্ত মাল উঠবার পারব।' আরো কয়েকজন তাকে সমর্থন দিল সঙ্গে সঙ্গে। পেছন থেকে আরেকজন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। বোঝা গেল তিনিও খাস ঢাকাইয়া (যদ্দূর মনে হল যে কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঢাকাইয়ারাই যেন বেশি সোচ্চার)।

'আবে ঐ... মাল না উঠাইলে গাড়ি রাস্তায় নামাইছস ক্যা? তোর মালিকরে কইস ঘরের মধ্যে বাস চালাইতে।'

এ রকম নানান সব মন্তব্য আসতে লাগল। এর মধ্যে আবার গবেষণা শুরু হয়ে গেল কত কেজি পর্যন্ত মাল বাসে উঠানো যায়। কেউ বলল, বিশ কেজি... কেউ ত্রিশ... কেউ চল্লিশ... এইভাবে বাড়তে বাড়তে দেড় টনে গিয়ে ঠেকল! ততক্ষণে বাস ড্রাইভার ব্রেক করে বাস থামিয়ে ফেলেছে!

'কী হল বাস থামল কেন?'

'এত ওজন লয়া এই গাড়ি চলব না। গাড়ি ওভারলোড!' বলল বাস ড্রাইভার।

বাস সংক্রান্ত সবচেয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল বোধহয় আমার! সে সময় মিরপুর লাইনে এসি বাস চলত। ঝকঝকে নতুন বাস। ভাড়া একটু বেশি। যাত্রীরাও সব টিপটপ স্মার্ট! আমিই কেবল আনস্মার্ট যাত্রী।

একদিন তিন কেজি আপেলের একটা পোঁটলা নিয়ে উঠলাম। একদম শেষ সিটে বসে পোঁটলাটা রাখলাম পায়ের কাছে। বাস চলছে হঠাৎ এক সময় তাকিয়ে দেখি আমার আপেলের ঠোঙা শূন্য! গেল কই সব আপেল? এত দাম দিয়ে কিনলাম। ব্যাপার কী? ব্যাপার আর কিছুই না আপেলের পোঁটলা মানে ঠোঙা কাত হয়ে সব আপেল এসি বাসের মেঝেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গড়াগড়ি খাচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাস যখন ছুটছে তখন আপেলগুলো সব এক সঙ্গে আমার দিকে তীর বেগে ছুটে আসছে! আবার বাস যখন স্পিড কমায় বা ব্রেক কষে সব আপেল এক সঙ্গে তীর বেগে ছুটে যায় সামনের দিকে। নিউটনের গতি জড়তার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শুরু হয়েছে যেন। বাসের যাত্রীদের দৃষ্টি সব জানালা দিয়ে বাইরে। ফলে কেউ বাসের মেঝেতে আপেলগুলোর এই রিলে রেস খেয়াল করছে না। আমি করলাম কি বাসের স্পিড বাড়তেই তীর বেগে ছুটে আসা আপেল একটা দুটো করে ঠোঙায় ভরতে লাগলাম। অনেকটা টেস্ট ম্যাচের উইকেট কিপারের মতোই যেন। আবার বাস ব্রেক করা মাত্র সব আপেল ছুটে যাচ্ছিল সামনের দিকে... আবার স্পিড... আবার আমার কাছে... এইভাবে করতে করতে যখন শেষ স্টপেজে এলাম (সেখানেই আমার বাসা) তখন আমার আপেল সংগ্রহ অভিযান মোটামুটি সমাপ্ত। আমি হৃষ্টচিত্তে নেমে যাচ্ছি... যাক সব কটা আপেল যাত্রীদের অলক্ষ্যে উদ্ধার করা গেছে। হঠাৎ শুনি বাসের গেট দিয়ে নামতে নামতে এক বাচ্চা তার বাবাকে বলছে—

'বাবা আপেল দুটো যে পেলাম কী করব?' বাবা ফিসফিস করলেন, 'গাধা পকেটে ঢোকা।'

বুঝলাম দুটো আপেল উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। বাস থেকে নেমে রিকশা নিলাম। হেঁটেই যাওয়া যায়, হাতে পোঁটলা দেখে রিকশায় উঠলাম। রিকশাওয়ালা তখন ঐ থেমে থাকা এসি বাসের সামনে দিয়ে রিকশা ঘুরিয়ে আমার বাসার দিকে এগুচ্ছে। দেখি বাসের ড্রাইভার আর কন্ডাক্টার দুজনের হাতে আরো দুটো আপেল। কন্ডাক্টার মোটামুটি কামড় বসিয়ে দিয়েছে। বুঝলাম আরো দুটো আপেল উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি! একুনে চারটা মিসিং!

এবার সাধারণ মিনিবাসের গল্পে আসি। এই বাসের সবচেয়ে কমন গল্প হচ্ছে সেই যে এক যাত্রী মাথা সোজা করে বাসের ভিতর দাঁড়াতে পারছে না বাধ্য হয়ে বলে উঠলেন, 'বাঙালি জাতিকে এরা আর কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেবে না।'

মিনিবাসের একটা বড় মুশকিল হচ্ছে এ বাস যাত্রীরা স্টপেজ ছাড়া যেখানে সেখানে থামিয়ে নেমে পড়ে। তো একবার এক যাত্রী সম্ভবত তার বাসার গলির মুখে বাস থামাতে বলল, ড্রাইভারও থামাল। লোকটা নামতে নামতে বিরক্তি প্রকাশ করল—

'এই কই রাখলা গলিডার মাঝখানে রাখলে না সুবিধা হইত।' ড্রাইভার মধুর হাস্যে বলল, 'তাইলে আবার উইঠা বসেন, আপনেরে বাসায় নামাইয়া দিয়া আসি ঐটাই তো বাকি আছে!'

দেশী বাস থাক। বিদেশী বাসের গল্প দিয়ে শেষ করি। এটাও বেসড অন এ ট্রু স্টোরি! পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ করি সবচাইতে বিতর্কিত বাস সার্ভিস হচ্ছে ইংল্যান্ডের স্ট্যাফোর্ডশায়ারের 'টাইম সার্ভিস' বাস। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সময়ের ব্যাপারে তারা খুবই সিরিয়াস। টাইম ধরে বাস ছাড়ে এবং টাইম ধরে বাস গন্তব্যে পৌছে। এই সার্ভিসের কারণে তারা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অচিরেই দেখা যায় টাইম টেবল রক্ষা করার জন্য তারা আর যাত্রী উঠাতে পারছে না। যাত্রী উঠাতে তাদের যে সময় ব্যয় হয় তাতে করে তাদের টাইম টেবল রক্ষা করা সম্ভব নয়। ফলে খুব শিগগির দেখা গেল 'টাইম সার্ভিস' বাসস্টপে সারিবদ্ধ হয়ে যাত্রীরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আর তাদের চোখের সামনে দিয়ে হুশহাশ করে যাত্রীহীন খালি বাস চলে যাচ্ছে আর আসছে! আসছে আর যাচ্ছে!

 দুনিয়ার পাঠক এক্ক হও! আমারবই.কম

❑

কদিন আগে সারা দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেল লাগাতার শৈত্যপ্রবাহ। সেই প্রবাহে একটা মজার খবর পড়লাম 'সাপ্তাহিক যায় যায় দিন'-এ। নারায়াণগঞ্জের কয়েকজন তরুণ মিলে 'ওম বিক্রয় কেন্দ্র' খুলেছে। প্রতি মিনিট দুই টাকা। তারা কিছু লাকড়ি জোগাড় করে সব সময় আগুন জ্বেলে রাখে। দুই টাকা দিলে আপনি এক মিনিট 'ওম' কিনতে পারেন মানে শরীর গরম করতে পারেন এ আগুনের পাশে বসে। তো তাদের ব্যবসা নাকি রমরমা। পথচারীরা বেশ সাড়া দিয়েছে তাদের এই ব্যবসায়। লাকড়ি কিনতে কিনতে নাকি তাদের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা। প্রতি মিনিট দু'টাকার জায়গায় তারা তিন টাকা করবে কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে!

এই খবর পড়ে আরেক বেকার ছেলে কম্বল নিয়ে ওম বিক্রির চিন্তাভাবনা করছে। তার কাছে নাকি এমন এক বিদেশী কম্বল আছে গায়ে দিলে গরমের চোটে ঘাম ছুটে যায়! সে ভাবছে ফুটপাতে ঐ কম্বল নিয়ে বসে যাবে। এক সঙ্গে চারজন ঐ কম্বলের নিচে ওম সংগ্রহ করতে পারবে। তো শৈত্য প্রবাহ চলে যাবার কিছুদিন পর সেই কম্বলের মালিকের সঙ্গে দেখা।

'কী তোমার কম্বলের ওম ব্যবসার খবর কী?'

'খবর খারাপ।'

'কীরকম?'

'কম্বল নেই।' বিষণ্ন মুখে সে জানায়।

'কেন কম্বল হাইজ্যাক হয়ে গেছে?'

'না হাইজ্যাক হয় নি।'

'তা হলে?'

'আসলে কম্বলের ব্যবসা প্রথম দিকে ভালোই হচ্ছিল, পরে দেখি সবাই বসে বসে কম্বল থেকে লোম বাছে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি লোম বাছতে বাছতে আমার কম্বল উজাড়! মানে কম্বল নাই!'

ঐ প্রবল শৈত্য প্রবাহের সময় আরেক তরুণকে পেয়েছিলাম সে ফিনফিনে এক শার্ট পরে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই আশ্চর্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার তোমার ঠাণ্ডা লাগে না?'

'নাহ।'

'কেন?'

'আমার কাছে একটা বিদেশী বই আছে...'

'বই দিয়ে শীত নিবারণ?'

'অনেকটা ঐরকমই... বইটার নাম "সুপার ডুপার এডান্ট জোক্স"। ওটার দুএকটা জোক্স পড়লেই শরীর বেশ গরম থাকে।'

শীত নিয়ে প্রতিযোগিতা হচ্ছে দুজনের মধ্যে। কার এলাকায় কত শীত! একজন বলছে—

'আমার এলাকায় এত শীত যে সামান্য একটু ওমের আশায় শেষ পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজে ঢুকতে হয়।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'আর আমাদের তো আরো খারাপ অবস্থা।'

'কীরকম?'

'দু কানে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয় সব সময়।'

'কেন কানে আগুন কেন?'

'আমরা যখন কথা বলি কথাগুলো পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমে যায় তখন কথা বুঝতে কানের কাছে জ্বলা আগুনে কথাগুলো গলে ঢুকে তখন আমরা বুঝতে পারি!'

❑

'দয়া করে আপনি আমার পিছে পিছে হেঁটে আসবেন না, কারণ আমি আপনাকে পথ দেখাতে পারব না। আমার সামনে দিয়েও হাঁটবেন না, কারণ আমি নেতা হিসেবেও আপনাকে মেনে নিতে পারব না।... বরং আমার পাশাপাশি হাঁটুন, আমি আপনাকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করব' বাক্যটি এক বিখ্যাত 'কোটেশন'। তো এক তরুণের কোটেশনটি ভীষণ পছন্দ হল। প্রায়ই বিভিন্নজনকে সে কোটেশনটি বলে। তো একদিন সে রাস্তা দিয়ে চলেছে তখন সন্ধ্যা। সে খেয়াল করল তার সামনে দিয়ে এক লোক হেঁটে চলেছে। সে বলে উঠল, 'ভাই আমার সামনে দিয়ে হাঁটবেন না, কারণ আমি নিশ্চিত আপনাকে আমি নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারব না।'

সামনের লোকটি কী বুঝল সে একটু থেমে তার পিছে চলে এল এবং পিছে পিছে হেঁটে আসতে লাগল। এবার তরুণ বলে উঠল, 'ভাই আমার পিছনে পিছনে হেঁটে আসবেন না দয়া করে, কারণ আমি আপনাকে সঠিক পথও দেখাতে পারব না!'

পিছনের লোকটি কী বুঝল সে এগিয়ে এসে তার পাশে পাশে প্রায় গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল। তখন তরুণ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আপনি আমার পাশে পাশে হাঁটুন আমি আপনাকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করব...'

শেষ বাক্যটি বলে কোটেশন প্রেমিক যথেষ্ট পুলকিত বোধ করে। পৃথিবীতে বোধ করি এই প্রথম কেউ একটি বিখ্যাত কোটেশনের ফিল্ডওয়ার্ক করল মানে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করল। কিছুক্ষণ পর তরুণটি আবিষ্কার করল তার পাশে হাঁটা লোকটি আর নেই। হয়তো অন্য কোনো গলি দিয়ে চলে গেছে। আর তখনি সে পকেটে হাত দিয়ে দেখে তার মানি ব্যাগটাও নেই!

❑

তিনশ সাংসদের জায়গায় এখন নাকি চারশ পঞ্চাশজন সাংসদ হবে। তা হোক , আমি ব্যক্তিগতভাবে এর পক্ষে। দেশে জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, ছিনতাই বাড়ছে, খুন, রাহাজানি বাড়ছে, ধর্ষণ বাড়ছে, এসিড মারা বাড়ছে, কিডন্যাপিং বাড়ছে, নেশাখোর বাড়ছে, অফিস-আদালতে ঘুষ দেওয়া-নেওয়া বাড়ছে... মোটকথা সবই এখন বাড়তির দিকে... তো সাংসদ বাড়বে না? সাংসদ বাড়লেই জনগণের কী লাভ হবে সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই, তবে টিভির প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর যে লাভ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এই চ্যানেলগুলো প্রায় প্রত্যেকেই তৃতীয় মাত্রা টাইপের অনুষ্ঠান করে থাকে যেখানে দু দলের দু জন সাংসদ ডেকে এনে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। সেই ঝগড়া দর্শক খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে। যদ্দূর জানি এই ধরনের ককফাইট টাইপ অনুষ্ঠানগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়। বিদেশী চ্যানেল 'ডব্লু ডব্লু এফ' মানে রেসলিং অনুষ্ঠান যেমন জনপ্রিয়, দেশের প্রাইভেট চ্যানেলে সাংসদদের ঝগড়া অনুষ্ঠানটিও জনপ্রিয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রেসলিং অনুষ্ঠানটা কিন্তু পাতানো অনুষ্ঠান। মানে সাজানো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনুষ্ঠান। এই রেসলিং খেলায় যে হারে সে নাকি বেশি টাকা পায়। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, এই পুরো অনুষ্ঠানটি সাজানো। তা হলে সাংসদদের অনুষ্ঠানটিও কি সাজানো? না মোটেই না। কিন্তু কদিন আগে 'প্রথম আলো'-তে দেখলাম দুই প্রধান দল বাইরে বাইরে ফাটাফাটি সম্পর্ক থাকলেও ভিতরে ভিতরে তাদের বেয়াই রাজনীতি নাকি খুবই মধুর।

মানে ভিতরে ভিতরে তারা একজন আরেকজনের বেয়াই... ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভাগাভাগি করে নিচ্ছে দিব্যি... শুধু চ্যানেলে মুখোমুখি হলেই ধুন্ধুমার লেগে যাচ্ছে...

যথারীতি এবার একটা গল্প। দুই সাংসদ (কোন দেশের কে জানে!)

'ওহে তোমার এলাকায় তুমি যাওটাও না?'

'যাব না কেন অবশ্যই যাই।'

'শেষ কবে গিয়েছিলে?'

'সেটা বলতে পারব না... তবে পাঁচ বছরে অন্তত একবার যাই।'

'ও বুঝেছি... নির্বাচনের আগে আগে... ক্যাম্পেইন করতে...'

'আরে না সে জন্যে নয়।'

'তা হলে?'

'আমি যে ওই এলাকার লোক তার একটা ছাড়পত্র বের করতে যাই...'

তো ওই দু জন সাংসদের একজনের মৃত্যু হল। সোজা চলে গেল স্বর্গে। স্বর্গে গিয়ে সাংসদ ভদ্রলোক স্বর্গের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করলেন, 'আমি ইহজগতে তো এলাকার লোকজনের জন্য কিছুই করি নি। দয়া করে পরকালে মানে স্বর্গে আমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হোক। আমি তাদের জন্য কিছু করতে চাই।'

'সেটা সম্ভব না।'

'কেন?'

'কারণ আপনার এলাকার লোক সব নরকে।'

'সে কী নরকে তো থাকার কথা আমার। তারা কেন?'

'তারা কোনো ঝুঁকি নেয় নি... পরকালে অন্তত আপনার থেকে দূরে থাকতে চায়।'

তিনশ সাংসদকে বাড়িয়ে চারশ পঞ্চাশ সাংসদ করা হয়েছে শুনে সুশীল সমাজের একজন(!) মন্তব্য করল—

'চারশ পঞ্চাশজন বেশি। কিছু কমানো উচিত।'

'কতজন কমানো উচিত?'

'এই ধরেন অন্তত ত্রিশজন!'

❑

অনেকদিন আগের কথা।

কোরবানির গরুছাগলের হাটে এক লোক গরু কিনতে গেল। দর দাম করে গরু কিনল। কোনো সমস্যা হল না। ছাগল কিনতে গিয়েই সমস্যা শুরু হল। লোক ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাগলের সাইজ এত ছোট কেন?'

'কী কন স্যার ছাগল তো ছাগলের সাইজেই হইব।'

'কিন্তু তোমরা যে সারা শহরে পোস্টারে ছবি ছেপেছ গরু-ছাগলের সাইজ এক রকম?'

লোকটাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। একজন আবার সাইড থেকে বলে বসল, 'ছার এই ছাগলই একটা লয়া যান ফটোস্ট্যাট করে। বড় কুইরা লয়েন।' ব্যস ঘৃতে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রথমে পেট্রল পড়ল তারপর অগ্নিসংযোগ হল। লোকটি এবার ষাঁড়ের মতো না চেঁচিয়ে সিংহের মতো গর্জন করে উঠল, 'কোন শালা এই কথা বলল?'

'দুলাভাই আমি কইছি।'

এবার ভিড়ের মধ্যে আরেকজন আওয়াজ দিল। লেগে গেল বিরাট হাউকাট!

উপরের এই ঘটনা শুনে মনে হতে পারে এটা বোধ হয় বানোয়াট গল্পো। না, বানোয়াট নয়। ৮৫% সত্যি!

আমাদের এক বন্ধু আছে আমরা তাকে আড়ালে ডাকি 'সমস্যা সবুর' কারণ তার হবি হচ্ছে খামোকা খামোকা সমস্যা সৃষ্টি করা। বহু আগে ঢাকা কলেজের সামনে যখন চিটাগাং রেস্টুরেন্ট ছিল তখন সেখানে একটা বিশাল সাইনবোর্ড ঝুলত। যার একদিকে ছাগলের ছবি আরেক দিকে ছাগলের সমান মুরগির ছবি। তো আমাদের 'সমস্যা সবুর' মানে সবুর হোসেন একদিন ঐ রেস্টুরেন্টে মুরগির রোস্টের অর্ডার দিয়ে মুরগির সাইজ দেখে গরুর হাটের মতো হাউকাউ লাগিয়ে দিয়েছিল।

'মুরগির সাইজ এত ছোট কেন?'

'মুরগি তো মুরগির সাইজেই হইব।'

'তবে যে বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলাইছ মুরগি আর ছাগলের সাইজ সমান?'

তবে সেবার চিটাগাং রেস্টুরেন্টে সমস্যা খুব বেশিদূর গড়ায় নি। ঢাকা কলেজের কয়েকজন বিচক্ষণ ছাত্র পাশের টেবিলেই চা খাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বেশ স্বাস্থ্যবান তরুণ, সে উঠে এসে সবুর হোসেনকে ঘাড় ধরে রেস্টুরেন্টের বাইরে ছুড়ে দিয়েছিল।

'সবুরে মেওয়া ফলে' এই বিখ্যাত বাংলা প্রবাদটি আমাদের সবুর হোসেনের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। সে মোটেই সবুর করত না... নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করত। এবং আমাদের ঝামেলায় ফেলত। শেষমেশ আমরা বন্ধুরা পরামর্শ করে ঠিক করি এই 'প্রতিভা' দেশে থাকলেই বিপদ। তাকে আমরা নানাভাবে উৎসাহিত করে বিদেশে পাঠিয়ে দেই। সে এখন সুদূর সাইপ্রাসে বসে নির্ঘাৎ নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে মাঝে মাঝে আমাদের বেয়ারিং চিঠি পাঠায়! যদিও বিদেশ থেকে বেয়ারিং চিঠি আসার কথা না কিন্তু সে এমন এক কায়দায় চিঠি লিখে যে আমাদের 'সমস্যা সবুর মেইল ট্যাক্স' দিয়ে চিঠি ছাড়াতে হয়!

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে সে এক বিদেশিনীকে বিয়ে করে সমস্যায় ফেলেছে। এবং গফুর হোসেন নামে নতুন এক ক্ষুদে সমস্যাকে পৃথিবীতে ছাড়পত্র দিয়েছে। তবে তারা এখন পর্যন্ত ভালোই আছে!

❑

যারা লেখালেখি করেন (দলিল লেখক ছাড়া) তাদের ঈদ এলেই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সেটা হচ্ছে,

'কোথায় কোথায় লিখছেন?'

একই প্রশ্ন বদলে যায়, যখন বই মেলা এসে পড়ে 'ক'টা বই বেরুচ্ছে আপনার?' তবে ইদানীং নতুন উপসর্গ জুটেছে ঈদের আগে আগে নতুন আরেকটা প্রশ্ন করা হয় সেটা হচ্ছে 'নাটক ক'টা যাচ্ছে?'

আমাকে সেদিন একজন এই প্রশ্ন করে বসল, 'এবার ঈদে কোনো নাটক যাচ্ছে?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কেন যাবে না? গত রোজার ঈদে তো শুনেছি তিন চ্যানেলে তিন ত্রিশে নব্বইটা নাটক গেছে।'

'না না আমি বলছি আপনার লেখা কোনো নাটক...'

'আমি? আমি কেন?'

'না মানে লেখালেখি করেন তো ভাবলাম...'

আমি তখন তাকে বোঝালাম আমি আসলে কার্টুনিস্ট। কার্টুন আঁকাই আমার কাজ। আমি রম্য লেখার চেষ্টা করছি এটাই ক্রাইম করছি... এখন আবার নাটক লিখতে বসলে সেটা হবে সুপার ডুপার ক্রাইম।

তো আমি যেটা বুঝলাম বুদ্ধিজীবী হতে হলে বেশ কয়েকটা পর্যায় আছে। প্রথমত লেখালেখি করতে হবে। ঈদ এলে ঈদ সংখ্যায় লিখতেই হবে এবং একটা দুটো নাটকও বিভিন্ন চ্যানেলে যেতে হবে (ঈদের অষ্টম দিনে হলেও ক্ষতি নেই। নাটক যাওয়া দিয়ে কথা)। বইমেলা এলে বই তো বেরুতেই হবে। আরেকটা ব্যাপার জরুরি, দৈনিক পত্রিকায় ডেঙ্গু মশা, বুড়িগঙ্গা নদী দখল, মাদককে না বলুন এ ধরনের বিষয়ের ওপর গুরুগম্ভীর বক্তব্য রাখতে হবে। আরো ভালো হয় সপ্তাহে অন্তত কোনো একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে (হোক না সেটা 'আলু পটলের মূল্য বৃদ্ধির আলোকে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়' টাইপ) কোনো বাংলা চ্যানেলে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া! তা হলেই আপনি একজন পরিপূর্ণ বুদ্ধিজীবী!

আপনারা ভাববেন না আবার যে আমি বুদ্ধিজীবী হওয়ার চেষ্টা করছি। আসলে জোক্স লিখে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না। বড়জোর পরজীবীবুদ্ধিজীবী হওয়া যেতে পারে মানে পরের ধন আত্মসাৎ করে বুদ্ধিজীবী হওয়া আর কি। বরং একটা ঘটনা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

প্রতীক প্রকাশনা থেকে যথারীতি আমার নতুন একটা জোক্সের বই বেরিয়েছে। বইটা মার্কেটেও এসেছে শুনে আমি নিউমার্কেট গেলাম। বইটা কিনে দেখি কেমন হল। এক দোকানে ঢুকলাম।

'জোক্সের বই আছে?'

'আছে।' দোকানি সাগ্রহে দু'তিনটা ইন্ডিয়ান জোক্সের বই বের করল।

আমি বললাম, 'না, না দেশী জোক্সের বই বের করুন। দোকানি মনে হল একটু হতাশ হল। বিরস মুখে আমার নতুন বইটি বের করে দিল নাম 'ফোর টুয়েন্টি ফোর আওয়ার জোক্স' আমি দুটো কিনলাম—একটা নিজের জন্য আরেকটি একজনকে গিফট করব। দুটো কেনায় লোকটা মনে হল খুশি হল, বলল, 'আপনি খুব জোক্স পড়েন?'

'পড়ি।'

'অন্য লেখকের বইও আছে দেখবেন?'

'নাহ্ আমি আবার এই লেখক ছাড়া জোক্স পড়ি না। এই লেখকের জোক্সগুলো ভালোই হয় কী বলেন?' আমি নিজেই নিজেকে ব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করি।

'আছে আর কি... সবই মারা জোক্স, এইহানতে ঐহানতে মাইরা বই বানায়... এই রকম বই আপনেও বানাইতে পারেন...'

আমি তখন চোখেমুখে আগ্রহ ফুটিয়ে বলি, 'ভাই তা হলে আপনাকে একটা সত্যি কথা বলি, আমার কাছে ভালো ভালো ১০০০টা নতুন জোক্স আছে, ওইখানতে এইখানতে মেরে সংগ্রহ করেছি। একলি প্রকাশক খোঁজে দিতে পারবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ আমারবই.কম

লোকটা বিরস কণ্ঠে বলল, 'আমরা ভাই বই বেচি। বাংলাবাজার যান ঐখানে প্রকাশক পাইবেন তারা যদি করে। এক কাজ করুন আপনার নাম ঠিকানা দিয়া যান। আমার এখানেও অনেক প্রকাশক আছে তাদের কয়া দেখতি পারি।

আমি অতি উৎসাহী হয়ে আমার নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম। লোকটি নামটা পড়ে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি তখন দোকানের বাইরে!

❑

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসছিলাম উন্মাদের দলবল নিয়ে। খুব সম্ভব চট্টগ্রামের শিল্পকলা একাডেমিতে তিন দিনের এক কার্টুন প্রদর্শনী করে। তো আমরা যে বগিতে উঠেছিলাম সেটাও ছিল বিচ্ছিন্ন একটা বগি। সমস্ত ট্রেনের ভেতর দিয়ে এক বগি থেকে আরেক বগিতে হাঁটাহাঁটি করা গেলেও আমাদের বগিতে আমরা ছিলাম গৃহবন্দি মানে বগিবন্দি। তো এর মধ্যে দু একজনের চায়ের নেশা চাগিয়ে উঠল।

'আহসান ভাই চা খাওয়া দরকার।'

'খাও সমস্যা কী?'

'কিন্তু আমরা তো আছি বিচ্ছিন্ন বগিতে। বুফে কারে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এখন কী করা যায়?'

'সেক্ষেত্রেও চা খাওয়া সম্ভব তবে প্রতি কাপ চায়ের দাম পড়বে দু শ দু টাকা! খাবে?'

'মানে?'

'বুঝলে না? আমাদের বগি থেকে চা খেতে হলে চেন টেনে ট্রেন থামাতে হবে। চেন টানার ফাইন দুশ টাকা আর চা তো প্রতি কাপ দু টাকা! একুনে কত হল?'

আমার বুদ্ধি শুনে সবাই ঝিমিয়ে পড়ে। তবে একজন সে নাছোড়বান্দা। সে বাই হক অর ক্যাপ্টেন জেমস কুক চা খাবেই।

'তা হলে আর কী জেমস কুকের থুড়ি জেমস বন্ডের মতো ছাদে উঠে যাও ক্রলিং করে গিয়ে পাশের বগিতে লাফিয়ে পড়। সেখান থেকে বুফে কারে...'

সে যখন মোটামুটি চায়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে ছাদে উঠার পরিকল্পনা করছে তখন বোধ হয় ঈশ্বর মুচকি হেসে ভাবলেন, 'দাঁড়াও তোমাদের চা খাওয়াচ্ছি।'

হ্যাঁ সে ট্রেনের দরজাটা সবে মাত্র খুলেছে কোথেকে একটা ঢিল এসে সরাসরি লাগল চোখে 'মাগো বাবা গো' বলে ট্রেনের বাইরে লাফিয়ে পড়লেই ভালো করত, না সে জাতে মাতাল তালে ঠিক, লাফিয়ে ট্রেনের ভিতরই এসে পড়ল সশব্দে। আমাদের চা খাওয়া মাথায় উঠল। চা ফেলে আমরা সবাই চোখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আক্রান্ত চা চ্যালেঞ্জার তখন চোখে রুমাল চেপে কোঁ কোঁ করছে আর অন্য সবাই এক চোখেই যে কত সুবিধা তা নিয়ে গবেষণায় নেমে পড়ল। এবং এই পৃথিবীতে কত বিখ্যাত লোকেব যে এক চোখ ছিল এবং তারা যে কত আরামে ছিল সেটা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যা হোক সে যাত্রা ঢাকা এসে চা চ্যালেঞ্জারের চোখ বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল কোনো রকমে। তবে যে পরিমাণ খরচ গিয়েছিল তার থেকে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে চা খাওয়াই বোধ হয় ভালো ছিল।

আরেকটা ঘটনা, অনেকটা এ রকমই। ছেলে এসে বাবাকে ধরে বসল।

'বাবা, হলে যেয়ে সিনেমা দেখব।'

দুনিয়ার পাঠক এক'হও! আমারবই.কম

'দেখ।'

'টিকিটের টাকা দাও।'

'কত?'

'তিন লাখ পঁচিশ টাকা।'

'মানে?' বাবার প্রায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ার অবস্থা!

ছেলে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কী করব সিনেমার হলটা যে দশ মাইল দূরে। আমার বন্ধুরা সব নিজের নিজের গাড়িতে করে যায়। রিকন্ডিশন একটা গাড়ি তিন লাখে হয়ে যাবে আর সিনেমার টিকিট পঁচিশ টাকা।

বাবা ছেলের আবদার শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন কিনা তা অবশ্য আর জানা সম্ভব হয় নি!

❑

বহুদিন আগের ঘটনা। আমার এক প্রকৃত বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু বললাম এ কারণে যে, সে প্রকৃতই আমার ভালো চায়। তো সেই প্রকৃত বন্ধু একদিন ফোন করল—

'আহসান?'

'হ্যাঁ, কী খবর?'

'খবর ভালো, শোন খুব শিগগিরই টিঅ্যান্ডটি মোবাইল ফোন ছাড়ছে। আমার এক আত্মীয় এজেন্সিও নিয়েছে। এখন তুই যত জলদি পারিস তোর গ্রামীণ ফোনটা বিক্রি করে দে... কারণ টিঅ্যান্ডটির মোবাইলে যে সুবিধা পাবি...'

আমি অবশ্য প্রকৃত বন্ধুর কথায় গুরুত্ব দিলাম না। ফোন বিক্রি করলাম না। এই ঘটনার পর শুধু বুড়িগঙ্গা কেন বাংলাদেশের সব নদী দিয়েই টন টন পানি পাস হয়ে গেছে শুধু মর্তে পানি কেন আকাশেও টন টন মেঘ জমেছে এবং পরিষ্কার হয়ে গেছে কিন্তু টিঅ্যান্ডটির মোবাইল ফোন বাজারে দেখা যায় নি।

প্রায় প্রায়ই দৈনিক পত্রিকায় বক্স নিউজ আসে "অচিরেই বাজারে টিঅ্যান্ডটির মোবাইল আসছে", তারপর আবার চুপ। কোনো ফলোআপ নেই। তো বাজারে গুজব আছে যখনই উচ্চ মহলে 'ট' বিষয়ক ক্রাইসিস দেখা দেয় তখনই নাকি ঐ বক্স নিউজ ছাপা হয়। '... অচিরেই আসছে...' আর তখন তখনই তড়িঘড়ি করে অন্যান্য ফোন কোম্পানিগুলো এক সঙ্গে নগদ কিছু 'ট' ধরিয়ে দেয়... তারপর আবার চুপ!

অনেকটা ঐ 'রাশিয়ানস আর কামিং! রাশিয়ানস আর কামিং!!' অবস্থা আর কি। কিন্তু রাশিয়ানরা আর আসে না।

ধরে নেই অবশেষে সত্যি সত্যি একদিন টিঅ্যান্ডটির মোবাইল ফোন এল বাজরে। ক্রেতারা সব আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করল এই ফোনে নানান রকম সুবিধা। সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই ফোন দিয়ে স্বর্গ-নরকে সরাসরি কথা বলা যায়। তো এক ক্রেতা ঐ ফোন কিনে তার নরকবাসী বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তাদের আলাপ জমে উঠায় তারা অনেকক্ষণ কথা বলল। হঠাৎ তার খেয়াল হল, আরে হায় হায় এটা তো আই.এস.ডি. কল নিশ্চয়ই অনেক বিল উঠেছে। সে ঠিক কত বিল উঠল জানার জন্য বন্ধুর সঙ্গে আলাপ শেষ করে কাস্টমার সার্ভিসে ফোন করল—

'আচ্ছা ভাই আমার নাম্বার এত আমি একটু আগে অনেকক্ষণ নরকে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি... বিলটা ঠিক কত উঠেছে বলবেন?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'এক মিনিট... হ্যাঁ বেশি না মাত্র ২০ টাকা।'
'কী বলছেন মাত্র বিশ টাকা? এত কম?!'
'হ্যাঁ বিশ টাকাই তো হবে এটা তো লোকাল কল!'

❑

স্কুল জীবনের একটা গল্প বলি। কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্তি হয়েছি ক্লাস ফোরে। ক্লাসে আমিই অন্য স্কুল থেকে আসা একমাত্র নুতন ছাত্র। ক্লাসের ভাবগতিক ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কোন স্যার কেমন। ক দিন পর বিপদ টের পেলাম। পঞ্চম পিরিয়ডে ধর্ম ক্লাস। ঐ ক্লাসে সবাইকে বই দেখে দু'পাতা আরবি পড়তে হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম আমি ছাড়া প্রত্যেকটা ছাত্র আরবি পড়তে পারে। স্যারের সামনে গড়গড় করে আরবি পড়ছে বই দেখে। আর আমি পড়তে পারছি না, যথারীতি একদিন স্যারের মার খেলাম অভিনব মার। প্রথমে জুলফির চুল দু আঙুলে ধরে চিড়বিড় করা... তারপর বেত দিয়ে সপাসপ। বেতের বাড়ি সহ্য হলেও জুলফির চুলের চিড়বিড় টান অসহ্য। অচিরেই আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। খুব দ্রুত আরবি শিখে যে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব সেটাও সম্ভব না কারণ আরবি এত সহজ ভাষা না যে চট করে শিখে বিপদ থেকে উদ্ধার পাব। হতাশ হয়ে আমি আমার ভাগ্যকে মেনে নিলাম যেন। প্রায় প্রতিদিন ধর্ম স্যার জুলফির চুল ধরে টানেন। জুলফিতে টাক পড়ার অবস্থা! কিন্তু আমার কিছু করার নেই!

হঠাৎ একদিন আমি আবিষ্কার করলাম আমি ছাড়াও আরো দু একজন মার খাচ্ছে। এটা কী করে সম্ভব? যে ছেলেটি গতকাল আরবি গড়গড় করে পড়ে গেল আজ সে পড়তে না পারার জন্যে মার খাচ্ছে কেন? হঠাৎ করেই আমি শার্লক হোমসের মতো আবিষ্কার করলাম যে আসলে আমাদের ক্লাসের কেউই আরবি পড়তে পারে না! তারা সবাই আগের দিন মুখস্থ করে আসে এবং স্যারের সামনে পরের দিন বই চোখের সামনে ধরে গড়গড় করে মুখস্থ বলে যায়! মানে পড়ার ভান করা। এখন কথা হচ্ছে ধর্ম স্যার কি ব্যাপারটা ধরতে পারেন না? অবশ্যই পারেন কিন্তু তিনিও যেন ভান করেন ছাত্ররা আরবি পড়েছে!

খুব শিগগির আমিও গড়গড় করে আরবি পড়তে শুরু করলাম। মানে আগের দিন মুখস্থ করে এসে পরদনি বই সামনে ধরে পড়ার ভান করতে লাগলাম। আমার জুলফি রক্ষা হল সে যাত্রা। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঠিক মজার ব্যাপারও না, বেদনার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর সব ধর্ম স্যাররাই কেন ছাত্রদের জুলফি ধরে টানাটানি করেন? জুলফির প্রতি তাদের এত ক্ষোভ কেন? এই নিয়ে একদিন আমি আমার বেশ কিছু জুলফিওয়ালা বন্ধুদের নিয়ে উন্মাদ অফিসে মিটিং-এ বসলাম।

'তুই হঠাৎ করে বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম স্যার নিয়ে পড়লি কেন?'

'পড়লাম কারণ ঐ ধর্ম স্যারদের কারণে আমার জীবনে জুলফি রাখা হল না... দুই জুলফিতেই টাক পড়ে গেছে।'

পরে আমাদের জুলফি বিষয়ক গুরুগম্ভীর আলোচনায় যেটা বেরিয়ে আসল সেটা হচ্ছে— ধর্ম স্যারদের প্রায় সবারই শুধু থুতনিতে এক গোছা দাড়ি থাকে, জুলফিতে তাদের কোনো চুলই থাকে না। ফলে তারাও কখনো জুলফি রাখতে পারে না তাদের জীবনে। তাই তাদের এত ক্ষোভ!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেই জুলফি আলোচনায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে এল সেটা হচ্ছে শুধু ধর্ম স্যার না অংক আর ড্রিল স্যাররাও ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি মারধর করে থাকে। অংক স্যাররা মারধর করে কারণ তাদের জীবনের অংক মেলে নি বলে অংকের উপর একটা ক্ষোভ আছে তাদের। আর ড্রিল স্যারদের বেলায় ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। এই স্যারদের তরুণ বয়সে একটা স্বপ্ন থাকে একদিন অলিম্পিকে যাবেন তিনি। দেশের জন্য স্বর্ণপদক ছিনিয়ে আনবেন কোনো একদিন কিন্তু বাস্তবে উল্টো ঘটনা ঘটে... অর্থাৎ তার বিয়ের সোনার আংটিটাই ছিনতাই হয়ে যায় একদিন!

যথারীতি একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। প্রাইমারি স্কুলের এক তরুণ ড্রিল স্যারকে দেখা গেল একা একাই পোলভল্ট প্র্যাকটিস করছেন। তার কজন ছাত্র ব্যাপারটা দেখে দাঁড়াল।

'স্যার আপনি পোলভল্ট প্র্যাকটিস করছেন যে?'

'সামনে অলিম্পিক না?'

'ও আপনি অলিম্পিকে যাবেন?'

'ঠিক তা না।'

'তবে?'

'আরে গাধা অলিম্পিক দেখার জন্য স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকতে হবে না... টিকিটের যা দাম!'

❑

কোরবানি ঈদের দিন সকালে আমার এক মালদার বন্ধুকে ফোন করলাম।

'কী রে খবর কী?'

'এই মাত্র ছাগল ফেললাম...'

'ঠিক আছে তুই ব্যস্ত পরে ফোন করছি।'

একটু পরে আবার ফোন করলাম, 'কী রে ফ্রি হয়েছিস?'

'না দোস্তা এই মাত্র গরু ফেললাম।'

'ঠিক আছে তুই এখনো ব্যস্ত পরে করছি...'

একটু পরে আবার ফোন করলাম, 'কী রে এখন কী অবস্থা?'

'এই মাত্র উট ফেললাম...'

আমি দেখলাম এ তো মহা সর্বনাশ! আমার ধনী বন্ধুটি তো দেশের পশু সম্পদ একে একে সব ফেলে দিচ্ছে মানে কোরবানি করে ফেলছে। ভয়ে আর ফোন করলাম না তাকে।

উট নিয়ে কোরবানির একটা প্রায় সত্যি গল্প বলা যেতে পারে। এক লোক (এ অবশ্য আমার বন্ধু না) সে হঠাৎ করে কোরবানি ঈদের আগে আগে একতলা বাসা ছেড়ে দোতলা বাসায় উঠে এল। তার এক বন্ধু তাকে ধরল।

'কী রে হঠাৎ ঈদের আগে বাসা বদল করলি? একতলা থেকে দোতলায়?'

'এবার উট কিনব যে?'

'উট কিনবি মানে?'

'মানে উট কোরবানি দেব।'

'তার সঙ্গে দোতলা বাসায় সিফট করার সম্পর্ক কী?'

'কেন তুই কি উট দেখিস নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কেন দেখব না।'

'উটের গলাটা দেখেছিস?' প্রায় জিরাফের মতো লম্বা। তুই কি মনে করিস এক তলায় থেকে উট কোরবানি দেওয়া যাবে? উটতো শুনেছি দাঁড় করিয়ে কোরবানি করতে হয়... তাই তো দোতলা বাসা নিলাম...'

আমার লেখার ধরন দেখে মনে হতে পারে বুঝি সব উট বাংলাদেশে কোরবানি হয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই না। উট হচ্ছে রাজহাঁসের মতো এমন একটি প্রাণী যাকে হত্যা করতে মায়া হয়। প্রতিবাদহীন এই প্রাণীটি বড্ড নিরীহ। তো এই নিরীহ প্রাণীটি নিয়ে দান দান তিন দান শেষ একটি গল্প।

এক লোক। তার একটি গৃহপালিত উট আছে। সে সকালে উটটিকে ঘাস খেতে (অবশ্য উট ঘাস খায় কিনা ঠিক জানি না) উটোয়াল থেকে বের করে দেয় (গরুর জন্য গোয়াল হলে উটের জন্য উটোয়াল!)। একটু পরে সে খাবার তৈরি করে উটের পাত্রে রেখে টিনের দেয়ালে শব্দ করে উটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তো প্রতিদিন এই উট আকর্ষণীর শব্দে বিরক্ত হয়ে একদিন তার প্রতিবেশী বলল—

'আচ্ছা বলুন তো প্রতিদিন টিনে বাড়ি দিয়ে ঐরকম বিশ্রী শব্দ কেন করেন?'

'আমার উটটাকে খাবার জন্য ডাকি।'

'মুখে শব্দ করে ডাকতে সমস্যা কী?'

'সমস্যা অবশ্যই আছে।'

'কীরকম?'

'ঐ বদমাশটা একদিন আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিল তারপর থেকে ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি আমি।' বলে ঝন ঝন করে টিনে বাড়ি দিতে লাগলেন তিনি। দুপুরের খাবার সময় হয়েছে তার উটের।

❑

অমর একুশের বইমেলা ২০০৪ শুরু হয়েছে। এবারের বইমেলায় সবচেয়ে উঁচু স্টলটি অন্য প্রকাশের। আর সবচেয়ে নিচু স্টলটি বোধ হয় খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানির। মজার ব্যাপার হচ্ছে দুটো স্টলই পাশাপাশি। (অবশ্য খান ব্রাদার্সকে নিচু বলা ঠিক হল না, অন্য প্রকাশের অতি উচ্চ স্টলের পাশে তুলনামূলক অর্থে একটু নিচুই লাগছিল)।

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানির মালিক ফিরোজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনি একটি মজার উক্তি করলেন। বললেন—

'প্রথম এবং শেষ।'

'জি ঠিক বুঝলাম না।'

'বলছি প্রথম এবং শেষ এবার পাশাপাশি।'

পরে বুঝলাম। হুমায়ূন আহমেদ তার প্রথম বই 'নন্দিত নরকে' দিয়েছিলেন খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানিকে আর এখন পর্যন্ত শেষ প্রকাশিত বই 'যদিও সন্ধ্যা' দিয়েছেন অন্য প্রকাশকে। প্রথম এবং শেষ এই কারণে পাশাপাশি!

প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রিয় গান ছিল প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ। তবে আমার ধারণা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আসলে একটিই। ছান্নান্ন হাজার বর্গমাইলব্যাপি প্রিয় মাতৃভূমির ওজন কিন্তু মাত্র পয়ষট্টি হাজার গ্রাম! (পয়ষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে) যদিও ট্রাকে লেখা থাকে সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন।

দুনিয়ার পাঠক এক্স হও! আমারবই.কম

দেশপ্রেমকে যেমন দাঁড়িপাল্লায় মাপা যায় না সেরকম দেশকে তো নয়ই। তারপরও দুই দেশপ্রেমিক নিজেদের দেশপ্রেম নিয়ে কথা বলছিল--

'আমি আমার দেশকে এত ভালবাসি যে বিয়েই করি নি।'

'দেশকে ভালবাসার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কী?'

'যদি স্ত্রীকে বেশি ভালবাসতে গিয়ে দেশকে ভুলে যাই, তুই...?'

'আমি দেশকে এত ভালবাসি যে সেটা বুঝাতে বিয়ে করেছি।'

'কীরকম?'

'আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি না। সে যখন জানতে চায় কেন তাকে ভালবাসি না তখন তাকে অন্তত বোঝাতে পারি যে দেশকে ভালবাসার পর তোমার প্রতি আমার আর ভালবাসা অবশিষ্ট নেই।'

প্রথম এবং শেষ একটি গল্প দিয়ে শেষ করি। একুশের বইমেলায় এক ক্রেতা গেছে বই কিনতে।

'এমন একটা বই দিন মানে আমি এমন একটা বই আমার সংগ্রহে রাখতে চাই যেটা পড়ে আমি হাসতে পারি কাঁদতে পারি... এমনকি যেন রেগেও উঠতে পারি।'

'সেক্ষেত্রে আপনি বই সংগ্রহ বাদ দিয়ে বরং একজন বউ সংগ্রহ করে নিন।'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# পৃথিবীবিখ্যাত সব ফেলটুস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ব্যর্থতম রণ কৌশল :**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করে তখন রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদ্ধতির পাশাপাশি নতুন এক রণ কৌশলের আশ্রয় নেয়। সেটা হচ্ছে তারা তাদের ট্যাঙ্কের নিচে কুকুরের খাবার রেখে কুকুরদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। এতে করে কুকুরগুলো নির্দেশ পাওয়া মাত্র খাবারের সন্ধানে ট্যাঙ্কের তলায় গিয়ে ঢুকবে। প্রশিক্ষণ শেষে মূল যুদ্ধের সময় কুকুরগুলোর পিঠে রাশিয়ানরা শক্তিশালী মাইন বেঁধে দেয় যেন জার্মান ট্যাঙ্কের নিচে ঢোকা মাত্র মাইন বিস্ফোরিত হয়ে ট্যাঙ্ক ধ্বংস হবে। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়া মাত্র তারা অপরিচিত জার্মান ট্যাঙ্কের নিচে না ঢুকে পরিচিত রাশিয়ান ট্যাঙ্কের নিচেই দল বেঁধে ঢুকতে শুরু করে। তারপর আর কি! রাশান ট্যাঙ্কের মড়ক লেগে যায়! এবং এতে করে পুরো একটা রাশান ডিভিশন দারুণ বেকায়দায় পড়ে যায়!

**ব্যর্থতম শাশুড়ি :**

'শাশুড়িরা ভুলে যায় যে সে একসময় বউ ছিল।' কিন্তু না, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি নিবাসী মিসেস জেনিফার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তা ভুলবেন না এবং তিনি হবেন পৃথিবীর মধুরতম শাশুড়ি। কিন্তু ছেলে উইলিয়ামের বিয়ের পরপর পুত্রবধূ সুসানের মধুর ব্যবহারে তিন মাসের মাথায় উল্টো তাঁকেই ছোট ছেলে আরভকে নিয়ে আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যেতে হয়। সে সময়ও তিনি ভালো শাশুড়ি হওয়ার আশা ছাড়েন নি। তিনি ভাবলেন ছোট ছেলের বেলায় নিশ্চয়ই তাঁর আশা পূরণ হবে। বলাই বাহুল্য ছোট ছেলে আরভ ন্যাপ্সি নামে যাকে বিয়ে করে ঘরে আনল তার তোপের মুখেও মিসেস জেনিফার টিকতে পারলেন না। এবার দু মাসের মাথায় তিনি একটি হোটেলে গিয়ে উঠলেন। পরবর্তীতে বাকি জীবন তিনি গুড হোমেই কাটিয়ে দেন। ভালো শাশুড়ি হওয়া প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, 'ব্যাপারটা সম্ভব হল না কারণ আমি দুটো ভেড়া প্রসব করেছিলাম বলে।'

**ব্যর্থতম কামান দাগা :**

মিস রিটা থান্ডারবার্ড নামে এক মহিলা কামানের গোলা হিসেবে খেলা দেখাতেন সার্কাসে। ঘটনা ফ্রান্সের। খেলার নিয়ম অনুযায়ী তিনি কামানের ভিতর ঢুকতেন তারপর কামান দাগা হত এবং রিটা থান্ডারবার্ড ছিটকে গিয়ে দূরবর্তী এক জালে আছড়ে পড়তেন নিরাপদে। তো একদিন শহরের মেয়র সার্কাস দেখতে আসেন এবং যথারীতি বিভিন্ন খেলার পর এক পর্যায়ে রিটা থান্ডারবার্ডকে কামানে পুরে কামান দাগা হয় কিন্তু রহস্যময় কারণে রিটা থান্ডারবার্ড কামানের ভিতরেই আটকে থাকেন কিন্তু তার সোনালি রঙের অন্তর্বাসটি ছিটকে গিয়ে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মেয়রের মাথায় পড়ে! মেয়র অবশ্য হাসিমুখেই ব্যাপারটি গ্রহণ করেন। বলেন, 'অন্তর্বাসটি মনে হয় আমার স্ত্রীও পছন্দ করবেন।' তবে কামানের ভিতর রিটা থান্ডারবার্ডকে দ্বিতীয় একটি অন্তর্বাস পৌছানো পর্যন্ত সার্কাস বন্ধ রাখা হয়!

**ব্যর্থতম বাস সার্ভিস :**

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ বাস সার্ভিস বোধকরি এখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের স্ট্যাফোর্ডশায়ারের 'টাইম সার্ভিস' বাস কোম্পানি। এই কোম্পানি শুরুতেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অচিরেই তারা তাদের টাইমটেবিল রক্ষা করার জন্য এতটাই সিরিয়াস হয়ে ওঠে যে দেখা যায় যাত্রীরা বাস স্টপে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আর 'টাইম সার্ভিসের' যাত্রীহীন শূন্য বাস হুসহাশ করে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে আর আসছে! যাত্রীদের উঠানোর তাদের সময় কোথায়!

**ব্যর্থতম আবিষ্কার :**

পৃথিবীর ব্যর্থতম আবিষ্কারটি হয় ১৯০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। আবিষ্কারক জন লেন্টার তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটাকে কার্পেটের ধুলা ঝাড়ার যন্ত্র হিসেবে দাবি করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তাঁর যন্ত্রটাকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, 'এই যন্ত্র কার্পেটের সব ময়লা শুষে নিবে মুহূর্তে...' তার যন্ত্রটি চালু করার পর দেখা গেল ম্যাল ফাংশনের কারণে যন্ত্রটি শুষে নেওয়ার বদলে উল্টো ফুঁ দিতে শুরু করেছে। ফলে মুহূর্তে সমস্ত সংবাদ সম্মেলন কক্ষ ধুলোয় ধুলোময় হয়ে ওঠে এবং সবাই ভয়ানকভাবে কাশতে এবং হাঁচি দিতে থাকে। আর ঐ প্রচণ্ড ধুলোর মধ্যে আবিষ্কারক কোন ফাঁকে তার যন্ত্র নিয়ে সটকে পড়েন।

**ব্যর্থতম ব্যাংক ডাকাত :**

১৯৭১ সালে ইংল্যান্ডের এসেক্সে তিনজন ব্যাংক ডাকাতির জন্য স্থানীয় একটি ব্যাংকে ঢোকে। তবে সেটা তাদের প্রথম ডাকাতি ছিল বলে তারা কিছুটা উত্তেজিতও ছিল। ফলে তারা ব্যাংকে না ঢুকে ভুল করে পাশের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে অস্ত্র উচিয়ে চিৎকার করে বলে, 'আমরা এই ব্যাংক লুট করতে এসেছি।' তখন দোকানে উপস্থিত কর্মচারীরা এটাকে একটা উঁচুদরের কোনো রসিকতা মনে করে হেসে ওঠে। তাদের হাসি শুনে তরুণ ডাকাতরা আরো ঘাবড়ে যায় এবং কিছু না বুঝেই এক গাদা কয়েন চকলেট নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়।

**ব্যর্থতম প্রতিক্রিয়া অবলোকন :**

পর্তুগালের এক জেলখানায় একবার জেল কর্তৃপক্ষ বিখ্যাত 'দ্য গ্রেট এসকেপ' ছবিটি কয়েদিদের দেখায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কয়েদিদের প্রতিক্রিয়া কী হয় তা বোঝার চেষ্টা করা। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষ আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করে ছবিটি কয়েদিরা মোটেই পছন্দ করে নি। তারা উল্টো ঐ ছবিটির প্রতিবাদে জেলখানার দেয়ালে একটা বিশাল পোস্টার লাগায়। এই প্রতিক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট অবাকও হয় খুশিও হয়। কিন্তু হঠাৎ এক রাতে জেলখানায় গার্ডরা হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করে প্রায় ১২৪ জন কয়েদি একসঙ্গে পালিয়েছে। বলাই বাহুল্য তারা যে বিশাল পোস্টারটি লাগিয়েছিল তার পিছনেই গোপনে তৈরি করেছিল এক বিশাল ছিদ্র! এবং ঐ ছিদ্রটি তৈরি করেছিল তারা 'দ্য গ্রেট এসকেপ' ছবিটি দেখেই উৎসাহিত হয়ে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ব্যর্থতম লেখক :**

জার্মানির এক লেখক তাঁর জীবনে ৬৪টা বই লেখেন যার মধ্যে মাত্র তিনটি বইয়ের প্রকাশক ধরতে তিনি সমর্থ হন। এর মধ্যে একটি বই প্রকাশক তার নিজের নামে ছাপিয়ে ফেলে, দ্বিতীয়টি ভুলক্রমে লেখকের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, আর তৃতীয়টির ক্ষেত্রে এসব কোনো সমস্যা হয় নি। পুরো বইয়ের বান্ডিল মার্কেটে যাবার পথে মিসিং হয় আর সে বইয়ের কোনো হদিস পাওয়া যায় নি! পরে অবশ্য এক ঠোঙা বিক্রেতার কাছে হারানো বইয়ের হদিস পাওয়া যায়, তবে বই হিসেবে নয় ঠোঙা হিসেবে।

**ব্যর্থতম এনগেজমেন্ট :**

সুন্দরী আন্দ্রিয়ানা মার্টিনসের সাথে অকটাভিও গুলিনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০০ সালে। এই সুন্দরীর সাথেই পরবর্তীতে গুলিনের বিয়ে হয়। কিন্তু কতদিন পর? তাঁদের এনগেজমেন্ট হয় প্রথম সাক্ষাতের ২ বছর পর। চমৎকার দিন কাটতে থাকে তাঁদের। ১৯৬৯ সালে তাঁদের খেয়াল হয় যে তাঁরা বিয়ে করেন নি। মেক্সিকো শহরে যখন তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন তাঁদের বয়স ৮২ বছর এবং তখন তাঁদের নাতি-নাতনির সংখ্যা মাত্র ৪১ জন।

**ব্যর্থতম সংগ্রাহক :**

বই সংগ্রহের ইতিহাসে বেতসি বেকারের (১৬৮২-১৭৫৯) নাম কোনোদিন মুছে যাবে না। এই মহিলা ছিলেন একজন গৃহবধূ। কিন্তু বইয়ের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড নেশা। তিনি অনেক কষ্ট করে শেক্সপিয়ারের অধিকাংশ নাটকসহ ৫৮টি নাটকের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছিলেন। একদিন ঘরে ফিরে দেখলেন তাঁর ৫৮টি বইয়ের ৫৫টি-ই পাঠের অযোগ্য হয়ে গেছে। বাড়ির ঝি কোনোটি পুড়িয়ে ফেলেছে, কোনোটি পিঠা বানানোর কাজে ব্যবহার করেছে। কোনোটিবা খোকাবাবুর ইয়ে পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হয়েছে। অক্ষত ছিল মাত্র ৩টি যেগুলো এখনো ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সসম্মানে সংরক্ষিত আছে।

**ব্যর্থতম ক্যাশ ছিনতাই :**

১৯৭৭ সালে যুক্তরাজ্যের সাউথহ্যাম্পটন শহরের এক ডাকাত একটি জেনারেল স্টোরের ক্যাশবাক্স ছিনতাইয়ের এক অদ্ভুত কৌশল বের করে। সেই স্টোরে ঢুকে সে সাধারণ ক্রেতার মতোই জিনিসপত্র ট্রলিতে করে ঠেলে ক্যাশিয়ারের দিকে যায়। তার প্ল্যানটা ছিল এরকম, সে দশ পাউন্ডের একটা নোট দিবে এবং যখনই ভাঙতি বের করার জন্য ক্যাশিয়ার ক্যাশবাক্স খুলবে সঙ্গে সঙ্গে সে ক্যাশের সমস্ত টাকা নিয়ে ছুটে বের হয়ে যাবে। তার প্ল্যান পুরোপুরিই কার্যকর করতে পারে সে কিন্তু সমস্যা হয়েছিল অন্যখানে। ক্যাশে ছিলই মাত্র ৪ দশমিক ৩৭ পাউন্ড। অর্থাৎ তার লস হয়েছিল (১০-৪.৩৭) ৫ দশমিক ৬৩ পাউন্ড।

**ব্যর্থতম চোর ধরা :**

১৯৭৮ সালের দিকে এসেক্সের এক বইয়ের দোকানের ক্যাশ থেকে রোজ রোজ ১০ পাউন্ড চুরি হতে লাগল...তাও ৫ টায় বন্ধের পর। এভাবে কয়দিন চলার পর মালিক চোর ধরতে এক ফন্দি আঁটলেন। ক্যাশবাক্সের একটু দূরেই এলোমেলোভাবে কিছু বড় কার্টুন ফেলে রাখলেন এবং দোকান বন্ধের পর চুপিচুপি তারই একটার মাঝে ঢুকে পড়লেন। আস্তে আস্তে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

১৪ ঘণ্টা কেটে গেল। মালিকও একদম জড়সড় হয়ে কাঠের মতো পড়ে আছেন এই বুঝি চোব এল। একসময় তার প্রকৃতির ডাক এল। সাড়া দিতে বাথরুমে গেলেন। পাঁচ মিনিট পরে হাত, পা, ঘাড় ডলতে ডলতে বের হয়ে আবিষ্কার করলেন এরই ফাঁকে চোর মহাশয় তার কাজ করে ভেগে গেছে।

**ব্যর্থতম গাড়ি চুরি :**
মে, ১৯৭৬ সালের ঘটনা। ব্রাকবার্নের ডেরন ড্রিংকওয়াটার এবং রেমন্ড হীপ একবার হাইওয়ে থেকে একটি গাড়ি চুরি করে। চুরি করা গাড়িটি বিক্রি করে তারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি রওয়ানা দেয়। কিন্তু বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেখে পুলিশ দাঁড়িয়ে। ততক্ষণাৎ চুরির দায়ে গ্রেফতার করা হয় তাদের। বলাই বাহুল্য চুরি করা গাড়িটি ভুলবশত তার আসল মালিকের কাছেই বিক্রি করেছিল চোরের দল। ফলে মালিক পুলিশের কাছে জানিয়ে দেয়। অতঃপর আর কি, তাৎক্ষণিক হাজতবাস!

**ব্যর্থতম চুরি :**
মি. গে এলি ১৯৬৮ সালে ডেট্রয়েটে একটি বড় রকমের চুরির দান মারে। পুলিশ এসে দেখে নিখুঁত চুরির পরেও একটু খুঁত রয়ে গেছে। চোরের কুকুরটি রয়ে গেছে স্পটে। পুলিশ 'হোম বয়' বলে কুকুরটিকে বাড়ি ফেরার নির্দেশ দেয়। কুকুরকে ফলো করে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই চোরের ঘরে পৌঁছে যায় পুলিশ কিন্তু তখনো চোর এসে পৌঁছে নি। তবে মিনিট কয়েক পরে অবশ্য চোর এসে হাজির হয় এবং যথারীতি গ্রেফতার হয়!

**ব্যর্থতম ফার্নিচার ব্যবসায়ী :**
পোল্যান্ডের পাপাভিচ ওয়ালসো বহু চিন্তাভাবনা করে একটি ফার্নিচারের দোকান দিয়ে বসেন। এন্টিক সব ফার্নিচার। তার দোকানে ভিড় লেগে যায়। তবে বিক্রি হওয়ার আগেই বেরসিক পুলিশ এসে হাজির। তার ফার্নিচার সবই দেশের এন্টিক সম্পদ। সে সরকারকে না জানিয়ে দোকান দিয়ে বসায় বিপত্তি। বলাই বাহুল্য দেশের প্রচলিত আইনে তাকে জেলে ঢুকতে হয়। তবে যে জেলে তাকে ঢুকানো হয় সেটাও একটা এন্টিক জেল। মানে দেশের সবচেয়ে পুরোনো জেলখানা।

**ব্যর্থতম আর্কিটেক্ট :**
আমেরিকান আর্কিটেক্ট নিকোলাস পাস করে আর্কিটেক্ট হয়েই বিরাট একটা সুপার মার্কেটের ডিজাইনের কাজ পেয়ে গেলেন। পায়ের তালুর ঘাম মাথার তালুতে উঠিয়ে খেটেখুটে যথাসময়ে ডিজাইনও জমা দেন। পেমেন্টও পেয়ে যান যথাশিগগির। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্তীতে তাঁর ডিজাইনটি চুরি হয়ে যায়। আর কাকতালীয়ভাবে তাঁর পুরো পেমেন্টটিও কয়েকজন কাল্লু ছিনিয়ে নেয়। এই দুঃখে নিকোলাস পরবর্তীতে আর তাঁর পেশায়ই থাকেন নি।

**ব্যর্থতম প্রদর্শনী :**
'দ্য রয়েল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অফ এক্সিডেন্ট' একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। যার বিষয়বস্তু ছিল 'দুর্ঘটনার প্রতিকার'। কিন্তু হায়! সম্পূর্ণ ডিসপ্লে বোর্ডটিই সশব্দে ভেঙে পড়ায় সে প্রদর্শনী আর কেউ দেখতে পারে নি। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৮ সালে হ্যারোগেট শহরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ব্যর্থতম গোলকিপার :**

ব্রাজিলের রিও প্রেটো দলের গোলকিপার আইসাডোর ইরানডির ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। একবার রিও প্রেটো বনাম করিনথিয়ার দলের সেন্টার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বল তাদের খেলোয়াড় রিভালিনোর পায়ে যায়। তিনি হাফওয়ে লাইন থেকেই বাঁ পায়ে জোরালো শট নেন গোলপোস্ট লক্ষ করে। সেই শট্ গোলকিপার ইরানডির কানের পাশ দিয়ে সোজা জালে জড়িয়ে পড়ে। গোলকিপার ইরানডির বল ফেরানোর কোনো চেষ্টাও করেন নি। কারণ তিনি তখন 'ম্যাচ-পূর্ব প্রার্থনায়' মগ্ন ছিলেন। গোলটি হতে সময় লেগেছিল মাত্র তিন সেকেন্ড।

**ব্যর্থতম বক্সার :**

যুক্তরাষ্ট্রের বক্সার আল কোটরের কাছে তারই স্বদেশী বক্সার র‍্যালফ ওয়ালইনের নক আউট হতে লেগেছিল মাত্র সাড়ে ১০ সেকেন্ড। আল কোটর যখন তাঁকে প্রথম এবং একমাত্র ঘুষিটি মারেন তখন তিনি তাঁর মুখের গাম শিল্ডটি ঠিক করতে ব্যস্ত ছিলেন! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সাড়ে ১০ সেকেন্ডই খরচ হয়েছিল নক আউট থেকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য রেফারির এক থেকে দশ গুনতে। বলাই বাহুল্য তিনি আর উঠে দাঁড়াতে পারেন নি। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে র‍্যালফ নকআউট হতে সময় নিয়েছিলেন মোট আধা সেকেন্ড!

**ব্যর্থতম মেয়র :**

মেয়র হিসেবে সেনর জোসে র‍্যামন বোধহয় পৃথিবীর ব্যর্থতম মেয়র। ১৯৭৮ সালে মেক্সিকোর কোয়াকেলোকে শহরের মেয়র নির্বাচিত হন তিনি। কিন্তু এক মাসের মাথায় যে ৪ হাজার লোকের ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি, তাঁরা সম্মিলিতভাবে তাঁর অফিস আক্রমণ করে বসে তাঁর প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য। ক্ষুব্ধ জনতা তাঁর অফিস তচনচ করে ফেলে এবং তাঁকে রেজিগনেশন লেটারে সই করানোর পূর্বে উত্তেজিত জনতা আরেকটা ঘটনা ঘটায়। ঘটনাটা হল, ব্যর্থ মেয়র র‍্যামনকে তাঁরা প্রমাণ সাইজের ১০ হালি কলা খেতে বাধ্য করে।

**ব্যর্থতম নির্বাচন :**

ভদ্রলোকের নাম মি. জর্জ কাইগুনেস। তিনি এবারডিন জেলার ম্যার্চাস কম্যুনিটি কাউন্সিলে মাত্র এক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হল সেই ভোটটাও তাঁর নিজের নয়। কারণ এই নিষ্প্রাণ নির্বাচনে তিনি ভোটই দেন নি। বিজয়ী হওয়ার পর সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে টি-শার্ট পরে পোজ দিতে দিতে বলেন, এরকম ম্যাড়ম্যাড়ে নির্বাচনে কীভাবে ভোট দেই বলুন তো? মূলত মি. জর্জ নিষ্প্রাণ নির্বাচনে ক্ষুব্ধ হয়েই ভোট দিতে যান নি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর বিদ্রোহ মোটেই গ্রাহ্য করেন নি। তাঁকে দ্রুত কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করেন।

**ব্যর্থতম পর্যটক :**

গ্রিনল্যান্ডের টমাস ম্যাকলেইন বোধ করি পৃথিবীর ব্যর্থতম পর্যটক। তিন তিনবার তিনি বিশ্ব ভ্রমণে বের হন এবং তিন বারই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। প্রথমবার সাইকেল নিয়ে বের হলে সাইকেলের চাকা পাংচার হয়ে যায় এতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করেন। এর পর পায়ে হেঁটে বিশ্ব ভ্রমণে বেরুতে গেলে তাঁর সামনে দিয়ে একটি কালো


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিড়াল হেঁটে গেলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বিড়ালটিকে আছড়ে মেরে ফেলেন (তাঁর ধারণা ছিল এটা অশুভ লক্ষণ) এতে করে অবশ্য তাঁকে পশু ক্লেশ আইনে দু মাস জেল খাটতে হয়। তৃতীয়বারে আর কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তিনি প্লেনে চড়েই বের হন। কিন্তু প্লেনটি ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করতে গেলে ভয় পেয়ে তিনি প্লেনের দরজা খুলে লাফিয়ে পড়েন। পরে প্লেনের প্রতিটি যাত্রী নিরাপদে প্লেন থেকে বেরুতে পারলেও তাঁকে উদ্ধার করা হয় পা ভাঙা অবস্থায় একটা ঝোপ থেকে।

**ব্যর্থতম জমির মালিক :**

ক্যালিফোর্নিয়া শহরের জন পল সম্ভবত পৃথিবীর ব্যর্থতম জমির মালিকদের একজন। পেশায় উকিল পল একটা মোটা অঙ্কের ফি পেয়ে একখণ্ড জমি কেনার সিদ্ধান্ত দেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে একখণ্ড জমি তাঁর পছন্দও হয়ে যায়। দরদামের তোয়াক্কা না করে জমিটা কিনে ফেলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্য মন্দ হলে যা হয় আর কি! জমিটা কেনার মাস খানেকের মধ্যেই তাঁর জমির উপর দিয়ে চার–চারটি রাস্তা সরকারের হুকুম দখল করে কাটাকুটি খেলা খেলে যায়। এই খেলার পর যেটুকু জমি অবশিষ্ট ছিল তা আর কোনো কাজেই আসে নি জন পলের।

**ব্যর্থতম হোমিং পিজন :**

যে পায়রা রাস্তা চিনে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে আবার ঠিকমতো ফিরে আসতে পারে তাদেরকে 'হোমিং পিজন' বলে। আগেকার দিনে এদের দিয়েই চিঠি চালাচালি হত। ১৯৬৩ সালে এমনই একটি পায়রা অর্থাৎ হোমিং পিজন ছাড়া হয়েছিল হেমব্রকশায়ার থেকে জুন মাসে। কথা ছিল সেদিন বিকেলের মাঝে সে তার মালিকের কাছে ফিরে আসবে। পায়রাটা ফিরে এসেছিল বটে, তবে ১১ বছর পর ব্রাজিল থেকে পার্সেল হয়ে মৃত অবস্থায়! এ ব্যাপারে তার মালিকের মতামত চাইলে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'আমরা তো ভেবেছি ওকে হারিয়েই ফেলেছি!'

**পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যর্থ দৈনিক পত্রিকা :**

বিলবোর্ডে 'ব্রিটেনের নির্ভীকতম সংবাদপত্র' লেখা 'কমনওয়েলথ সেনটিনাল' পত্রিকাটির উদ্বোধন করা হয় ১৯৬৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে এবং বন্ধ হয়ে যায় ৭ তারিখে। কমনওয়েলথভুক্ত সকল মানুষের মুখপত্র হিসেবে ডিজাইন করা ওই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লন্ডনবাসী মি. লিওনেল বারলি। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে, স্টোরি লিখে গরম গরম এক সপ্তাহ পার করে তিনি প্রথম সংখ্যার মুখ দেখলেন। অবশেষে বারলি পুলিশের কাছ থেকে একটা ফোন পেলেন। 'কমনওয়েলথ সেনটিনাল দিয়ে আপনি কী করতে চাচ্ছেন?'

একজন পুলিশ অফিসার প্রশ্নটি করলেন। 'ব্রাউনয় হোটেলের প্রবেশপথের বাইরে ৫০ হাজারেরও বেশি কপি পড়ে আছে এবং তারা এর মধ্যেই অ্যালরেমার্ল স্ট্রিটে বিশাল ট্রাফিক জ্যাম তৈরি করে ফেলেছে।'

'আমরা আসলে ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারটি ভুলেই গিয়েছিলাম', বারলি পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাপারটি খোলাসা করেন। তবে পরে জানা যায় ঐ পত্রিকার একটি কপি নাকি বিক্রিও হয়েছিল...ঐ কপিটি বারলির নিজের মেয়ে একজন পথচারীর কাছে বিক্রি করেছিলেন এবং বিষয়টি এতটাই উত্তেজক ছিল যে ঐ প্রথম কপি বিক্রির দৃশ্যটি পর্যন্ত ক্যামেরাবন্দি করে রাখা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও~ আমারবই.কম

**ব্যর্থতম অপারেশন :**

কানাডার মন্ট্রিলে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস লেন ট্রুট চারটি কন্যা সন্তানের জনক-জননী হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিলেন যথেষ্ট হয়েছে আর নয় এবার বন্ধ্যাকরণ অপারেশন জরুরি। স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে দুজনেই ড. গর্ডনের কাছে অপারেশন করালেন। চমৎকার সফল অপারেশন হল। কিন্তু এক বছর পর পেটে টিউমার নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে মিসেস ট্রুট একটি পুত্র সন্তান নিয়ে ফিরলেন। ক্ষিপ্ত মি. ট্রুট সিদ্ধান্ত নিলেন ঐ ড. গর্ডনের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অপারেশনের মামলা করবেন। কিন্তু মিসেস ট্রুটের চার কন্যার পর একটি পুত্র সন্তান এত ভালো লেগে গেছে যে তিনি তার নাম রেখে ফেললেন গর্ডন জুনিয়র।

**ব্যর্থতম আবহাওয়া প্রতিবেদন :**

জেদ্দায় একটা বিরল ধরনের বন্যার পর ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে 'আরব নিউজ' নিম্নলিখিত বুলেটিন প্রকাশ করে—'আপনাদেরকে অদ্যকার আবহাওয়ার বার্তা জানাতে না পারার জন্য আমরা বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা আবহাওয়া বার্তার জন্য যে বিমান বন্দরটির উপর নির্ভর করি...দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে সে বিমান বন্দরটি আপাতত বন্ধ আছে। আগামীকালও আপনাদেরকে সঠিক আবহাওয়া বার্তা দিতে পারব কিনা সেটা নির্ভর করছে আগামীকালের আবহাওয়ার উপর।'

**ব্যর্থতম বিক্রি :**

'নিউ টেস্টামেন্ট'কে কপটিক থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে ডেভিড উইলকিংস যে পরিমাণ শ্রম দিয়েছিলেন অন্য কোনো লেখক তার ধারকাছেও যেতে পারেন নি। এই শ্রমের ফসল হিসেবে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বইটি প্রকাশিত হয় ১৭১৬ সালে। কিন্তু তার এই শ্রম পুরোটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ ১৯১ বছর পর অর্থাৎ ১৯০৭ সালে দেখা যায় বইটির সাকুল্যে ১৯১ কপি বিক্রি হয়েছে। গড়ে ১ বছরে বিক্রি হয়েছে ১ কপি।

**ব্যর্থতম বাইবেল সংস্করণ :**

বাইবেলের সবচেয়ে উত্তেজনাকর সংস্করণটি ছাপা হয়েছিল ১৬৩১ সালে লন্ডনে। মুদ্রাকর ছিলেন যথাক্রমে রোবট বার্কার এবং মার্টিন লুকাস। বইটি ছিল অসংখ্য ভুলে ভরা, কিন্তু একটি 'ভুল' ছিল উন্মাদনা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। সপ্তম আদেশ থেকে 'নট' বা 'না' শব্দটি বাদ পড়ে যাওয়ায় অর্থ পাল্টে গিয়ে এমন দাঁড়িয়েছিল, যা বাইবেল-পাঠককে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপারটি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, এই আশঙ্কায় রাজা প্রথম চার্লস বইটির ১ হাজার কপি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন এবং এই মুদ্রাকরকে ৩ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেন।

**ব্যর্থতম ফিচার লেখক :**

অস্ট্রেলিয়ার উইলিয়াম এ-গোল্ড সর্বকালের ব্যর্থতম ফিচার লেখক। সৃষ্টিশীলতার ১৮ বছরে ৩ মিলিয়নের ওপরে শব্দ লিখে তিনি কামাই করেছেন সাকুল্যে ২৮ পেন্স্।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ক্যানবেরা একটি সংবাদপত্রে একটি লেখার জন্য ১৯৭৪ সালের ২৪ মে তিনি এই সম্মানীটি পান। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ৫১ বছর। এর ১৬ বছর পর 'ওয়ার্কারস এডুকেশান এসোসিয়েশন বুলেটিন'-এ তাঁর ১৫০ শব্দের এক গ্রন্থ-সমালোচনা ছাপা হয়েছিল। সমালোচনাটি অবশ্য ছাপা হয়েছিল এই শর্তে যে, মি. গোল্ডকে কোনো প্রকার সম্মানী দেওয়া হবে না।

**ব্যর্থতম কম্পিউটার প্রোগ্রামার :**

জার্মানির জন মারথুস পেশায় একজন শৌখিন কম্পিউটার প্রোগ্রামার। তার কাজ হচ্ছে এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম তৈরি করা। তো একবার বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে একটি এন্টি ভাইরাস তৈরি করে পরীক্ষামূলকভাবে 'টেস্টরান' করতে তার এক বন্ধুর পিসি ব্যবহার করে। পিসিটি চালাতে গিয়ে দেখা গেল তার এন্টি ভাইরাসটিই আসল ভাইরাস হয়ে বন্ধুর পিসির হার্ডডিস্ক ক্র্যাশ করে দিয়েছে।

**ব্যর্থতম কান্ট ব্যবসায়ী :**

ভারতের কেরালার হরিনাথ পান্ডে ১৯৬৬ সালে লাইনঘাট করে সোজা যুক্তরাষ্ট্র রওনা হন। উদ্দেশ্য সেখানে নিজেকে একজন পীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে আখের গোছানো। সেখানে পৌঁছে মোটামুটি একটা উপশহর বেছে নিয়ে শুরু হয়ে যায় তুকতাক অলৌকিক কর্মকাণ্ড। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে এলাকায় সে তার তুকতাক অলৌকিক কাজকর্ম প্রদর্শন করেছিল তার দুদিন আগেই সেখানে ঐ একই ধরনের জাদু দেখিয়ে গেছেন বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর হুডিনি। ফলে তার জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সোজা ঢুকতে হয় শ্রীঘরে। তবে হরিনাথ পান্ডে শ্রীঘরে নাকি দু একজন শিষ্য জোটাতে সমর্থ হয়েছিল।

**ব্যর্থতম পোর্ট্রেট শিল্পী :**

ফ্রান্সের জাকুয়ে ফ্রা-ই সম্ভবত পৃথিবীর অন্যতম ব্যর্থ পোর্ট্রেট শিল্পী যিনি তাঁর জীবনে মোট আড়াই শ' পোর্ট্রেট করেন কিন্তু কোনোটিই মূল মডেলের সঙ্গে একবিন্দু মেলে নি। ফলে তাঁর মার্কেট হু হু করে পড়ে যায় (অবশ্য পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবে তাঁর মার্কেট ছিলও না খুব বেশি)। তাও শেষ রক্ষা হত যদি না বারো জন একসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে দিত। আটটি মামলা থেকে তিনি খারিজ হলেও চারটি মামলায় তাঁকে ছয় বছরের মতো জেল খাটতে হয়। তবে জেলে বসে তিনি তাঁর সতীর্থ কয়েদিদের যে পোর্ট্রেট করেন সেগুলো আবার বেশ মিলে যাচ্ছিল মূল মডেলদের সঙ্গে।

**ব্যর্থতম ক্রিকেট ম্যাচ :**

সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রিকেট নিয়ে এত হইচই! অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে কম রানের ক্রিকেট খেলাটি যে একটি রিয়েল লাইফ জোক হয়ে আছে তা আমরা কজন জানি? খেলাটি হয়েছিল গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংল্যান্ডে। ক্যামব্রিজে দুটি টিমের মধ্যে 'ট্রফি বয়েজ ক্লাব' ভার্সেস 'কিংস কলেজ' টিম। ট্রফি বয়েজ ক্লাব টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে...এবং খুবই দ্রুত রানের খাতায় এক পরম শূন্য রেখে অল আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যায়। এরপর কিংস কলেজ ব্যাট করতে নামে। ব্যাটে বলে কোনো সংযোগ না ঘটিয়েই তারা জিতে যায়। জেতার জন্য তাদের দরকার ছিল মাত্র এক রান এবং সেটা ট্রফি বয়েজ ক্লাবের প্রথম বলটি নো বল হওয়ার কারণে তারা সহজেই জয় পেয়ে যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ব্যর্থতম ক্রীড়া সরঞ্জাম :**
ইতালির পাওলো জিদান চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ঠিক করলেন ক্রীড়া সরঞ্জামের ব্যবসা করবেন। যেই কথা সেই কাজ। তিনি প্রথম চালানে একশ ক্রিকেট ব্যাট আর স্টাম্প নামালেন। ক্রীড়া সরঞ্জামের দোকানে সাপ্লাই দিলেন যথারীতি। কিন্তু সব সাপ্লাই ফেরত এল পরদিন। ব্যাপার কী? দোকানদাররা জানাল তারা ব্যাট আর স্টাম্পের পার্থক্য করতে পারছে না।

**ব্যর্থতম দর্শক উপস্থিতি :**
ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে কম দর্শকের উপস্থিতি ঘটে ১৯২১ সালের ৭ মে। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় লিসেস্টার সিটি বনাম স্টকপোর্ট কাউন্টির মধ্যে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলা হওয়া সত্ত্বেও আনলাকি থারটিনের খপ্পরে পড়েই হয়তোবা খেলা দেখতে আসে মাত্র ১৩ জন দর্শক। হাফ টাইমের পর ছয় জন দর্শক চলে গেলে দর্শক সংখ্যা দাঁড়ায় সাত জনে। এতে অবশ্য খেলোয়াড়রা খুশি হয়ে ওঠে যে আনলাকি থার্টিন তো আর নেই এখন লাকি সেভেন।

**ব্যর্থতম গাড়ির চালক :**
১৯৫৪ সালে বেলজিয়ামের জন হপকিনস ৩৫ বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি গাড়ি চালানো শিখবেন। একটি ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়ে শিখলেও কিন্তু ট্রেনিং পিরিয়ডে পরপর ছ'টি দুর্ঘটনা ঘটান। দুজন পথচারী তার বিরুদ্ধে মামলা করে। তো শিক্ষানবিশ হিসেবে তিনি মামলা থেকে খারিজ হলেও তিনটি ড্রাইভিং স্কুল ফেঁসে যায়। ফলে পরবর্তীতে কোনো স্কুলই তাঁকে আর ড্রাইভিং শেখাতে রাজি হয় নি। পরে দেখা যায় তিনি আসলে বিশেষ ধরনের গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত। সব সময় দুটি জিনিস দেখেন।

**ব্যর্থতম সাঁতারু :**
১৯৪৬ সালে ইতালির পল ফ্রান্সেসকো যিনি নিজেকে একজন প্রফেশনাল সাঁতারু হিসেবে দাবি করেন। তিনি বিশ্বে প্রধান প্রধান সাঁতারুদের চ্যালেঞ্জ করে বসেন। বলাই বাহুল্য নির্দিষ্ট দিনে পল ফ্র্যান্সেসকো ছাড়া অন্য কোনো সাঁতারুকে পুলে দেখা যায় নি। তবে পল বীর বিক্রমে একাই ঝাঁপিয়ে পড়েন পুলে এবং মাঝপথে এক রহস্যময় কারণে তিনি ডুবে মারা যান। পরবর্তীতে জানা যায় তিনি মানসিক রোগী ছিলেন।

**ব্যর্থতম দৌড়বিদ :**
১৯৫৭ সালে যুক্তরাজ্যের নর্থহ্যামশেয়ারের ফ্লিন্ট বায়োস একজন ম্যারাথন দৌড়বিদ। তিনি একবার আন্তর্জাতিক ম্যারাথন দৌড়ের সিদ্ধান্ত নেন। প্রায় চৌদ্দটি দেশের এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটি ছিল ছাব্বিশ মাইলের। তো ফ্লিন্ট বায়োস ২৬ মাইল দীর্ঘ এই ম্যারাথন দৌড়ে দৌড় শুরু করলেন এবং ভুল পথে গিয়ে একাই প্রায় ৩৭ মাইল দৌড়ান।

**ব্যর্থতম অভিনেত্রী :**
সম্ভবত ষাট দশকে জার্মানির মিস বারবারা ফুস পৃথিবীর ব্যর্থতম অভিনেত্রী। তিনি প্রায় ১৮টি নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। কথিত আছে তাঁর অভিনয়ের সময়ে এত পরিমাণ আপেল, টমেটো ছোড়া হত যে পরদিন কাঁচা বাজারে ফলমূলের টান পড়ে যেত। শোনা যায় পরবর্তীতে তিনি ফলমূলের দোকান দিয়ে ভালো ব্যবসা করতে সমর্থ হন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ব্যর্থতম শ্রবণযন্ত্র :**
১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। মি. হ্যারল্ড সেনবি কানে কম শোনার কারণে ২০ বছর ধরে হেয়ারিং এইড ব্যবহার করে আসছেন। ডাক্তারের চেম্বারে বসে হঠাৎ একদিন তিনি আবিষ্কার করেন, কান থেকে শ্রবণযন্ত্রটি খুলে ফেললেই যেন তিনি বেশি ভালো শোনেন। ডাক্তার সাহেব গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। এরকম হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই। আরো খানিকটা পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর কারণটা বের হয়ে এল। মি. হ্যারল্ড সেনবি গত ২০ বছর ধরে ভুল কানে হিয়ারিং এইড পরে আসছেন।

**ব্যর্থতম জার্নাল :**
১৯৭৮ সালে 'দ্য হিস্ট্রি অব কর্নিশ পাবস' নামক একটি জার্নাল প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে এর সংশোধনী তালিকার কারণে। তালিকায় ছিল সর্বমোট ১৪০টি ভুলের সংশোধনী। জার্নালটি ছিল মাত্র ৭০ পৃষ্ঠার। এই জার্নালটির মুখবন্ধে 'বিশেষ সততার' সঙ্গে সম্পাদক তাদের প্রিন্ট হবার পর প্রুফ দেখতে যেয়ে ধরা পড়া 'এই সামান্য' ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার সঙ্গে এও জানিয়ে দেন, যান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিরাম চিহ্ন সংক্রান্ত ভুলগুলোর সংশোধন সম্ভব হয় নি!

**ব্যর্থতম নৌ মেরামত :**
এক দুর্ঘটনায় ইউ. এস. নিউক্লিয়ার সাবমেরিন সোর্ডফিশের কারণে এর লোডিং পিসটন জ্যাম হয়ে যায়। এক হপ্তা ধরে অগুণিত দক্ষ ডুবুরি বহু চেষ্টা করে তা ঠিক করতে পারে নি। অবশেষে লোকজনসহ সেই সাবমেরিনটিকে টেনে ডাঙায় তুলে তবে মেরামত করতে হয়েছিল। আর এতে ইউ.এস. নেভির মোট খরচ হয়েছিল ১ লাখ ৭১ হাজার মার্কিন ডলার। অথচ, এই পুরো দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ছিল একটি ছোট্ট ঘষে রং তোলার যন্ত্র, যার মূল্য মাত্র ৩০ সেন্ট।

**ব্যর্থতম পাহাড়ের মালিক :**
জাপানের মাসাউকির অনেক দিনের শখ তিনি একটি পাহাড়ের মালিক হবেন। সে সুযোগও একদিন এসে গেল। তিনি খবর পেলেন তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোক একটি পাহাড় বিক্রি করবেন। খবর পেয়ে তিনি ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। পাহাড়ের দামদস্তুর ঠিক হল। তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে একদিন কিনে নিলেন পাহাড়টিকে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস পাহাড়ের মালিকানার দলিল তাঁর হাতে যেদিন চলে এল সেদিন এক ভূমিকম্পে তাঁর পুরো পাহাড়টি মাটিতে বসে গেল! মানে রাতারাতি পাহাড় প্রায় সমতল হয়ে গেল! তারপরে মাসাউকির মনের কী অবস্থা হয়েছিল তা আর জানা যায় নি!

**ব্যর্থতম জাহাজ :**
১৯৫৩ সালে তৈরি হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত 'আর্গো মার্চেন্ট' নামের জাহাজটি হেন দুর্ঘটনা নেই যার মুখোমুখি সে হয় নি! যেমন ১৯৬৮ সালে এটি নাবিক বিদ্রোহের কবলে পড়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর শীত নিদ্রায় থাকে। ১৯৭৪-এ ছয় বার জাহাজটির বয়লার ফেটে যায়। ডুবে যাওয়ার আগের বছরেই জাপান থেকে আমেরিকা যেতে তার সময় লেগেছিল মাত্র আট মাস! এই দীর্ঘ যাত্রায় সে দুবার দুটি জাপানি জাহাজকে


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধাক্কা দেয়। তিন বার আগুন লেগে যায়। মেরামতের জন্য তাকে থামতে হয় মাত্র পাঁচ বার। এক পর্যায়ে তাকে দুটি লাল বাতি জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা যায় যার অর্থ এই জাহাজের ইঞ্জিন ও স্টিয়ারিং ফেল করার কারণে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ক্রুদের হাতে নেই; যার জন্য জাহাজটির চলাচল ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন এবং পানামা খালে নিষিদ্ধ ছিল। জাহাজটি নিজে চূড়ান্তভাবে ডুবে যাওয়ার আগে 'কেপ কড' নামের একটি বিখ্যাত তেলের ট্যাংকারকে সাফল্যের সঙ্গে ডুবিয়ে দিতে সমর্থ হয় এবং তার পরপরই সেটি ১৫ ঘণ্টার জন্য ব্রেক নিখোঁজ হয়ে যায়। ডুবে যাওয়ার আগ মুহূর্তে জাহাজটি চলছিল ব্রেক নক্ষত্র দেখে কারণ আধুনিক যন্ত্রপাতির কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। গ্রিক ভাষায় লিখিত গতিপথের একটা বর্ণনা ছিল যা পশ্চিম ভারতীয় ক্যাপ্টেন হেলসম্যানের পক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না।

**ব্যর্থতম প্রদর্শনী :**

পৃথিবীবিখ্যাত এক গ্যালারিতে পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের পেইন্টিং প্রদর্শনী চলছে। প্রদর্শনী চলবে টানা এক মাস। শেষ দিনে হঠাৎ এক বিখ্যাত শিল্পী প্রদর্শনীতে এসে হাজির! প্রদর্শনীর আয়োজকরা সব ছুটে এলেন বিখ্যাত শিল্পীকে সঙ্গ দিতে। শিল্পী সব ছবি একে একে দেখে সবার শেষে নিজের ছবির সামনে এসে দাঁড়ালেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজের ছবি দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর আয়োজকদের দিকে ফিরে হতাশ হয়ে প্রশ্ন করলেন— 'একমাস ধরেই কি আমার ছবিটা উল্টো ঝুলছে?' প্রশ্ন শুনে আয়োজকদের চোয়াল ঝুলে পড়ল!

**ব্যর্থতম ভাস্কর :**

জর্জ হবারই বোধ করি পৃথিবীর অন্যতম ব্যর্থ ভাস্কর। জন্মসূত্রে স্কটিশ এই ভাস্কর তার জীবনে মোট দু হাজার ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। তবে সঠিক বাক্যটি হবে মোট দু হাজার বার একই ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। আসলে গৌয়ার টাইপের এই ভাস্কর তার প্রেমিকার ভাস্কর্য দিয়েই 'ভাস্কর পেশা জীবন' শুরু করার প্রতিজ্ঞা করেন কিন্তু সম্ভবত প্লাস্টার অব প্যারিসে কোনো ভেজাল বা সমস্যা থাকার কারণে প্রতিবারই তার ভাস্কর্য ভেঙে যাচ্ছিল এবং এভাবে প্রায় দু হাজার বার চেষ্টা করার পর তার প্রেমিকা অধৈর্য হয়ে (কেননা প্রতিবারই তাকে মডেল হতে হচ্ছিল) জর্জ হবারকে ত্যাগ করে। প্রেমিকার এমন আচরণে হতাশ হবার নিজেও তার ভাস্কর্য পেশা ত্যাগ করে বাবার এন্টিক মালামাল বিক্রির ব্যবসায় মনোনিবেশ করে। পরে তার বাবা মন্তব্য করেন, 'জর্জ পুরোনো ভাস্কর্য বিক্রিতে ইতোমধ্যেই বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে।'

**ব্যর্থতম দরজি :**

ভারতের কেরালা রাজ্যের শ্রী অরবিন্দ ঘোষ একটা চুড়িদার পাঞ্জাবি বানাতে দিলেন এলাকার এক দর্জির দোকানে। এরপর তাঁর জীবনে একটা বাজে ঘটনা ঘটে। একটা মিথ্যা মামলায় ফেঁসে গিয়ে তার তিন বছর জেল হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসে তাঁর খেয়াল হয় তিনি জেলে ঢোকার আগে শখ করে একটা পাঞ্জাবি বানাতে দিয়েছিলেন। রিসিটটা ছিল। গেলেন পাঞ্জাবি আনতে। রিসিট হাতে নিয়ে দর্জি বলল, 'কাল সন্ধ্যায় আসুন'।

**ব্যর্থতম ব্যবসায়ী :**

তুলার ব্যবসায় ধরা খেয়ে জর্জিয়ার স্টিফেন বন্ধুদের পরামর্শে পাথরের ব্যবসায় নামেন। সেটা ১৯৫৭ সালের কথা। পাথরের প্রথম চালানটি তিনি পাঠান একটি দশটনি ট্রাকে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ট্রাকটি গন্তব্যে পৌছানোর কথা ছিল দুই দিনে। স্টিফেন ধৈর্য ধরে দু বছর অপেক্ষা করেন ট্রাকটির জন্য। তারপর ফের ফিরে যান তার আগের পেশায়।

**ব্যর্থতম দুর্ঘটনা :**
১৯০৬ সালে কর্নওয়ালের রেডরুথ নামের এক শহরে এক সকালে দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এটা অবশ্য কোনো ঘটনাই নয় কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঐ সময় ঐ শহরে মাত্র ঐ দুটি গাড়িই ছিল!

**ব্যর্থতম স্বাস্থ্য :**
স্বাস্থ্য বিষয়ক বেস্ট সেলার বই 'স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি' গ্রন্থের পশ্চিমা লেখক রুডলফের রহস্যময় মৃত্যু হলে পুলিশ তার ময়না তদন্ত করে। ময়না তদন্তের রিপোর্টে ডাক্তার যে সার্টিফিকেট দেয় তাতে তার মৃত্যুর কারণে লিখেছে 'পুষ্টিহীনতা'। এ খবর প্রচার হলে বেস্ট সেলার বইটি মাত্র এক সপ্তাহে ওর্স্ট সেলারে নেমে আসে!

**ব্যর্থতম আর্কিওলজিস্ট :**
মরক্কোর আবিওয়ালা আল রাজি একজন শৌখিন আর্কিওলজিস্ট। পেশায় তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হলেও তাঁর নেশা হচ্ছে প্রাচীনকালের হাড়-হাড্ডি খুঁজে বেড়ানো। দীর্ঘ বারো বছর অন্বেষণ করে তিনি অবশেষে নিজের এলাকাতেই 'নিয়ানডারথল' যুগের মানুষের চোয়াল খুঁজে পান। যা নিয়ে আর্কিওলজিস্টদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। পরে কার্বন টেস্টে ধরা পড়ে যে ঐ চোয়ালটি কোনো নিয়ানডারথল যুগের মানুষের নয় তারই মৃত নিজের দাদার চোয়াল।

**ব্যর্থতম ফাঁসি দণ্ড :**
১৯১২ সালে মোনাকোতে এক লোকের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স থেকে একজন ফাঁসুড়েকে আনা হয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ফাঁসুড়ে ফাঁসি দেওয়ার খরচ বাবদ ১০,০০০ ফ্রা দাবি করে বসে। জেল কর্তৃপক্ষ এই খরচে রাজি না হওয়ায় ঐ ব্যক্তি ফাঁসি না দিয়েই ফ্রান্স ফিরে যায়। মোনাকোতে তখন কোনো ফাঁসুড়ে না থাকায় ঐ লোকের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করা হয়। তৎকালীন আইন অনুযায়ী ফাঁসির আসামিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগ পর্যন্ত প্রত্যেকদিন সুস্বাদু খাবার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়। কাজেই ঐ কয়েদি পরবর্তী আরো ত্রিশ বছর রাজার হালে ঐ জেলখানায় কাটিয়ে দেয়। এবং একদিন জেলখানার ভিতর তার খুব স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। বলাই বাহুল্য ঐ ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনো ফাঁসুড়ে জোগাড় করা ঐ জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

**ব্যর্থতম চোর :**
১৯৬৪ সালের ফ্রান্সের প্যারিসে পল নিমো নামে এক চোর চুরির ইতিহাসে বোধ করি ব্যর্থতম চোর হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সে এক বাসায় চুরি করতে ঢুকে দেখে সে বাসায় রাতে এক পার্টি হওয়ায় খাওয়ার টেবিলে তখনো প্রচুর খাবার। সে নিজেও ক্ষুধার্ত থাকায় আয়েশ করে খেয়ে নেয়। এবং রকিং চেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুলতে থাকে। এবং অচিরেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। এবং টানা দুদিন ঘুমায় (পার্টির বাড়িতে কেউ ছিল না, তারা পার্টি করে বেড়াতে গিয়েছিল)। তৃতীয় দিনে বাড়ির কর্তা তাকে ঘুম থেকে ডেকে উঠায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ আমারবই.কম

**ব্যর্থতম সীমানা :**

ভেনিজুয়েলা ও কলম্বিয়ার সীমান্তের ঠিক মাঝখানে একটি বাড়ি আছে, বাড়িটির শোবার ঘরটি পড়েছে কলম্বিয়ার ভেতর। ঐ বাড়ির মালিক এক ভয়ঙ্কর অপরাধী যার বিরুদ্ধে ভেনিজুয়েলার পুলিশের কাছে রেকর্ড আছে। পুলিশ যখনই তাকে ধরতে যায় তখনই সে চট করে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দেয়। শোবার ঘরটি কলম্বিয়ার মাটিতে হওয়ায় ভেনিজুয়েলার পুলিশ দরজা ভাঙতে পারে না। বলাই বাহুল্য, ঐ দাগি আসামি আবার কলম্বিয়ার পুলিশের কাছে সাধু সেজে থাকে। শোবার ঘরের ব্যাক ডোর দিয়ে ঐ যোগাযোগ সে নিয়মিত রক্ষা করে চলে।

**ব্যর্থতম বিচার :**

সুইডিশ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে র‍্যানি নামে এক মহিলাকে ধরে আনা হয়। তার অপরাধ সে বিভিন্ন দোকান থেকে প্রায় প্রতিদিনই নানান জিনিস চুরি করে থাকে। পরে ম্যাজিস্ট্রেটদের বাক-বিতণ্ডায় প্রমাণিত হল যে র‍্যানি আসলে একজন ক্লিপ্টোম্যানিয়াক রোগী। এবং তাকে সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হয় কোনো সাজা না দিয়েই। মহিলা কোর্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর দুই ম্যাজিস্ট্রেটের একজন তাঁর কালো কোট খুঁজে পেলেন না, দ্বিতীয় জন তাঁর মানিব্যাগ। মহিলা অবশ্য ততক্ষণে হাওয়া!

**ব্যর্থতম সমন :**

বলিভিয়ার লা পাবে এক সার্কাস কর্মীর বিরুদ্ধে কোর্ট থেকে সমন জারি করা হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার হাতে এ সমন পৌছাতে হবে অন্যথায় ঐ সমন বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সমন নিয়ে যখন পুলিশ সার্কাস গ্রাউন্ডে পৌছল তখন সার্কাসের সমনপ্রাপ্ত লোকটি রনপা পরে খেলা দেখাচ্ছিল। পুলিশ তাকে নেমে এসে সমনটি গ্রহণ করতে অনুরোধ জানায় কিন্তু লোকটি রনপা থেকে নামতে অস্বীকৃতি জানায় এবং পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা অনুরোধ-অস্বীকৃতির টানাপোড়েন চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হওয়ায় সার্কাসের লোকটি সমন জারি থেকে বেঁচে যায়!

**ব্যর্থতম ভ্রমণ :**

স্পেনে বেড়াতে গিয়ে মিসেস স্পেন্সারের হাত ব্যাগ খোয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ 'টুরিস্ট প্রোটেক্ট পেট্রল স্কোয়াড'কে জানান। চারদিন পর তাঁকে জানানো হয় আপনার ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে তবে ভিতরে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। মিসেস স্পেন্সার ভাবলেন মন্দের ভালো, ব্যাগটাই গ্রহণ করা যাক না। ব্যাগটা ফেরত নিতে গিয়ে সাইন করতে হয় একটা ফেরত প্রাপ্তি খাতায়। তাঁর কাছে কলম ছিল না বলে তিনি কলম চাইলে ঐ বিশেষ স্কোয়াডের লোক যে কলম এগিয়ে দেয় তিনি দেখেন সেটি তাঁরই ব্যাগের ভিতর থাকা একটি কলম। তিনি কিছু না বলে হতাশ হয়ে শূন্য ব্যাগটি নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এবং ঐ অফিসের বাইরে এসে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে তিনি যখন সিগারেট ধরানোর জন্য লাইটার খুঁজছেন তখন স্কোয়াডের একজন ভদ্রতা বশত এগিয়ে এসে তাঁর লাইটার জ্বালিয়ে মিসেস স্পেন্সারের সিগারেটটি ধরিয়ে দেয়। মিসেস স্পেন্সার খেয়াল করেন ঐ লাইটারটিও তাঁরই, ঐ কলমের সঙ্গেই যা খোয়া গেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ব্যর্থতম উদ্ধার অভিযান :**
১৯৭৮ সালের ১৪ জানুয়ারিতেই সম্ভবত পৃথিবীর সবচাইতে সফল পশু উদ্ধার ঘটনাটি ঘটে ব্রিটেনে। এক বৃদ্ধার পোষা বিড়াল ছানাটি কীভাবে যেন এক বিশাল বৃক্ষের মগডালে উঠে আটকে যায়! তখন দমকল বাহিনীর ধর্মঘট চলছিল বলে ব্রিটিশ সৈন্যরা বিপুল উদ্যমে ঐ বিড়ালটিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে। এবং অসাধারণ দক্ষতায় বিড়ালটি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। সমস্ত ব্যাপারটিতে বৃদ্ধা এতই খুশি হন যে তিনি উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ঐ সৈন্যদের না খাইয়ে ছাড়েন না। পরের পর্ব বেশ দ্রুত শেষ হয়। সৈন্যরা বিদায় পর্ব শেষ করে গাড়িতে উঠে যাওয়ার সময় উদ্ধারকৃত বিড়ালটিকে চাপা দিয়ে চলে যায়। বলাই বাহুল্য বিড়ালটি কোন ফাঁকে যে বৃদ্ধার কোল থেকে নেমে গাড়ির তলায় আশ্রয় নিয়েছিল তা কারোরই জানা সম্ভব হয় নি।

**ব্যর্থতম সুইসাইড কেস :**
প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নিউইয়র্কের এক পেইন্টার 'অ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং'-এর ছিয়াশি তলা থেকে লাফ দেয়। কিন্তু সেদিনটায় আবার ভয়াবহ বায়ু প্রবাহ চলছিল। সেই প্রবাহের ধাক্কায় সে তিরাশিতলায় অবস্থিত এনবিসি টেলিভিশনের স্টুডিওর কাচ ভেঙে ভিতরে গিয়ে পড়ে। সেখানে তখন আবার একটা লাইভ শো চলছিল যার বিষয় ছিল 'বেঁচে থাকার নানান বিড়ম্বনা'। উপস্থাপক ঘটনার আকস্মিকতায় বিন্দু মাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে অনুষ্ঠান চালিয়ে যান এবং আছড়ে পড়া ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করেন। সেই ব্যক্তি জানায় সে নিজেকে এই মুহূর্তে ভাগ্যবান মনে করছে কারণ সে লাফ দেওয়ার পরপরই তার আত্মহত্যার ইচ্ছে চলে যায়! সে আসলেই ভাগ্যবান ছিল কারণ ঐ অনুষ্ঠানে আবার তার ছ্যাক দেওয়া সেই প্রেমিকাও দেখছিল এবং সে এই ঘটনায় আবেগে আপ্লুত হয়ে তার প্রেমিকের কাছে পুনরায় ফিরে আসে!

**ব্যর্থতম বক্তা :**
পৃথিবীতে বিখ্যাত বক্তার অভাব নেই। তবে ১৯৭৭ সালে লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক ড. ডেভিড কাওয়ার্ড সম্ভবত পৃথিবরি ব্যর্থতম বক্তা হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তিনি এক সেমিনারে 'প্রশ্রাবখানার সমস্যাবলির' উপর বক্তব্য রাখতে গেলে সেমিনারের আশি ভাগ দর্শক আক্ষরিক অর্থেই নাক ডাকতে শুরু করেন। বাকিরা হল ত্যাগ করে (সম্ভবত তারা বাড়িতে গিয়ে নাক ডাকতে শুরু করেন!) পরে ঐ বক্তৃতাটি 'বছরের সেরা বিরক্তিকর বক্তৃতা' হিসেবে স্থানীয় আরেকটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করে।

**ব্যর্থতম সিঁধেল চোর :**
পৃথিবীর ব্যর্থতম সিঁধেল চোরের ঘটনাটি ঘটেছে বোধ করি বাংলাদেশেই!...এলাকায় (এলাকার নাম উল্লেখ করলাম না সেই এলাকার লোকজন আহত হতে পারে) ছিল এক সিঁধেল চোর! তারা তিন পুরুষ ধরেই এই কাজ করে। কিন্তু আমাদের আলোচিত চরিত্র যার নাম ছিল কাইয়ুম চোর। সে ছিল অপেক্ষাকৃত অলস আর বোকা প্রকৃতির। একদিন এক বর্ষণমুখব রাতে তার স্ত্রী ক্ষেপে গেল।

: বলি ঘরে বসে আর কত দিন?
: শরীরটা ভালো ঠকছে না আজ।
: ওসব হবে না আজই বেরও...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্ত্রীর ঘ্যান-ঘ্যানানিতে শেষ পর্যন্ত সে বের হল সে রাতেই। আগেই বলেছি সে অলস প্রকৃতির, তার ওপর বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। অন্ধকারে এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘোরা-ঘুরি করে নিজের এলাকাতেই চুরি করার সিদ্ধান্ত নিল। এক বাড়ির পিছনে গিয়ে হাজির হল। মাটি খোঁড়া শুরু করল। মাটি নরম হয়ে আছে। প্রমাণ সাইজের সুরঙ্গ খুঁড়তে খুব বেশি সময় লাগল না। এবার সুরঙ্গ দিয়ে সাবধানে ঢুকল সে। গৃহস্থের অন্ধকার ঘরে টুকটাক জিনিস সরাল। দেখে বিছানায় বাড়ির বউ বাচ্চা নিয়ে ঘুমাচ্ছে গায়ে কাঁথা দিয়ে। ভাবল কাঁথাটা নিলে কেমন হয়! সাবধানে কাঁথাটি টেনে নিয়ে সব তার ঝোলায় ঢুকাল। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সুরঙ্গ দিয়ে! বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে এদিক-সেদিক ঘুরেফিরে নিজের বাড়িতে পৌছাল। বাড়িতে ঢুকে দেখে মহা হাউকাউ! কী ব্যাপার? ব্যাপার আর কিছু নয় তার বাড়িতেও সিঁধেল চোর ঢুকেছিল। তবে চুরির মালামাল খোয়া যায় নি। সবই বেরুল কাইয়ুম চোরের ঝোলা থেকে! সে নিজেই নিজের বাড়িতে সিঁধ কেটেছিল!

**ব্যর্থতম পশুরাজ সিংহ :**

ইতালির এক সার্কাস থেকে এক সিংহ কীভাবে যেন ছুটে যায় এবং রাস্তায় এসে সে একটা ছোট ছেলেকে তাড়া করে। ওদিকে ছেলেটির মা রাস্তার পাশেই এক পার্কের বেঞ্চিতে বসে কিছু একটা সেলাই করছিলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখে ভয়ানক ক্ষেপে যান। তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ঐ সিংহকে সেলাইয়ের কাঁটা দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ সার্কাসের লোকজন ছুটে এসে তাকে বাধা দেয়। পরে ঐ মাকে বীরের সম্মান না দিয়ে উল্টো সিংহকে আহত করার অপরাধে পশু ক্লেশ আইনে জরিমানা করা হয়। তবে কড়া প্রকৃতির ঐ মাও পাল্টা কেস করলে ব্যাপারটা বেশি দূর আর গড়ায় না।

**ব্যর্থতম ডকুমেন্টারি ফিল্ম :**

ব্রিটিশ এয়ার ক্রাফট করপোরেশন একবার একটা ডকুমেন্টারি ছবি তৈরি করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যর্থতম ডকুমেন্টারি ফিল্ম বোধ করি এটাই! ছবির বিষয় হচ্ছে ব্রিটিশ এয়ার করপোরেশনের নিজস্ব কারখানায় প্রটেকটিভ গগলস না পরে কাজ করলে কী ক্ষতি হতে পারে তার বিতং বর্ণনা! সেই ছবির প্রেস শোতে সব কর্মচারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কিন্তু ছবি শুরু হওয়া মাত্র তিনজন ভয়ে অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যান। বিশ থেকে পঁচিশ জন ছুটে বের হয়ে যান ভয়ের চোটে। এবং বাকি অধিকাংশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় কর্মকর্তারা ছবি বন্ধ করে দেন। এবং পরিচালককে ডেকে প্রশ্ন করা হয় 'আপনাকে কি হরর ছবি বানাতে বলা হয়েছে না গগলসের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে? পরিচালক কী উত্তর দিয়েছিলেন তা জানা যায় নি তবে ব্রিটিশ এয়ার ক্রাফট করপোরেশনের কারখানার অনেকেই ঐ ডকুমেন্টারি দেখার পর চাকরি ছেড়ে দেন।

**ব্যর্থতম গাড়ির ইঞ্জিনের ডিজাইনার :**

ফ্রান্সিস ওয়েব বোধকরি পৃথিবীর ব্যর্থতম গাড়ির ইঞ্জিনের ডিজাইনার! তিনি বহু ডিজাইন করেন তাঁর জীবনে এবং প্রতিটি ডিজাইন দেখেই সব গাড়ির কোম্পানি প্রশংসা করে কিন্তু রহস্যময় কারণে কেউ তা কার্যকর করার উদ্যোগ নেয় না। শেষ পর্যন্ত একটি কোম্পানি তাঁর একটি ডিজাইন পছন্দ করে এবং কাজে নেমে পড়ে। অর্ধেক কাজ করার পর হঠাৎ তারা আবিষ্কার করল যে এই গাড়ির ইঞ্জিন একটা হলেও তার হুইল দুটা। এর ব্যাখ্যা তার কাছে চাওয়া হলে তাঁকে পাওয়া যায় না কারণ তিনি তখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে গির্জায় ব্যস্ত!


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ব্যর্থতম ধর্মীয় র‍্যালি :**

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের ঘটনা। ইংল্যান্ড হেয়ার ফোর্ড কেথেড্রাল নামে একটা ধর্মীয় সংগঠন প্রতি বছর 'মার্ক হোলি অকেশন' উপলক্ষে বিশাল র‍্যালি করত। এই বিখ্যাত র‍্যালিতে তাদের ধর্মীয় প্রধান সিদ্ধান্ত নিলেন যে প্রতিবারই তিনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটে পড়তে পড়তে যান এবার একটু পরিবর্তন আনতে চান সেটা হচ্ছে তিনি ঘোড়ায় চড়ে ধর্মগ্রন্থ পড়তে পড়তে এগুবেন পিছনে থাকবে বিশাল মিছিল। এতে করে সুবিধা হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ পড়া সহজ হবে। যেই কথা সেই কাজ! যথারীতি তিনি নির্দিষ্ট দিনে ঘোড়ায় চড়ে পবিত্র বাণী পড়তে পড়তে এগিয়ে চলেছেন। মাদি ঘোড়াটি শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তাকে নিয়ে। তাদের র‍্যালিটি যখন একটি ঘোড়ার আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ একটা পুরুষ ঘোড়া ছুটে এসে র‍্যালির সম্মুখের মাদি ঘোড়াটির সঙ্গে যে কাণ্ডটি করল তাতে করে হেয়ার ফোর্ড কেথেড্রালের ধর্মীয় প্রধানের ধর্মীয় বাণী পড়া তো পরে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল। তা ছাড়াও দুই ঘোড়ার ঐ রোমান্টিক কর্মকাণ্ডে চারদিকে একটা চাপা হাসির রোল উঠল যা সহ্য করা ঐ ধর্মীয় প্রধানের জন্য সত্যিই কষ্টকর ছিল। এ ঘটনায় ঐ র‍্যালিই পণ্ড হয়ে যায়!

**ব্যর্থতম বিচারক :**

১৯৬৭ সালের ঘটনা। নিউ স্টেটমেন্টে এই রিপোর্টটি ছাপা হয়। এক আসামির বিচার চলছিল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামি বলছিল, 'ধর্মাবতার আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ! আমার কেসটা বুঝতে হলে আপনাকে এই হ্যান্ডকাফটি হাতে পরে দেখতে হবে, না হলে আপনি এই কেসের মর্মই বুঝতে পারবেন না।'

কৌতূহলী বিচারক রাজি হলেন। উপস্থিত পুলিশ চাবি দিয়ে আসামির হ্যান্ডকাফ খুলে বিচারককে পরিয়ে দিল।

বিচারক বললেন, এবার?

—চাবিটি আমার হাতে দেওয়া হোক ধর্মাবতার, তা হলে আমি বুঝিয়ে দিব ব্যাপারটা

বিচারকের নির্দেশে পুলিশ তার হাতে চাবি দিল। আর চাবি হাতে পেয়ে আসামি কাঠগড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল বিচারকের দিকে। তারপর আচমকা চাবি নিয়ে লাফিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিল দৌড়!

পরে হাতকড়ায় আটকানো বিচারককে মুক্ত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল!

**ব্যর্থতম জোক বক্তা :**

প্রফেসর জোনসকেই আমরা ব্যর্থতম জোক বলিয়ে হিসেবে বিচার করতে পারি। তিনি আত্মভোলা টাইপের একজন বয়স্ক পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। তো এই বয়স্ক শিক্ষকের খুব শখ জোক বলে কোনো পার্টিতে সবাইকে হাসাবেন। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে না। কোনো পার্টিতেই তিনি কোনো জোক মনে করে উঠতে পারেন না বলে আর জোক বলা হয়ে ওঠে না। একবার অবশ্য তাঁর সে সুযোগ হল। সেটা ছিল একটা আধা ঘরোয়া আধা অফিসিয়াল পার্টি। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পর সবাই একটা একটা জোক বলছে। এক পর্যায়ে বৃদ্ধ প্রফেসর হাত তুললেন, তিনি একটা জোক বলতে চান। সবাই খুশি যাক এবার বৃদ্ধ প্রফেসরের জোক মনে পড়ছে! তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে পড়া জোকটি বললেন। শুনে সবাই হু হু করে হাসল। প্রফেসর খুশি মনে বসলেন। পাশে বসা স্ত্রীকে বললেন, 'দেখলে

তো ঠিক ঠিক জোকটা বলে শেষ করতে পেরেছি।' স্ত্রী কিন্তু যথেষ্ট গম্ভীর। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে স্ত্রী ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি যে জোকটা বললে তোমার আগের জন সেই জোকটাই বলে সবাইকে হাসিয়েছে!'

**ব্যর্থতম প্রেমিক-প্রেমিকা :**

ঘটনাটি ভারতের। বর্ধমান জেলার এক গ্রামে এক মেয়ে আর এক ছেলের প্রেম হয়ে গেল। কিন্তু দুজনেই গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়ে। এক পর্যায়ে মেয়েটি আরেক গ্রামে গেল কাজের সন্ধানে। সেখানে সে একটি বিড়ি বাঁধার দোকানে কাজ নিতে গেল। সেখানে কাজ নিতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল যে সেখানে ছেলেদের বিড়ি বাধার রেট দৈনিক ৫ টাকা আর মেয়েদের রেট ৪ টাকা। মেয়েটি বেশি আয়ের আশায় ছেলে সেজে ছেলেদের দলে ভিড়েই বিড়ি বাঁধতে লাগল। এদিকে প্রেমিক ছেলেটি প্রেমিকার খোঁজে এসে হাজির হল সেই বিড়ির কারখানায়। সে মেয়েটির সন্ধান লাভের আশায় মেয়ে সেজে মেয়েদের দলে ভিড়ে গিয়ে বিড়ি বাঁধতে লাগল! এভাবে দিনের পর দিন দুজন দু জায়গায় বিড়ি বেঁধে চলল, কারো সাথে কারো দেখা হল না!

**ব্যর্থতম পরামর্শক :**

মেক্সিকোর জনাথন ছিলেন মূলত ফ্যাশন ডিজাইনার। কিন্তু তাঁর ডিজাইনকৃত একটি বোতাম কণ্টকিত পোশাক পরে এক হার্টের রোগীর হার্ট অ্যাটাক হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয় নি কারণ তাঁর বোতাম কণ্টকিত পোশাক খুলতে খুলতেই রোগী মারা যায়। এই ঘটনা চারদিকে চাউর হলে তাঁর ডিজাইনকৃত পোশাকের ব্যবসা ফল করে। ফলে বছর খানেকের মধ্যে জোনাথন তাঁর ব্যবসা পরিবর্তন করে নতুন ব্যবসা খুলেন। সেটা হচ্ছে 'মুখশ্রী উন্নয়ন কেন্দ্র'। মানে জোনাথনের কাছে যে সমস্ত ক্লায়েন্ট আসে তাদের তিনি পরামর্শ দেন কীভাবে মুখশ্রী আরো আকর্ষণীয় করা যায়। কাউকে তিনি বলেন ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি রাখতে কাউকে বা জুলফি, কাউকে কানে দুল পরার পরামর্শ দেওয়া। প্রথম দিকে এই নতুন ধরনের ব্যবসা জমে উঠলেও হঠাৎ করেই তাঁর ব্যবসায় রাতারাতি ধ্বস নামে যখন তিনি এক মহিলাকে চেহারা আকর্ষণীয় করার জন্য গোঁফ রাখার পরামর্শ দেন। পরে অবশ্য তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন যে মহিলাকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন নি যে তিনি একজন নারী।

**ব্যর্থতম শিক্ষক :**

আফ্রিকার এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক প্রাইমারি স্কুল। স্কুলের অবস্থা খুবই খারাপ। ঐ স্কুলে ক্লাস শেষ হয়েছে বা ছুটি হয়েছে এটা জানানোর জন্য কোনো ঘণ্টা ছিল না। ফলে তাঁরা ক্লাস শেষ হলে বা ছুটির আগে স্কুলের বাইরে অপেক্ষমাণ এক আইসক্রিমওয়ালার কাছ থেকে ঘণ্টি ধার করে এনে বাজাত। কিন্তু এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে আইসক্রিমওয়ালা ঐ স্কুলে ঘণ্টার বিনিময়েই শিক্ষকের চাকরি দাবি করে বসে। স্কুলে শিক্ষকের কিছু স্বল্পতাও ছিল প্লাস ঘণ্টির জন্যও তার চাকরি হয়ে যায় ঐ স্কুলে। কিন্তু কিছুদিন বাদে ঐ ঘণ্টি স্কুল থেকে চুরি হয়ে গেলে আইসক্রিমওয়ালা থুড়ি ঐ শিক্ষকের চাকরি চলে যায়।

**ব্যর্থতম লাইব্রেরি মেম্বার :**

১৯২৩ সালের ঘটনা। সিনসিনাটি মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে এক তরুণ ডাক্তার যখন চক্ষু বিষয়ক একটি বই ফেরত দিতে এল। তখন লাইব্রেরিয়ানের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কারণ বইটি নেওয়ার সাল লেখা আছে ১৮২৩ সাল। প্রায় একশ বছর পার হয়ে গেছে। কারণ বইটি নিয়েছিল তরুণটির প্রপিতামহ। নানা কারণে তিনি বইটি ফেরত দিতে ভুলে যান। এবং তার পুত্রও ভুলে যান, ফলে নাতির হাতে এসে পড়ে। তরুণকে জানানো হল তার ফাইন হয়েছে সাড়ে ছয় হাজার ডলার। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা মওকুফ করা হয়। কেননা এরকম এন্টিক একটা বই ফেরত পাওয়াতে তারা খুশি।

**ব্যর্থতম জেল সিক্যুরিটি :**
গভীর রাতে লন্ডনের এক খ্যাতিসম্পন্ন জেলখানায় বেজে উঠল সাইরেন। জেল সিক্যুরিটি পুলিশের সার্চলাইট প্রাচীরের ওপর পড়তেই তাতে ধরা পড়ল একজন কয়েদি, সে দেওয়াল টপকানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। সাথে সাথে সমস্ত পুলিশ এসে দারুণ মুন্সিয়ানার সাথে তাকে গ্রেফতার করে। অচিরেই জেলপালানোর চেষ্টার অভিযোগে তার বিচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়ে আসামি জানায় যে সে মোটেও জেল পালাচ্ছিল না, বরং জেলে ঢোকার চেষ্টা করছিল! হতভম্ব জেল কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে জানতে পারে যে—স্বল্পমেয়াদি কয়েদিরা তাদের কারাগার থেকে বাইরে বের হওয়ার একটি গোপন রাস্তা বানিয়ে রেখেছে এবং প্রতি রাতে শুধু মাত্র একজন কয়েদি সুযোগ পায় বাইরে গিয়ে কাছের একটি বারে মদ খেয়ে আসার। গভীর রাতে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়। এবং দারুণ নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও এভাবেই চলে আসছিল ঐ কয়েদি ধরা না পড়া পর্যন্ত।

**ব্যর্থতম দোকান লুট :**
একসময়ে ইংল্যান্ডের সমুদ্রতীরবর্তী ব্রাইটন শহরে দোকানের কাচ ভেঙে দোকান লুটের হার ভীতিকর হারে বেড়ে যায়। সেরকমই একটি দোকানে কয়েকবার এরকম লুট হবার পর এক দোকানি বুদ্ধি করে বুলেটপ্রুফ কাচ লাগায়। পরদিন ভোরে দোকান খুলতে এসে দেখে দোকানের সামনে এক লোক অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। পরে জানা যায় যে সেই ব্যক্তি আসলে এসেছিল দোকানের কাচ ভেঙে লুটের উদ্দেশ্যে কিন্তু কাচ ভাঙার উদ্দেশ্যে ইট মারতে সেটা বুলেটপ্রুফ কাচে ধাক্কা লেগে উল্টো তাকেই ধরাশায়ী করে ফেলে। বলাই বাহুল্য, সে হতভাগ্য চোরটির জ্ঞান ফেরে পুলিশি হেফাজতে।

**ব্যর্থতম হুমকি :**
১৯২২ সালের দিকে লিডসের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এক ব্যক্তির নামে মাতলামির অভিযোগ আসতে শুরু করে। কোর্টও প্রতিবার তাকে শুধু হুমকি দিয়েই ছেড়ে দিত। এভাবে চলতে চলতেই একসময় সে ৫০০তম বারের মতো কোর্টে উপস্থিত হয় এবং এবারেও কোর্ট তাকে স্রেফ হুমকি দিয়েই ছেড়ে দেয়। তবে বিপত্তিটি ঘটে কোর্ট থেকে বের হবার পর। ৫০০তম বারের কোর্ট পদার্পণ করা উপলক্ষে সে আবারো মদে চুর হয়ে মাতলামি করা শুরু করে। তবে এবার ৫০১ তম বারের সময় তাকে জরিমানা করা হয়।

**ব্যর্থতম উপস্থাপক :**
ব্রিটেনেব জনপ্রিয় প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে 'ডের্জাট আইল্যান্ড ডিস্ক' অন্যতম। একবার অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক ঔপন্যাসিক অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সিদ্ধান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিলেন। যথারীতি অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হল। সবকিছু ঠিকঠাক। ক্যামেরা লাইট সব রেডি। তিনি এলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল

: আপনি কতদিন যাবত লেখালেখি করছেন?

: আমি তো লেখালেখি করি না।

: কেন 'গানস অফ নাভারন' আপনার লেখা নয়?

: মাফ করবেন আমি অ্যালিয়েস্টার ম্যাকলিন নই।

: মানে?

: মানে আমি উনার সেক্রেটারি...উনি আমাকে পাঠিয়েছেন জানাতে যে উনি সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন না।

বলাই বাহুল্য অনুষ্ঠানটি লাইফ প্রোগ্রাম ছিল। আর উপস্থাপক আগে কখনো অ্যালিয়েস্টার ম্যাকলিনকে চর্মচক্ষে দেখেন নি!

**ব্যর্থতম কিস্তিদাতা :**

১৯৬৩ সালের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ার সিডনির জন ফিন্টন পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তো একদিন তিনি একটা খুব দামি ফ্রিজ কেনেন। ফ্রিজটা কেনেন তিনি ইনস্টলমেন্টে। ফ্রিজের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পরপরই তিনি স্থানীয় একটি মিথ্যে মার্ডার কেসে ফেঁসে যান এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর জেল হয়ে যায় দশ বছরের জন্য। তিনি কিছুই করতে পারেন না। দশ বছর পর জেল থেকে বের হয়ে তাঁর খেয়াল হয় ফ্রিজের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয় নি। তিনি তখন তখনি ছুটে যান দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে। কিন্তু তাঁর কিস্তির টাকা নেওয়ার জন্য তখন আর ঐ ফ্রিজের কোম্পানি বসে নেই। কিন্তু 'কিস্তি খেলাপি'র জন্য তার বিরুদ্ধে মামলার কারণে তাঁকে দ্বিতীয় কিস্তিতে জেলে ঢুকতে হয়, তবে এবার অবশ্য মাত্র ছয় মাসের জন্য!

**ব্যর্থতম ধূমপায়ী :**

কলম্বিয়ার মাইকেল জর্জ কখনোই ধূমপান করতেন না। কিন্তু বিয়ের পর তার স্ত্রী তাকে ধূমপান করতে উৎসাহিত করেন। কেননা তার স্ত্রীর ধারণা পুরুষ মানুষ সিগারেট না খেলে 'ম্যানলি' লাগে না। স্ত্রীর অনুরোধে জর্জ একদিন বিমর্ষমুখে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে এনে একটি ধরালেন! সিগারেটে টান দেওয়া মাত্র তিনি কাশতে কাশতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় হাসপাতালে নিতে হল। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে মাইকেল জর্জ একটি চিঠি পেলেন। স্ত্রীর পাঠানো ডিভোর্স লেটার!

**ব্যর্থতম পর্নোগ্রাফি :**

১৯৭০ সালে সুইডেনের এক পর্নোগ্রাফিক পত্রিকা প্রকাশককে পুলিশ তৎকালীন প্রকাশনা আইনে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। তার গ্রেফতারের কারণ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ক্রেতারা অভিযোগ করে যে সে বিজ্ঞাপনে তার পত্রিকাটিকে যতটা উত্তেজক বলে প্রচার করেছে বাস্তবে ততটা ছিল না।

**ব্যর্থতম সঙ্গীত প্রতিযোগিতা :**

১৯৭৭ এ ওয়েলসের সঙ্গীত প্রতিযোগিতাটিই বোধ করি পৃথিবীর ব্যর্থতম সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। কারণ প্রচুর প্রচারণা চালানোর পরও সেই প্রতিযোগিতায় কোনো গায়কই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসে নি। একমাত্র যে গায়ক মি. হাক্সালি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন সেও ৪৫ মিনিট দেরি করে আসেন। ফলে বিরক্ত কর্তৃপক্ষ হাক্সালিকে একমাত্র প্রতিযোগী হলেও তাকে দেরি করার শাস্তিস্বরূপ দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। এতে হাক্সালিও ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোষণা করেন যে তিনি দ্বিতীয়বার আর এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিবেন না।

**ব্যর্থতম মামলা :**
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় পশু নিয়ন্ত্রণের অধিদপ্তরের গাড়ির চাকার নিচে চাপা পড়ে মারা যায় জিম এটকিনসের ফক্সটেরিয়ার কুকুর 'বাফি'। এতে ক্ষিপ্ত জিম এটকিনস পশু নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা করে কিন্তু জিম এটকিনস উল্টো মামলায় হেরে গিয়ে জেলে ঢোকে। কারণ তার কুকুর ফক্স টেরিয়ার বাফির গলার বেল্টে কোনো 'ভ্যাকসিনেশন ট্যাগ' লাগানো ছিল না অর্থাৎ কুকুরটিকে সময়মতো সঠিক সময়ে টিকা দেওয়া হয় নি। দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার আগে কুকুরটি তো টিকা না দেওয়ার জন্য রোগে শোকেও মারা যেতে পারত!

**ব্যর্থতম ছড়া :**
ইংল্যান্ডের উত্তর লন্ডনের সকল নার্সারি স্কুলে 'বা বা ব্ল্যাকশিপ' ছড়াটি হঠাৎ করে নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় ছড়াটির মধ্যে বর্ণবাদের ইঙ্গিত আছে। তিন মাস পরে ঘোষণা দেওয়া হয় ব্ল্যাকশিপের পরিবর্তে গ্রিনশিপ বলা হলে ছড়াটি পুনরায় স্কুলে পড়ানো যেতে পারে।

**ব্যর্থতম গোপন অস্ত্র :**
ফ্র্যাংকো-প্রুশান যুদ্ধ সবচেয়ে আলোচিত ছিল 'মিট্রোলিইস মেনিন গান' নামক একটি গোপন অস্ত্র ব্যবহারের কারণে। এটা সেই যুদ্ধের জন্যই বিশেষভাবে ডিজাইন করা ছিল এবং ফ্রেঞ্চ সৈনিকরা ছিল এর ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। তবে এর ব্যবহার ও প্রথম মাঠে নামানোর বিষয়গুলো এতই গোপন রাখা হয়েছিল যে, ১৮৭০ সালে সম্মুখযুদ্ধের প্রথম দিন পর্যন্তও সৈনিকরা জানতে পারে নি এর ব্যবহাররীতি! এবং যতক্ষণে তারা তা জানতে পারে ততক্ষণে 'বড্ড বেশি দেরি' হয়ে গিয়েছিল।

**ব্যর্থতম ডাক্তার :**
স্পেনের হুয়ান সানচেস বোধ করি পৃথিবীর ব্যর্থতম ডাক্তার। পরপর চৌদ্দ বার সার্জারিতে ফেল করার পর তার স্ত্রী তাকে আর পরীক্ষা না দিয়ে বরং তার ছেলের ডাক্তারি পড়াটা দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করে কেননা তখন তার ছেলেরও সার্জারি পরীক্ষা চলছিল। কিন্তু বাবা নিজের সার্জারি পরীক্ষার ব্যাপারেই বেশি সিরিয়াস ছিলেন। যথারীতি ছেলে পাস করে গেলেও বাবা ফেল করেন। পরে বাবা যখন ৩২ তম সার্জারি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন তখন 'নন ডক্টর'সদের একটি সংগঠন তাকে বাধা দেয়। কেননা তিনি এবার পাস করে গেলে তাঁকে আর সংবর্ধনা দেওয়া যাবে না। হুয়ান অবশ্য সংবর্ধনা থেকে পরীক্ষা দেওয়াটাকেই জরুরি মনে করেন।

**ব্যর্থতম শিকারি :**
উইলিয়াম ফকনার বোধ করি পৃথিবীর ব্যর্থতম শিকারি। জিম করবেটের বিশেষ ভক্ত এই শিকারির দাদা ছিলেন একজন নামকরা শিকারি। দাদার নাম রাখতেই বোধ করি

দুনিয়ার পাঠক এক হও~১৬৩মারবই.কম

তিনি একদিন দোনালা বন্দুক নিয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে চিতা শিকারে বের হন। তবে জঙ্গলে ঢোকার আগেই তিনি স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন। দুটি কারণের প্রথম কারণ তাঁর বন্দুকের লাইসেন্স ছিল না। দ্বিতীয় কারণ জঙ্গল মনে করে তিনি যেখানে ঢুকেছিলেন সেটা ছিল একটা প্রাইভেট গলফ খেলার মাঠ। তাকে ছ মাস জেল খাটতে হয়। ঐ ছ মাসে তিনি জেলখানায় বসে জিম করবেটের বাকি সব বই পড়ে শেষ করে ফেলেন।

**ব্যর্থতম রাজনৈতিক হত্যা প্রচেষ্টা :**

ভাগ্য ভালো ফিদেল ক্যাস্ট্রোর। ১৯৭৪ সালের ভেতরেই অন্তত ২৪ বার তাঁকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয় এবং প্রতিবারই তা ব্যর্থ হয়। একবার, কোল্ড ক্রিমের ডিব্বায় রাখা বিষ ভরা ক্যাপসুল গলে যায়, কালো চুলের এক মায়াবিনী ঘাতক উল্টো ফিদেলের প্রেমে পড়ে যায়, টার্গেট মিস করা প্রচুর পয়জন পেলেটস কিউবান গাছদের ক্ষতিই বেশি করে, দুজন ধরা পড়ে যায় এক আস্ত বাজুকা নিয়ে এক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পার হবার সময়, বিষ মাখিয়ে ফ্রিজে রাখা চকলেট মিল্ক শেক খাবার আগেই বরফ হয়ে তা খাবার অযোগ্য হয়ে যায় এবং বিস্ফোরিত একগাদা 'সি শেল' ক্যাস্ট্রোকে মাত্র চল্লিশ মিনিটের জন্য মিস করলেও মূল হাভানা শহরের সমস্ত ট্রাফিক লাইট ফিউজ করে দিতে সক্ষম হয়।

**ব্যর্থতম শেয়াল শিকার :**

উত্তর যুক্তরাজ্যে আছে এক শেয়াল শিকারির দল। শেয়াল শিকারের সকল কৌশলে তারা বিশেষজ্ঞ, তাদের চলাচল ঘোড়ায় চড়ে, তারা গায়ে পরে বিশেষ লাল ইউনিফর্ম এবং শিকারে বেরুবার সময় তাদের সাথে থাকে নানান অস্ত্র। তবে ১৯০১ সাল থেকে তারা কয়টি শেয়াল মারতে পেরেছে সে প্রশ্নের জবাব হচ্ছে 'একটিও নয়', তবে তারা একটি বড় খরগোশ মেরেছিল। এ সফল শিকারের কৌশল ও ধরনের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলে তাদের দলের 'হান্ট মাস্টার' জানান 'ইয়ে...মানে, ওটা আমাদের একটা ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়েছিল!

**ব্যর্থতম পাণ্ডুলিপি :**

গিলবার্ট ইয়ংয়ের লেখা 'বিশ্ব সরকার বিপ্লব' বইটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদের কাছ থেকে ১০৫ বার ফেরত আসে। অবশেষে ইয়ং সাহেব রাশান এম্বাসেডরের কাছে চিঠি লেখেন যদি তার দেশের কোনো প্রকাশক এই পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে উৎসাহী হয়। বলাই বাহুল্য এগিয়ে আসে নি কেউই। অবশ্য প্রকাশকদেরও যে খুব একটা দোষ দেওয়া যায়, তাও কিন্তু নয়। ইয়ং সাহেব ১৯৫৮ সালে ইন্সুরেন্সের চাকরি ছেড়ে 'বিশ্ব সরকার ও প্রবীণ পেনশনার' নামের একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনবার তিনি বাথের জেনারেল ইলেকশনে অংশ নেন এবং তিনবারই তার জামানত খোয়া যায়; এর ভেতর একবার তিনি র‍্যালি করেন যেটাতে তিনি ছাড়া শুধুমাত্র আর একজন মানুষ যোগ দেন। তাঁর সেই বইটি ছিল তাঁর দলেরই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সংকলন। যার ভেতরে উল্লেখযোগ্য ছিল পুরো বিশ্বে থাকবে একটি মাত্র সরকার এবং সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীও থাকবে একটি। বিশ্বে ভাষাও ব্যবহৃত হবে একটি মাত্র এবং সেটা হবে বাধ্যতামূলক। তাঁর অন্যতম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল–বার্কিংহাম প্যালেসকে ওল্ড হোমে রূপান্তর করা।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ব্যর্থতম কাব্য সমালোচক :**
লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ছিলেন একজন জাঁদরেল কাব্য সমালোচক। এক কাব্যসভায় তিনি 'মাফ করবেন, এই প্যারাগ্রাফের একটি শব্দের বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই...' এই বলে তাঁর সময়ের সবচেয়ে নামী কবি আলেক্সান্ডার পোপকে তাঁর কাব্য পাঠের মাঝে অন্তত পাঁচ বার বাধা দেন এবং সেটা যে পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে মতামত দেন। তবে কাব্যপাঠের শেষে হ্যালিফ্যাক্সের বন্ধু ড. গ্র্যাথ কবি পোপকে ডেকে কিছু বুদ্ধি বাতলে দেন। মাস তিনেক পর পোপ হ্যালিফ্যাক্সের সাথে দেখা করে তাঁর গঠনমূলক সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে তাঁর কথা অনুযায়ী তিনি তাঁর কবিতার প্রচুর পরিবর্তন করেছেন এবং কবিতাটি পড়ে শোনানোর পর সমালোচক সাহেব খুবই খুশি হন এবং এর চেয়ে ভালো কবিতা আর হতেই পারে না বলে ঘোষণা দেন। তবে ড. গ্র্যাথ সাহেব পোপকে যে বুদ্ধিটি দিয়েছিলেন তা হচ্ছে-কবিতার কিছুই বদলাবার প্রয়োজন নেই, কেবল দিনকতক পর হ্যালিফ্যাক্সকে ডেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আবার যেই কে সেই কবিতাটাই শুনিয়ে দিও।

**ব্যর্থতম রাজমূর্তি :**
১৯৭৪ সালে প্রবীণ জে. বামা'র এক শখ হল সে কাদা মাটি, কাঠ ও কাগজের মশ দিয়ে রানী ২য় এলিজাবেথ ও তার পরিবারের ভাস্কর্য তৈরি করবেন এবং করেছিলেনও বটে। শিল্প সমালোচকরাও তার তৈরি ভাস্কর্যের নৈপুণ্য ও 'এক্সপ্রেশন' নিয়ে প্রশংসা করেছিলেন প্রচুর। তবে সমস্যা অন্যখানে। বৃদ্ধ পেনসনের সামান্য টাকায় ভাস্কর্যের রাজকীয় পোশাকের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। কাজেই, রানীর পরনে ছিল প্রাচীন হাসপাতালের ধাত্রীদের পুরোনো পোশাক, ডিউক অফ এডিনবোরা পরনের 'ব্যাগি প্যান্টটি' এতই ব্যাগি ছিল যে তার হাই নেমে এসেছিল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। এবং প্রিন্সেস এনার গায়ে যে পোশাকটি ছিল, যতদূর সম্ভব সেই পোশাকের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি টেবিল ল্যাম্পের শেড হিসেবে।

**ব্যর্থতম গুপ্তচর :**
১৯৭৬ সালে সোভিয়েত গুপ্তচর জনাব আর. ই.ডি. ক্রুয়েকার যথাযথ মুন্সিয়ানার সাথে সমরাস্ত্রে সজ্জিত গার্ডদের চোখ এড়িয়ে এগনেনোতে অবস্থিত নেটো'র নেভাল বেইসে ঢুকে পড়েন এবং এক বাক্স ভর্তি গোপন ডকুমেন্ট নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে বের হবার সময় তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাগটি তিনি সেখানে ফেলে আসেন, যার ভেতরে ছিল একটি হাতুড়ি, একটি খালি ফাইল, একটি বাইবেল, প্লেবয় পত্রিকার একটি কপি এবং তাঁর গুপ্তচরবৃত্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি! বলাই বাহুল্য, ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই তিনি গ্রেফতার হন।

**ব্যর্থতম বোম্বিং :**
১৯৪০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বর্কাম সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে উড়ে যাবার সময় এক জার্মান বোম্বারের চোখে পড়ে দুইটি ডেস্ট্রোয়ার জাহাজ। লাফটওয়াফেল বোম্বার প্লেনটি তার জীবন বাজি রেখে দারুণ কৌশলে দুটো জাহাজই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। সেসময়ে আর কোনো বিমানই একসাথে এত বড় ধ্বংস করতে পারে নি। তবে দুঃখজনক ব্যাপারটি হচ্ছে, লেব্রেক্ট মা'আস ও ম্যাক্স স্লান্টজ্ নামের সেই ডেস্ট্রয়ার জাহাজ দুটিও ছিল জার্মান সরকারেরই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও, ~ আমারবই.কম

# নতুন রম্য রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

❑

বিষয় হিসেবে পৃথিবীর সব কার্টুনিস্টদের কাছে নুহ নবীর নৌকা একটি চমৎকার ব্যাপার। পৃথিবীর খ্যাত-অখ্যাত সব কার্টুনিস্ট নুহ নবীর নৌকা নিয়ে কার্টুন এঁকেছেন। যেমন আমেরিকান এক কার্টুনিস্ট এঁকেছিলেন সব প্রাণীরাই জোড়ায় জোড়ায় নুহের নৌকায় উঠছে মানুষও এক জোড়া উঠছে...তবে তারা সঙ্গে একজোড়া কম্পিউটার নিতে ভোলে নি! মোট কথা নুহ নবীর কারণেই হোক আর পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ পানির কারণেই হোক নৌকা নানা ফর্মে নানা বর্ণে এক সেলিব্রেটি বাহন। শুধু বর্তমান সরকারের কাছেই গাত্রদাহর কারণ হয়ে আছে যেন...যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পুলিশের মনোগ্রামে নৌকা চিহ্নটি সরানো হয়েছে বা সরানোর পরিকল্পনা চলছে। ওটা ওখান থেকে সরালে যদি পুলিশ সন্ত্রাসী ধরতে আরো বেশি পারদর্শী হয়ে ওঠে তা হলে কোনো আপত্তি ছিল না...কিন্তু...

তার আগে একটা প্রায় সত্য ঘটনা। বন্যায় চারদিক ডুবে গেছে...মাঠঘাট ধানক্ষেত...থইথই করছে পানি চারদিকে...উপর দিয়ে ভেসে চলেছে সরকারি ত্রাণ নিয়ে নৌকা। নৌকার মাঝি মুখোশ পরে আছে। পাশ থেকে আরেকজন চিৎকার করে জানতে চাইল এর কারণ

—কীহে ত্রাণ নিয়ে চলেছ মুখোশ পরে আছ যে?

—কী করব ভাই...নিচে তাকিয়ে দেখ।

—দেখলাম...ধানক্ষেত

—বুঝেছ? ধানের শীষের উপর দিয়ে নৌকা নিয়ে চলেছি...কত বড় স্পর্ধা আমার। সরকারি লোক কেউ দেখে ফেললে আস্ত রাখবে মনে কর?

এবার নৌকা নিয়ে অন্য গল্প। গল্পটা পুরোনো তবে অন্য ফর্মে। দুই বুদ্ধিমান নৌকা দিয়ে চলেছে মাছ ধরতে। একজন আরেকজনকে বলল

—আচ্ছা আমরা যে মাছ ধরতে যাচ্ছি মাছের জায়গাটা চিনে রেখেছিলি তো?

—অবশ্যই আমি কি অত বোকা নাকি? ঐ জায়গাটায় গতকাল মাছ ধরার সময় চক দিয়ে আমি নৌকায় একটা যোগ চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম এই যে এখনো নৌকার এই পাশে আঁকা আছে!

—সত্যি তোর বুদ্ধির তুলনা নেই।

কিন্তু তারা চিহ্ন দিয়েও চিহ্নিত স্থানে এবার আর মাছ পেল না। দুজনেই মহা অবাক!

—কারণ কী মাছ পেলাম না যে আজ?...অথচ দেখ নৌকায় তো এখনো যোগ চিহ্নটা দেয়া আছে!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ভুলটা ওখানেই হয়েছেরে চিহ্ন দেয়ায় গোলমাল হয়েছে তোর।

—কী রকম?

—দেখিস না আজকাল আর ফার্মেসিতে যোগ চিহ্ন না লিখে চাঁদের চিহ্ন আঁকে...ওই চিহ্নটাই দেয়া দরকার ছিল।

—ঠিক তো, সত্যি তোর যা বুদ্ধি!

কয়েক বছর পরের ঘটনা। সেই দুই বুদ্ধিমান (তাদের বুদ্ধি বাই দিস টাইম আরো নিচে নেমেছে মানে...মাঝখানে তারা কিছুদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে বুদ্ধি হাঁটু থেকে নেমে এখন গোড়ালিতে সেটেল করেছে!) একটা বেশ বড়সড় মাছ কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছে। পাশ থেকে এক লোক জানতে চাইল

—মাছ নিয়ে কোথায় চলেছ হে এই সাতসকালে?

—নৌকা ধরতে।

—কী বলছ মানুষ নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যায়...তোমরা মাছ নিয়ে চলেছ নৌকা ধরতে?? তোমরা কি পাগল না উন্মাদ???

—জি না আমরা ঠিকই আছি...কিছুদিন রাজনীতি করেছি তো...বুঝে গেছি এই দুনিয়ায় টিকে থাকতে হলে উল্টো চলতে হয়। বলে তারা তাদের ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল নৌকা ধরতে।

আরেকটা গল্প। তবে নৌকা নিয়ে নয়। জাহাজ নিয়ে। তাও আবার যে-সে জাহাজ নয় যুদ্ধ জাহাজ। যুদ্ধ জাহাজটা ঝড়ে পড়ে ডুবতে বসেছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন সবাইকে ডেকে বললেন বিপদ থেকে উদ্ধারের দোয়াটা কে জানে? একজন হাত তুলল।

—সেক্ষেত্রে তুমি জাহাজের ডেকে বসে দোয়াটা পড়তে থাক...

—বাকিরা? জানতে চাইল দোয়া জানা নাবিকটি।

—বাকিদের লাইফ জ্যাকেট হয়ে যাবে। একটাই শর্ট ছিল আমাদের!

❑

সেই গল্পটা তো সবার জানা সেই যে এক বাবা তার ছেলেকে নিয়ে গেলেন চিড়িয়াখানা দেখাতে। ছেলে গাধার খাঁচার সামনে থমকে দাঁড়াল। 'বাবা এ ঘোড়াটা এমন কেন?'

—ঘোড়া না এটা গাধা।

—আর ওটা? দূরে দাঁড়ানো আরেকটা গাধার দিকে আঙুল নির্দেশ করে।

—ওটা আরেকটা গাধা...গাধার বউ আর কি।

—গাধারা বিয়ে করে? ছেলে আশ্চর্য! বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, গাধারাই বিয়ে করে।'

এ গল্পটাই আবার অন্যভাবে। এবার আরেক ভদ্রলোক তিনি বিয়ে করেন নি...চিরকুমার। এসেছেন চিড়িয়াখানায় সাথে তার ছয় বছরের ভাস্তে। তারা ঘুরতে ঘুরতে যথারীতি গাধার খাঁচার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ছোট্ট ভাস্তে বলল

—চাচা এ জেব্রাটার গায়ে জেব্রা ক্রসিং কই?

—এটা জেব্রা না।

—তা হলে?

—এটা গাধা।

—এ একা কেন? এর বউ কই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ আমারবই.কম

—এ বুদ্ধিমান গাধা, বিয়ে করে নি। গম্ভীর চিবকুমার চাচার উত্তর।

—তোমার মতো?

চাচার ইচ্ছে ছিল ভাস্তেকে একটা কোন আইসক্রিম কিনে দেবেন। সে চিন্তা বাদ দিয়ে ভাস্তের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাসায় ফিরলেন।

হঠাৎ গাধা নিয়ে পড়লাম কেন? আসলে সেদিন দেখি একটা দৈনিকে লিখেছে ইংল্যান্ডের কোনো এক জায়গায় নাকি একটা 'গাধার স্বর্গরাজ্য' আছে। সেখানে গাধাদের জন্য সব ধরনের সুবিধা রয়েছে। তাদের কিছুই করতে হয় না। খায়দায় ঘুমায় আর আপত ট্যুরিস্টদের 'হ্যালো' বলে (তাদের ভাষায় আর কি)। ট্যুরিস্টদের ভিড়ও লেগেই আছে। সবাই বিবাহিত ট্যুরিস্ট। কারণ সেই যে গাধারাই নাকি বিয়ে করে।

তো গাধা নিয়ে লিখতে গিয়ে যত গাধামি চিন্তা মাথায় আসছে যেন...আসলে গাধাদের এত বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই। তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান প্রাণী (মস্কো চিড়িয়াখানায় এক গবেষণায় প্রমাণিত)। তা হলে তার গায়ে ঐ গাধামির সাইনবোর্ডটা লাগল কীভাবে? আসলে গাধা এমন একটা প্রাণী যে সাত রকমের সাঁতার জানে কিন্তু যখন পানিতে পড়ে তখন আর কোনোরকম সাঁতারই মনে করতে পারে না এজন্যই সে বোকা! তবে আমার ধারণা ভিন্ন...গাধা বেচারারা মানুষের কাছে পোষ মেনেই তাদের সর্বনাশটা করেছে। মানুষের ফাইফরমাশও খাটতে হচ্ছে আবার 'গাধা' গালিও শুনতে হচ্ছে। এর থেকে মুক্তি নেই যেন। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। একবার এক এলাকার এক গাধা মানুষের পোষ মানল না। সে হয়ে উঠল বিদ্রোহী। যারাই তাকে পোষ মানাতে এল তাদেরই পিছনের পা দিয়ে লাথি মেরে পায়ের হাঁটু ভেঙে দেয়। তো ক্রমে ক্রমে সে হয়ে উঠল 'সন্ত্রাসী গাধা'। সবাই তার নাম শুনলে থরহরি কম্পিত হয়ে ওঠে। এমন অবস্থা দাঁড়াল তার ভয়ে বাঘে গরুতে শেয়ালে মুরগিতে একঘাটে পানি খায়। এ ঘটনা চারদিকে চাউর হয়ে গেল। একজন ঝানু শিকারিকে দায়িত্ব দেয়া হল তাকে হত্যা করার জন্য। তো একদিন সেই শিকারি জঙ্গলে ঢুকল সেই সন্ত্রাসী গাধাকে মারতে...। বাঘ শিকার করতে হলে গাছের নিচে ছাগল বেঁধে গাছে বসে থাকলেই হয় কিন্তু গাধা শিকার করতে হলে কী করণীয়? কেউ কেউ বুদ্ধি দিল মুলা বেঁধে রাখা হোক। গাধার সামনে তো মুলাই ঝোলানো হয়। কিন্তু না এ গাধা তো মুলার গাধা না। সন্ত্রাসী গাধা। অনেক ভেবেচিন্তে শিকারি একজন দরিদ্র মানুষকে (বহুকষ্টে টাকাপয়সা দিয়ে রাজি করাতে হল) গাছের নিচে বসিয়ে রাখল। কেননা এই গাধা মানুষ দেখলেই লাথি মেরে হাঁটু ভেঙে দেয়, তাই এই বুদ্ধি...মানুষ দেখে লাথি মেরে হাঁটু ভাঙতে ছুটে আসবে তখন উপর থেকে শিকারি বন্দুক দিয়ে...দুম!

সারা রাত অপেক্ষা করেও গাধা এল না। ভোর হয়ে আসছে নিচে লোকটিও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। উপর থেকে ক্লান্ত বিরক্ত শিকারি নেমে আসছে...এ সময় দেখা গেল সেই গাধাকে। অপ্রস্তুত শিকারির হাত ফসকে বন্দুক পড়ে গেল। ধড়মড় করে জেগে উঠল টোপ হিসেবে থাকা গাছের নিচের লোকটি। সন্ত্রাসী গাধা শান্ত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। দুজনই ভয়ে থরহরি কম্পিত। গাধা তখন পরিষ্কার মানুষের গলায় বলে উঠল, "তোমরা আমাকে মারতে এসেছ? কিন্তু তোমরা কি জান কোনো বিদ্রোহী গাধা যে একশ সিংহের চেয়েও ভয়ঙ্কর..." কম্পিত শিকারি তখন বলল

—না জনাব, আপনাকে আর মারার ইচ্ছে নেই আমাদের। তবে একটা প্রশ্ন ছিল।

—কী প্রশ্ন?

—আপনি বেছে বেছে মানুষের হাঁটু ভেঙে দেন কেন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কারণ মানুষের মাথা অর্থাৎ মগজ আসলে হাঁটুতে...ওটাই গুঁড়িয়ে দেই...এই পৃথিবীতে ওটাই যত নষ্টের মূল।

শেষ করার আগে সদ্য প্রয়াত ড. হুমায়ুন আজাদের একটা বিখ্যাত কোটেশন— 'মানুষ সিংহকে প্রশংসা করে কিন্তু গাধাকেই পছন্দ করে'।

❑

জীবনে বহু ভুল করেছি তার মধ্যে অতিসাম্প্রতিক ভুল হচ্ছে আমার উন্মাদ অফিসের বর্তমান পিয়ন নির্বাচন। তার বয়স কিছু কম ফলে তাকে অফিসের চারদেয়ালের গণ্ডিতে আটকে রাখা কঠিন। সে প্রতিদিন আসে দেরি করে এবং দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে সে অদ্ভুত সব গল্প শোনায়। আমি তার কল্পনাশক্তি দেখে মাফ করে দেই। কারণ স্বয়ং আইনস্টাইন বলে গেছেন 'জ্ঞান অর্জনের চেয়ে কল্পনাশক্তি বাড়ানো জরুরি' তারপরও মাঝে মাঝে আমি অতিষ্ঠ হয়ে আমার পিয়নটিকে আমার বন্ধুদের অফিসে ডেপুটেশনে পাঠাতে চেয়েছি। বলেছি বেতন আমিই দেব শুধু তোর অফিসে পিয়ন হিসেবে থাক। কিন্তু কেউই রাজি হয় নি। বন্ধুরা বলেছে ওকে ছাঁটাই করে দে। কিন্তু কেন সে ছাঁটাই হয় না সেটারও একটি কারণ আছে। সেটা হচ্ছে তার অন্তত একটা গুণ আছে সে লেবু চা বানায় অসাধারণ। যে আমার অফিসে এসে তার হাতের এক কাপ লেবু চা খেয়েছে সে আবারো এসেছে চা খেতে। এটা পরীক্ষিত সত্য। তো গ্রেনেড হামলার পরদিন অফিসে এসে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গ্রেনেড হামলার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছি। দুজনেই আমরা হতভম্ব যে এটা কী হল। তখন আমার পিয়ন এসে জানাল—

—আজ লেবু চা হবে না।

—কেন? আমি জানতে চাই।

—লেবু নাই।

—লেবু নাই মানে?

—পুলিশ লেবুওলা উঠায়া দিছে।

তার আগে লেবু নিয়ে একটু বলা দরকার। যেহেতু সে ভালো চা বানায় সেহেতু লেবু কেনার বা লেবু চেনার একটা বিশেষ ব্যাপার আছে তার কাছে। সে শংকর বাসস্ট্যান্ডের কাছের কোন এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে বিশেষ ধরনের বড় বড় লেবু কিনে আনে সেই লেবু দিয়ে তৈরি হয় তার বিশেষ চা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে গ্রেনেড হামলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আর পুলিশ শংকর বাসস্ট্যান্ড থেকে লেবুওয়ালা উঠিয়ে দিল কেন? আমার বিচক্ষণ পিয়ন জানাল, ঐ লেবুগুলো বড় বড় বলে দেখতে নাকি অনেকটা গ্রেনেডের মতো বলেই পুলিশের এত ক্ষোভ লেবুওলার উপর।

কিন্তু কেন এই গ্রেনেড হামলা? শত শত পুলিশ কিছুই দেখল না? এতগুলো গ্রেনেড ফাটল পরপর? কিংবা তারাও তখন জীবন বাঁচাতে পালাচ্ছিল। তারাও তো মানুষ! কিন্তু যারা গ্রেনেড ফাটাচ্ছিল তারা যে মানুষ না এটা মোটামুটি নিশ্চিত। এ প্রসঙ্গে দুজন কথা বলছে—

—বুঝলেন ভাই আমাদের চারদিকে এখন হায়না ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—ঠিক।

—যে কোনো মুহূর্তে হামলা হতে পারে আমাদের ওপর।

—ঠিক! ঠিক!!

—আমাদের সাবধান হতে হবে।

—ঠিক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ওফ তখন থেকে 'ঠিক ঠিক করছেন' আপনি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন? একটা সিরিয়াস ব্যাপারে কথা বলছি...আপনার মতামত চাচ্ছি...আর আপনি মোটেই সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না...আপনি কি মানুষ না পশু??

—পশু...হে...হে...লোকটি হায়নার মতো হেসে উঠল!

লোকটি অবশ্য সত্যি সত্যি হায়না ছিল না, বরং একটা সত্যি হায়নার গল্প শোনা যাক। একবার এক হায়নার বাচ্চা তার মার কাছে বায়না ধরল আয়না কেনার।

—কেন আয়না দিয়ে কী হবে? জানতে চাইল তার মা।

—নিজের চেহারাটা দেখব মানুষের মতো কি না।

—কেন তোর চেহারা মানুষের মতো হবে কেন?

—বাহ আমি তো মানুষ না...অমানুষ...আর অমানুষরাই তো দেখতে মানুষের মতো!

ন্যাশনাল জিওগ্রাফির আলোকে এবার একটু জ্ঞান দান করা যাক। হায়না হচ্ছে এমন এক প্রাণী যে দেখতে কুৎসিত। যখন ডেকে ওঠে মনে হয় বুঝি কোনো মানুষ হাসছে! তার চোয়ালের শক্তি ভয়ঙ্কর। কোনো কিছু কামড়ে ধরলে ছোটানো অসম্ভব। কিন্তু এ প্রাণীটি ভীষণ ভিতু। একা কিছু করার শক্তি বা সাহস নেই। এরা যা করে সম্মিলিতভাবে করে। অতএব তাদেরকে সম্মিলিত হতে দেয়া যাবে না!

❑

সে অনেক কাল আগের কথা। আরবের লোকরা তখন কী করত জানি না। তবে ঢাকার লোকেরা রাস্তাঘাটে অনেক জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাত। সেই সব দুস্থ জ্যোতিষীরাও ভাগ্যহত মানুষের হাত গোনার জন্য বসে থাকত।

তো এক হতাশ লোক গেছে জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাতে। অবশ্য রাস্তার জ্যোতিষীর কাছে না সে গেছে 'পস' এক জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাতে। এ জোতিষী অ্যাস্ট্রোলজি নিউমোরলজি পামিস্ট্রি সব জানে। তার ভিজিট সেই আমলে ৫০ টাকা। যে আমলের কথা বলছি সে আমলে মানুষ কোটিপতি বলত না বলত লক্ষপতি। মানে লাখ টাকাই তখন কোটি টাকা। এই আমলে চাঁদাবাজিই লাখ টাকার নিচে হয় না আর আমি যেই আমলের কথা বলছি সেই আমলে চাঁদা বলতে মানুষ বুঝত কেবল জ্যামিতি বক্সের চাঁদা! যাহোক আসল গল্পে ফিরে আসি। সেই লোক ঢুকে গেল জ্যোতিষী ঘরে...

জ্যোতিষী তার জন্মতারিখ লিখে হিসাবনিকাশ করে গম্ভীর হাতে তুলে নিল ঢাউস সাইজের একটা আতশি কাচ। তার হাতের রেখাও দেখল দুএকটা তারপর গম্ভীর গলায় বলল—

—আপনি এক মাসের মধ্যে লক্ষপতি হবেন।

—কী বলছেন আমার তো দিন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা!

—এ দিন আর থাকবে না।

—ঠিক বলছেন?

—আমি বেঠিক বলি না।

—যদি আপনার কথা সত্যি না হয়?

—উফ বললাম তো আমার ভবিষ্যদ্বাণী আজ পর্যন্ত মিথ্যা হয় নি।

—ধরুন যদি আপনার কথা সত্যি না হয়?

—উফ বললাম তো সত্যি হবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—বাজি?

—যান বাজি।

—কত টাকা?

—যান লাখ টাকা।

এব এক মাস পর। আবাব এল সেই লোক। বলাই বাহুল্য সেই জ্যোতিষীর কথানুযায়ী সে লক্ষপতি হয় নি। বাজিতে হেরে জ্যোতিষীকে লক্ষ টাকা দিতে হল। এভাবে সেই লোক লক্ষপতি হল। মানে জ্যোতিষীর কথা ফলে গেল। এটা অবশ্য গল্প তবে সত্যি গল্পও কম চমকপ্রদ নয়। এক লোক গেছে নিজের ভাগ্য শুনতে জ্যোতিষীর কাছে...

—দেখুন তো খুব শিগগির জেল খাটতে হবে কিনা?

—খুব শিগগির আপনার স্ত্রী মারা যাবেন...

—সেটা আমিও জানি কিন্তু জেল খাটতে হবে কিনা বলুন...

জ্যোতিষী কোনো কথা না বলে উঠে গেল। ফোন করল থানায় 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর'...রোগ হওয়ার আগেই রোগ সারাও...থানাওয়ালারা এসে একজন ভবিষ্যৎ খুনিকে ধরে নিয়ে গেল। এভাবেই একজন স্ত্রী বেঁচে গেলেন খুনি স্বামীর হাত থেকে। এবং বলাই বাহুল্য জ্যোতিষীর কারণেই। এ গল্পটিই প্রমাণ করে...ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দেন ফিকশন!

মানুষ আসলে জ্যোতিষীদের গণনা বিশ্বাস করে না। তারপরও নিজের সম্পর্কে ভূতভবিষ্যৎ শুনতে তাদের ভালো লাগে। অনেকটা ভূতের মতো আর কি। ভূত বিশ্বাস করে না কিন্তু রাত হলেই ভূতের ভয় চাগা দিয়ে ওঠে। তো এইরকম...এক কোটিপতি যে জ্যোতিষীবিদ্যা দু চোখে দেখতে পারে না। মনে করে এসব ভাঁওতাবাজি। সে একবার ঠিক করল দেশের বিখ্যাত জ্যোতিষীকে নাকানি-চুবানি খাওয়াবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সে খুবই একজন দরিদ্র লোকের ছদ্মবেশে গেল সেই বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে—

—কী চাই?

—জনাব আমি দরিদ্র মানুষ আমার ভাগ্যটা গুনে বলুন না এই জীবনে কখনো কি দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাব না?

—আপনার জন্মতারিখ বলুন।

জন্মতারিখ বলল ছদ্মবেশী কোটিপতি। জ্যোতিষী চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী সব হিসাব করল। তারপর পূর্ণ চোখে তাকাল কোটিপতির দিকে।

—আমার ভিজিট দেয়ার ক্ষমতা আছে তোমার? শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কোটিপতির ফাজিলটা বলে কী দেশের সবচেয়ে ধনী লোককে বলছে ভিজিট দেয়ার ক্ষমতা আছে কিনা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল—

—আছে। কত আপনার ভিজিট?

—এক লাখ।

পকেট থেকে এক লাখ টাকার বান্ডিল বের করে ছুড়ে দিল টেবিলে। হো হো করে হেসে উঠল জ্যোতিষী। লজ্জায় জিব কাটল দরিদ্রবেশী কোটিপতি।

গল্পে গল্পে লেখাটা শেষ করা যাক। শেষ গল্প—

ধরা যাক এটি অতিসাম্প্রতিক একটি ঘটনা। এক নিউমোরলজিস্টের কাছে সন্ধ্যার দিকে চোখ-মুখ ঢেকে ঢুকল একটি লোক।

—বলুন তো আমি ধরা পড়ব কি না পুলিশের হাতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আপনি কে?

—আমি একজন দাগি খুনি। পুলিশ আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

—ভেবেচিন্তে একটি সংখ্যা বলুন। ভাবল খুনি কিছুক্ষণ তারপর বলল—

—সাত।

—না।

—ধরা পড়ব না?

—না।

—কখনোই ধরা পড়ব না?

—না।

খুশি হয়ে উঠল খুনি। নিউমোরলজিস্টকে তার ভিজিট দিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে নিশ্চিত মনে বেরিয়ে যেতে গিয়ে খুনি যেন থমকে দাঁড়াল দরজার কাছে।

—জনাব একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—পারেন।

—কীভাবে বুঝলেন আমি ধরা পড়ব না মাত্র একটি সংখ্যা দিয়ে?

হাসলেন সংখ্যাতত্ত্ববিদ তারপর বললেন 'সাত খুন মাফ'

❑

কোনো একটি স্কুলে স্কুলের হেডস্যারের কাছে হঠাৎ একটা ফোন এল। একটি বাচ্চার গলা—

—হ্যালো হেডস্যার বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আমি সোহেল...মানে সোহেলের বাবা বলছি...সোহেল অসুস্থ আজ ও স্কুলে আসতে পারবে না।

—হ্যালো সোহেলের বাবা তুমি, কোন ক্লাস রোল কত?

—স্যার ক্লাস এইট রোল ১৭...

এই একই গল্প এখন কিন্তু বদলে গেছে। যেমন এরকম। কোনো একটি স্কুলে নাকি হেডমাস্টারের কাছে ফোন এসেছে। ফোনের গলাটি অবশ্যই বাচ্চাদের।

—হ্যালো হেডস্যার বলছেন?

—হ্যাঁ কে?

—আগামীকাল ক্লাস এইটের বায়োলজি পরীক্ষা হলে কিন্তু বোম ফাটবে।

—কেন তোমার প্রিপারেশন কি খুব খারাপ?

—এ্যাঁ...হ্যাঁ...বাচ্চাটি লাইন কেটে দিল।

তো বোঝাই যাচ্ছে ইদানীং ঢাকা শহরে স্কুলে স্কুলে বোমা আতঙ্ক শুরু হয়েছে। হয়তো কিছুই না। তারপরও আতঙ্ক। কে কখন কোন দিক দিয়ে বোম মেরে বসে বোঝা মুশকিল। কার ভিতর কী আছে কে জানে? কে যে পকেটে বোমা নিয়ে ঘুরছে না তা-ইবা কে জানে। একজন তো বলল পিক পকেট নাকি দেশে এখন অনেক কম! কারণ আর কিছুই না পকেটে হাত ঢুকাল মানিব্যাগের জন্য কিন্তু মানিব্যাগের বদলে যদি থাকে বোমা, তখন?

বরং বোমা বহনকারীদের নিয়ে একটা গল্প শোনা যাক। দুই বোমাবাজ বোমা নিয়ে একটা ছোট্ট গাড়িতে করে আসছিল কিংবা ধরা যাক যাচ্ছিল তাদের টার্গেটে। তো তারা খুব দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছিল। আরেকজন বলল—



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আস্তে চালাও এত জোরে চালাচ্ছ গাড়িতে ঝাঁকি লাগলে তো বোমা ফেটে আমরা দুজনই একসঙ্গে মারা পড়ব।

—আরে আমি কি অত বোকা নাকি?

—মানে?

—মানে একটা বোমা ফাটলেও অসুবিধা নেই। আমি সঙ্গে আরেকটা শক্তিশালী বোমা নিয়েছি গোপনে গাড়ির বনেটে।

বোমা আতঙ্কের কারণে ইদানীং চারদিকে খুবই চেকিং হচ্ছে। রাস্তাঘাটে গাড়ি থামিয়ে প্রায়ই চেক করা হচ্ছে। বোমাটোমা আছে কি না দেখছে পুলিশ। তো এরকম রাস্তায় একটি ক্যাব গাড়ি থামানো হল। ভিতরে একজন প্যাসেঞ্জার

—কী ব্যাপার গাড়ি থামালেন যে?

—রুটিন চেক নামতে হবে।

লোকটি বিরক্ত হয়ে নামল। তার গায়ে হাত দিয়ে চেক করল পুলিশ। কিছু পেল না। তার ব্যাগ চেক করার জন্য চেন খুলতে যাবে তখন লোকটি আপত্তি জানাল—

—প্লিজ ওটা খুলবেন না।

—কেন?

—সমস্যা আছে।

শুনে পুলিশের সন্দেহ আরো গভীর হল। তারা খুলবেই। এবং জোর করে খুলে ফেলল। দেখে ভিতরে অদ্ভুত আকারের একটা বোতল। বোতলের মুখও পুলিশ খুলে ফেলল। ভুশভুশ করে কালো কালো ধোঁয়া বের হতে লাগল অদ্ভুত দর্শন বোতল থেকে।

—কী হল? পুলিশ হতভম্ব।

—তখনই নিষেধ করলাম এখন সামলান। বলল প্যাসেঞ্জার।

সেই কালো ধোঁয়া থেকে ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে এক বিশাল দৈত্য। দৈত্য গর্জন করে উঠল

—হুকুম করুন মালিক।

—মা-মালিক কে? কম্পিত পুলিশ জানতে চাইল।

—এই বোতল যার হাতে সেই আমার মালিক। বলুন আপনার কী চাই।

—তা-তা হলে আমাকে কমপক্ষে কয়েকটা বোমা জোগাড় করে দিন তাই দৈত্য...চাকরিটা আগে বাঁচাই!

❑

মানুষ এমন এক প্রাণী যার অতীত জানা আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জানা নেই। ভবিষ্যৎ জানতে পারলে মানুষের ভোগান্তি বোধহয় একটু কম হত, কে জানে! তবে দেশের দেশপ্রেমিক নেতারা যেমন অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেই বেশি পছন্দ করেন...! সে তুলনায় (দেশের) ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। অবশ্য তারা যদি ভবিষ্যৎও জানতে বা দেখতে পারতেন তা হলে সাধারণ মানুষের যে কী অবস্থা হত কে বলতে পারে! তবে হস্তরেখাবিদরা অবশ্য কেউ কেউ দাবি করেন যে তারা মানুষের হাতের রেখা নামতার মতো শুনে দিব্যি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। অর্থাৎ হাত দেখে ভূতভবিষ্যৎ সব বলে দেন। যেমন একটা ঘটনা এমন—

এক হতাশ তরুণ গেছে এক বিখ্যাত হস্তরেখাবিদের কাছে হাত দেখাতে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—পামিস্ট সাহেব দেখুন তো অদূরভবিষ্যতে আমার কোনো প্রেমট্রেম...

—অদূর না সুদূর ভবিষ্যতে আপনার একটা প্রেম দেখতে পাচ্ছি।

—সত্যি? তরুণ দারুণ খুশি।

—হ্যাঁ। পামিস্ট গম্ভীর।

—কত সুদূর?

—এই ধরুন ষাট-সত্তর।

—কী বলছেন? ষাট-সত্তর বছরে প্রেম?? কার সাথে?

—কেন দেশের সাথে। দেশপ্রেম। আপনি দেশের একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ হবেন...

অতীত যদি হয় 'না' তা হলে ভবিষ্যৎকে বলতে পারি আমরা 'হাঁ'। না নিশ্চিত আর হাঁ হচ্ছে অনিশ্চিত। তো আমাদের জীবনে কিন্তু নিশ্চিত 'না'-এর সংখ্যা ক্রমে ক্রমেই বাড়ছে! মাদককে 'না' বলছি, সন্ত্রাসকে 'না' বলছি এখন পত্রিকায় দেখি বিশাল বিজ্ঞাপন মোবাইল ফোনের মিসড কলকেও 'না' বলতে হবে। অবশ্য আমি বহু আগে থেকেই মিসড কলকে ডাবল না বলে আসছি। মানে মিসড কল কখনো ধরি না। আরেকজন আমার টাকা খরচ করে আমার সঙ্গেই কথা বলবে এটা সহ্য করা মুশকিল। তারপরও একবার একটা মিসড কল ধরেছিলাম তার ধরনটা এমন—

মিসড কল আসছে তো আসছেই একবার দুবার তিনবার আমি ধরি না। শেষে পঞ্চম বারে ধরলাম। ধরা মাত্র ওপাশ থেকে—

—হ্যালো আপনে কেডা?

—আপনে কেডা মানে? আপনিই তো আমাকে মিস কল দিচ্ছেন তখন থেকে। আপনি কে? কাকে চান?

—ও আসলে ভাইজান মোবাইলডা এট্টু টেস করতাছি...মিস কল যায় কি না দেখলাম!

তো এ ঘটনার পর তো মোবাইল ফোনের মিসড কল আরো ধরি না। অতীত নিয়ে আরেকটি গল্প। তবে এ গল্পের কিছু অংশ প্রায় সত্যি।

এক ভদ্রলোক অফিস থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাক্সিক্যাবের জন্য বাসায় যাবেন। হঠাৎ তার কাছে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক হাত পাতল—

—বাবা পাঁচটা টাকা দ্যান।

—পাঁচ টাকা কেন? এক টাকা দু টাকা চাইতে পার। পাঁচ টাকা দিতে হবে কেন? টাকা কি এতই সস্তা হয়েছে?

—বাবা এক টাকা নেয়া বহু আগেই ছাড়ছি। দুই টাকাই নিতাম কিন্তু আজকাল দুই টাকার নোট এত ময়লা থাকে যে রোগবালাই হইতে পারে তাই নেই না...কাগজে লেখছে পড়েন নাই?

ভদ্রলোক দেখলেন আরে এই বৃদ্ধ তো মহাধড়িবাজ...! আর তখনই তার মাথায় ক্লিক করল আরে একে তো সকালে অফিসে আসার সময় তিনি পাঁচ টাকার একটা কয়েন দিয়েছিলেন। অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত দেয়া নয় সিএনজি ক্যাবের ভাড়া দিতে পারছিলেন না ভাংতি করে নিয়ে পাঁচ টাকার কয়েনটা দিয়েছিলেন বৃদ্ধ ভিক্ষুককে! পুরো ব্যাপারটা মনে পড়তেই তার মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল।

—এই বুড়া মিয়া আমি তো তোমাকে পাঁচ টাকা দিয়েছি আগে...ঐ যে সকালে সিএনজি ক্যাবের ভাড়া দিতে গিয়ে...ভাংতি করতে পারছিলাম না...মনে পড়ছে?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে পড়ব না কেন মনে আছে...কিন্তু সে তো অতীতকাল। অতীতের কথা ভুইলা যান। অতীত নিয়া পইড়া আছি দেইখাই না আইজ আমগো দেশের এই অবস্থা।

ভদ্রলোক আর দেরি করলেন না। লাফিয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়লেন। আজ বরং বাসেই যাওয়া যাক। বৃদ্ধ দার্শনিক ভিক্ষুককে অতীতে ফেলে বর্তমানের বাসে চড়ে ছুটে চললেন ভবিষ্যতে।

❑

আগে সবাই প্রশ্ন করত

—কটা ঈদ সংখ্যায় লিখেছেন বা এঁকেছেন?

এখন প্রশ্নের ধরন বদলেছে সবাই বলে 'কটা চ্যানেলে নাটক যাচ্ছে?' যেন নাটক না গেলে ঈদ মাটি। গত ঈদে আমাকে এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

—কোথায় কোথায় লিখেছেন?

—আমি তো লেখক না আঁকক।

—ঐ হল আর কি কোথায় কোথায় আঁকক হয়েছেন মানে এঁকেছেন?

—উন্মাদ।

—ওটা তো আপনার নিজের পত্রিকা...অন্য কোথায়?

—অন্যদিন।

—আর?

—বিচিত্রা, অনন্যা...

—আর নাটক?

—মানে?

—মানে নাটক যাচ্ছে কোন চ্যানেলে?

—আমি নাটক লিখব কোন দুঃখে? আমি নাট্যকার নাকি?

—আরে শুধু লিখলেই লেখক হওয়া যায় নাকি? সাথে নাটক না গেলে...

তো মজার ব্যাপার হচ্ছে এ বছর কোথায় কোথায় লিখেছেন এ প্রশ্নের মুখোমুখি হলেও কোন কোন চ্যানেলে আপনার নাটক যাচ্ছে এ প্রশ্ন কেউ করে নি। অথচ এবারের ঈদে দুর্ঘটনাক্রমে আমার একটি নাটক যাচ্ছে!! ভুল বললাম। নাটক না তাও আবার টেলিফিল্ম। তো ঘটনা হচ্ছে উন্মাদ ঈদ সংখ্যাতেই আমরা ব্যঙ্গ করেছি টেলিফিল্ম নিয়ে। মানে টেলিফিল্মের ভাবসম্প্রসারণ করার চেষ্টা করেছি। যে ফিল্ম কেউ দেখে না। যে ফিল্ম দেখতে বসার আগে টেলিস্কোপ দিয়ে আশপাশ দেখে নিতে হবে যে আপনি যে ফিল্ম দেখতে বসেছেন সেটা আবার কেউ দেখে ফেলছে কিনা...এই কারণেই এটা টেলিফিল্ম...ইত্যাদি ইত্যাদি...দেখে ফেললে সর্বনাশ আপনার মানইজ্জত সব যাবে। তো সেই মানইজ্জত যাওয়ার সময় হয়েছে আমার। আমাকে এখন টেলিফিল্ম দেখতে বসতে হবে অন্তত একটা হলেও...নিজেরটাই আর কি।

আরেক ঈদে আমার একটা নাটক গিয়েছিল তখন সেই নাটক যাওয়ার পরদিন এক পরিচিত বন্ধু আমাকে বলল—

—তোর নাটক শুনলাম।

—শুনলাম মানে? দেখিস নি?

—না মানে আমার টিভিতে যে হঠাৎ কী হল ছবি আসছে না। তাই বাধ্য হয়ে শুনতেই হল...

দুনিয়ার পাঠক এক হও~আমারবই.কম

এর উল্টো ঘটনাও আছে একটা। একজনের রেডিওতে নাটক গেছে। পরদিন তার পরিচিত একজন তাকে পথে আটকাল—

—তোমার নাটক দেখলাম।

—দেখলাম মানে? এ তো শোনার নাটক রেডিওতে গেছে।

—নারে ভাই আমার রেডিওও নেই টিভিও নষ্ট কাজেই দেখতেই হল।

—মানে?

—মানে কাগজে দেখলাম বিনোদন পাতায়, তোমার নাটক যাচ্ছে।

এবারের ঈদে নাটকে পুড়ি টেলিফিল্মে কী অবস্থা হবে বলা মুশকিল বরং আগেরবারের অভিজ্ঞতাটা বলা যেতে পারে।

—তোর নাটক দেখলাম (বন্ধু খুবই গম্ভীর)।

—কেমন লাগল?

—নাটকটা কি হাসির ছিল?

—কেন হাসিস নি তুই?

বন্ধু আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বলল 'দেখ তুই উন্মাদ করিস এটাই অনেক কষ্টে সহ্য করি আর আগে বাড়িস না প্লিজ।'

অভিজ্ঞতা দুই।

—তোর নাটক তো হিট।

—কী রকম?

—আমার বউ দেখে তো চোখের পানি নাকের পানিতে...সত্যি দারুণ ট্র্যাজিক নাটক লিখেছিস তুই।

—কী বলছিস? এটা তো হাসির নাটক ছিল?

—তুই সিওর?

—ওভার সিওর, আমি লিখেছি আমি জানি না?

—তা হলে যে ও ভেউভেউ করে কাঁদল।

—মনে হয় তোরা ভুল করে অন্য নাটক দেখেছিস।

—অসম্ভব তোর নাম দেখে নাটক দেখতে বসলাম।

—আমার নাম কী বল তো?

বন্ধু যে নাম বলল মুহূর্তে সে শত্রু হয়ে গেল।

আসলে হঠাৎ করে নাটক নিয়ে নিজের ঢোল পিটাতে বসেছি কেন? দুটো কারণে প্রথম কারণ বিচিত্রা থেকে দুলাল আচার্য্য ফোন করে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে... লেখা ঈদ বিষয়ক হতে হবে, নইলে এই লেখাই বিচিত্রার শেষ লেখা! ঈদ নিয়ে কী লিখি...ভাবতে ভাবতে শেষমেশ ঈদের নাটক নিয়েই...আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে নিজের ঢোল নিজে পিঠানোই ভালো অন্যকে দিলে ফাটিয়ে ফেলতে পারে...তবে এখন অবশ্য এই বাক্যটি আরেকটু আপগ্রেড হয়েছে। সেটা হচ্ছে নিজের ঢোল নিজে পিটাও অন্যকে দিলে ফাটাবে না...তবে গায়েব করে দিতে পারে! অতএব...

❑

বাংলাদেশ আবার চতুর্থবারের মতো বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হয়েছে। তবে আশার কথা এবার আর বাংলাদেশ নিঃসঙ্গ শেরপা নয়। সাথে একজন অভিযাত্রী আছে। হাইতি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাইতির জনসাধারণকে বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। শেষ মুহূর্তে আমাদের সঙ্গী হওয়ায় আমাদের নিঃসঙ্গতা কাটল।

আবারো মুবারকবাদ হাইতিকে।

কিন্তু কথা হচ্ছে ব্যাপারটা হাইতির দেশপ্রেমিক জনগণ কীভাবে নিচ্ছে? তাদের জন্য তো এটা প্রথমবার। বরং চলুন কল্পনা করা যাক। হাইতির রাজধানী 'পোর্ট আ প্রিন্স'। প্রধান সড়কের পাশের এক বারে দুই দেশপ্রেমিক হাইতিবাসী ঢুকল।

—আজকের পেপার দেখেছ?

—দেখেছি।

—আমরা এখন পৃথিবীর এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। উফ কী লজ্জার কথা!

—আরে এত আপসেট হচ্ছ কেন বাংলাদেশের কথা একবার ভাব...ওরা তো...

—ওদের তো অভ্যেস হয়ে গেছে এই নিয়ে চারবার...কিন্তু আমরা উফ

—তা অবশ্য কী করা যায় বল তো? এ লজ্জা কীভাবে ঢাকি?

—চল পান করে ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করি।

—গুড আইডিয়া...বেয়ারা...বেয়ারা...

কিন্তু বেয়ারার খবর নেই। হঠাৎ তারা খেয়াল করল বারে তারা শুধু দুজন বসে আছে। আর কোনো টেবিলে কেউ নেই। কেউ পানও করছে না। এ সময় দেখা গেল ম্যানেজার তাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

—কী ব্যাপার ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছেন কেন? আপনাদের লজ্জা করে না?

—মানে? দুজনেই অবাক।

—আজ সবাই লজ্জায় ঘর থেকেই বের হয় নি আর আপনারা এসেছেন বারে মদ খেয়ে ফুর্তি করতে? ছি ছি।

লজ্জিত দুজন বেরিয়ে পড়ল বার থেকে। তাই তো আজ রাস্তাঘাট ফাঁকা।

—বরং চল গ্রামের দিকে যাই ওখানে আমার পরিচিত একটা দোকানে চোলাই মদ বিক্রি করে ওটা খেয়েই বরং ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করি আমরা...

—কিন্তু গ্রামের লোকজন যদি বারের ম্যানেজারের মতো আচরণ করে!

—আরে ধুর গ্রামের লোকরা এত খবর রাখে না।

—তা ঠিক।

তারা অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের সেই দোকানে গিয়ে চোলাই মদ নিয়ে বসল। গ্লাসের পর গ্লাস মারতে লাগল। খেতে খেতে একজন বলল—

—আচ্ছা বল তো আমি এখন কয় জন?

—একটু আগে দুজন ছিলে এখন তুমি তিন জন।

—তা হলে চল উঠা যাক যথেষ্ট নেশা হয়েছে...আমিও তোকে তিন জন দেখছি...

তারা টলতে টলতে রওনা দিল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তা ফাঁকা। গাড়িটাড়ি নেই। রাস্তার মাঝখান দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিল তারা। হঠাৎ একজন রাস্তার মাঝখানে শুয়ে পড়ল।

—কী হল তোমার?

—আমি আর হাঁটতে পারছি না এখানেই একটু ঘুমিয়ে নেই...

—তাই বলে রাস্তার মাঝখানে? গাড়িচাপা পড়ে মরবে তো।

—মরলে মরব বলে সে দিব্যি নাক ডাকতে লাগল রাস্তার মাঝখানে শুয়ে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু দ্বিতীয় জন রিস্ক নিল না রাস্তা থেকে সরে গিয়ে ডান দিকের ঢালের বড় বড় ঘাসের মধ্যে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। এবং শোয়ামাত্র সেও ঘুম।

ওদিকে একটা ভারী ট্রাক আসছিল। চালাচ্ছিল আরেক হাইতিবাসী। তার মনটা খারাপ শেষমেশ কিনা এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হল হাইতি। ছি ছি। অবশ্য হবে না-ইবা কেন? সে নিজে কি কম দুর্নীতি করেছে। তার ট্রাকড্রাইভারির জীবনে কম করে হলেও দশ জন মানুষ চাপা দিয়ে মেরেছে সে। কিন্তু কিচ্ছু হয় নি তার। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে দুর্নীতি করে পার পেয়ে গেছে। না আর নয় এখন সৎ হওয়া দরকার। সৎ হওয়ার এখনই সময়। ভাবতে ভাবতে...সে আচমকা হার্ড ব্রেক করল। সামনে রাস্তার উপর এক লোক পড়ে ঘুমাচ্ছে, লোকটা মাতাল নিশ্চয়ই। না আর কোনো মানুষ চাপা দেয়া চলবে না। নেভার এভার। ট্রাকড্রাইভার ডান দিকে স্টিয়ারি হুইল ঘুরিয়ে ঢালের বড় বড় ঘাসগুলোর উপর দিয়ে কাটিয়ে নিয়ে ফের রাস্তায় উঠল। একটা আর্তচিৎকার তার কানে এল। কিন্তু কে সে ঠিক বুঝল না। ট্রাক ছুটতে লাগল ফের সামনের দিকে।

❑

দেশপ্রেমিক এক লোক দেশ নিয়ে খুব ভাবে। এ দেশটার কিচ্ছু হল না। এত বছর হল কোনো উন্নতি নেই। বেকারত্ব, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সব মিলিয়ে যেন লেজে-গোবরে-পেচ্ছাপে একটা যা-তা অবস্থা! এর থেকে কি মুক্তি নেই? সে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে তার এক বিচক্ষণ বন্ধুর দ্বারস্থ হল।

—আচ্ছা দোস সত্যি করে বল তো আমাদের দেশটার কিছু হচ্ছে না কেন?

—কী হবে?

—আরে ভালো কিছু হচ্ছে না কেন?

—কীভাবে হবে বল? আমাদের সবার ব্রেন আসলে পচে গেছে!

—মানে?

—মানে আমাদের ব্রেন চেঞ্জ করা দরকার নতুন ব্রেন থেকে যদি প্রডাক্টিভ কিছু বের হয়!

—কিন্তু নতুন ব্রেন কোথায় পাব?

—খোঁজ লাগা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, ঢাকা শহরে টাকা ফেললে সবই পাওয়া যায়। বাদুড়ের দুধও পাওয়া যায়।

—বাদুড়ের দুধ? আমার মনে হয় কথাটা তুই ভুল বললি হবে বাঘের দুধ।

—আরে বেকুব বাঘের দুধ যোগাড় করা কোনো ব্যাপার না। ট্রাঙ্কুলাইজার দিয়ে বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে দুধ দুইয়ে নিলেই হল। কিন্তু একটা বাদুড় ধরার চেষ্টা কর তো দেখি। গাছের মগডালে না হয় ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে থাকে যা তো ধরে আন তো একটা বাদুড়। দেখি তুই কত বড় সেয়ানা হয়েছিস!

ঠিক তো এ লাইনে ব্যাপারটা ভেবে দেখা হয় নি মি. ভাবুকের। তো সেই দেশপ্রেমিক ভাবুক (যেহেতু দেশ নিয়ে ভাবে তাই তাকে ভাবুক বলা যায়) চারদিকে খোঁজ লাগাল। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন সন্ধান পেল নতুন ব্রেনের। আরেক লোক মানুষের ব্রেন বিক্রি করে। তার ব্যবসা নাকি রমরমা। অনেকেই তার কাছ থেকে ব্রেন কিনে নিয়ে যায়। তো সেই লোকের ব্রেনের শো-রুমে ঢুকে মি. ভাবুক তাজ্জব হয়ে গেলেন। কাচের জাবে ব্রেন সাজানো। কোনোটা শিক্ষকের, কোনোটা ব্যবসায়ীর, কোনোটা আর্মির, কোনোটা...

দুনিয়ার পাঠক ঐক্য হও! আমারবই.কম

—আচ্ছা ভাই কোনটার কী রকম দাম?

—সেটা নির্ভর করছে আপনি কার ব্রেন নেবেন।

—দেখুন আমি দেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি...আনকোরা নতুন একটা ব্রেন দরকার।

—তা হলে এটা নিন।

—এটা কার ব্রেন?

—একজন এমপির। একদম আনকোরা। কোনো কাজে ব্যবহার হয় নি। আর যদি দামি ব্রেন নিতে চান তা হলে এটা নিন।

—এটা কার ব্রেন?

—সচিবদের পিয়নের ব্রেন। ৫০,০০০ টাকা দাম!

—বলেন কী এত দাম? একজন পিয়নের ব্রেনের এত দাম!

—হবে না দেশ তো আসলে ওরাই চালাচ্ছে।

—কীভাবে?

—বাহ সচিবদের গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলো কোথায় কোনখানে আছে, কোনখানে যাবে সেটার আসল খবর তো ওরাই রাখে। ওদের ফাইল চালাচালির ওপরই তো...

কিন্তু না সেই দেশপ্রেমিক ভাবুক এমপি বা সচিবের পিয়ন কারো ব্রেনই কিনলেন না। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা ব্রেন কিনলেন। দামও সস্তা। উন্মাদের ব্রেন। সেটাই মাথায় সেট করে বেরিয়ে এলেন ব্রেন স্টোর থেকে। নিজেরটা ফেলে দিলেন গারবেজে।

তারপর আর কি একদিন দেখা গেল ঢাকা শহরে সম্পূর্ণ দিগম্বর এক নতুন উন্মাদ ট্রাফিক আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে। এ-ই ভালো দেশ নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা নেই মাথায়। আর সেই ফাঁকে আসল ট্রাফিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

❑

এ গল্প আগে অনেকবার করা হয়েছে বিশেষ কারণে আবার করতে হচ্ছে। বহু আগে আমাদের একবার 'উষ্ট্রব্যাধি' হয়েছিল (ঘোড়ারোগ বললাম না) উন্মাদ থেকে একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করেছিলাম। প্যাকেজ অনুষ্ঠানের আওতায় সেটাই ছিল প্রথম ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান!! কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! জমা দিলাম বিটিভিতে প্রচার হল আমেরিকার এক বাংলা চ্যানেলে। সেরকমই একটা ঘটনা ঘটেছে আবার! যুগান্তরের ফান সাপ্লিমেন্টে ইন্টারভ্যু দিলাম। প্রকাশিত হল আমার দেশের ফান সাপ্লিমেন্টে! রহস্যটা কী? রহস্য আর কিছুই না যুগান্তরের লোকজন চলে গেছে আমার দেশে। যাওয়ার সময় অধমের ইন্টারভ্যুটাও নিয়ে গেছে বগলদাবা করে। তো কদিন আগে সেই ভাগলবা দল আবার এসে হাজির। এবার কার্টুনে ইন্টারভ্যু দিতে হবে।

—মানে? আমি চিন্তিত হয়ে উঠি।

—আমরা প্রশ্ন করব লেখ্য ভাষায় আপনি উত্তর দেবেন কার্টুনে। তো যাহোক কোনোমতে কার্টুনে উত্তর দিয়ে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। দুদিন পর আরেক দল এসে হাজির।

—আরে কী খবর তোমাদের?

—এবার কার্টুনে ইন্টারভ্যু দিতে হবে।

—আরে গত পরশুই তো দিলাম।

—কী বলছেন এটা তো আমাদের আইডিয়া...কাকে দিলেন? তারা হায় হায় করে উঠল। বুঝলাম দেশে এখন প্রতিটি দৈনিকের সঙ্গে একটা করে নাছোড়বান্দা ফান সাপ্লিমেন্ট বের হচ্ছে বলে ইধারকা আইডিয়া উধার পাচার হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারা বহু চিন্তাভাবনা করে ঠিক করল ঠিক আছে কার্টুনে ইন্টারভ্যু যখন হয়ে গেছে তা হলে জোক্সে ইন্টারভ্যু হোক...এবার আমি হায় হায় করে উঠলাম! তারপরও দিতে হল জোক্সে ইন্টারভ্যু...তবে ইন্টারভ্যুটা দিয়ে ভালোই লেগেছে বলে এখানে হুবহু...

—আপনার দিনকাল কেমন কাটছে?

—কাটছে তবে ব্লিডিং হচ্ছে...আবার মাঝে মাঝে হচ্ছেও! তখন ডেটল লাগাচ্ছি!

—উন্মাদের ব্যবসা কেমন?

—ব্যবসা তো পা থেকে মাথায় উঠেছে। ২০ টাকার উন্মাদ আগে হকাররা পায়ের কাছে ফেলে বেচত। ৫০ টাকার ঈদ সংখ্যা এখন মাথায় করে বেচছে!

—কার্টুনিস্ট কীভাবে হলেন?

—এক লোকের স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ ছিল এক থেকে দশের বেশি মনে রাখতে পারত না। পরে তাকে বক্সিঙের রেফারি হয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। আমার স্মৃতিশক্তি অত খারাপ না তাই বোধ হয় কার্টুনিস্ট হতে পেরেছি।

—আপনাকে যদি দেশের রাষ্ট্রনায়ক করা হয়?

এক লোক বাজারে গেছে মাছ কিনতে মাছওয়ালাকে বলল

—ঐ রাষ্ট্রনায়ক মাছটা দিন।

—রাষ্ট্রনায়ক মাছ মানে?

—আরে ঐ মাথামোটা ফাঁপা মাছটা দিন।

অতএব বুঝতেই পারছেন রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার বাসনা খুব একটা নেই।

—নিজেকে তো গ্র্যান্ডফাদার অফ জোক্স বলে ঠাট্টা করেন বলে শুনেছি। আপনার প্রিয় একটা জোক্স বলুন।

—বারে মদ খেতে ঢুকে এক লোক দেখে তার পাশে একটা কুমির বসে হুইস্কি খাচ্ছে! এই দৃশ্য দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। এটা কী করে সম্ভব?? কুমিরটা তখন তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল

—কী খুব অবাক হয়েছেন? মনে হচ্ছে যেন জীবনে কুমিরই দেখেন নি!

—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আপনার কোনো পরামর্শ...

—জাপান, ফ্রান্স আর বাংলাদেশের তিন লোক চলেছে জাহাজে করে বেড়াতে। জাপানিটা তার হাতের ল্যাপটপটা হঠাৎ ছুড়ে ফেলে দিল সমুদ্রে। অন্য দুজন আঁতকে উঠল এ কী করলেন? 'আমার দেশে এসব প্রচুর আছে' জাপানির নির্বিকার উত্তর। এবার ফ্রান্সের লোকটি সঙ্গে করে আনা দামি শ্যাম্পেনের বোতলটি ছুড়ে ফেলে দিল সমুদ্রে। 'এ কী করলেন?' 'আমাদের দেশেও এসব প্রচুর পরিমাণে আছে।' ফ্রান্সের লোকটির উত্তর। এবার বাংলাদেশী লোকটি তার সঙ্গে থাকা ছোট ভাইকে ঠেলে ফেলে দিল সমুদ্রে। অন্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুজন হা হা করে উঠল এ কী করলে? 'আমাদের দেশেও এসব প্রচুর আছে' বাংলাদেশীর উত্তর।

জোক্সটাও অবশ্য এখানেই শেষ না। ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরে বাংলাদেশী দেখে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া তার ছোট ভাই তার আগেই বাসায় এসেছে তার সঙ্গে ল্যাপটপ আর শ্যাম্পেনের বোতল। অতএব জনসংখ্যা কাজে লাগাতে হবে আমাদের।

—বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স নিয়ে কিছু বলুন...

—খেলায় হেরে দল মর্মাহত। ড্রেসিংরুমে সবাই মুখ গোঁজ করে বসে আছে...কোচ এসে সবাইকে চিয়ার আপ করার জন্য বলল 'আরে মন খারাপ করার কী আছে টসে তো আমরা জিতেছিলাম...' কে জানে সারা জীবন হয়তো টসেই জিততে হবে আমাদের।

—আপনার কি মনে হয় আপনি আসলে পাগল না উন্মাদ?

এক লোক বই কিনতে গেছে দোকানে

—ভালো একটা বই দিন।

—এটা নিয়ে যান, এটা পড়লে আপনি আধাপাগল হয়ে যাবেন।

—তা হলে এ বইটা আমাকে দু কপি দিন।

আমিও ঐ রকম আধাপাগল হওয়া বই সব সময় দু কপিই কিনি।

—জাতির উদ্দেশে আপনার কীর্তিকলাপ নিয়ে কোনো বাণী?

—'পৃথিবীর সব মানুষের কীর্তিকলাপ একটিমাত্র শস্যদানায় লুকিয়ে ফেলা সম্ভব' এটা অবশ্য আমার বাণী নয় একটি বিখ্যাত কোটেশন।

❑

—এখন যারাই সোনার গহনা বানাবে তারাই লাভবান হবে।

—কেন? সোনার দাম কমেছে নাকি?

—না।

—তা হলে?

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার নোবেল মেডেলটি চুরি হয়েছে জানিস তো?

—জানি।

—ওটা এখনো পাওয়া যায় নি জানিস তো?

—জানি।

—তার মানে ওটা নির্ঘাত স্মাগল হয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে। কে জানে এতক্ষণে সেটা গলিয়ে গহনাটহনাও তৈরি হয়ে গেছে...তাই বলছিলাম এখন কেউ গহনা কিনলে নির্ঘাত এ গহনায় কবিগুরুর নোবেল মেডেলের ফ্লেভার পেত।

এটা অবশ্য নিছকই একটা ঠাট্টার কথাবার্তা। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি মেডেলটি বাংলাদেশে পাচার হয়ে আসে এবং ধরা যাক সেটা গলিয়ে কেউ সোনার গহনাও তৈরি করে ফেলল। ধরা যাক সেই নোবেল-স্বর্ণে নির্মিত গহনা পরে সেই মহিলাই একদিন বেড়াতে বেরুলেন ধানমণ্ডির অপরাধমুক্ত এলাকায় এবং যথারীতি ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে সমস্ত গহনা ছিনতাই হল এবং মহিলা ক্ষুরের আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে গেলেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হসপিটালে। আমার এই লেখার মাধ্যমে ধরা যাক এ মহিলা দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোকের নিকটাত্মীয় ফলে পুলিশের ওপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করা হল ঐ ছিনতাইকারী দলকে ধরতে।

ওদিকে ছিনতাইকারী দল ধরপাকড়ের খবর পেয়ে তাদের ছিনতাইকৃত গহনা নিয়ে পালাল ভারতে। তার মানে কী দাঁড়াল? কবিগুরুর নোবেল পদক কবিগুরুর দেশেই ফিরে গেল। কিন্তু অন্য ফর্মে! এখন ভারতীয় পুলিশ উদ্ধার করবে কীভাবে?

তবে সত্যি-মিথ্যা জানি না ইদানীং দেশের ছিনতাইকারীদের মধ্যে নাকি এক ধরনের হতাশা দেখা দিয়েছে।

—কেন?

—এরা এখনো পুরুষ পথচারীদের মোবাইল আর মহিলাদের সোনার চেইন ছিনতাইয়েই আটকে আছে! অথচ ভারতের ওরা চলে গেছে কোথায়? তারা এখন ছিনতাই করে বিশ্ববরেণ্য কবির নোবেল পদক! এটাই তাদের হতাশার কারণ!

কবিগুরুর নোবেল পদক চুরিতে কমবেশি সবাই আহত হয়েছে। তবে একেক জনের ধরন একক ধরনের। যেমন একজনকে পাওয়া গেছে...তার হতাশা সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। তিনি তার মেয়েকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবেন বলে একজন গানের টিচার ঠিক করলেন; ঘটনা নোবেল পদক চুরির আগে। তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক গান শেখাতে এলেন পদক চুরির পর। সেরকমই কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মেয়ের বাবা হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন।

—সে কী রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবেন না? শিক্ষক অবাক।

—নারে ভাই। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মেয়ের বাবা।

—কেন?

—ভাবছি নজরুলসঙ্গীতই শেখাব।

—তা শেখান। কিন্তু হঠাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীত কী দোষ করল?

—আরে ভাই আগের সেই রবীন্দ্রনাথ কি আর আছেন?

—মানে? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

—বাহ্ আপনি জানেন না? কবিগুরুর নোবেল পদক চুরি হয়েছে? নোবেল পদকহীন রবীন্দ্রনাথের গান শিখিয়ে কী হবে?

এরপর সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষকের হতভম্ব মূঢ় (হতভম্ব ও বিমূঢ়ের যুক্ত সন্ধি) হয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি ছিল না।

আসলে নোবেল পদকটি গেছে কোথায়? কেউ কেউ বলছেন এটা চলে গেছে নির্ঘাত কোনো এন্টিক কালেক্টরের ব্যক্তিগত কালেকশনে। বরং চলুন না এটা নিয়ে শেষবারের মতো এ প্রসঙ্গে একটু কল্পনার আশ্রয় নেয়া যাক।

এক সাংবাদিক গেছে ইউরোপের এক বিখ্যাত এন্টিক কালেক্টরের ইন্টারভ্যু করতে।

—আপনার কাছে তো পৃথিবীর বহু এন্টিক বস্তু আছে।

—তা আছে।

—আপনার কাছে এগুলো আসে কীভাবে?

—আন্তর্জাতিক স্মাগলাররা স্মাগল করে নিয়ে আসে। তারপর আমি চড়া দামে কিনে নেই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আচ্ছা আপনার কাছে কোনো পদক এসেছে ইদানীং? সাংবাদিকের উদ্দেশ্য কবিগুরুর নোবেল পদকটি যদি উদ্ধার করা যায়!

—হ্যাঁ এসেছে।

—কোথা থেকে এসেছে?

—এশিয়া থেকে এসেছে...বোধহয় পাক-ভারত...বার্মা...ঐ এলাকা থেকে।

—পদকটি কী বিষয়ক বলবেন কি?

—অকার্যকর রাষ্ট্র পদক।

এই পর্যায়ে সাংবাদিক চেপে গেলেন। বলাই বাহুল্য সাংবাদিকটি বাংলাদেশের এবং এই পদক কে কেন কবে পেয়েছে সবই তার জানা!

❑

এক বাবা মৃত্যুশয্যায়। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি তার একমাত্র ছেলেকে কাছে ডাকলেন

—বাবা তোকে একটা উপদেশ দিয়ে যেতে চাই।

—জানি তুমি কী বলবে।

—কী বলব বল তো?

—বলবে আমি যেন বিয়ে না করি...তারপর আমি বলব হ্যাঁ আমি তোমার কথা রাখব...এবং মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমার ছেলেকেও ওই একই উপদেশ দিয়ে যাব।

—আশ্চর্য, তুই কী করে বুঝলি?

—এ আর বোঝাবুঝির কী? এ তো অতি পুরাতন গল্প সবাই জানে। তবে ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন—বাবা তোমাকে দুটো ঘটনা বলতে চাই...এক নম্বর হচ্ছে আমার পক্ষে বিয়ে না করা অসম্ভব ব্যাপার...ইনফেক্ট (ছেলে খুকখুক করে একটু কাশল) আমি...আমি বিবাহিত তোমাকে বলা হয় নি, আমরা কোর্ট ম্যারেজ করেছি, ও...মানে তোমার বউমা আমার ক্লাসমেট ছিল। আর দ্বিতীয় তথ্য হচ্ছে...এ কী বাবা? বাবা??

বাবা ততক্ষণে কোর্ট ম্যারেজের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ইহকালের সকল মায়া ত্যাগ করে পরকালের দিকে রওনা হয়ে পড়েছেন। দ্বিতীয় তথ্যটি জানা হল না বাবার। তবে পাঠকদের জানা দরকার। এবং দ্বিতীয় তথ্যটি জানতে হলে গল্পটি আবার নতুন করে শুনতে হবে (আশা করি পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না, তা ছাড়া লেখাটাও বড় করা দরকার। আফটার অল ঈদ সংখ্যার লেখা)।

এক বাবা মৃত্যুশয্যায়। ছেলেকে কাছে ডাকলেন

—কী বাবা?

—তোকে শেষবেলায় একটা উপদেশ দিতে চাই।

—বল।

—এ জীবনে তুই আর যাই করিস বাবা, বিয়ে করিস না।

—ঠিক আছে বাবা, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব...এমনকি আমিও মৃত্যুশয্যায় আমার ছেলেকে ওই একই উপদেশ দিয়ে যাব।

ছেলের এই উত্তর শুনে বাবার হার্ট অ্যাটাক হল সঙ্গে সঙ্গে। মারা গেলেন তিনি। কিন্তু আসল সত্য হল ছেলে কিন্তু বাবার সঙ্গে একবিন্দু মিথ্যে কথা বলে নি। ছেলে পরবর্তী জীবনে বিয়ে করে নি। তবে তার একটি অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের কারণে তার একটি পুত্রসন্তানও ছিল।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তো বহু বছর পর সেই ছেলে বৃদ্ধ হল, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তার অবৈধ সন্তানকে ডেকে পাঠাল—

—বাবা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তোমাকে একটা শেষ উপদেশ দিতে চাই।

—কী বলবে জলদি বল, আমার টাইম একটু শর্ট আছে।

—বলছি...তোর এত তাড়া কিসের?

—কী বলবে জলদি বল, তবে দাদার মতো বিয়ে না করার উপদেশ দিও না প্লিজ।

—না না বাপ, এত ভুল করব না, ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম বিয়ে করিস বাপ, বিয়ে করিস...

বলেই চোখ বুঝলেন অবিবাহিত অবৈধ বাবা।

ছেলে আঞ্জুমান মুফিদুলে ফোন দিয়ে লাশের ব্যবস্থা করে ছুটল নন্দন পার্কে, ওখানেই টাইম দেয়া আছে মল্লিকাকে।

তো মল্লিকার প্রেমিকের একটা নাম দেয়া যেতে পারে। ধরা যাক তার নাম বৈধ চৌধুরী। নিজে অবৈধ সন্তান বলেই তার এই নাম গ্রহণ। একটা প্রতীকী ব্যাপার আর কি। তো এই বৈধ চৌধুরীর একটা জেদ ছিল। সেটা হচ্ছে সে যেহেতু জানত যে তার বাবা-মার মধ্যে বিয়ে হয় নি, লিভ টুগেদারের অফ স্প্রিং সে। বরং এ কারণেই কিনা কে জানে, সে প্রতিজ্ঞা করল একাধিক বিয়ে করে এর প্রতিশোধ নেবে!

ব্যস, শুরু হল তার প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রক্রিয়া। একের পর এক পাণিগ্রহণ...। প্রথমে মল্লিকাকে বিয়ে করল, এক বছরের মাথায় ডিভোর্স। এরপর আরেক তরুণীর পাণিগ্রহণ করল...এবং এভাবেই একের পর এক পাণিপ্রার্থী হওয়া ও পাণিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলতেই থাকল...পাণিপ্রার্থী অতঃপর পাণিগ্রহণ...পাণিপ্রার্থী অতঃপর পাণিগ্রহণ...এবং এই করতে করতে একদিন দেখা গেল সে আর্সেনিক আক্রান্ত! কেননা এদেশের বহু এলাকার পানিতেই এখন আর্সেনিক। আর অতি পাণিগ্রহণের ফলে...

তো আর্সেনিক আক্রান্ত সেই রোগী মানে বৈধ চৌধুরী এখন মৃত্যুশয্যায়। যথারীতি সে তার বারো পুত্রকে ডেকে পাঠাল। বলাই হয় নি প্রতি স্ত্রীর ঘরেই তার একটি করে পুত্রসন্তান হয়েছিল।

—বাবারা কাছে আস।

—কী বলবা জলদি বল। ছেলেরা বিরক্ত...

—বাবারা আমি তো আর্সেনিক বিষে মরতে বসেছি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি, অতিরিক্ত পাণিগ্রহণের ফলে।

—আর্সেনিকের মাত্রা বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়ে আছে।

—কতবার বললাম একটা সবুজ কল বসাও...বৈধ চৌধুরীর ছেলেরা নানান মন্তব্য করতে লাগল।

—বাবারা চুপ কর আমার উপদেশটা শোন।

—আরে জানি তো তুমি কী বলবা আমাদের।

—কী বলব বল তো?

—ওই যে দাদার দাদা যা বলে গেছেন "বিয়ে না করার ফতোয়া", শোন বাবা তোমাকে একটা পরিষ্কার কথা বলতে চাই—ফতোয়ার দিন কইলাম শেষ। বড় ছেলে বলে। মেজো ছেলে মানে বড়টার পরেরটা তখন বলে ওঠে

—ঠিক ঠিক ফতোয়ার দিন শেষ। আমাদের ভার্সিটির ফিজিক্সের এক টিচার ফতোয়া দিচ্ছিল মেয়েদের বোরকা পরে ক্লাসে আসতে হবে, তার এখন নিজেরই বোরকা পরে বসে থাকতে হচ্ছে ঘরে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—উফ। তোরা একটু চুপ করে আমার উপদেশটা শুনবি?

—আচ্ছা আচ্ছা বল।

—বিয়ে তোরা অবশ্যই করবি এবং একটার বেশি করবি না।

—এটা কোনো উপদেশ হল। এ তো সবাই জানে।

—আরে এটা মূল উপদেশের সাথের ফ্রি উপদেশটা বললাম। আজকাল সবকিছুর সঙ্গে একটা কিছু ফ্রি দেয় না?

—বুঝলাম, এখন বল মূল উপদেশটা কী?

—মূল উপদেশটা হচ্ছে...আগে তোরা বার জন বারটা লাঠি আন।

—উফ! তুমি তো সেই ঈশপের গালগল্পো শুরু করেছ, শোন বাবা ঈশপের গল্পোও এখন অচল। ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন সেই কচ্ছপ আর খরগোশের যে গল্পটা...সেটায় খরগোশ ভুল করে ওই একবারই ঘুমিয়েছিল বাকি জীবনে কয়েক লক্ষ বার কচ্ছপকে পিছনে ফেলে এসেছে...বলতে গেলে খরগোশকুলের ঘুম এখন হারাম হয়ে গেছে! এই প্রজাতি এখন আর ঘুমায় না, দেখ না চোখ সব সময় লাল!

এ সময় সবার অলক্ষ্যে পাঁচ বছরের সবচেয়ে ছোট ছেলেটা গুটিগুটি করে এসে কখন যে বাবার হাতে একটা লাঠি ধরিয়ে দিল। হয়তো খেলাচ্ছলে একটা লাঠি দিল তার হাতে। বৈধ চৌধুরী আর দেরি করলেন না। ওই লাঠি দিয়ে শেষ শক্তিতে (যতটুকু অবশিষ্ট শক্তি তার ছিল) নিজের মাথায় মেরে পারমানেন্টলি চোখ বুজলেন। নিজের মূল উপদেশ যখন বাচাল ছেলেদের কানে দিতে পারলেন না...ছেলেদের উপদেশ শুনতেও আর রাজি নন! (ইন্নালিল্লাহে...)

বৈধ চৌধুরীর শেষ উপদেশটা পাঠকদের জানাতে না পারলেও তবে আমার শেষ একটা উপদেশ সেটা হচ্ছে বিচিত্রা ঈদ সংখ্যার অন্য সব লেখা পড়ুন কোনো সমস্যা নেই, এটা পড়বেন না প্লিজ!

তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপদেশ বোধকরি 'প্লিজ কোনো উপদেশ দিয়েন না।'

❑

যার নেই কোনো গুণ সেই হল বেগুন। সেই বেগুনের কেজি গিয়ে ঠেকেছে আশি টাকায়। তবে মন্দের ভালো মাঝখান দিয়ে পেঁপে চলে এসেছে লাইমলাইটে। বেগুনির ভেতরে এখন পেঁপে, নিজের শাশ্বত ঐতিহ্য বিকিয়ে হলেও পেঁপেই এখন বেগুনি। ভাবেসাবে মনে হচ্ছে সরকারের সকল উন্নয়নের জোয়ার গিয়ে ঠেকেছে বেগুনে। তবে সরকারের আর দোষ কি সরকার যদি বুঝত যে বেগুনের দামই বাড়বে তা হলে হয়তো গরু-ছাগলের মাংসের রেট বাঁধার মতো রেট বেঁধে দিত। তার আগে বরং রেট বাঁধা নিয়ে একটু স্মৃতিচারণ করে নেই।

কার্টুনিস্ট অরূপ একসময় দৈনিক বাংলায় কার্টুন আঁকতেন। তার অনেক কার্টুনই আমার প্রিয় ছিল। একটা কার্টুন মনে পড়ছে এরকম—সরকার তখন কোনো কারণে রিকশা ভাড়ার রেট বেঁধে দিয়েছে। সেই রেট বেঁধে দেয়ার খবর ছাপা হওয়ায় সংবাদপত্র দেখিয়ে এক যাত্রী রিকশাওয়ালাকে বলছে বেশি ভাড়া কেন চাচ্ছ, সরকার তো রেট বেঁধে দিয়েছে? রিকশাওয়ালা তখন বলছে—

'কাগজে যখন লেখছে তখন কাগজে চাইপ্যাই যান!'

খুব মজা পেয়েছিলাম তখন। এই ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সরকার রমজান মাস উপলক্ষে গরু-ছাগলের মাংসের রেট বেঁধে দিয়েছে! (গরু ১০০ টাকা, ছাগল ১৪০ টাকা, মহিষ ৮০ টাকা) কিন্তু গরুর মাংস কিনতে গিয়ে দেখি ১২০ টাকা কেজি।

—১২০ টাকা মানে? সরকার তো রেট বেঁধে দিয়েছে!

—সরকার কত রেট বাঁধছে? মাংস বিক্রেতা জানতে চায়।

—কেন কাগজে দেখ নি? ১০০ টাকা।

—তা হলে যান সরকারের কাছ থাইকাই কিনেন।

বিষণ্ন বদনে ১২০ টাকা দিয়েই মাংস কিনে ফিরে এলাম। তা হলে কি দেশের সরকারের কথা কেউ শোনে না?

সরকার বলে এক পাবলিক বুঝে আরেক। সরকার বলছে দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে আর পাবলিক বুঝে উল্টোটা। আসলে আমাদের কোনটা বোঝা উচিত? বরং একটা গল্প বোঝার চেষ্টা করি—

হঠাৎ করে এক লোককে দেখা গেল শহরের প্রধান ফটকে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে আশপাশে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠেছে। দুএকজন প্রশ্ন করতে শুরু করেছে

—কি ভাই শিরাসন করছেন বোধ হয়?

—নাকি দু পায়ে রক্ত বেশি হয়েছে তাই মাথায় রক্ত ফেরত আনার চেষ্টা করছেন?

—ঠিক তা নয়।

—তা হলে?

—আমি আসলে এই মুহূর্তে একজন সুখী মানুষ!

—মানে?

—মানে সবাই বলত দেশটা উল্টো চলছে। একটা উল্টো চলা দেশের মানুষ হয়ে মনে বড্ড কষ্ট ছিল...বড্ড অসুখী ছিলাম...এখন সুখী।

—সেটা কীভাবে?

—দেখছেন না উল্টো হয়ে আছি...এখন দেখছি দেশটা সোজা চলছে...আমি এখন সুখী!

সে ক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় বাদুড়রা প্রাণিজগতে সবচেয়ে সুখী।

—কেন? একজন জানতে চাইল?

—কারণ তারা সব সময় উল্টো হয়ে গাছের ডালে ঝুলে উল্টে চলা পৃথিবীকে সোজা দেখে।

—না, সব ক্ষেত্রে সেটা ঠিক নয়।

—কী রকম?

—পৃথিবীর উল্টো পিঠের বাদুড়দের কথা একবার ভাব! তাদের উল্টো হয়ে ঝুলে লাভ কী?

❑

জোট সরকারের তিন বছর হল। তো এই তিন বছরে কী 'প্লাম' আর কী না 'প্লাম' তার হিসাব মেলাতে ঠাণ্ডা মাথায় রমনা পার্কে গিয়ে বসল এক জোট সরকার সমর্থক! আর ঠিক তখনই পু ওওওও...বাঁশির শব্দ! পুলিশ! নাকি র‍্যাব!

—কী ব্যাপার ভাই?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

—আমার অপরাধ?

—আপাতত তোমার অপরাধ তুমি পাবলিক।

—দেখুন, আমি তো কিছু করছি না পার্কে বসে ভাবছিলাম।

—নিশ্চয়ই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো চিন্তাভাবনা করছিলে?

—কী বলছেন? ছি ছি আমি এই সরকারের একজন ফ্যান!

—আরে রাখ ফ্যান, চল তোমারে ফ্যানে ঝুলায়া বাইরামু...

তারপর আর কি—লোকটাকে টেনেহিঁচড়ে তোলা হল পুলিশ ভ্যানে।

তো হাজতে এক রাত থেকে সে কিন্তু খুশি হয়ে উঠল। তার মতোই আরো অনেক জোট সরকার সমর্থক কারাগারে ঢুকে সে কিন্তু খুশি হয়ে উঠল। তার মতোই আরো অনেক জোট সরকার সমর্থক কারাগারে ঢুকে সে কিন্তু খুশি হয়ে উঠল। তার মতোই আরো অনেক জোট সরকার সমর্থক ওখানে। তবে তারা সবাই চিন্তিত এই ভেবে তাদের কেন গ্রেপ্তার করা হল, হোক না তারা গণগ্রেপ্তারের শিকার। তারা মিটিঙে বসল।

—আমার মনে হয় এটা সরকারের কোনো উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা।

—ঠিক, আমারও তাই ধারণা নইলে আমরাই ভোট দিলাম আবার আমাদের কেন ধরে আনবে।

—এটা করেছে নিরাপত্তার জন্য, বাইরে সন্ত্রাস, বোমা, ইদানীং শুরু হয়েছে র‍্যাব-আতঙ্ক, র‍্যাবের ক্রসফায়ারে পড়লে...ওরে বাপরে! বরং এখানেই...

তো তারা আত্মতুষ্টিতে কেন্দ্রীয় কারাগারে ভালোই রইলেন। তারা ভালো থাকুন। কেননা যে কোনো মূল্যে ভালো থাকা দরকার আমাদের।

এই ফাঁকে অন্য একটি গ্রেপ্তার সংক্রান্ত গল্প শুনি...। এক লোককে জেলখানায় ঢোকানো হল। অন্য কয়েদিরা তার আশপাশে ভিড় করল।

—কি ভাই নতুন আসছেন? বাইরের অবস্থা কী?

—বাইরের অবস্থা মানে?

—মানে দেশ কেমন চলছে?

—দেশ ভালো চলছে...আমাদের দেশ তো এখন উন্নত বিশ্বের কাতারে চলে এসেছে!

—তাই নাকি বলেন কী, জেলখানায় বসে আমরা কোনো খবরই পাই না...

—হ্যাঁ হ্যাঁ আগে মানুষ লন্ডন-আমেরিকার ভিসার জন্য লাইন দিত এখন তো পুরো উল্টা।

—মানে?

—মানে আমেরিকা, লন্ডনের লোকরা এখন বাংলাদেশে আসার জন্য বাংলাদেশ এম্বেসিতে লাইন দিচ্ছে।

—বলেন কী এ তো মারাত্মক সুসংবাদ! উফ কবে যে জেলখানা থেকে বের হব।

—আচ্ছা ভাই আপনাকে ধরল কেন? এখানে আসার কারণ?

—ওই যে খামাখা খামাখা মিছা কথা কই তাই এলাকার লোকজন ধইরা ঢুকায়া দিছে এইখানে!

❑

সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে আমরা সপরিবারে অনশন করে এলাম। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মুক্তবুদ্ধির মানুষের এক বিরল জনসমাবেশ। ভোরের কাগজের মেলা থেকে বলা হয়েছে, এ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিয়ে একটা কিছু লেখার জন্য কিন্তু সবাই এত সুন্দর সুন্দর লেখা লিখেছেন সেখানে আমার লেখার চেষ্টা করা বৃথা। তারপরও লেখার চেষ্টা করছি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণে। বাংলাদেশের মানুষ আসলে অসম্ভব আবেগতাড়িত মানুষ। সেটাই আবার প্রমাণিত হল এই সিলেট অনশনের সামগ্রিক ঘটনায়। কত যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে যা কখনো বেদনার, কখনো আনন্দের, কখনোবা প্রতিরোধের; তাই নিয়েই না হয় লিখি। তবে যেহেতু আমি একটু রম্য ধরনের লেখার চেষ্টা করি অতএব...পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ব্যাপারটা গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন।

পাবনা থেকে দলবল নিয়ে এসেছেন লেখক দারা। 'সৈনিকটি এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে'। সময় প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তার এ বইটি যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সুধী মহলে। আবেগে আপ্লুত এই লেখকের নাম দারা হলেও তাকে সব জায়গায় দেখি শোয়া অবস্থায়। ট্রেনে শোয়া, হোটেলে শোয়া, অনশন প্রান্তরেও দেখি তিনি শোয়া। হেংলা-পাতলা গোছের লেখক এই প্রচণ্ড রোদেও শেষ পর্যন্ত অনশন করে গেছেন।

হুমায়ূন-জাফরের ভক্তরা এর মধ্যেও কেউ কেউ অটোগ্রাফের জন্য খাতা বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন তাদের দিকে। তারা অটোগ্রাফও দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে খবর এল অটোগ্রাফ দেওয়া যাবে না। কারণ অটোগ্রাফ নিয়ে ফেরার পথে দুই তরুণীকে নামকরণবিরোধীরা তাদের খাতায় অটোগ্রাফ দেখে রিকশা থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে নাজেহাল করেছে। অতএব অটোগ্রাফ বন্ধ!

রাতে ট্রেনে দেখা গেল প্রতিটি বগিতে গান হচ্ছে। এক বগিতে হচ্ছে 'আমরা করব জয়...' আরেক বগিতে সেটারই ইংলিশ ভার্সন চলছে 'উই শ্যাল ওভার কাম...' আরেক বগিতে এক সিলেটী গায়ক গলা ছেড়ে গাইছে হাছন রাজার সব বিখ্যাত গান...আশপাশে দুএকজন নেচে-কুঁদে তাল দিচ্ছে। এক পর্যায়ে দেখি সিকিউরিটির এক গার্ড রাইফেলের সঙ্গে তার হেলমেট ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে...সে এক মহামিলন...।

এক পর্যায়ে দেখা গেল আমার ভাস্তি ইয়েশিম (মুহম্মদ জাফর ইকবালের মেয়ে) আয়াতুল কুরশির ফটোকপি ট্রেনের প্রতিটা যাত্রীকে দিচ্ছে এবং বলে দিচ্ছে পকেটে রেখে দিতে—কোনো বিপদ হবে না।

শাহজালালের (রহ.) গেটে দেখি কাওসার ভাই (জ্যোতিষী কাওসার আহমেদ চৌধুরী) গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনিও এসেছেন! তার এক সহকারী তারই একটি কবিতার ফটোকপি বিলাচ্ছে। সেখানে তার এক চমৎকার কবিতা, যার প্রথম লাইন...। নাহ থাক! প্রথম লাইনটা লেখা একটু মুশকিল। তবে কবিতাটি চমৎকার প্রতিবাদী একটি কবিতা যা পত্রিকায় পড়েছি। তিনিও নামকরণবিরোধীদের হাতে আহত হয়েছেন।

সুনামগঞ্জ থেকে একদল এসেছে অনশনে। তাদের সঙ্গে ছিল মৌলবাদবিরোধী ব্যানার। পথে ওদের আটকাল নামকরণবিরোধীরা। তারা কোথায় যাচ্ছে জানতে চাইলে তারা বলল, পিকনিকে। কিসের ব্যানার? পিকনিকের ব্যানার। মৌলবাদীরা ব্যানারটি হাতে নিয়েও শেষ পর্যন্ত খুলে দেখে নি তাতে আসলে কী লেখা আছে!

ট্রেনেই পরিচয় হল বাংলার বাণীর রুমীর সঙ্গে। প্রাণবন্ত এই তরুণ ট্রেনের প্রতিটি মানুষের ইন্টারভিউ করছিল। তার অ্যাসাইনমেন্টটা ছিল হুমায়ূন আহমেদের বগিতে আড্ডার ব্যাপারটা কভার করা। আমি এক পর্যায়ে তাকে বললাম, সবার ইন্টারভিউ করলেন, পুলিশেরটাইবা বাদ যায় কেন? দেখলাম, সে অতি উৎসাহে তাদের দুএকজনের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করছে। খুবই দুঃখজনক এই প্রাণবন্ত, চমৎকার ছেলেটি পরে মৌলবাদীদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনশন প্রান্তরে এক পর্যায়ে খবর এল নামকরণবিরোধীরা দু জায়গায় মিটিং করছে এবং ঐ মিটিং শেষ করে তারা ১২টার দিকে এখানে হামলা করবে। ব্যাপারটা বুঝতে আমি একজন পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম—সত্যি কিনা। পুলিশ অফিসার মুচকি হেসে বললেন, "চিন্তার কিছু নেই, ওদের এমন 'পালিশ' দেওয়া হয়েছে যে এদিকে আসতে পারবে না।"

মুক্তিযোদ্ধা মিতিল আপাও গিয়েছিলেন সিলেট। তবে তিনি গিয়েছিলেন একদিন আগে। ২৬ মার্চ তিনি যখন শাহজালাল ভার্সিটির দিকে রওয়ানা হলেন তখন তাকে আক্রমণ করল নামকরণবিরোধীরা! তবে মিতিল আপা তাদের প্রশংসাই করলেন এ কারণে যে, তারা তার দিকে ঢিল না মেরে ট্যাটো ছুড়ে মেরেছিল। অবশ্য ট্যাটোর আঘাতেও তার একটি চশমার কাচ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিকই পৌছেছিলেন।

অশীতিপর এক বৃদ্ধ এসেছেন একাত্মতা ঘোষণা করতে। ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না। হাতে লাঠি নিয়ে টুকটুক করে এসেছেন তিনি। আমি তাকে বললাম, আপনি বুড়ো মানুষ, কষ্ট করে এলেন ওরা আপনাকে বাধা দেয় নি? তিনি জানালেন, 'দিয়েছিল'। তখন আপনি কী বললেন? তিনি দৃঢ় গলায় জানালেন, 'আমি ওদের একটা কথাই বলেছি, হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা করতে যাব, দেখি কে আটকায়।' বলাই বাহুল্য, মৌলবাদীরা তাকে আটকানোর সাহস পায় নি।

আদমজী কলেজের এক ছাত্র মেহেদী জানাল, ২৭ তারিখ তার পরীক্ষা তবু সে এসেছে। তার ব্যাগ ভর্তি বই। দরকার হলে ট্রেনে বসেই সে পড়বে তবু সিলেট যেতেই হবে। পরে অবশ্য তাকে বই নিয়ে পড়তে দেখি নি। তবে এক পর্যায়ে তাকে খুব উৎফুল্ল মনে হল। সে বলল, 'যে স্যার পরীক্ষা নেবেন তাকে ম্যানেজ করে ফেলেছি।' মানে? 'মানে আমাদের মোজাম্মেল হক স্যারও তো অনশনে চলেছেন। স্যারকে ম্যানেজ করে এসেছি।'

একদল তরুণকে দেখা গেল ফেরার সময় তাদের টিকিট আছে। কিন্তু ট্রেনে সিট নেই। কুছ পরোয়া নেহি। তারা হুমায়ূন আহমেদের বগিতে টয়লেটের পাশে বিছানা পেতে বসে পড়ল। সারা রাত হইহুল্লোড় করে কাটিয়ে দিল। এই না হলে তারুণ্য!

এই সিলেট যাত্রার কত না ঘটনা কত না গল্প তা লিখে শেষ করা যাবে না। আমার জীবনে এ রকম চমৎকার স্বাধীনতা দিবস আর হয়তো আসবে না। মনে হয় নতুন করে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। তাই যেন হয়!

❑

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। একুশের বইমেলায় গিয়েছি ঘুরতে। গিয়ে দেখি ভিতরে একটা বালিশের দোকান। আমি চমকে উঠলাম। তবে কি বাংলা একাডেমী এবার নীলক্ষেতের লেপ, তোশক, বালিশের দোকানদারদেরও মেলায় স্টল করতে অনুমতি দিয়েছে? কিন্তু না, পরে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা তা নয়। ওটা একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার স্টল। তারা ১৪ ফেব্রুয়ারি মানে 'ভ্যালেন্টাইন ডে' উপলক্ষে বালিশ বানিয়ে বিক্রি করছে। বালিশ মানে লাল-নীল নানান রঙের বালিশ, যার আকৃতি অনেকটা হৃদয়াকৃতির এবং ঐ বালিশ বিক্রিও হচ্ছে ধুমসে। আমিও একটা কিনে ফেললাম।

তো ঐ লাল হৃদয়াকৃতির বালিশই সম্ভবত এই দেশে 'ভ্যালেন্টাইন ডে'-এর সূচনা করে। আরো পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, ঐ সাপ্তাহিকটিই ভালবাসাবাসি দিনের এই ব্যাপারটিকে স্টাবলিশ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে একটা ঘটনা বলা যায়। আমার এক বন্ধু বেচারার কিছুতেই প্রেম বা বিয়ে কিছুই হচ্ছে না। তার চেহারার ফর্মাটা অবশ্য মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডের একটু নিচেই। সেটা সে নিজেও জানে এবং এ কারণেই তার প্রেম হচ্ছে না সেটাও সে জানে। তো তাকে আমি বুদ্ধি দিলাম তুই এক কাজ কর, 'ভ্যালেন্টাইন ডে'-তে একটা অ্যাটেম্পট নে। সে রাজি হল। তাকে আমি একটা উন্মাদের টি-শার্ট গিফট করলাম। তাতে লেখা 'হৃদয় খালি আছে', নিচে বড় করে একটা হার্টের ছবি আঁকা। সে ঐ টি-শার্ট পরে একটা প্রমাণ সাইজের প্লাস্টিকের ফুল নিয়ে ভ্যালেন্টাইন ডে-তে বেরিয়ে পড়ল। সারা দিন আর তার খোঁজ নেই। সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা, বিধ্বস্ত অবস্থা তবে মুখে চিকন হাসি! তার কাছ থেকে ঘটনা শুনে আমিও চমকিত!

সে ঐ গেঞ্জি পরে প্লাস্টিকের ফুল হাতে ঢাকার নারী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ঢুঁ মেরেছে। সারা দিন মোট ছয় জন তরুণীকে ঐ ফুলটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তিন জন নাকি সরাসরি পায়ের হিল খোলার ভঙ্গি করেছে! একজন 'স্টুপিড' বলে গালি দিয়েছে। একজন জানতে চেয়েছে, 'এই টি-শার্টটা কোথা থেকে কিনেছেন?' একজন রিকশায় উঠে হুড তুলে দিয়েছে! শুধু একজন! হ্যাঁ, শুধু একজন! শুধু একজন ফুলটা নিয়ে প্রশ্ন করেছে—

: ওমা এ যে প্লাস্টিকের ফুল!

তখন সে সেই চিরন্তন জোক্‌সটা শুনিয়ে দিয়েছে—সেরকম প্ল্যানই ছিল আমাদের। 'সারা দিন ঘুরেছি তো আসল ফুল হলে তো শুকিয়ে যেত' শুনে নাকি মেয়েটা খিলখিল করে হেসেছে এবং দুজনে মিলে একটা টং দোকান থেকে চাও খেয়েছে এবং একটা ছোট্ট নীল কাগজে মেয়েটা একটা ফোন নম্বরও দিয়েছে। সে কাগজটি আমাকে দেখাল। আমিও যথেষ্ট উত্তেজিত। অবশেষে প্রজেক্ট সাকসেসফুল! আমি বললাম, 'বসে আছিস কেন ফোন কর জলদি।' 'ধীরে বন্ধু ধীরে।' সে আমাকে আশ্বস্ত করে এখন ফোন করলে ছেঁচড়া ভাববে। দুদিন পরই করব। তারপর সপ্তাহখানেক পর সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

—কীরে ফোন করেছিলি?

বন্ধুকে কেমন বিমর্ষ দেখায়। মাথা নাড়ে। তার মানে সে ফোন করেছিল। 'তারপর?' আমি আগ্রহী হয়ে উঠি, 'কী বলল তোকে?'

: নম্বরটা...

বন্ধুর গলায় যেন কথা আটকে যায়!

: নম্বরটা ভুল ছিল?

: নম্বরটা ঠিকই ছিল...

: তা হলে?

: নম্বরটা ছিল রমনা থানার।

শুনে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল। চট করে চার লাইনে একটা পরিচিত শের মনে পড়ল—

'আমাকে প্রশ্রয় দিও না নারী
আমাকে প্রশ্রয় দিলেই তোমাকে চাইব
আর তুমি তো এতটা সহজলভ্য নও যে
যে কেউ চাইলেই তোমাকে পাবে...'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

❑
ঢাকা শহরের প্রায় ৩৫টি জল নিষ্কাশনের পথ নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ভূগর্ভে পানি ঢোকার পথ নেই, বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায়। ঢাকার ভূগর্ভে নাকি ব্যাপক ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যে কোনো সময়...না ভূমিকম্প নয় ভূমিধসেই হয়তো ঢাকার বিস্তীর্ণ নগরী বা পুরো ঢাকা মাটির তলে আচমকা তলিয়ে যাবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর মতো প্রাচীন সভ্যতা হয়ে উঠবে। হয়তো ঘুম থেকে উঠে দৈনিকের প্রথম পাতায় দু শ পয়েন্টে হেডিং দেখবেন ঢাকা শহরের ৫ লাখ লোক নেই, পাতাল নগরীতে তলিয়ে গেছে। তবে ভালো সংবাদ হচ্ছে ওই ভয়ঙ্কর সংবাদটি আপনাকে দেখতে হবে না কারণ আপনিও তখন ওই পাতাল নগরীতেই অবস্থান করছেন...আই মিন তলিয়ে গেছেন (কে জানে তখন হয়তো মনকির-নকিরের কঠিন কঠিন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন বা দিতে শুরু করেছেন)। তবে পাতাল নগরীতে যাওয়ার একটা সুবিধা আছে। হয়তো রূপকথার সেই পাতাল কন্যার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। সে আমাদের স্বাগত জানাবে—

—আসুন আসুন উন্নয়নের জোয়ারের ধাক্কায় চলে এলেন তা হলে?

—আরে উন্নয়নের জোয়ার নয়...ভূমিধসের ধাক্কায়...

—ওই হল যাহা বাহান্ন তাহাই সাড়ে তেপ্পান্ন চলুন আপনারা বাবার সঙ্গে দেখা করবেন।

—বাবা?

—হ্যাঁ...পাতালে এসেছেন পাতালের রাজার সঙ্গে দেখা করবেন না?

—কাম সারছে...এখানেও রাজা-রানী-রাজপুত্র?? তবে যে শুনলাম পৃথিবী থেকেই রাজতন্ত্র উঠে গেছে?

—আরে তন্ত্র উঠে গেছে তাতে কী তার মন্ত্র তো রয়ে গেছে।

নাহ রূপকথা থেকে বাস্তবে ফিরে আসা যাক। অন্য বড় বড় বাস্তবতাগুলো বাদই দিলাম, একটা অতি ক্ষুদ্র বাস্তবতা এখন পরাবাস্তবতার দিকে রওনা হয়েছে যেন...সেটা হচ্ছে মশা। নাগরিক মশা। লোকচক্ষুর অন্তরালে (সিটি করপোরেশনের অন্তরালেও) ধীরে ধীরে এই মশা যেন...কী আর বলব। আগে হলে বলতাম প্রয়োজনে মশা মারতে কামান দাগা হোক। এখন 'কামান দাগা'র কথা বললে শিশুরাও মুখ বন্ধ করে হাসে (মুখ খুললে যে মশা ঢুকে পড়বে)। আমার এক বন্ধু তো জানাল সে আগে অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যায় চেয়ারে বসে টিভি দেখত, এখন নাকি আর চেয়ার লাগে না মশারাই নাকি তাকে তুলে ধরে রাখে। আর সে টিভিতে বসে বসে অ্যারোসল, মরটিন, লাল-সবুজ প্যাঁচানো কয়েল আর গুড নাইট-এর অ্যাড দেখে।

এত মশার মধ্যেও এক লোককে দেখা গেল মশারি ছাড়া ঘুমায়। আরেকজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—সে কী মশারি ছাড়া ঘুমান আপনাকে মশা কামড়ায় না?

—নাহ।

—সত্যি কামড়ায় না?

—নাহ।

—নিশ্চয়ই কোনো এন্টি-মসকিউটো ক্রিম মাখেন গায়ে?

—নাহ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তা হলে নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রমী। রাত-দিন খাটতে খাটতে আপনার রক্ত পানি হয়ে গেছে তাই আর মশা পানি খেতে আসে না।

—তাও না।

—তা হলে?

—আমি আসলে মশারা যখন কামড়াতে আসে তখন তাদের...একটা ফিরিস্তি শুনিয়ে দেই...

—কিসের ফিরিস্তি?

—সিটি করপোরেশন আমাদের কী কী নাগরিক সুবিধা দেয় সেই ফিরিস্তি...একের পর এক বলতে থাকি...তখন তারা আমাকে বদ্ধপাগল ভেবে আর কামড়ায় না।

❑

র‍্যাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কে একজন বলল র‍্যাব এসে 'ক্রসফায়ার' শব্দটির অর্থই বদলে দিয়েছে। আরেকজন বলে উঠল আরে রাখেন আপনার র‍্যাব...আমি মরি ড্যাবের জ্বালায়...

পরে জানা গেল সেই তরুণ ডাক্তার রাজনীতির সঙ্গে এখন আর যুক্ত নন (একসময় আওয়ামী লীগের ছাত্ররাজনীতি করছিল) কিন্তু ড্যাব (ডাক্তারদের সরকারি সংগঠন) তাকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফোর্স পোস্টিং দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম "মন্দ কী ড্যাবের কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষ ডাক্তারি সেবা পাচ্ছে...এমনি কি আর তুমি ওখানে যেতে?"

দেশের আড্ডায় আলোচনার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে র‍্যাব এখনো শীর্ষেই আছে। সাধারণত কোনো আলোচনা যখন টক অব দ্য টাউন থেকে টক অব দ্য কান্ট্রিতে রূপান্তরিত হয় তখন সেই বিষয় নিয়ে একটা-দুটো জোক্স বের হয়ে যায়। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম র‍্যাব নিয়ে কেউ কোনো জোক্স শুনাচ্ছে না। একটা অবশ্য হালকার উপর দিয়ে শোনা গেছে। তবে সেটাকে জোক বলা যাবে না। উইটি কমেন্ট! সেটা হচ্ছে র‍্যাবকে নাকি প্রয়োজনে 'জন্ম শাসনেও' নামানো হতে পারে? এটা শুনে নাকি বিয়ের হার আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে! অবশ্য এ সবই গল্প। কিন্তু র‍্যাব নিয়ে জোক্স কেন শোনা যাচ্ছে না। ক্রসফায়ারের ভয়ে? যোগাযোগমন্ত্রী তো বলেই বসেছেন তথ্যসন্ত্রাস র‍্যাব দিয়ে সাইজ করলে কেমন হয়?

যা হোক, কেউ যখন ঝুঁকি নিচ্ছে না তখন আমি আপনাদের একটা 'র‍্যাব জোক' শোনাতে চাই। সেটা এরকম। প্রথমে সাধারণ পুলিশের গল্প। পুলিশ ফাঁড়িতে একদিন!

পুলিশ ডিউটি শেষে ৫ রাউন্ড গুলির মধ্যে তিনটি বুলেট জমা দিল।

—বাকি দুই বুলেট কী করেছ?

—ফুটাইছি।

—কই আওয়াজ তো পাইলাম না!

এবার র‍্যাব কার্যালয়ে ওই একই দিনে, ঘটনাও একই—

র‍্যাবের জোয়ান দশ রাউন্ড গুলি নিয়ে ডিউটি শেষে পাঁচ রাউন্ড ফেরত দিল—

—৫ রাউন্ড গুলি কই?

—ক্রসফায়ারে খরচ হইছে।

—কিন্তু লাশ তো মাত্র দুইটা!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তবে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা খুশি। সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ মরছে, খারাপ কী। শুধু আফসোস গডফাদারদের নাম বেরুচ্ছে না। গডফাদার নিয়ে একটা জোক্‌স শোনা যাক (আমরা অবশ্য একটা জোককেও বলে ফেলি জোক্‌স, হবে জোক। ব্যাপারটা আসলে মিসকলের মতো। আমার বলি মিসকল শব্দটা হওয়া উচিত মিসড কল) গডের কাছে এঞ্জেলরা গেল।

—হঠাৎ তোমরা, কী ব্যাপার পৃথিবীতে কোনো সমস্যা?

—গড, পৃথিবীর সব মানুষ আমাদের ধরেছে একটা ব্যাপারে, তারা আপনার সাথে সরাসরি কথা বলতে চায়।

—ওদের বলে দাও সেটা সম্ভব না গড সবকিছুর উর্ধ্বে...সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

—কিন্তু গড, ব্যাপারটা সিরিয়াস, একটু যদি শুনতেন।

—শুনতে পারি, বেশ বলো।

—গড, পৃথিবীতে আপনার নামের অপব্যাখ্যা হচ্ছে। কিছু কিছু লোক ফাদারের আগে গড লাগিয়ে মানে 'গডফাদার' নাম নিয়ে যা ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ যাদের মনে মনে ঘৃণা করে...এই ব্যাপারেই তারা আপনার সঙ্গে...

শুনে ক্ষিপ্ত হলেন গড। হুঙ্কার দিয়ে বললেন—

—এখুনি পৃথিবীর সব গডফাদারকে আমার সামনে হাজির কর।

—কিন্তু গড, সেটা তো সম্ভব না।

—কেন সম্ভব না?

—কারণ ওরাও আপনার মতো সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে!

❑

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

পাক হানাদার বাহিনী হঠাৎ এক বাঙালিকে আটকাল—

—হল্ট।

বাঙালি লোকটি ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল।

—আইডেনটি কার্ড নিকালো?

লোকটি যাচ্ছিল রেশন তুলতে। সাথে আইডেনটি কার্ড নেই। কী মনে করে রেশন কার্ডই দেখিয়ে দিল। সাথে সাথে ঠকাস স্যালুট। পাক সেপাই ভেবেছে এত বড় আইডেনটি কার্ড না জানি সিভিল ড্রেসে কত বড় অফিসার!

দ্বিতীয় ঘটনাটিও কম মজার নয়। বিহারী লাল নামে এক হিন্দু ভদ্রলোককে বর্ডার ক্রসের সময় পাকড়াও করল পাকবাহিনীর দল।

—তোমহারা নাম কেয়া হ্যায়?

বিহারী লাল ভাবলেন। মেরেই তো ফেলবে মিথ্যা বলে লাভ কী সত্যিটাই বলি।

বললেন—

—বিহারী লাল।

—তোম বিহারী হ্যায়?

সঙ্গে সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরে পারে তো কোলে করে বর্ডার পার করে দেয় হিন্দু ভদ্রলোককে। হোক না হিন্দুস্থান।

তৃতীয় ঘটনাটিও বর্ডারে। আরেকজনকে আটকাল পাক আর্মি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তোম কোন হ্যায়?

—এ্যাঁ...ইয়ে...সাচ্চা পাকিস্তানি।

—ন্যাশনাল সং ছোনাও।

—পাক সার জমিন সাদ বাদ...

—সেকেন্ড লাইন?

—নেহি জানতা।

—ঠিক হ্যায় যাও...তোম সাচ্চা পাকিস্তানি হ্যায়!

আসলে পাকিস্তানি আর্মির বুদ্ধি সব সময়ই ছিল হাঁটুতে। যুদ্ধের সময় [illegible] বাংলাদেশের এ মাথা থেকে ও মাথা মুক্তিবাহিনীর তাড়া খেয়ে [illegible] ডাবল মার্চ করে দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁটুর ব্রেন ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে [illegible] গোড়ালিতে। মতান্তরে পায়ের নলিতে। আর পায়ের গোড়ালি তো ভারী বুট [illegible] খুলবে কোথে কে? তারপরও অবসরে এক পাকিস্তানি মেজর বুট খুলে [illegible] সময় স্থানীয় এক রাজাকার ছুটে এসে কম্পিত গলায় জানাল 'মেজর সাহেব [illegible] হ্যায় মুক্তিবাহিনীর বিশাল দল আতা হ্যায়।'

পাক মেজর দ্রুত নিজে তৈরি হয়ে সব সৈন্যকে প্রস্তুত হতে বলে লাইন [illegible] করাল। তারপর দেশের জন্য আত্মত্যাগের ওপর ছোটখাটো একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা [illegible] তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলল 'এখন বল কে কে শত্রুর সঙ্গে সাহসের সাথে মোকাবিলা করে এই মুহূর্তে জীবন দিতে প্রস্তুত? তারা এক কদম এগিয়ে এস?' মেজর সাহেব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন মাত্র একজন সোলজার এক কদম এগিয়ে এসেছে। আশ্চর্য মাত্র একজন? হতাশ মেজর স্বগতোক্তি করল। তখন এক কদম এগিয়ে আসা সোলজারটি ফিসফিস করে বলল (উর্দুতে)—

—স্যার আমি এগিয়ে আসি নি বরং সবাই এক কদম পিছিয়ে গেছে।

পাক আর্মির বুদ্ধিবৃত্তির ওপর শেষ একটি গল্প দিয়ে শেষ করি। আরেক পাক মেজর গাছতলায় বসে পান করতে করতে ভাবল একটু ফান করা যাক। এক বাঙালিকে [illegible] ডাকল 'ইয়ে বাঙালি লোক ইধার আও' লোকটি এল।

—তোম কেয়া করতা হ্যায়?

—জুয়া খেলতা হ্যায় (বাকিটা বাংলায় লেখতা হ্যায়)?

—ইন্টারেস্টিং। বেশ আমার সঙ্গে একটা বেট ধর দেখি।

—জনাব ওই যে দূরের বটগাছটা, আমি ওটা ছুঁয়ে আসতে আসতে আপনি প্যান্ট খুলতে পারবেন না। যদি পারেন তা হলে এই যে আমার ব্যাগের সব টাকা আপনার। মেজর সাহেব অট্টহাস্য করলেন এটা কোনো ব্যাপার। 'বেশ তুমি ওই গাছ ছুঁয়ে আস। আমি প্যান্ট খুলছি'। দেখা গেল বাঙালি হেরে গেল, গাছ ছুঁয়ে আসার আগেই পাক মেজর দিব্যি নিখুঁত হয়ে দাঁড়িয়ে।

টাকা বুঝে নিতে নিতে মেজর সাহেব বললেন, 'এখন বুঝছ তো তোমরা বাঙালিরা কী পরিমাণ বেকুব' আর ঠিক তখনই সম্মিলিত একটা হাস্যরোল কানে এল মেজর সাহেবের।

—কী হল হাসল কারা?

—স্যার ওই যে আপনার দুই প্লাটুন সোলজার। ওদের সাথে বাজি ধরেছিলাম, আপনার প্যান্ট খোলাতে পারলে প্রত্যেকে নগদ একশ টাকা করে দেবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

❑
বিল গেটসের মাইক্রোসফট বাংলাদেশে তাদের অফিস খুলেছে। এবং তারা ঘোষণা দিয়েছে ২০০৫ বা ২০০৬ সালের মধ্যে উইন্ডোজের ওয়ার্ড, এক্সেল সব বাংলায় করা হবে। এমতাবস্থায় সাধুবাদ জানাতে হয় বিল গেটসকে। আর যথারীতি তার সম্মানে একটি জোক—

এক বাবা তার একমাত্র ছেলের বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ছেলেকে ডেকে বললেন

—দেখ বাবা তোমার জন্য আমি একটা বিয়ে ঠিক করেছি...আশা করি তোমার অমত হবে না।

—দেখ বাবা আমি নিজের পছন্দমতোই বিয়ে করতে চাই।

—মেয়েটি কিন্তু বিল গেটসের মেয়ে।

—সেক্ষেত্রে...ছেলে আমতা-আমতা করে। বাবা তখন গেলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের কাছে।

—কী ব্যাপার? প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন।

—একটি ছেলেকে চাকরি দিতে হবে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে।

—আপাতত আমাদের কোনো ভাইস প্রেসিডেন্টের দরকার নেই।

—দেখুন, ছেলেটি কিন্তু বিল গেটসের মেয়ের জামাই।

—তাই নাকি? সেক্ষেত্রে...আমতা-আমতা করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট।

অতঃপর বুদ্ধিমান (এবং ধুরন্ধর) বাবা এবার গেলেন সরাসরি বিল গেটসের কাছে।

—আপনার মেয়ের জন্য একটি ছেলে আছে আমার হাতে।

—মাফ করবেন আমি আপাতত মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছি না।

—ছেলেটি কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট...

—তাই নাকি? সেক্ষেত্রে...বিল গেটস আমতা-আমতা করে...

বিল গেটস আমতা-আমতা করতে থাকুন আমরা দেখি আমজনতা উইন্ডোজ বাংলা হওয়া নিয়ে কী ভাবছে।

আমার পরিচিত একজন শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তা হলে তো এখনই স্পোকেন বেঙ্গলি কোর্স চালু করা দরকার।

'কেন?' আমি জানতে চাই।

—আরে আজকাল অলিতে-গলিতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের যন্ত্রণায় ছেলেপেলে যেভাবে হাউ মাউ খাউ ইংরেজি বলতে শুরু করেছে তাতে করে কম্পিউটার যখন বাংলায় হয়ে যাবে তখন ওই বাংরেজদের কম্পিউটার বোঝাতে তাদের নতুন করে বাংলা শেখাবে কে শুনি? আরেকজন বললেন— 'আসলে আমাদের দেশে তিন ধরনের বাঙালি আছে—এক, ইংরেজি জানে না বাংলা জানে। বাংলা মাসের হিসাব জানে। এরা সাধারণ মানুষ। এদের আগেও কম্পিউটার ছিল না, উইন্ডোজ বাংলা হলেও কম্পিউটার থাকবে না। আরেক দল ভুল ইংরেজিতে জায়গায়-বেজায়গায় ফরফর করে আবার ভালো বাংলাও জানে না (এদেরকে উদ্দেশ করেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'বাপু বিলেতে গিয়ে ইংরেজিটাও ভালো শিখ নি বাংলা তো আগেই ভুলেছ')। এদের কম্পিউটার আছে তবে এদের বাসার বুয়াকে বলতে শোনা যায় 'আম্মা ছোড টিভিডা তো একদিনও ছাড়লেন না।'

তখন বিড়বিড় করে উত্তর আসে 'গাধা চালাতে জানলে তো...এটা হচ্ছে স্ট্যাটাস সিম্বল'। তৃতীয় দলটি ইংরেজি জানে। ভালোই জানে। এরা রিডার্স ডাইজেস্ট অথবা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পড়ে। এরা বাংলা জানে কিন্তু বলে না। বললেও ইংরেজির মতো শোনায়। এদের কম্পিউটার নেই তবে ল্যাপটপ আছে। সেই ল্যাপটপে বাংলা উইন্ডোজ ঢুকলে এরা ভাইবাস মনে করে ইরেজ করে দেয় তৎক্ষণাৎ!

অতএব হে মহামতি বিল গেটস আপনি কার জন্য উইন্ডোজ বাংলা করবেন?

আসলে লেখার জন্যই লেখা। উইন্ডোজ বাংলা হোক। আমরাও চাই। আমরা ২০০৫ বা ২০০৬ সালে বলতে চাই 'জানালা খুলে শব্দে যাও' মানে উইন্ডোজ খুলে ওয়ার্ল্ডে যাও বা ওই ধরনের কিছু।

শেষ একটা ঘটনা দিয়ে লেখাটা শ্যাষ করে দেই। তখন বিল ক্লিনটন বাংলাদেশে এসেছেন। আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু মহাবিরক্ত!

—কী হল তোর?

—আর কইস না, এই বিল ক্লিনটন আইসা আমার সব বিল আটকায়া দিছে।

বিল ক্লিনটন আসায় কীভাবে তার বিল আটকাল বুঝলাম না। তবে পাশ থেকে আরেকজন বলল—

—অপেক্ষা কর বিল গেটস আইতাছে...বিল সব পায়া যাইবি...

❑

চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে দু বন্ধু আলাপ করছিল।

—আচ্ছা দেশটা কোনদিকে যাচ্ছে ঠিক করে বল তো? হতাশ কণ্ঠে এক বন্ধু জানতে চাইল আরেক বন্ধুর কাছে।

—সেটা যারা দেশ চালাচ্ছে তাদের জিজ্ঞেস কর, আমাকে কেন?

—যারা চালাচ্ছে তাদের পাব কোথায়?

—কেন বিটিভিতে দেখিস না তারা তো সব সময় বলছে তারা জনগণের পাশেই আছে...থাকবে...

—তুই শিওর তারা আমাদের পাশে আছে?

—অবশ্যই, বিটিভি সত্য হলে...

পরদিন সেই বন্ধু বাসে করে চলছে। তার পাশে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। বন্ধু জিজ্ঞেস করল—

—ভাই আপনি নিশ্চয়ই সরকার চালাচ্ছেন?

—আমি সরকার চালাচ্ছি মানে?

—মানে আপনি সরকারের লোক না? মানে বিএনপি করেন না?

—খবরদার মুখ সামলে...আমি সাধারণ জনগণ! বিএনপি কেন, কোনো দলই করি না...

—তা হলে যে বিটিভি বলে তারা জনগণের পাশেই আছে...?

—ওফ্ বিটিভির কথা বাদ দেন...ওটা প্রথমে ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশন তারপর হল বাংলাদেশ টেলিবিভীষণ...আর এখন বাংলাদেশ টেলিবিভীষিকা... মিথ্যা কত প্রকার ও কী কী... ভদ্রলোক কথা শেষ না করে নেমে গেলেন, তার বাস স্টপেজ এসে গেছে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মিথ্যাকে বারবার বললে নাকি সেটা সত্য হয়ে ওঠে আবার সত্যটাকেও বারবার শোনাতে বাধ্য করলে সেটাকেও মিথ্যা বলে সন্দেহ হতে শুরু করে। আমরা এখন কোনদিকে যাব? কার কাছে যাব?

গ্রামের এক লোক মধ্যমাঠে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে...যেন কোনদিকে যাবে কার কাছে যাবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আরেক লোক, সে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল—

—কী হইল, কই যাইবেন, কার কাছে যাইবেন?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকটি হাত তুলে একগাছি দড়ি দেখাল।

—ও বুঝছি ফাঁস লইবেন? ভালো গাছ খুঁইজা পাইতাছেন না? উত্তরে বন্দে যান শক্ত গজারি গাছ আছে অনেক। লটকি দিয়া পড়লে ঠাইলও ভাঙব না।

—না না আত্মহত্যা করমু কোন দুঃখে?

—তাইলে?

—আসলে আমি বুঝতে পারতাছি না...আমি কি আমার গরুটা হারাইলাম নাকি এই দড়িটা খুঁইজা পাইলাম...

আমাদের মানে সাধারণ জনগণের যারা প্রতিটি দলের পোস্টারে নিচের দিকে তাদের সম্মতি ছাড়াই কখনো জাগ্রত জনতা হিসেবে থাকে কখনোবা সচেতন জনতা হিসেবে থাকে...তাদের হয়েছে গ্রামের ওই কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকটির মতো অবস্থা। এই এত বছরে কী পাইলাম আর কী হারাইলাম বুঝে উঠতে পারছি না।

শেষ একটা ঘটনা দিয়ে লেখাটা নিঃশেষ করে দেই। ঘটনাটা গ্রেনেড হামলা বিষয়ক এবং সত্যি ঘটনা। দু জন নিম্নমধ্যবিত্ত লোক কথা বলছে :

—আচ্ছা তোর কী মনে হয়, গ্রেনেড হামলা কারা করছে?

—ক্যান, বিএনপি।

—ধুর বিএনপি কি এত বোকা নাকি যে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবো? কী যে বেকুবের মতো কথা কস তুই।

—তা হলে আওয়ামী লীগ?

—তুই তো দেখতাছি একটা আস্তা রামগাধা। নিজের গায়ে নিজে গ্রেনেড মারে কেউ?

—তা হলে তুই-ই বল...তুই কি আন্দাজ করতে পারছস কাগো কাজ এইটা?

—অবশ্যই। যেইদিন হামলা হইল সেইদিনই টের পাইছি।

—কস কী! কারা? জলদি ক??

—আর কারা, সন্ত্রাসীরা!

❑

আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন বন্ধুই বিদেশিনী বিয়ে করেছে। এবং তারা মানে বিদেশী বন্ধুপত্নীরা বেশ ভালোই বাংলা বলে এবং পড়তে পারে। একজনকে আমার একটি আব্জাব্ গ্রন্থ দিয়ে তো বিপদে পড়েছি। দেখা হলেই সে আমার লেখ্য বাংলার ভুল ধরে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। কে জানে তার কারণেই হয়তো একদিন আমাকে আব্জাব্ লেখা বন্ধ করে দিতে হবে। তো সেই বাংলা বিশারদকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—

—আচ্ছা বাংলাদেশের কোন কোন জায়গা তোমার ভালো লেগেছে?

সে একটু চিন্তা করল যেন...তারপর বলল—



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—বঙ্গবাজার আর কক্সবাজার।

শুনে আমি হতভম্ব। কক্সবাজার না হয় বুঝলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গা। কিন্তু হোয়াই বঙ্গবাজার?? আরেক বঙ্গবাজার বিশারদ আমাকে জ্ঞান দিল 'আরে বুঝলি না বিদেশে যে সমস্ত কাপড়চোপড় ওরা হারায় সেগুলাই আবার এই বঙ্গতে এসে খুঁজে পায় যে...!'

আরেক বন্ধুপত্নী তিনিও বিদেশী। তিনি আবার এক ডিগ্রি সরেস। পান খাওয়া শিখেছেন। সারা দিন কুটনা বুড়ির মতো পান চিবান। আর কোমরে শাড়ি বেঁধে শাশুড়ি, ননদ, পাড়াপড়শি সবার সঙ্গে ঝগড়া করেন। সবাই নাকি তার ভয়ে অস্থির! বন্ধুটি মাঝে মধ্যেই হতাশ গলায় বলে—

—বুঝলি মানুষ তো দেশের ভেতর খাল কেটে কুমির আনে আর আমি বিদেশ থেকে নদী কেটে হাঙর নিয়ে এসেছি। পান আর জর্দা কিনতে কিনতেই ফতুর হয়ে গেলামরে!

শেষ একজন বিদেশিনীর কথা বলি। ইনিও বন্ধুপত্নী। আমেরিকান। সে আমার নিরীহ বন্ধুটিকে রেঞ্জ দিয়ে নাটবল্টুর মতো এমন টাইট দিয়ে রেখেছে যে নড়াচড়ার উপায় নেই। নড়লেই প্যাঁচ কেটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। গভীর প্রেমে পড়ে বিদেশিনী বিয়ে করেছিল সুখী হবে এই স্বপ্নে...কিন্তু সেই সুখী হওয়ার স্বপ্নের গুড়ে বালি...প্রতি সপ্তাহেই বউ নিয়ে কক্সবাজার সৈকতের বালিতে গিয়ে বসে থাকতে হয়। বউয়ের চামড়া টেন করার রোগ আছে। কক্সবাজার যেতে যেতে এমন অবস্থা হয়েছে তার যে কক্সবাজারের নাম শুনলেই তার মাথায় লোনা রক্ত উঠে যায়। তো সেই আমেরিকান বন্ধুপত্নীকে ক'দিন আগে ঠাট্টা করে বলেছিলাম—

—কি তুমি তো মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে ইরাকি বন্দির মতো আচরণ করছ।

ব্যস তেলে বোধহয় গাজর পড়ল (বেগুন ফেললাম না। ওরা বেগুন খায় কি না জানি না তবে গাজর খায় বলে শুনেছি) আমি কোনোমতে পালিয়ে বাঁচলাম। বন্ধুর খোঁজ আর নেই নি। তবে খবর পেয়েছি তারা এই মুহূর্তে দেশে নেই। হয়তো এই গরমে কক্সবাজারের 'তামা গরম' সৈকতে না গিয়ে নিজের দেশের কোনো শীতল সৈকতে গিয়ে 'ঠাণ্ডা' হয়ে আসতে গেছে!'

❑

দেশ অনেক আগে থেকেই ডুবছিল...সেই যখন থেকে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ তারপর নারী নির্যাতনে দ্বিতীয় তারপর অকার্যকর রাষ্ট্র...তখন থেকে ডোবার শুরু...আর এখন তো আক্ষরিক অর্থেই ডুবতে বসেছে বন্যার পানিতে...। চারদিক পানিতে পানিতে সয়লাব। আমার পরিচিত একজন সেদিন বলল টিভি ছাড়লে সে নাকি তৎক্ষণাৎ ভয়ে টিভি বন্ধ করে দেয়।

—কেন, কিসের ভয়?

—এত পানি যে মনে হয়...টিভি চুইয়ে না পানি পড়তে শুরু করে। সেই ভয়ে বন্ধ রাখি, নতুন কেনা টিভি যে!

আসলে ব্যাপারটা এখন আর ফানের পর্যায়ে নেই। প্রতিটি দৈনিকে দুইশ পয়েন্টে হেডিং 'বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ'। এইরকম যখন অবস্থা চারদিকে থইথই পানি, কারো মুখে হাসি নেই তখন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সদা হাসিমুখ ফালুর হাসি নিয়ে মোটামুটি গবেষণা চলছে। আলাপ-আলোচনায় মনে হচ্ছে তার হাসির কাছে দা ভিঞ্চির মোনালিসার হাসি ফেল। কেউ বলছেন তার হাসির মূল্য মিলিয়ন ডলার, কেউ বলছেন প্লিজ তিনি যেন


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আজীবন ওইরকম হেসে যান, মুখ ফিরিয়ে না নেন। (সূত্র : যায়যায়দিন)। হাসার পক্ষে আমিও। হাসা উচিত। হাসলে নাকি মুখের বত্রিশটি পেশির চমৎকার ব্যায়াম হয়। হাসি একটি চমৎকার ব্যাপার অবশ্য সেটা যদি হয় স্বতঃস্ফূর্ত। কেউ হাসিমুখে থাকলে সমস্যা নেই। সেটাই উত্তম কিন্তু আশপাশ থেকে গ্যাস মেরে (তেল মারার দিন বোধহয় এখন শেষ) ব্যাপারটাকে বিষময় করে তুললেই সমস্যা। সে যাই হোক, আবার বন্যায় ফিরে আসি। আসলে বন্যা নিয়ে আর যাই হোক রম্য লেখা কঠিন। তারপরও একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সেটা অষ্টাশির বন্যার সময়কার কথা (অনেকে বলছেন এবারের বন্যা নাকি অষ্টাশির বন্যাকেও ক্রস করেছে)। আমি তখন কল্যাণপুরে এক ভাড়া বাসায় থাকি। বাসার একতলা ডুবে গেছে অনেক আগেই। আমি সপরিবারে বড় ভাইয়ের বাসায় উদ্বাস্তু। একদিন গেলাম কল্যাণপুরের বাসার খোঁজ নিতে। বাসার সামনের রাস্তায় গলা পানি। একটা নৌকা ভাড়া করে বাসার কাছাকাছি যেতেই দেখি টাইটানিকের মতো একটা বিশাল নৌকা প্রায় ছুটে আসছে। এত বিশাল নৌকার চলার কথা নদীতে সেটা এখন চলছে কল্যাণপুরের রাস্তা দিয়ে, অবিশ্বাস্য! এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন ওই বিশাল নৌকার মাঝিকে উদ্দেশ্য করে—

—ভাই এই নৌকা সমগ্র বাংলাদেশ কয় টন?

—ইয়ার্কি করেন? মাঝি বিরক্ত হল বলে মনে হল।

—না ভাই ইয়ার্কি না...বন্যার পানি সরে গেলে ছেলেপেলেদের বলতে হবে না এই রাস্তা দিয়ে কত টন নৌকা চলতে দেখেছি।

—পাঁচ টন। মাঝি গম্ভীর মুখে জানাল।

সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টনি নৌকাকে কোনোরকমে সাইড দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমার ছিপ নৌকা নিয়ে। কয়েকটা দোকানের সাইড দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার পাশ দিয়ে হুশ করে ভেসে উঠেছে একটা মানুষের মাথা। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। (ইদানীং এ ঘটনা ঘটলে হয়তো ভাবতাম 'অ্যাকোয়া হাইজ্যাকার') লোকটি দম নিয়ে আবার ডুব দিল আবার ভুশ করে ভেসে উঠল! আমি অবাক হলাম লোকটা কি এখানে ডুব দেওয়ার প্রতিযোগিতা করছে?...নাকি গোসল করছে! তাই বলে বন্যার এত নোংরা পানিতে? শেষমেশ সাহস করে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম—

—কী ব্যাপার ভাই, এই ময়লা পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছেন যে?

লোকটি হাত তুলে একটা চাবি দেখাল। তারপর আবার ভুশ করে ডুব দিল। পরে বুঝলাম যে সে আসলে তার তালাবদ্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। ডুব দিয়ে দোকান খোলার চেষ্টা করছে। কিছুতেই পারছে না। ব্যাটে-বলে হচ্ছে না মানে তালা-চাবিতে হচ্ছে না।

বাসার সামনে এসে নৌকা থেকে নেমে কোমর পানি ভেঙে বাসার দরজার তালা খুলতেই দেখি ঘরের ভিতর পানি থইথই করছে, সেখানেও প্রায় কোমর পানি। ছপাৎ করে একটা কিছু যেন বেরিয়ে গেল, তাকিয়ে দেখি মাছ...সম্ভবত একটা টাকি মাছ।

তারপর আরেকটা কী যেন সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল কিংবা ঢুকল। আমার আর সাহসে কুলাল না। সাপটাপ হতে পারে। জলমগ্ন বাসা তালা মেরে কোনোমতে এসে আবার ভাড়া নৌকায় উঠলাম। এ তো গেল অষ্টাশির বন্যার কথা। এবারের বন্যা নাকি তার থেকেও ভয়াবহ! তা হলে কী হবে এ দেশের অবস্থা! কী আছে আমাদের ভাগ্যে?

এবার একটা পিতা-পুত্র সংলাপ। বিষয় বন্যা। পুত্র তার পিতাকে প্রশ্ন করল—

: বাবা প্রতি বছর আমাদের দেশে বন্যা হয় কেন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: আল্লাহ আমাদের দেশে প্রতি বছর বন্যার মতো বিপদ দিয়ে বোধহয় আমাদের পরীক্ষা করেন।

: পরীক্ষায় আমরা পাস করি না ফেল করি?

: মনে হয় ফেল করি...তাই বারবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে আমাদের।

তবে সব কথার শেষ কথা হচ্ছে সেই চিরন্তন বাক্য 'ফেইলারস আর দ্য সাকসেস অব পিলার'—যতই পরীক্ষা দিয়ে ফেল করি না কেন একদিন নিশ্চয়ই পাস আমাদের হবেই হবে।

❑

অবশেষে শেক্সপিয়ারের সেক্স চেঞ্জ হয়ে গেছে! কোন একটি দৈনিকে পড়লাম শেক্সপিয়ার নাকি আসলে একজন 'নারী' ছিলেন! এখন কেউ যদি হয় শেক্সপিয়ারের অন্ধভক্ত কিন্তু নারীবিদ্বেষী তা হলে তার অবস্থাটা এই মুহূর্তে কেমন হবে একবার ভেবে দেখেছেন কি?

যে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে শেক্সপিয়ার একজন মহিলা তাতে বলা হয়েছে তিনি নারী হলেই নাকি সবদিক রক্ষা হয়। মানে সবদিকে ঠিকঠাকমতো মিলে যায়। এখন মনে হচ্ছে তার নামেরও উচ্চারণ নিয়ে যে গল্পটা ছিল সেটারও একটা গতি হয়। প্রসঙ্গক্রমে গল্পটা বলা যেতে পারে—

এক লোক একবার শেক্সপিয়ারকে প্রশ্ন করেছিল—

—আচ্ছা আপনার নামের প্রথম অংশটার উচ্চারণ নিয়ে কি সমস্যায় পড়তে হয় না!

—খুব একটা না, তবে...

—তবে?

—তবে—নাম বলার সময় আমি একটু কৌশল করি...

—কী রকম?

—মেয়েদেরকে যখন নিজের নাম বলি তখন বলি শুধু পিয়ার।

—আর ছেলেদের ক্ষেত্রে?

—পুরো নামটাই বলি...

শেক্সপিয়ার মহিলা হলে এই গল্পটায় একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় যেন!

কবি মধুসূদন দত্ত শেক্সপিয়ারের ভীষণ ভক্ত ছিলেন। তিনি নাকি প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করতেন—'নিউটনের চেয়ে শেক্সপিয়ার বেশি প্রতিভাবান। নিউটন ইচ্ছে করলেই শেক্সপিয়ার হতে পারবেন না। কিন্তু শেক্সপিয়ার ইচ্ছে করলেই নিউটন হতে পারতেন।'

তো মধুসূদন দত্ত একবার ক্লাসে বোর্ডে অঙ্ক করতে গিয়ে আটকে গেলেন। বন্ধুরা পেছন থেকে টিটকিরি মারা শুরু করল 'কীরে শেক্সপিয়ার নাকি ইচ্ছে করলেই নিউটন হতে পারত?' তখন মধুসূদন দত্ত ঘষঘষ করে অঙ্কটা করে ফেললেন। বলাই বাহুল্য অঙ্কটি সঠিক হয় নি। অঙ্কের উত্তর দেখে শিক্ষক বললেন—

—মধু তুমি কি নিশ্চিত অঙ্কের উত্তরটা সঠিক হবে?

মধুসূদন দত্ত তখন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন!' ক্লাসসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল!

শেক্সপিয়ার নিয়ে শেষ একটা গল্প—শেক্সপিয়ার একবার স্ট্যামফোর্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন এক জায়গায় বেশ ভিড়। উঁকি মেরে দেখেন একটা পোস্টার লাগানো, সেটাই সবাই ভিড় করে পড়ছে। তিনি যেহেতু চশমাটা আনেন নি তাই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী লিখেছে?

লোকটি তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'আমিও আপনার মতো পড়তে পারি না।'

শেষ হয়েও শেষ করা গেল না যেন। আসলে শেক্সপিয়ারকে নিয়ে আরেকটি ঘটনা না লিখলেই নয়। শেক্সপিয়ার তখন তরুণ। তখনো তিনি নাটক লেখা শুরু করেন নি। অভিনয় করেন। অভিনয়টাকেই পেশা হিসেবে নেবেন বলে ভাবছেন। এমন সময় তিনি একটি নাটকের চরিত্র পেলেন কিন্তু তাতে কোনো সংলাপ নেই। ক্রুদ্ধ শেক্সপিয়ার পরিচালকের সঙ্গে দেখা করলেন। এই পরিচালকই ওই নাটকটি লিখেছেন।

—আমাকে কী চরিত্র দিয়েছেন কোনো সংলাপ নেই?

—বাছা, নাটকের সংলাপ লেখা কি চাট্টিখানি কথা। একটা লিখে আনতে পারলে...না হয় তোমার চরিত্রে কিছু সংলাপ ঢুকিয়ে দিব। ঠাট্টা করল পরিচালক কাম নাট্যকার। দুদিন বাদে শেক্সপিয়ার একটি নাটক নিয়ে হাজির হলেন, নাটকের নাম 'কমেডি অব এরর'। বলাই বাহুল্য পরবর্তীতে সেই মঞ্চে সেবার সেই 'কমেডি অব এরর' মঞ্চস্থ হয়েছিল। আর সেই নাট্যকার মঞ্চের সামনে সংলাপহীন হয়ে বসেছিল।

এবারের লেখাটা শেক্সপিয়ার দিয়েই পার করে দিলাম।

❑

ষাট বছর বয়সের এক লোক গেছে ডাক্তারের কাছে।

—আপনার সমস্যা কী?

—গাছে উঠেছিলাম ওখান থেকে পড়ে ব্যথা পেয়েছি হাঁটুতে ...ব্যথা আর যায় না।

—কত বড় গাছ?

—অনেক বড়...আমগাছ।

ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দুটো ওষুধ দিলেন

—এটা দিনে তিনবার খাবেন ব্যথা কমে যাবে।

—আর এটা? রোগী জানতে চাইল।

—এটা পাগলামি কমার ওষুধ...এটাও খাবেন।

—কী বলছেন? পাগলামি মানে? আমার মধ্যে পাগলামির কী দেখলেন?

—নিশ্চয়ই আছে। নইলে এই ষাট বছর বয়সে আপনি আমগাছে চড়তে যাবেন কেন?

কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, আসলেই ওই ষাট বছর বয়সের লোকটি কেন গাছে উঠেছিল সেটা কিন্তু গবেষণার বিষয়। বন্যার পানিতে তার ঘরবাড়ি ডুবে গেছে বলে সে গাছে আশ্রয় নিয়েছিল? তা নয়, কারণ বন্যার পানি তার এলাকায় ঢুকলেও তার বাড়ি ডোবে নি। কোনো লোকাল সন্ত্রাসীর ভয়ে গিয়ে গাছে উঠেছে? তাও নয়, কারণ তার এলাকার 'টপটেরর নাক চ্যাপা নকিব' র‍্যাব-এর হাতে অতিসম্প্রতি ধরা পড়েছে। এবং 'ক্রসফায়ারে' মারাও গেছে। গ্রামীণ মোবাইলের নেটওয়ার্ক ধরতে মোবাইল হাতে গাছে উঠেছিল? তাও নয়, কারণ তার এলাকায় গ্রামের অনেক লোক মোবাইল ব্যবহার করলেও তার মোবাইল ফোন নেই, নাকি এই বৃদ্ধ বয়সে আম পাড়তে গাছে উঠেছে? তাও নয়, কারণ এ সময় ওই গাছে কোনো আম ছিল না। তা হলে?

আসলে সে উঠেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে—সেটা হচ্ছে দেশের উন্নয়ন আসলে ঠিক কতটা হল তা একনজর দেখতে ওই আমগাছের মগডালে উঠেছিল। তবে তার ভাগ্য


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভালো বলতে হবে পিছলে পড়ে তার হাত-পা ভাঙে নি, শুধু হাঁটুতে সামান্য চোট লেগেছে মাত্র।

এই বৃদ্ধের প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে আরেকটি ঘটনা। আরেক বৃদ্ধ, তিনি অবশ্য বিদেশী। বাংলাদেশে এসেছেন এ দেশের উন্নয়ন কতটা হল তা সরজমিন দেখতে। তার এই কৌতূহলের কারণ তরুণ বয়সে তিনি একসময় এই দেশে কাজ করে গেছেন। তো মজার ব্যাপার হচ্ছে তারও হাঁটুতে জখম, শুধু হাঁটু কেন হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে ডাক্তার দেখালেন—

—এ কী অবস্থা পায়ের? কী হয়েছিল?

—উন্নয়ন দেখতে গিয়েছিলাম এক অনুন্নত দেশে।

—তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

—সম্পর্ক আছে। ওই দেশে আসলে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে...প্রতি দু ফুট পরপর উন্নয়নমূলক ভিত্তিপ্রস্তর...হাঁটতে গিয়ে ঔগুলোয়ই বারবার পায়ে বাড়ি লেগে লেগে আমার পায়ের এই অবস্থা!

এবার দেশের সেই বৃদ্ধের কাছে ফেরা যাক। তিনি আসলে উন্নয়ন ঠিক দেখতে পারেন নি। কারণ প্রায় পুরো দেশই তখন বন্যার পানিতে ঢেকে ছিল, ফলে যথারীতি উন্নয়নও ঢাকা পড়েছে। পানি সরলে যদি দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে শেষ একটি গল্প—সরকারদলীয় দুই নেতা কথা বলছেন।

—সর্বনাশ হল, আমাদের সব উন্নয়নই তো বন্যার পানিতে মার খেয়ে গেল।

—আরে খামোশ! বন্যা আমাদের জন্য আশীর্বাদ...ম্যাডাম বলেছেন...

—কীভাবে?

—বন্যার পানি একদিকে আনছে বিদেশী ত্রাণ...আরেকদিকে টনকে টন পলি পড়বে জমিতে...তারপর দেখবি আগামী বছর ক্ষেতে ক্ষেতে খালি ফসল আর ফসল... ধানের শীষ আর ধানের শীষ...নৌকা ঢোকার এক ইঞ্চি জায়গাও থাকবে না।

—বুদ্ধি তো খারাপ না।

—তার মানে কী বুঝলি...'বন্যা জাতির জন্য সর্বনাশ, সরকারের জন্য পৌষ মাস!'

—হে হে...

অতঃপর তাহারা হায়নার মতো হাসিতে লাগিল...

❑

প্রবল বর্ষণের দিন এক লোক হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এল। এসে দেখে দরজা খোলা এবং ড্রইংরুমে একটা অচেনা ছাতা! কে এল? একটু বাদেই টের পেল সে। তার স্ত্রীর গোপন প্রেমিক! ক্ষিপ্ত স্বামী আবহাওয়া অফিসে ফোন করল—

—হ্যালো এই বৃষ্টি কতক্ষণ থাকবে?

—মনে তো হচ্ছে তিন দিন।

—ধন্যবাদ।

এবার স্বামী প্রেমিকের ছাতাটা ভেঙে দু টুকরো করল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এবার দেখি শালার ব্যাটা বাড়ি ফিরিস কীভাবে?'

এই হচ্ছে নিরীহ বাঙালির প্রতিশোধপরায়ণতা। তবে সব বাঙালিই যে নিরীহ এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। এবার দেখা যাক এক হিংস্র স্বামীর প্রতিশোধ নেওয়ার ধরন—


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রবল বর্ষণ। গত পঞ্চাশ বছরে এমন বৃষ্টি হয় নি। স্বামী বেচারা কাক...না ভুল বললাম 'কোকিল তেজা' হয়ে বাড়ি ফিরল। ঘটনা প্রায় একই--দেখে ড্রইংরুমে এক অচেনা বেইন কোট। এই স্বামী আগের স্বামীর মতো অত বোকা নয়। চট করে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ফেলল। ফোন করল...না আবহাওয়া অফিসে নয়, প্রথমে আত্মমান মুফিদুলে তারপর থানায়।

—হ্যালো পুলিশ কন্ট্রোল রুম।

—হ্যাঁ।

—আপনাদের হাজত রুম কি খালি?

—মানে?

—মানে কোনো মার্ডার কেসের আসামি আছে?

—না।

—তা হলে রেডি হয়ে যান।

—আপনার ঠিকানাটা বলেন।

খট করে ফোন রেখে দিল উত্তেজিত স্বামী। তারপর পিস্তল বের করল কোহিনীর খাতিরে ধরে নেওয়া যাক তার একটা লাইসেন্স করা পিস্তল আছে)। এফবিআই-এর এজেন্টদের মতো দু হাতে পিস্তল ধরে ঝট করে ঢুকে পড়ল তার বেডরুমে, যেখানে...

—দোস তুই?

বিছানায় শোয়া তারই ছেলেবেলার বন্ধু।

—কোনো কথা নয় বল কোথায় গুলি করব বুকে, না মাথায়?

—বুকে করিস না দোস্ত আমি হার্টের রোগী, মাথায় কর...একদম ব্রেনে...

—তোর ব্রেন কোথায় আমি জানি সে গুলি করল তার হাঁটুতে...

যাহোক, মূল ঘটনায় মানে বাস্তবে ফিরে আসা যাক। মূল ঘটনা তো একটাই এই তো ক'দিন আগের বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ঘরের ভেতরই হাঁটুপানি এবার, তাও কি বন্যার পানি নয় বৃষ্টির পানি। তার মানে বাইরে পানি কী পরিমাণ! একজন ঠাট্টা করে বলল 'সবকিছুর তদন্ত হচ্ছে এই অনাহূত বৃষ্টির তদন্ত হওয়া দরকার এটাও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হতে পারে।'

'হ্যাঁ অবশ্যই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র...আমার ধারণা হারিকেন আইভান এর সাথে জড়িত'। আরেকজন গম্ভীরভাবে তার অভিমত জানাল। আসলে আমাদের দেশটা ষড়যন্ত্র আর তদন্তের দেশ হয়ে উঠেছে যেন। সব ষড়যন্ত্র আবার নাকি আন্তর্জাতিক। ইদানীং তদন্তও দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে, ইন্টারপোল, এফবিআই যেভাবে ঘন ঘন দেশে আসছে। এত উচ্চ শ্রেণীর আলাপে না গিয়ে বরং এফবিআই-এর একটা গল্প দিয়ে এই গালগল্প শেষ করি...গল্পটা আগেও শুনে থাকতে পারেন তবে একটা কথা আছে না ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বোটল...

এক জঙ্গলে হারিয়ে গেছে এক বিরল প্রজাতির ভালুক। প্রথমে দায়িত্ব পড়ল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ওপর। তারা জঙ্গলের প্রতিটা প্রাণীকে আলাদা আলাদাভাবে ইন্টারভ্যু করল কিন্তু তাদের কথাবার্তায় ভালুক ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। এরপর এল ইন্টারপোল। তারা পুরো জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিল। সব প্রাণী ছুটে পালাল ভালুকও লাপাত্তা। শেষপর্যন্ত জঙ্গলে ঢুকল এফবিআই। তারা তিন মিনিটের মাথায় একটা গরিলাকে পিটাতে পিটাতে বের করে আনল। গরিলাও সমানে চিৎকার করছিল, 'ঠিক আছে ঠিক আছে আমিই সেই বিরল প্রজাতির ভালুক।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# অপসন থ্রি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অপসন থ্রি

গৃহত্যাগী জোছনা বলে নাকি একটা কথা আছে, যে জোছনা উঠলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু মতলুবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তা নয়, সে ভরদুপুরে গৃহত্যাগ করল। একবারে যাকে বলে একবস্ত্রে। গনগনে রোদে সে হনহন করে হাঁটা দিল সোজা উত্তর দিকে। গত বছর দক্ষিণ দিকে হাঁটা দিয়ে ধরা খেয়েছিল। এবার আর দক্ষিণ দিকে হাঁটার ঝুঁকি নিল না। সোজা উত্তরে, সেদিকেই নাকি হিমালয়। দ্য মাউন্ট এভারেস্ট। এবার নির্ঘাত হিমালয়ের কোনো গুহায় সাবলেট নিয়ে...

—কী মতলুব কই যাস?

মাঝপথে মতলুবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আব্দুল তাকে আটকাল।

—হিমালয়ে।

—বুঝছি আবার ব্যারা উঠছে তোর। কোন গুহায় গিয়া ধ্যান কইরা সন্ন্যাসী হইবি। তা যা, লোকসংখ্যা কিছু কমা দরকার, দেশে মানুষ খুব বাড়ছে!

—তা হলেই যাই।

—যা... তবে শোন, হিমালয় যে যাস সাঁতার জানস তো?

—হিমালয়ে যাইতে হইলে সাঁতার জানতে হইব নাকি?

—অবশ্যই। আগে না জানলেও চলত এখন সাঁতার জানা জরুরি।

—মানে? কী কস তুই?

—আরে গাধা তুই মনে হয় দুনিয়াদারির কোনো খোঁজখবরই রাখছ না, শুনস নাই হিমালয়ের গ্লেসিয়ার মানে চলমান বরফের চাক্কি সব গলতে শুরু করেছে... তার পানি যেইভাবে ছুইটা আসতাছে... দেশের নদ-নদীতে বন্যা না হইয়া যায়... তুই তো পানির মধ্যে গিয়া পড়বিরে... ডুইবা না মরস। তাই বলছিলাম সাঁতারটা শিইখা গেলে ভালো হইত না?

মতলুব ঠিক বুঝল না প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বন্ধু আব্দুল তার সাথে ঠাট্টা করছে না তো? চেহারার ভঙ্গিতে সেরকম অবশ্য মনে হল না।

মতলুবের হিমালয় যাওয়া হল না। ফিরে চলল বাসায়। পানিকে তার ভীষণ ভয়। পানিতে ডুবে মরার চেয়ে বরং... ঘরেই ফেরা যাক। পথে মদনার চায়ের টংয়ে বসে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। মতলুব দেখে আরেকটা লোক আগে থেকেই বসে আছে। চুল দাড়ি গোঁফে সমস্ত মুখটা ঢাকা। লোকটা অচেনা। বেশ লম্বা-চওড়া শরীর। এই এলাকার লোক না বোঝা যাচ্ছে। তারপরও চোখ দুটো কেমন চেনা চেনা ঠেকে মতলুবের।

চা খেতে খেতে দুপুরের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল মতলুব। ঢাকা থেকে তার ভার্সিটিতে পড়ুয়া শ্যালিকা এসেছে বেড়াতে। তার সাথে একটু রঙ্গরসিকতা করতে গিয়ে যত সর্বনাশ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে অবশ্য রঙ্গরসিকতার লোক না। আসলে রঙ্গরসের উসকানিটা দিয়েছিল তার সেই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বন্ধু আব্দুল—

—কীরে ঢাকা থাইকা বুলে তোর শালী আইছে?

—হুঁ।

—তা রংঢং কিছু করস না?

—মানে?

—আরে শালী হইল গিয়া সেকেন্ড বউ... তার সাথে একটু আশনাই... মতলুব আড্ডা থেকে উঠে পড়ে, বিষয়টা তার ভালো লাগে না। তারপরও ঘরে ফিরে রঙ্গরসের কী যে ভূত চাপল... কিছু না হাতটা একটু ধরেছিল লিপির আর ঠিক তখনই তার বউ ঝর্না ঢুকল—

—ওকি ওর হাত ধরে বসে আছ কেন?

থতমত খেয়ে হাত ছেড়ে দেয় মতলুব।

—আহা আপু, তুমি কি, দুলাভাই হাত ধরলে কী হয়। শ্যালিকা লিপি বাঁচানোর চেষ্টা করে।

—না কোনো দরকার নেই। আর তুমিও এটা তোমার ঢাকার রমনা পার্ক পাও নাই। যাও বেরোও ঘর থেকে...। মতলুব ভেবেছিল শ্যালিকা লিপিকেই ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলছে ঝর্না। পরে বুঝল শ্যালিকাকে না তাকেই...

অত্যন্ত অপমানিত হয়ে মতলুব এক বস্ত্রে বের হয়ে গেল। 'দুলাভাই যাচ্ছেন কোথায়' চট করে প্রশ্ন করে বসে লিপি। মতলুব তাকিয়ে দেখে। লিপি মিটিমিটি হাসছে। তখন তার ধারণা হল মেয়েটা কি তার সঙ্গে ইচ্ছে করেই এটা করল?

—যেখানে ইচ্ছে সেখানে।

—হিমালয়ের দিকে না তো?

—মানে?

—না মানে উত্তর দিকে যেভাবে হনহন করে হাঁটা শুরু করেছেন... ওদিকেই তো হিমালয়।

—তা হলে ধর হিমালয়।

মদনপুর এলাকাটা বেশ বড়। সবচে বড় কথা এটা একটা ট্যুরিস্ট স্পট। এই এলাকার চারদিক ঘিরে আছে যে ছোটখাটো নদীটা সেটা একসময় বেশ বড়সড়ই ছিল। এখন মরার পথে। তারপরও বর্ষায় তার ঢেউয়ের ধাক্কায় একটা দুটা নৌকা এখনো আপসে উল্টে যায়। তবে এক হিসেবে মদনপুর এলাকাটা সুরক্ষিত। সে কারণেই হয়তো ট্যুরিস্টরা মাঝে মধ্যে ভিড় করে। এলাকারটার প্রায় চারদিকে নদী, একপাশে একটু জঙ্গলের মতো আছে। আর জঙ্গলের পেছনেই পাহাড়। ধারণা করা হয় হিমালয় রেঞ্জের ধারাবাহিকতা ধরে এগুলো সব মেসোজোয়িক যুগের পাহাড়। তো ওই জঙ্গলে এখনো একটা দুটা বাঘ থাকাও বিচিত্র নয়। অবশ্য স্থানীয় পরিবেশবাদীরা ওই ছোট্ট জঙ্গলটুকু রক্ষার জন্য যেভাবে আন্দোলন শুরু করেছেন তাতে করে মনে হচ্ছে অচিরেই এই জঙ্গল কেটে সাফ করে বিল্ডিং উঠে যাবে।

মদনপুরে ঢোকার মুখটায় একটা চায়ের দোকান। কাকতালীয়ভাবে ওই দোকানদারের নাম মদনা। সে অবশ্য গোপনে দাবি করে তার নামেই নাকি এই এলাকার নাম। তবে ইতিহাসবিদরা অবশ্য বলেন অন্য কথা। বহু বছর আগে আরবের লোকেরা যখন বর্বর ছিল তখন এই মদনপুরও ছিল বর্বর... জঙ্গলে জঙ্গলময়। একদিন এখানে মদন কুমার নামে এক


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজা আসে শিকারের উদ্দেশ্যে। হাতির পিঠে বসে শিকার করার সময় হঠাৎ বাঘের গর্জনে চমকে উঠে পিছলে পড়ে কোমর ভাঙে এবং ওখানেই তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই ওই কোমর ভাঙা রাজার নামে এলাকার নাম মদনপুর।

মদনপুরের মুখটায় যে চায়ের দোকান সেই চায়ের দোকানের আদা চা আবার খুব বিখ্যাত। যে একবার খায় তাকে আবার খেতে হয়। অনেক ছোটখাটো আদার ব্যাপারীই নাকি এখানে আদা চা খেয়ে পরবর্তী সময়ে পয়সা বানিয়ে এখন বড় বড় জাহাজের কারবারি হয়েছে। অবশ্য এ সবই শোনা কথা।

তো একবার এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে, তখনো মদনার চায়ের দোকানে কোনো কাস্টমার নাই। এক কাস্টমার এসে হাজির হল। লোকটার সারা মুখে দাড়ি-গোঁফের অভয়ারণ্য, হাতে পত্রিকার কাগজে মোড়ানো লম্বা কিসিমের একটা কিছু। লোকটা প্রথমে দোকানের সামনের বেঞ্চে বসল। তারপর মদনার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। অবশ্য হাসল বলা ঠিক হল না তার ঘন দাড়ি-গোঁফের আড়াল থেকে কয়েকটা সাদা দাঁত দেখা গেল তাতেই মদনা ধরে নিল লোকটা হাসল। কিন্তু লোকটার হাসি দেখে মদনার কলজে উড়ে গেল যেন। লোকটা কে এমন করে হাসল? লোকটা তখন তার হাতের কাগজে প্যাঁচানো জিনিসটা বাড়িয়ে ধরে পরিষ্কার শুদ্ধ ভাষায় বলল—

—ভাই এটা একটু আপনার দোকানের ভেতরে রাখুন তো। মদনা রাখল। তারপর কম্পিত গলায় বলল 'চা দিমু?'

লোকটা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

আর তার একটু পরই ঢুকল আমাদের মতলুব মিয়া। মদনার দোকানে আগে থেকে বসা লোকটাকে তার হঠাৎ করে খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছে সে তাকে, বিশেষ করে চোখ দুটো...। কিন্তু মনে করতে পারে না। লোকটাও তার দিকে কয়েকবার তাকাল হাসি হাসি মুখে, যেন খুব পরিচিত। কিন্তু কিছু বলল না। মতলুবের একবার মনে হল লোকটার পরিচয় জিজ্ঞেস করে। কী মনে করে করল না। ট্যুরিস্ট হতে পারে। একা একা অনেক পাগল কিসিমের ট্যুরিস্ট এখনো আসে এই এলাকায়। একা একা ঘুরে যে কী আনন্দ পায় আল্লাই জানে। এ ধরনের পাগলের সংখ্যাই দেশে দিনে দিনে বাড়ছে!

মতলুব চা খেতে খেতে দেখল ইদ্রিসের দল আসছে। ইদ্রিস এই এলাকার সন্ত্রাসী। কেটে পড়া দরকার, ওদের সাথে মতলুবের একটা বোঝাপড়া আছে সেটা অনেক আগের, এখন ওদের সামনে পড়ে সেটা মনে করতে চায় না। তারাও হয়তো চাইবে না। দ্রুত চা শেষ করে উঠে পড়ল মতলুব। একবার ভাবল বিদেশী লোকটাকে সাবধান করে যায়। পরমুহূর্তে ভাবল দরকার কী বাপ! মৃত্যুশয্যায় তার বাপের শেষ বাক্যটি মনে পড়ল 'কারো উপকার করতে যেয়ো না তা হলে তুমি কিন্তু শেষ... দেখছ না আমার অবস্থা' এই মহান বাক্যটি বলেই তার পিতা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন।

মতলুব বিদায় হতেই ইদ্রিসের দল ঢোকে। সতর্ক হয়ে যায় মদনা। ইদ্রিসের সাথে যথারীতি তার দুই শাগরেদ বক্কর আর ধলা।

—সেলামালিকুম। বিগলিতভাবে বলার চেষ্টা করে মদন।

—কীরে মদনা ট্যাক্স-ম্যাক্স বুলে দিবার চাস না আইজ কাল? খালি পিছলাইয়া যাস?

—কী কন বস গত মাসেও তো দিলাম।

—দেহিস মাগুর মাছের মতো খালি পিছলাইস না... পরে ছাই দিয়া যখন ধরমু মজা টের পাবি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধলা আর বক্কর তখন মদনার দোকানের প্লাস্টিকের বয়াম খুলে কেক খাওয়া শুরু করেছে। বসের জন্য এক প্যাকেট বেনসন এগিয়ে দিল ধলা। মদনা ভেতরে ভেতরে আফসোস করল, পুরা প্যাকেটটাই গেল। আগে বুঝলে সরিয়ে ফেললে হত।

এক প্যাকেট বেনসন ছটা কেক আর তিন কাপ চা খেয়ে উঠল ইদ্রিসের দল। মোট ১১৭ টাকা লস। মদনা মনে মনে হিসেব করে আর হাত কচলায়।

—ওরা তোমাকে টাকা দিল না যে?

—শশশ...! মুখে আঙুল দিয়ে মদনা সাবধান করতে চেষ্টা করে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, আগন্তুকের বাক্যটি শুনে ফেলেছে সন্ত্রাসী ইদ্রিস। তারা ফিরে এল।

—কী কইলি?

—কী কইলি না বলুন কী বললেন?... বললাম যে তোমরা এখানে খেলে তার দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছ বিষয় কী?

—ওই সাবধান মুখ সামলায়া কথা বল... বসরে চিনস?

—চিনার দরকার নাই। টাকা দিয়া যাইতে বল... আর তুই-তোকারি করবা না আমার সাথে...

ইদ্রিস তার জীবনে এত অবাক আগে হয় নাই। অভ্যাসবশত তার একটা হাত চলে গেল পেছনে। পেছনে প্যান্টের ভেতরে গোঁজা আছে একটা ছ'ইঞ্চির অটোমেটিক সুইস চাকু, খালি বাটনে একটু হালকা চাপ দিলে সাৎ করে বের হয়ে আসবে তার ধারালো ফলাটা...এরকম পরিস্থিতিতে খুনখারাবি না করে দুয়েকটা 'পাড়' দিয়ে ফেলে গেলেই যথেষ্ট। মেরে ফেললে তো শেষ, আধ মরা করে গেলে বরং আশপাশে প্যানিকটা ছড়ায় বেশি।

আর কী আশ্চর্য, লোকটাও মদনার দিকে হাত বাড়াল। বলল 'জিনিসটা দিন'। ইদ্রিসের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সাবধান করল। সে পেছন থেকে হাতটা সামনে নিয়ে এল। ভাব করল যেন সে পিঠ চুলকানোর জন্য হাতটা পেছনে নিয়েছিল। এটাও তার একটা কৌশল। সে ধলাকে ইশারা করল, ধলা চট করে পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট বের করে ছুড়ে দিল মদনার দিকে। তারা তিনজনেই সরে পড়ল। ঝামেলা করল না।

—আমাকে আরেক কাপ চা দিন।

মদনা দ্রুত হাতে চা বানায়। সে বুঝতে পারছে না এখন তার কী করা উচিত। ছুটে গিয়ে কি পা চেপে ধরবে? লোকটাকে বলবে 'ভাই বিদেশী মানুষ আপনি এখান থেকে যান'। কিন্তু লোকটার ঠাণ্ডা চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারল না। সে আড়চোখে পত্রিকার কাগজে মোড়ানো লম্বামতো জিনিসটার দিকে তাকাল। ওটা যে একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র এখন আর মদনার সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রইল না।

ঘরে গিয়ে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে গেল মতলুব। তখন চারটার উপরে বাজে। ঝর্না আলনায় কাপড় গুছাচ্ছিল। মতলুবকে দেখে ঠোঁটের কোনায় একটু সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল তার। অন্তত মতলুবের তাই মনে হল।

—খেয়ে এসেছ না খাবে?

মতলুব কথা বলে না।

—কী হল কথা কানে যায় না?

—না যায় না। রাগে-দুঃখে এবার চেঁচিয়ে উঠল মতলুব।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আস্তে চেঁচাও বাসায় ভালো না লাগলে আসলে কেন? হিমালয়ের গুহায় বসে থাকতে।

তার মানে লিপি হিমালয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ঝর্নার সাথে আলাপ করেছে। নারীজাতির উপর থেকে মন উঠে গেল মতলুবের। মতলুব আর কথা না বাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। গায়ে পাতলা কাঁথাটা টেনে মুখ ঢেকে ফেলে। তখনই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মদনার দোকানের লম্বা লোকটাকে। ইদ্রিসের সাথে ওই বিদেশী লোকটার কোনো ঝামেলা হয় নি তো? ইদ্রিসের দলটা ইদানীং বেশ বাড়াবাড়ি করছে এলাকায়!

সাধারণত মদনা তার চায়ের দোকান বন্ধ করে দশটায়, কিন্তু আজ সে সিদ্ধান্ত নিল দোকান বন্ধ করবে এখনই। এখন বাজে মাত্র সাড়ে সাতটা। তার কেন যেন মনে হচ্ছে ইদ্রিসের দল আবার আসবে। এত বড় অপমান ইদ্রিসের মতো লোক এতক্ষণ ধরে হজম করছে কীভাবে? সে চুলা বন্ধ করে তাকাল আগন্তুকের দিকে।

—স্যার?

—আমাকে বলছেন?

—জি জনাব।

—বলুন।

—দোকান তো স্যার বন্ধ করা দরকার।

—করুন।

—আপনার জিনিসটা?

—ওটা থাক না, ভেতরেই থাক। আমি ভাবছি আজ রাতটা এই বেঞ্চেই কাটাব সমস্যা নাই তো?

—না সমস্যা কী? মদনা আর বলার মতো কথা খুঁজে পায় না। তবে দোকান বন্ধ করতে শুরু করে। আর লোকটা অন্ধকার বেঞ্চে মূর্তির মতো বসে থাকে।

মদনার একটু অস্বস্তি বোধ হয়। একবার ভাবে লোকটাকে কি তার বাসায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করবে? আবার কী ভেবে কোনো কথা না বলে হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে। অনেকটা গিয়ে ফিরে তাকায় মদনা, লোকটা তখনো দোকানের বেঞ্চে ধ্যানমগ্ন পুরুষের মতো বসে আছে।

এই একটা নড়বড়ে বেঞ্চে বসে পুরো রাত ঠায় কাটিয়ে দেয়া রুহুলের জন্য কোনো বিষয় না। একটা সময় ছিল যখন রুহুল এক গ্লাস পানিও ঢেলে খেত না। এখন সে অন্য রুহুল, বিন্দু বিন্দু করে নিজেকে বদলেছে। নিজেকে তৈরি করেছে... না কোনো গোপন বিপ্লবী নেতা হওয়ার জন্য নয়। একটি নারীকে একটি মাত্র বাক্য বলার জন্য। পৃথিবী বড় বিচিত্র। সমস্ত পৃথিবী জয় করেও কেউ বীর হয় কেউবা একটি মাত্র নারীকে জয় করার জন্য বীর হতে চায়। রুহুলের হাসি পায় সে কি ইদানীং নিজেকে বীর ভাবতে শুরু করেছে।

রাত কত হয়েছে কে জানে! সাথে ঘড়ি নেই। তবে রাত খুব কমও হয় নি। আশ্চর্যজনকভাবে লোকজন আর চলাচল করছে না। করলেও কেউ রুহুলের দিকে তাকাচ্ছে না। সেটা বরং ভালো। রুহুল খেয়াল করল কয়েকটা শেয়াল আশপাশে ঘুরঘুর করছে। তারা কি ভেবেছে একজন মৃত মানুষ বসে আছে?

রুহুল চোখ বন্ধ করে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিল কে জানে। যখন চোখ খুলল দেখল তার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। রুহুল কি সাহসী? রুহুলের ধারণা সে প্রচণ্ড সাহসী। সে তার এই জীবনে ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড ঘটিয়েছে। যা কেবল একজন সাহসী মানুষের পক্ষেই সম্ভব। অবশ্য একজন মানুষের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার সাহস নিয়ে কোনো মন্তব্য করা ঠিক না।

—তুমি কে? রুহুল তার সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে প্রশ্ন না করে পারে না।

—আমি ত্যানা চোরা।

—এরকম অদ্ভুত নামের কারণ?

—আগে ত্যানা ম্যানা যাই পাইতাম তাই চুরি করতাম! তাই লোকজনে নাম দিছে...।

—এখন কর না?

—না, এখন সাহস কিছু বাড়ছে।

রুহুল ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল, সে সাহস নিয়ে ভাবছিল এই লোকটিও সাহস নিয়েই কথা বলল! রুহুল ধারণা করল লোকটির হাতে একটা কিছু অস্ত্র আছে।

—তা আজ কী কাজে বেরিয়েছ?

—তা ধরেন গিয়া... এখন কন্টাকে কাজ করি।

—আজকের কন্টাক কী?

—এই ধরেন মদনার দোকান।

—মদনার দোকানে তো যদ্দূর জানি মূল্যবান কিছু নাই।

—আছে। ইদ্রিস কইছে আছে।

হেসে ফেলল রুহুল। আর তখনই ত্যানা চোরা তার চাদরের আড়াল থেকে একটা রামদা ধরনের কিছু বের করল। অন্ধকারে রুহুল দেখল জিনিসটি সরলরেখার মতো সোজা তবে মাথাটা সামান্য বাঁকানো! রুহুলের মাথায় দ্রুত চিন্তা চলছে। যা করার জলদি করতে হবে। সে খেয়াল করল লোকটি তার ডান হাতের রামদাটি খুব ধীরে ধীরে বাঁ দিকে আনছে... তার মানে সে হঠাৎ...

—আমি দশ পর্যন্ত গুনব এর মধ্যে তুমি সরে পড়বে... এক... দুই...

—স্যার আপনে কোন দলের?

—তিন... চার...

—স্যার খালি বলেন আপনে কোন দলের? আমি চইলা যাইতাছি...

—পাঁচ... ছয়...

আর কী আশ্চর্য, ত্যানা চোরা হঠাৎ ঘুরে দৌড় দিল। ত্যানা চোরাকে যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে দেখল রুহুল। তার হঠাৎ করে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। শেয়ালগুলো আবার ফিরে এসেছে। তারা কি এতক্ষণ আড়াল থেকে এই দ্বৈত নাটক দেখছিল? ত্যানা চোরা ফিরে যেতেই ফিরে এসেছে? রুহুল খেয়াল করল অন্ধকারে চার জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে!

আষাঢ় মাস। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে বৃষ্টির তোড়টা যেন বেশি। বদরুল এক হাতে ছাতা আর এক হাতে বদনা নিয়ে বেরুল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বোধ হয় সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছে। কিন্তু তা নয় সে চলেছে এলাকার চেয়ারম্যানের বাড়িতে। চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করার জন্য সময়টা মোটেই শুভ নয় সেটা বদরুলও জানে। তবু সে হনহন করে হাঁটা শুরু করল। চারদিকে ধানক্ষেত।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মাঝখানের আইল ধরে হাঁটছে। এক হাতে হালকা ছাতা অবশ্য বৃষ্টির তোড়ে ছাতাটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে, আরেক হাতে পিতলের বদনা। বদনাটা ভরা।

পিতলের বদনা এমনিতেই ভারী তার উপর তেল ভরা।

—কী বদরুল কই যাও?

—চেয়ারম্যান বাড়ি। প্রশ্নকর্তা অবাক হয়। চেয়ারম্যান লোক সুবিধার না। আর বদরুলকে তো আরো দেখতে পারে না। লোকটি আরো কী বলতে চায় কিন্তু বদরুল দাঁড়ায় না। হনহন করে হাঁটতে থাকে।

চেয়ারম্যান সাহেব বারান্দায় বসে হুঁকো টানছিলেন। পাশে এক চামচা কিসিমের লোক বসা। বদরুল খেয়াল করল রোজি, মানে চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ে যে একসময় তার সাথে একই স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ত এবং যার সাথে বদরুলের বেশ একটা হালকার উপর পাতলা ভালবাসাবাসির সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে চেয়ারম্যান সাহেব বদরুলকে দুই চক্ষে দেখতে পারেন না... সেই রোজি। সম্ভবত বাবাকে পান-সুপারি দিতে এসেছে বারান্দায়। সেই প্রথম দেখল। বদরুল এত দূর থেকেও বুঝতে পারল রোজির দু চোখ নিশ্চয়ই ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাইছে বিস্ময় এবং ভয়ে। সে ঝট করে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। বারান্দায় ভেজা ছাতা নিয়ে উঠে এল বদরুল। চেয়ারম্যান সাহেব যারপরনাই অবাক হলেন! তিনি ঘন ঘন দু বার হুঁকায় টান দিয়ে ভ্রূ কুঁচকালেন?

—তুমি? এই সময়?

—একটা কাজে আসছি... এই মিয়া তুমি যাও তো... উনার সাথে আমার প্রাইভেট টক আছে। বসা লোকটি হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়াল। চেয়ারম্যান সাহেব চোখে ইশারা করলেন লোকটিকে। লোকটি ছাতা হাতে চলে গেল।

'রোজিকে দেখলাম। কবে আসল?' বদরুল বুঝতে পারছে চেয়ারম্যান মতি তার প্রতিটি কার্যকলাপেই ক্রমে ক্রমে ক্ষেপে উঠছেন, কিন্তু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন তিনি, কী বলে বদরুল। তিনি রোজি প্রসঙ্গে গেলেন না। হুঁকো টানা বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বললেন—

—কী বিষয়ে আসছ জলদি বল আমার কাজ আছে।

—তাইলে যান কাজ সাইরা আসেন আমার লম্বা কথা আছে... আমি ততক্ষণ রোজির সাথে কথা বলি। বলেই চিৎকার করে রোজি রোজি বলে ডাকল। চেয়ারম্যান মতি এবার কঠিন গলায় বললেন—

—বদরুল তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করতাছ।

—এক সময় রোজিকে ভালবাসছিলাম বিয়ে করতে চাইছিলাম। আপনে রাজি হন নাই। গোপনে জোর কইরা এক বদলোকের সাথে বিয়া দিছেন। তাতে সে তো আমার অচেনা হয়া যায় নাই। এখন তার সাথে কথা বলতে অসুবিধা কী?...যাউকগা বাদ দেন আপনার কাছে যে জন্য আসছি... আপনার একটা প্রত্যয়নপত্র দরকার আমার... শুনছেন তো বোধ হয় বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করতাছি... সব কাগজপত্রই রেডি হইছে খালি আপনার প্রত্যয়নপত্রডাই এখনো পাইলাম না... লোকমুখে শুনলাম আপনে সাফ সাফ বইলা দিছেন আমার মতো বেতমিজরে প্রত্যয়নপত্র দিবেন না।...দুই একজন কইল আপনেরে তেল মারলে নাকি দিবেন তাই বদনায় কইরা তেল নিয়া আসছি, খাঁটি সরিষার তেল... কোথায় মাখব বলেন?

চেয়ারম্যান সাহেবের চোয়াল ঝুলে পড়ল। বদরুল বেয়াদব টাইপের তিনি জানেন। এতটা বেয়াদব বুঝতে পারেন নি। তিনি রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। আর ঠিক এ সময় রোজি এল বারান্দায়। মাথায় ঘোমটা দেয়া।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—এসব কী শুরু করছেন? আপনি যান।

রোজির দিকে তাকিয়ে বুকটা ভরে গেল বদরুলের। এই সেই রোজি তার জানের জান। যার জন্য এখনো এই পৃথিবীটাকে তার শক্ত হাতে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলতে পারে বদরুল। চোখে চোখে তাকাল, আরো সুন্দর হয়েছে সে। কী মায়ায় ভরা চোখ। সেই চোখে শুধু বদরুলের জন্য মায়া নাই। বদরুল হাসিমুখে বলল, 'কেমন আছ রোজি?'

—আপনি এখন যান। কঠিন গলায় বলার চেষ্টা করল রোজি। বদরুলের হাসি পায় পাখির পালকের মতো নরম মেয়েটি কি কখনো কঠিন হতে পারে।

—যাব তো অবশ্যই চেয়ারম্যান সাহেবরে একটু তেল মেরে যাব। আমার প্রত্যয়নপত্রডা দরকার।

—আপনি যান। জেদের স্বরে বলে রোজি। বদরুল তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে দু চোখে করুণ আকুতি। ঠিক তখনই সিদ্ধান্ত পাল্টায় বদরুল। না অনেক নাটক হয়েছে। কী দরকার এই বদ চেয়ারম্যানের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিয়ে? এর প্রত্যয়নপত্র নিয়ে বিদেশে যাওয়ারই বা দরকার কী? সে কিছু না বলে ছাতা নিয়ে নেমে আসে। আর তখনই ঠক করে একটা কিছু পড়ার শব্দ হল। ফিরে দেখে চেয়ারম্যান মতি লাথি দিয়ে তার বদনাটা ফেলে দিয়েছে। পিতলের বদনাটা কাত হয়ে আছে। গলগল করে তেল পড়ছে। উঠোনের বৃষ্টি জমা পানিতে সরু একটা রাস্তা করে এগিয়ে চলেছে তেলেরা ধারা। তেলে-জলে মিশ খায় না, এখানেও মিশ খেল না। প্রবল বর্ষণের মধ্যেও শুনল রোজি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। বদরুল দ্রুত পায়ে বের হয়ে এল।

ইদ্রিস তার দুই সহযোগীকে নিয়ে গেল চেয়ারম্যান সাহেবের বাসায়। সময়টা বিকেল। প্রায় সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে বলে দিনটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেয়ারম্যান সাহেব বাসাতেই ছিলেন। থমথমে মুখে বসে আছেন। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কে যেন বলেছে পাগলা বদরুল নাকি এসে ঝামেলা করেছে। বদরুল এত সাহস পায় কীভাবে, মাথায় আসে না ইদ্রিসের। শুয়োরের বাচ্চাকে নাই করে দিলেই হয়। ওই শুয়োরের বাচ্চার ত্রিসংসারে কেউ নাই বলে শুনেছি—তো ওরই বা থাকার দরকার কী পড়েছে এই দুনিয়ায়। চেয়ারম্যান সাহেব তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ ভঙ্গি করেন অর্থাৎ কী খবর এনেছ?

—স্যার একটু সমস্যা হইছে।

—কী?

—এলাকায় বড় সন্ত্রাসী ঢুকেছে।

—মানে?

—মানে বাইরের সন্ত্রাসী ঢুকছে।

—কী চায়?

—চায় না কিছু... তবে ভাবে মনে হয় বড় অস্ত্র নিয়া ঢুকছে।

—কোন দল?

—কোন দল ঠিক ধরতে পারলাম না। তো আমাগো লোক না...

—তোমরা কী কর, ঘাস কাট? হঠাৎ খেঁকিয়ে ওঠেন মতি চেয়ারম্যান।

—আপনে বললে কাটব অসুবিধা নাই। পরামর্শের জন্য আসলাম। আপনেই তো বললেন কয়েকটি দিন এলাকায় বড় অস্ত্র নিয়া না ঘুরতে, নাইলে তো আজকেই ফালায়া দিতাম ওরে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আজকের দিনটা দেখ।

—আমিও তাই ভাবতাছি... স্যার আরেকটা কথা... বদরুল নাকি ঝামেলা করতাছে? মতি চেয়ারম্যান কোনো কথা বললেন না, তার নজর গেল পিতলের বদনাটার দিকে। যেটাতে করে সকালে বদরুল তেল এনেছিল। এখনো উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তেলের একটা ধারা এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। 'ওই বদনাটা বদরুলের বাড়ি দিয়া আস। আর বইলা আস আজকের মধ্যে এলাকা ছাড়তে, না হলে...' কথা শেষ করতে পারেন না চেয়ারম্যান মতি... হঠাৎ খেয়াল করেন তার মেয়ে রোজি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সরে গেল রোজি। তবে কি মেয়েটা শুনে ফেলেছে? কে জানে? মেয়েটাকে আজ-কালের ভেতর জামাইয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে।

—স্যার বলেন তো ঝামেলা আজ-কালের মধ্যেই শেষ করে দেই? গলা নামিয়ে বলে ইদ্রিস।

মতি চেয়ারম্যান কথা বলেন না, ইদ্রিস উঠে পড়ে। সে বুঝে গেছে চেয়ারম্যান সাহেব কী চান। ধলাকে ইশারা করে বদনাটা উঠিয়ে নিতে। ধলা বদনা হাতে নিয়ে ইদ্রিসকে অনুসরণ করে। বদনার ব্যাপারটা আসলে কী হয়েছিল তার মাথায় আসে না। বদনাটা যে অসম্ভব ভারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইসব পিতলের বদনা যে কেন মানুষ ব্যবহার করে...।

সেই রাতেই চেয়ারম্যানের লাঠিয়াল বাহিনী এল বদরুলের বাড়িতে। তবে বদরুলকে পেল না। বদরুলের বাসার একমাত্র বাসিন্দা তার বৃদ্ধা ফুপুও বলতে পারল না বদরুল কোথায়। লাঠিয়ালরা হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেল। বদরুলের দিন শেষ। তার কিছুক্ষণ বাদেই এল বদরুল। তার বৃদ্ধা ফুপু এক গাদা অভিযোগ করল—এভাবে আর চলতে পারে না। হয় তাকে গলা টিপে মেরে ফেলুক না হয় তার ছেলের কাছে রেখে আসুক। এভাবে দাসী-বান্দি হয়ে খাটা তার পক্ষে আর সম্ভব না... ইত্যাদি ইত্যাদি। বদরুল তার কথায় কান দিল না। চলে গেল বাড়ির পিছনে পুকুর ঘাটে। হাত-মুখ ধুতে। মুখ ধুয়ে ফেরার পথে তার মনে হল বাঁশঝাড়ে কেউ দাঁড়িয়ে। কালো মতো একটা কিছু নড়ে উঠল কি? সাবধানে এগুল বদরুল।

—কে ওইখানে?

—আমি। রোজির গলা। বদরুল দ্রুত এগিয়ে যায়। আরে তাই তো রোজি!

—তুই এইখানে? এত রাতে তোর কি মাথা খারাপ?

—তুমি পালাও।

—কেন?

—তোমারে তারা মাইরা ফেলবে।

—আরে ধুর ধুর... দু হাতে জড়িয়ে ধরে বদরুল রোজিকে। রোজি ছটফট করে।

—আহ ছাড়।

—ক্যান? কে দেখব?

—না আগে ছাড়। বদরুল ছাড়ে না। জোর করে চুমু খায়।

—আসাটা ভুল হইছে। ঠোঁট মুছে বলে রোজি। বদরুল হাসে। কী এক অসম্ভব ভালোলাগা এই মুহূর্তে চারিদিকে। উপরে ঘন বাঁশঝাড়। বাতাসে শিরশির করে কাঁপছে তার চিকন পাতাগুলো। তার আড়ালে এক খণ্ড চাঁদ। এত সামান্য চাঁদে আজ এত আলো কেন? অবাক হয় বদরুল। ফিসফিস করে বলে, 'রোজি চল তুই আর আমি পালায় যাই।'

—না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—না কেন? তোর জামাইডা তো বদের বদ।

রোজি কথা বলে না। হঠাৎ তার হাত যায় বদরুলের পিছে। আঁতকে ওঠে রোজি। বদরুলও বুঝতে পেরে ওর হাত সরিয়ে দেয়।

—এই অস্ত্র তোমার কাছে কেন? তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চায় রোজি।

—তা দিয়ে তোর দরকার কী?

—তুমি ওইসব সন্ত্রাসী দলে নাম লেখাইছ?

বদরুল হেসে বলে, 'লেখাইলে লেখাইছি'। রোজি ঝটকা মেরে সরে দাঁড়ায়। তারপর ঘুরে হাঁটা শুরু করে, পিছে ছুটে আসে বদরুল। আশ্চর্য দক্ষতায় রোজি সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। যেন তার কত দিনের চেনা পথ। 'শোন শোন' ফিসফিস করে চেঁচায় বদরুল। রোজি শোনে না। রাগী ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। আর ঠিক তখনই অনেকগুলো পায়ের শব্দ একসাথে কানে আসে বদরুলের। সে দাঁড়িয়ে পড়ে বোঝার চেষ্টা করে, রোজি তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। হ্যাঁ ধুপধাপ অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। পিছনে হাত দিয়ে লুঙ্গিতে গোঁজা অস্ত্রটি হাতে নেয়ার আগেই কে যেন তার পিছনে আঘাত করে। চিৎকার করারও সময় পায় না বদরুল। ধুপ করে আছড়ে পড়ে আগের দিনের বৃষ্টিতে ভেজা নরম মাটিতে।

সে রাতেই চেয়ারম্যানের লোকজন বদরুলকে পিটিয়ে মেরে ফেলে লাশ ভাসিয়ে দেয় পাশের নদীতে। জোয়ারের পানিতে ভেসে যায় বদরুলের লাশ। আধখানা চাঁদের অস্বাভাবিক আলোয় কালো জলের উপর দিয়ে লক্ষিন্দরের ভেলার মতো ভাসতে ভাসতে চলে তার মৃতদেহ, কেউ জানতে পারে না। রোজিও না। তবে দিনের বেলা গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যায় বদরুলকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার দলের লোকই তাকে মেরে ফেলেছে। প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে রোজি যখন কাঁদতে যাবে তখনই শুনল তার বর এসেছে গাড়ি নিয়ে তাকে নিয়ে যেতে। সে থমথমে মুখে বাবাকে সেলাম করে গাড়িতে ওঠে। হায় মানুষের জীবন এমন কেন? একটু কাঁদতেও কেউ দেবে না?

বদরুলের লাশ ভাসতে ভাসতে ভাটার টানে একটা জংলা মতো চরে আটকে গেল। সকালের রোদ এসে স্পর্শ করে তাকে। এক পর্যায়ে দেখা গেল বদরুল নড়েচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে? না সে মরে নি। প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ শুয়ে ছিল সে জানে না। দুপুরের দিকে আশ্চর্যজনকভাবে মাথাব্যথাটা চলে যায়। তবে শরীরের কয়েকটা জায়গায় অসম্ভব ব্যথা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় বদরুল। কোনোরকমে হেঁটে কাছাকাছি একটি বাজারে ঢুকে চা খায়। তার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে চায়ের পয়সা চায় না হোটেলওলা। পয়সা চাইলেও দেয়ার ক্ষমতা ছিল না তার। চা-টা তাকে অনেকখানি শক্তি জোগায়। সে হাঁটা শুরু করে তার নিজের গ্রামের দিকে। এলাকাটা সে চিনতে পেরেছে। এখান থেকে তার গ্রাম খুব বেশি দূর হবে না। কিন্তু যেতে হবে ঘোরা পথে। ওদের চোখের সামনে পড়া যাবে না। রাত দশটার দিকে নিজের বাড়ির শূন্য উঠানে জ্ঞান হারাল বদরুল।

দুলাভাই মতলুব লোকটাকে লিপির খুব পছন্দ। লোকটাকে বুদ্ধিমান বলা যাবে না। এমন কিছু করে বলে মনে হয় না। ছোটখাটো একটা পর্যটনের ব্যবসা নাকি করে। যারা এখানে এই মদনপুরে বেড়াতে আসে তাদের গাইড হিসেবে এখানে সেখানে দেখানোর ব্যবস্থা হয়তো করে দেয়। হয়তো বলল এজন্যে যে তার ব্যবসার ধরনটা সে বোঝে না। বেশিরভাগ সময় তো বাসায়ই থেকে আপার বকাই খেতে দেখে। আপাও হয়েছে একটা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিজ। লোকটাকে সহ্য করতে পারে না। আসলে আপা তার আগের প্রেমিককে মনে হয় ভুলতে পারে নি। আপার সেই স্মার্ট ক্লাসমেট রুহুল। টানা পাঁচ বছর প্রেম করে। হঠাৎ করে আপা একদিন পালিয়ে গেল রুহুলের সাথে... বাসায় একটা চিরকুট রেখে গেল 'বাবা মা পারলে ক্ষমা করে দিও, আমরা বিয়ে করেছি—ঝর্না'। তারা পালিয়ে গেল যে জায়গাটায় সেটা এই মদনপুর। তাদের প্ল্যান ছিল বোধহয় এখানেই বিয়ে করে হানিমুন করবে। অবশ্য হানিমুন করার জন্য জায়গাটা খুব উপাদেয় বলা যাবে না। তবে জঙ্গল আর নদীর ধারে বেশকিছু ছোটখাটো হোটেল হয়েছে। হোটেলগুলো কাঠের তবে সুন্দর।

কিন্তু ঘটনা অন্যরকম হল। লিপি আজ এত বছর পর ব্যাপারটা নতুন করে বোঝার চেষ্টা করে... আপার কাছ থেকে যতটুকু শোনা গেছে তার সাথে নিজের কল্পনার মিশেল দিয়ে গল্পটা যা দাঁড়াল সেটা অনেকটা এরকম...।

* * *

...লোকটার গায়ে সাদা একটা কলারহীন গেঞ্জি। পায়ে বার্মিজ স্যান্ডেল। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় কোনো উপজাতীয়। চোখ দুটো ছোট ছোট। তবে মায়াকাড়া।

—তুমি আমাদের গাইড? রুহুল জানতে চায়।

—জি।

—আমরা যে জায়গাটায় যেতে চাই সেটা তোমাকে বুঝাতে পেরেছি?

—জি।

—কীভাবে যেতে হবে?

—উত্তরের জঙ্গল পার হয়ে সোজা দক্ষিণে...।

—কোনো বিপদ নাই তো?

—আগে ছিল এখন নাই।

ঝর্না খেয়াল করল তাদের তরুণ গাইড মাঝে মাঝে চোরা চোখে তাকে দেখার চেষ্টা করছে। তবে ছেলেটির মধ্যে একটা বন্য সৌন্দর্য আছে। চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। পেটা শরীর। আর কালো। সে ফর্সা হলে অবশ্য তাকে মানাত না। সে রুহুলের চেয়ে অনেকটাই লম্বা।

—তবে মিস্টার গাইড... তোমার নামটা?

—মতলুব।

—মি. মতলুব আমরা ফিরে এসে বিয়ে করব। এ ব্যাপারে তুমি হেল্প করতে পারবে? মানে এখানে কাজী-টাজি কিছু আছে?

—আছে।

—এখানে ট্যুরিস্টদের জন্য সুন্দর হোটেল আছে বলে শুনেছি।

—আছে।

—গুড। ...বিদেশীরা আগে কাপড় খুলে তারপর বিয়ে করে, আমরা বিয়ের পর কাপড় খুলি... তবে আমি বিদেশী স্টাইলে বিশ্বাসী। বলে সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ঝর্নার দিকে। অবশ্য শেষের কথাগুলো সে বলে প্রায় ফিসফিস করে... শুধু ঝর্নাকে উদ্দেশ্য করে।

ভোর আটটায় একটা ফোর হুইল সিক্স সিলিন্ডারের গাড়িতে করে রওনা দিল তারা তিন জন। গাড়িটা খুব পুরোনো। ফোর্ড কোম্পানির গাড়ি। রুহুল, ঝর্না আর গাইড মতলুব আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গাড়ির চালক। পাহাড়ের অলিগলি দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল জিপটি। সামনে সিটে বসে ড্রাইভার আর মতলুব। পিছনে ঝর্না আর রুহুল। রুহুল এক হাতে কোমর জড়িয়ে কাছে টেনে ঝর্নাকে ফিসফিস করে কিছু বলে, আপত্তি জানায় ঝর্না।

—এসব কী?

—মাই লাভ, এখানে কেউ নেই।

—ওরা?

—ওরা জানে 'কাপল'রা কেন এখানে আসে, শুধু প্রকৃতির সুধা পান করতে নয় প্রকৃতির জীবন্ত উপাদানের সুধা পান করতেও। বলে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে একটা চোখ ছোট করে রুহুল। এই প্রথম ঝর্নার হঠাৎ করে রুহুলকে যেন কেমন লাগে। কিংবা কে জানে এই বন্য সৌন্দর্যে সবকিছু একটু বোধ হয় অন্যরকম। একটু খোলামেলা। তবে না ভালো লাগছিল ঝর্নার... ঘণ্টা দুয়েক টানা ছোটার পর হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করল। মতলুব নামল।

—কী হল?

—হাতিয়ার আনতে যায়। বলে ড্রাইভার।

—মানে? রুহুল ভ্রু কুঁচকে তাকায়। ততক্ষণে মতলুব নাই হয়ে গেছে পাশের একটা ছোপের মধ্যে।

—হাতিয়ার মানে? ড্রাইভার জবাব দেয় না। নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরায়। কাঁচা তামাকের গন্ধে মুহূর্তে চারপাশটা ভরে যায়। রুহুল আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল তখনই মতলুবকে দেখা গেল। তার হাতে অদ্ভুত দর্শন একটা অস্ত্র। নলটা মোটা ভারী হাতলটা ছোট। ট্রিগার আবার একটু বড়। ম্যাগাজিনের মতো কিছু একটা বের হয়ে আছে। কিন্তু সেটা ম্যাগাজিন না। এটা কোন ধরনের অস্ত্র কে জানে।

—অস্ত্র এনেছ কেন?

—সামনে একটু ঝামেলা আছে। সাথে থাকা ভালো। ঝর্না শুকনো মুখে তাকায় রুহুলের দিকে। রুহুল ঘাবড়েছে বলে মনে হল না। সে বেশ সাহসী এটা ঝর্না জানে। রুহুল বিরক্ত গলায় বলে—

—এটা তো আগে বল নি কী ঝামেলা?

—ওই যে ট্রাইবালরা, এখন ছোট ছোট অনেক দলে ভাগ হয়ে গেছে তো—তারা কেউ কেউ রাস্তাঘাটে ট্যুরিস্ট দেখলে ঝামেলা করে। তাই...।

বাকি রাস্তা আর ঝর্না কোনো কথাই বলল না। রুহুলকে একটু চিন্তিত মনে হল! দু পাশে অসাধারণ প্রকৃতি একটু একটু করে একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে। কখনো খাড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে টানেলের মতো রাস্তা চলে গেছে কখনো চওড়া রাস্তা নিচে খাদ। তবে সবই পাহাড়কে আশপাশে রেখে এই প্রকৃতির খেলা। দু জনেরই একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল। হঠাৎ ঝিমুনিটা কেটে গেল। জিপ আস্তে আস্তে থামছে। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে চার জন লোক। তাদের তিন জনের হাতে যে অস্ত্র এতদূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। প্রায় ৫০ গজ দূরে থাকতে জিপ পুরোপুরি থামল। তিন জনের একজন এগিয়ে আসতে যাবে এ সময় লাফিয়ে জিপ থেকে নামল মতলুব। তার হাতে অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরা।

ঝর্নার মনে হল এইচবিও চ্যানেলের কোনো সিনেমার দৃশ্য যেন। চার জন অস্ত্রধারীর সামনে একা আরেক জন মতলুব। তার হাতেও অস্ত্র। মতলুব চেঁচিয়ে কিছু বলল স্থানীয় ভাষায়! এগিয়ে আসা লোকটি অস্ত্র নামিয়ে পিছিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ নাই হয়ে গেল পাশের ঝোপে চার জনই একসাথে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাকি পথে আর কোনো ঝামেলা হল না। তারা শেষ যেখানে থামল সেটাকে পাহাড়ের পাদদেশ বলা যায়। প্রকৃতি এখানে তার সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ সাধন করে পেমে গেছে। বড় বড় কিছু পাথর পাশাপাশি পড়ে আছে অত্যন্ত অগোছালোভাবে। আসলে খেয়াল করলে দেখা যাবে অত্যন্ত অগোছালো নয় অত্যন্ত যত্নের সাথে কাজটি করেছে কেউ। আর সেই গোছানো কাজের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জলধারা। পাথর টপকে টপকে যেতে হয় যে জায়গাটায় সেটার স্থানীয় নাম গুমগুম গুহা। রুহুল হাত ধরে নামাল ঝর্নাকে।

—অসাধারণ।

—এখানে আমি আগে একবার এসেছিলাম। তবে হেলিকপ্টারে।

—মানে আগে বল নি তো?

—এসেছিলাম এক কর্নেলের সাথে একটা কাজে। তখনই ঠিক করেছিলাম তোমাকে নিয়ে আসব একদিন। রুহুল এবার মতলুবের দিকে ফিরে তাকাল—তোমার আর আসার দরকার নেই বাকি রাস্তা আমি চিনি। তুমি এখানেই থাক গাড়িতে। আমরা ঠিক দু ঘণ্টা পর চলে আসব। মতলুব মাথা নাড়ে। ঝর্নার হাত ধরে এগিয়ে গেল রুহুল। মতলুবের চোখের সামনে থেকে হঠাৎ হারিয়ে গেল তারা। কোনো কারণ ছাড়াই মতলুবের বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল।

ভোর ছ'টায় দোকান খুলতে এসে বেঞ্চে রুহুলকে একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে ভীষণ অবাক হয় মদনা। অবশ্য সে এরকমটাই আশা করেছিল। আবার এটাও ভেবেছিল সে এসে হয়তো দেখবে রক্তমাখা লাশ পড়ে আছে লোকটার।

—স্যার কি সত্য সত্যই সারা রাত এইখানে কষ্ট করলেন?

—সব কষ্টই তো সত্য, মিথ্যা কষ্ট বলে কিছু আছে নাকি আবার?

—স্যারের কথা বুঝলাম না।

—বুঝার দরকার নেই জলদি গরম গরম চা দাও। তোমাদের এখানে তো ভোর রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে হে।

—তা পরে। খারান আপনেরে চা-বিস্কুট দেই। চুলা জ্বালিয়ে কাজে লেগে পড়ে মদনা।

চা দিয়ে মদনা সাহস করে প্রশ্ন না করে পারে না।

—স্যার এখানে আসার আপনার উদ্দেশ্যটা কী?

—কোনো উদ্দেশ্য নাই।

—কারো খোঁজে আসছেন?

—হ্যাঁ, তা একজনের খোঁজে আসছি।

—কে?

—একজনকে খুঁজছি... বদরুলকে চেন? বদরুল হাসান। এই গ্রামেই থাকে। আমরা ঢাকায় একসাথে পড়াশোনা করেছিলাম। বদরুল বলেছিল আমার জন্য অপেক্ষা করবে এই দোকানে। মানে তোমার দোকানে, এটাই তো মদনার দোকান?

—জি জি আমিই মদনা। বদরুল ভাইয়েরে চিনি। পাগলা কিসিমের লোক। তবে লোক ভালো...।

—তার বাসা চেন?

—জে না। মদনা আসলে চেনে কিন্তু নতুন কোনো ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকটি হঠাৎ ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ায়। আকাশ অন্ধকার করে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। লোকটা হাত বাড়ায় মদনার দিকে। 'ছাতাটা দিন।' মদনা ভীষণ অবাক হয় 'ছাতা?'

—হ্যাঁ আমার ছাতাটা দিন... মদনা হতভম্ব ভঙ্গিতে কাগজে মোড়ানো ছাতাটা এগিয়ে দেয়।

—তুমি কি ভেবেছ অস্ত্র? লোকটি মোড়ানো কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে কিছু একটাতে চাপ দিতেই ঠাস করে ছাতাটা খুলে যায়। অটোমেটিক ছাতা। নতুন ছাতা। লোকটি মুগ্ধ ভঙ্গিতে ছাতাটার দিকে তাকায়।

—ছাতাটা বেশ বড় কি বল মদন মিয়া? তবে এই দেশটার জন্য আরো একটা ছাতা দরকার অনেক বড়... আর হাতলটা ধরতে পারে এমন একটা তাগদওলা লোক... কি বল? ভ্রু ভঙ্গি করে লোকটি। কিছু বোঝে না মদনা। লোকটি বেরিয়ে যেতেই দ্রুত ঝাঁপ ফেলে। আর ঠিক তখনই মাটি ফুঁড়ে যেন বের হয় ছ'সাত জন লোক, মদনার কলজে দ্বিতীয়বারের মতো উড়ে যায়। ইদ্রিস তার দলবল নিয়ে এসেছে। সোজা এসে কলার চেপে ধরে ঠাস করে একটা চড় বসায় ওদের কেউ একজন!

—শুয়োরের বাচ্চা ওই লোক কই?

—কোন লোক? ঝাঁ ঝাঁ করা কানে হাত ঘষতে ঘষতে বলে মদনা।

—আরে বাইক্কত অস্ত্র রাখলি যার!

—ও ঐডা অস্ত্র না ছাতা! একটা ছাতা, একটু আগে ওই লোক নিয়া চইলা গেল!

—তুই ঠিক দেখছস ছাতা?

—জে ঠিক দেখছি.... অটোমেটিক ছাতা।

—যাওয়ার সময় কী কইল?

—মারফতি কথা কইল কিছু বুঝলাম না। তয় বদরুলের খোঁজে আইছিল।

—বদরুল?

ইদ্রিস চোখ তাকাতাকি করে অন্যদের সাথে। তাদের মধ্যে কে একজন বলে ওঠে 'বদরুলের আর পাওন লাগব না ওই হালারে কয়া দিস। ও খর্চা হয়ে গেছে।' 'চোপ কর' আরেক জন ধমক দেয় তাকে 'কথা কম ক'। ইদ্রিসের দল চলেই যাচ্ছিল। ধলাকে কী ইশারা করল ইদ্রিস। ধলা মদনার পকেট থেকে নগদ যা পেল উঠিয়ে নিল। মনে মনে হিসাব করল মদনা, গেল সাড়ে চারশ টাকা হাওয়া হয়ে। মনটাই তার বিষিয়ে গেল। দোকানের ঝাঁপ লাগাতে লাগাতে সে ঠিক করল বদরুলের বাসায় যে একবার যাবে। সম্ভব হলে এখনই।

মদনা আর ছাতাওয়ালা প্রায় একই সাথে বদরুলের বাসায় পৌছল। বদরুল তার কিছুক্ষণ আগে এসেছে। তখনো তার জামাকাপড়ের এখানে-সেখানে রক্তের দাগ।

—বদরুল একি অবস্থা তোর?

—কে, রুহুল? কখন আইলি? অবস্থা তো পুরো ডাইল খিচুড়ি, রক্তাক্ত মুখে হাসার চেষ্টা করে বদরুল।

—কারা করেছে?

—ওরা মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তয় পারে নাই। বিলাইয়ের জান আমার... উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, ছুটে এসে ধরল মদনা।

—মদনা তুই কই থাইকা? বিড়বিড় করে বলে বদরুল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই স্যারের পিছে পিছে আইলাম। মিথ্যা কথা বলে মদনা। অবশ্য সত্য-মিথ্যা যাচাই করার সময় না এটা। বদরুলকে বাঁচাতে হলে জলদি সদরে নেয়া দরকার।

ভ্যান জোগাড় করল মদনা। তারপর সেই রাতেই গোরাপাথে বদরুলকে নিয়ে ছুটল ওরা দু জন। আর ভ্যানচালক মনা। বদরুল তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ভ্যানে। উপরে খোলা আকাশ তবে অন্ধকার! হয়তো রাতে আরো ঘন মেঘ করেছে। তা না হলে আকাশ জুড়ে দেখা যেত নাম না জানা সব তারার মেলা। মদনপুরের আকাশে অনেক তারা থাকে সব সময়।

সদর হাসপাতালে পৌঁছানোর পাঁচ-দশ মিনিট আগেই বদরুল মারা গেল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু। ডিউটিরত ডাক্তার সাহেব গলায় হাত দিয়েই বুঝে গেলেন। বদরুল আর নাই। কিন্তু সেটা সাথে আসা লোকজনদের বুঝতে দিলেন না। দু হাতে বুকে কয়েকবার ধাক্কা দিলেন। বদরুলের মুখে হাঁ করে ফুঁ দিলেন। যেন শেষ চেষ্টা করলেন তিনি। তারপর বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা দু পাশে নাড়লেন। বাংলা ছবিতে ডাক্তারেরা রোগী মারা গেলে ঠিক এভাবেই মাথা নাড়ে। বহু কষ্টে শিখেছেন তিনি। আসলে জীবনের সব ক্ষেত্র থেকেই শেখা যায়। শেখার আছে। যেমন সবচে বড় শেখা হচ্ছে হাসপাতালে মরা রোগী এলে সাথে সাথে বলা উচিত না যে রোগী মারা গেছে। চেষ্টা করতে হবে বা ভান করতে হবে যে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে পরে অন্তত মৃত রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা বলে যে, নাহ, ডাক্তার লোকটা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে... কিন্তু হায়াৎ নাই বেচারার... ইত্যাদি ইত্যাদি! এই শেখাটা শিখেছেন প্রথম জীবনে, তখন তিনি ইন্টার্নি ডাক্তার। হাসপাতালে হঠাৎ একজন রোগী নিয়ে কয়েকজন লোক এল। ডিউটি ডাক্তার ছিলেন তিনি। গলায় হাত দিয়েই বুঝলেন কেস ফিনিশ। মুখে বললেনও সেটা।

—এ তো মরে গেছে!

—শুয়োরের বাচ্চা কী কইলি? মারছস তো তুই... তারপর আর কিছু মনে নেই তার। সেবার প্যাঁদানি খেয়ে একটা বড় শিক্ষা হয়েছিল তার। বাস্তবে ফিরে আসেন ডাক্তার। কেশে গলা পরিষ্কার করে বলেন—

—অনেক আগেই... এটুকু বলেই রোগীর সাথে আসা তিন জনের দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার সাহেব ভেবেছিলেন সাথে আসা তিন জনের কেউ একজন অন্তত আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠবে! কিন্তু সেরকমটা হল না। ডাক্তার ইশারা করতেই নার্স এসে সাদা চাদর দিয়ে বদরুলের মুখটা ঢেকে দিল। আর তখনই সবাইকে চমকে দিয়ে মুখের সাদা কাপড়টা সরিয়ে বদরুল উঠে বসে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল 'অপসন নাম্বার ওয়ান'। তারপর মদনার দিকে তাকিয়ে বলল 'মদনা এক গ্লাস পানি দে'।

এই গল্পে সম্ভবত হাসপাতালের বেডে সদ্য বেঁচে ওঠা বদরুল নায়ক। আর রোজি নায়িকা। বদরুল মারা গেছে এটা ছিল 'অপসন এক'। আরো দুটো অপসন আছে এই গল্পে। আমরা এবার দু নম্বর অপসনে ঢুকব।

...এক সপ্তাহ পরেই প্রায় সুস্থ হয়ে গ্রামে ফিরল বদরুল। তবে নিজের বাড়িতে উঠল না। চেয়ারম্যানের লোকদের সে বুঝতে দিতে চায় না যে সে বেঁচে আছে। সে উঠল মদনার বাসায়। সাথে রুহুল আছে তখনো।

—এখন বল তুই কেন এসেছিস? বদরুল জানতে চায়।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—এমনি।

এমনি না। তুই এসেছিস ঝর্নাকে নিতে? রুহুল কথা বলে না। এটা সম্ভব না ঝর্না মতলুবকে বিয়ে করেছে স্বেচ্ছায়। তারা বোধহয় সুখেই আছে... রুহুল লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'না আমি ঝর্নাকে নিতে আসি নি একটা কথা বলতে এসেছি।'

—এত বছর পর একটা কথা বলার কী দরকার বাপ? নিজে একটা বিয়ে করে বিয়ে করা বউকে দশটা কথা শোনাও না কেন? কে না করেছে তোকে?

—তা হলে তুই বলছিস ঝর্নাকে কথাটা বলা উচিত হবে না?

—না।

—কথাটা তুই শুনতে চাস না?

—না।

—কেন হঠাৎ আমার আর ঝর্নার ওই গভীর জঙ্গলে ছাড়াছাড়ি হল...?

—না শুনতে চাই না।

—কেন প্রবল ঘৃণায় ঝর্না মুখ ফিরিয়ে নিল আমার থেকে... বিয়ে করল একটা সাধারণ স্থানীয় গাইডকে?

—না না শুনতে চাই না। এইসব গল্প-উপন্যাসের প্লটে আমি নাক গলাতে চাই না। তুই ফিরে যা। তা ছাড়া মতলুব তোকে দেখলে লাশ ফেলে দিতে পারে... জানিস তো মতলুবও ছিল এক সময় ভয়ঙ্কর টেরর। সাধারণ কোনো গাইড না। ঢাকার স্মার্ট মেয়ে ঝর্নাকে বিয়ে করে সে এখন রীতিমতো ভদ্রলোক।

—মতলুবের সাথে আমার দেখা হয়েছে।

—বলিস কী?

—ও আমাকে চিনতে পারে নি। আর চিনবেই বা কীভাবে তখন তো আর আমার এরকম দাড়ি–গোঁফ বাবরি চুল ছিল না। আর তখনকার আমি আর এত বছর পরের আমির মধ্যে বিস্তর ফারাক।

—যাক তা হলে, না চিনলে তো তুই বেঁচেই গেলি। যা ভাগ এখন। এসেছিলি একদিকে ভালো হল, তোর জন্যই বলা যায় এ যাত্রায় আমি বেঁচে গেলাম। আচ্ছা তোর কি ধারণা তুই সে কথাটি ঝর্নাকে বললে ঝর্না ফের তোর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ঢাকা ছুটবে?

—হ্যাঁ... অবশ্যই! বদরুল অবাক হয়ে তাকায় রুহুলের দিকে।

দিন দুয়েক পরে। যেদিন লিলির ঢাকা ফিরে যাওয়ার কথা। সেদিন বাজার থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল মতলুবের। ঘরে এসে দেখে লিলি পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে।

—কী হইছে তোমার? তোমার আপা কই?

—আপা চলে গেছে।

—কই গেছে?

—ঢাকায়... রুহুল ভাইয়া এসেছিল...

—রুহুল!

চট করে তখন মাথার ভেতর মদনার দোকানের দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোকটাকে চিনে ফেলল মতলুব। রুহুলের সাথে চলে গেছে আমার বিয়ে করা বউ? কথাটা বলতে গিয়েও বলল না। সাবধানে তাকাল লিলির দিকে। লিলি যায় নি কেন? পাশেই তার কালো চামড়ার সুদৃশ্য ব্যাগ গোছানো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কখন গেছে ওরা?

—সকালের বাসে।

তার মানে এতক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে। সকালের যে বাসটা ঢাকা যায় সেটা নতুন বাস, স্পিড ভীষণ। ওরা ঢাকা গেছে। ঢাকা যায় নি কখনো মতলুব। ঝর্নার সাথে একবার যাওয়ার কথা হয়েছিল। আর তো যাওয়া হবে না। ঝর্না নেই। বুকের ভেতর ক্রোধের একটা বাষ্প উঠতে গিয়েও উঠল না। মতলুব হাত বাড়িয়ে লিলির ব্যাগটা নিল। তারপর বলল, 'চল, ঢাকার শেষ বাসটা ধরতে না পারলে...' লিলি খুব অবাক হয়ে মতলুবের দিকে তাকায়। তারপর চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়।

লিলিকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল মতলুব। নিজেকে তার খুব বোকা বোকা লাগছে। লিলি নিঃশব্দে কাঁদছে। মতলুব লেখাপড়া খুব বেশি দূর করে নি। খুব সাধারণ একজন মানুষ। এই সময় লিলিকে কী বলা উচিত তার মাথায় আসছে না। তারপরও কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আমারে নিয়া তাইব না, আমি ভালোই থাকব। তোমরা ভালো থাইক। তোমার বইনরে বইল...' বলে থামল মতলুব। কিছু বলল না। তারপর লিলিকে কিছু না বলে হনহন করে হাঁটা দিল। পেছনে বাসের গর্জন শুনতে পেল মতলুব। বাস স্টার্ট নিয়েছে ঢাকা যাওয়ার জন্য। মতলুব আর পেছনে তাকাল না। তাকালে ভালো করত। সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পারত। যে দৃশ্যের জন্য কোনো কোনো পুরুষ সারা জীবন অপেক্ষা করতেও রাজি হবে হয়তো।

মদনপুর এলাকাটা ছোট। মতলুবের বউ চলে গেছে এটা সবাই জেনে যাবে। লোকজনকে কী বলবে মতলুব? ভীষণ লজ্জা লাগে মতলুবের। হাঁটতে হাঁটতে বাজারের রাস্তাটা পার হতে গিয়ে মুখোমুখি পড়ে গেল ইদ্রিসের। ইদ্রিস আজকাল একটা দল নিয়ে ঘোরে। এই মুহূর্তে তার সাথে পুরো দলটা না থাকলেও সাথে দু জন আছে।

—কী মতলুব খবর কী?

—ভালো।

—কী যেন শুনলাম?

—কী শুনছ? ঠাণ্ডা গলায় বলে মতলুব। সে টের পায় অনেক পুরোনো একটা রাগ এখনকার কষ্টের সাথে মিলেমিশে কী যে হল তার। ইদ্রিস যখন বলল, 'তোমার ফুটানির বউ বুলে ফুটছে কার লগে?' তখন... তখন খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পাশের দা-খুন্তির একটা দোকান থেকে একটা রামদা নিয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইদ্রিসকে কোপাল মতলুব। গুনে গুনে সাতটা কোপ দিল। রক্তাক্ত দা-টা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে দেখে শুধু দা'ওলা না আশপাশের সব দোকানের লোকেরাই যে যার ঝাঁপ ফেলে পালিয়েছে। দা-টা দোকানের সামনে ফেলে হাঁটা দেয় মতলুব।

একটা ঘেয়ো কুকুর তখন ইদ্রিসের লাশটার কাছে গিয়ে শোঁকার চেষ্টা করছে। তার শাগরেদ দুটো তখন ছিল না। ইদ্রিসের শরীর থেকে রক্তের একটা চিকন ধারা এঁকেবেঁকে নেমে আসছিল ঢালের দিকে। যেন তারাও দিশেহারা কোন দিকে যাবে!

ঝর্না বা লিলি কেউই জানল না তারা ঢাকা পৌছার আগেই গ্রেফতার হয়েছে মতলুব। বাংলাদেশে কখনো কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কারণ ছাড়াই পুলিশ খুব তৎপর হয়ে ওঠে। মতলুবের ক্ষেত্রেও তাই হল। মতলুবকে সে রাতেই নেয়া হল সদর থানায়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জরুরি বিচার আইনে হয়তো বা তাকে ফাঁসিতে ঝুলাতেও খুব বেশি সময় নেবে না তারা। তদন্তের প্যাঁচে না পড়লে।

ইদ্রিসের মৃত্যুর পর বদরুল তার নিজের বাসায় ফিরে এসেছে। সবকিছুই কেমন উল্টেপাল্টে গেল। ইদ্রিসের সাথে তার ব্যক্তিগত হিসাব-নিকাশটা মতলুবই কেন করতে গেল কে জানে। নিজের বাসায় ফিরে এসে দেখে তার বাসায় দাওয়ায় রাখা একমাত্র কাঠের চেয়ারটায় বসে আছে রুহুল। ভীষণ অবাক হল বদরুল!

—তুই না ঝর্নাকে নিয়ে পালিয়েছিস?

—পালাই নি ঝর্না স্বেচ্ছায় আমার সাথে গিয়েছে। তোকে তো আগেই বলেছিলাম। আমি যে কথাটা বলতে এসেছিলাম সেটা ঝর্নাকে বলামাত্র সে আমার কাছে ফিরে আসবে।

—কথাটা কী ছিল?

—সেটা এখন আর জরুরি নয়।

—মানে?

—মানে...এটা এখন মোটেই কোনো জরুরি বিষয় নয়... তা ছাড়া এখন এ গল্পের 'অপসন থ্রি' চলছে... মনে নেই অপসন টু'তে তুই মরতে মরতে বেঁচে উঠলি, আমি ঝর্নাকে নিয়ে ঢাকা গেলাম। মতলুব খুন করল ইদ্রিসকে... এ সবই অপসন টু'র ঘটনা। এখন আমরা আছি অপসন থ্রিতে...।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ে বদরুল। আর তখনই ঝুনঝুন শব্দে তাকিয়ে দেখে রোজি ঢুকছে। তার হাতে একটা কাগজ।

—আরে রোজি তুমি?

—হ্যাঁ, বাবা পাঠালেন। আপনার প্রত্যয়নপত্র, আপনি না বিদেশে যাবেন?

—হ্যাঁ, ভেবেছিলাম যাব কিন্তু এখন আর যাব না।

—সত্যি? খুশি খুশি গলায় বলে ওঠে রোজি।

—তোমার জামাই কিছু মনে করবে না এই যে এত রাতে একা একা আমার কাছে আসলা?

—এইসব কী বলতাছেন আপনে? এইটা তো 'অপসন থ্রি... আমার বিয়া হয় নাই বিয়া হবে আপনার সাথে। বাবা রাজি হয়েছেন।'

এ সময় একটা হাসির শব্দ শুনল বদরুল। তাকিয়ে দেখে একটু আগে যে চেয়ারটায় রুহুল বসেছিল সেখানে বসে আছে মতলুব। সে-ই হেসে উঠেছে।

—আরে মতলুব তুমি না জেলে?

—আরে না কি বলেন না বলেন... বারবার ভুল করতাছেন আপনে। 'অপসন থ্রি'তে সব পজিটিভ। রুহুল বিয়া করছে ঝর্নাকে... আমি লিলিকে।

—লিলিটা কে?

—ঝর্নার বোন। খুব ভালো মেয়ে। ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে। মদনপুরে বেড়াতে আসছিল। তাকে নিয়া গেছিলাম গুমগুম গুহা দেখাইতে সেইখানে...

—সেইখানে কী বল?

—না থাক বাদ দেন... কেমন এক লাজুক হাসি দিয়ে থেমে যায় মতলুব। বদরুলের সবকিছু ধাঁধার মতো লাগে। কিছু না বুঝেই সে বলে—

—তা হলে সব ঠিক আছে? খালি ইদ্রিসটাই খুন হল? হো হো করে হেসে উঠল মতলুব। না ইদ্রিস খুন হয় নাই তো... আপনি তো আবার ভুল করলেন... সে তো অপসন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থ্রিতে জনপ্রিয় মেম্বার। খুবই ভালো একজন মানুষ। গ্রামের অনেক উন্নতি করছে। মদনপুর তো এখন একটা মডেল ট্যুরিস্ট স্পট বলা যায়। সে খুন হবে কেন?

হতভম্ব বদরুল উঠে দাঁড়ায়। কানের কাছে ফিসফিস করে রোজি, 'এই চলেন না বাড়ির পিছে পুকুরপাড়ে যাই খুব বাতাস ওখানটায়।' বদরুল বলে 'চল'। হাত ধরে যেতে যেতে বদরুল দেখে দাওয়ায় রাখা কাঠের চেয়ারটা খালি। মতলুব বা রুহুল কেউই আর সেখানে বসে নেই। কখন চলে গেল তারা?

পুকুরপাড়ে এক অসাধারণ দৃশ্য তৈরি হয়েছে। পূর্ণ চাঁদের প্রতিফলন পড়েছে পুকুরে। আকাশছোঁয়া বাঁশঝাড়ের পাতা শিরশির করে কাঁপছে। পুকুরের অন্য পাশেই বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত। যেন সবুজ একটা সমুদ্র উদ্দাম হাওয়ায় দুলছে... এক হাতে রোজির কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টানে বদরুল। 'এই কী করেন? ছাড়েন' বদরুল ছাড়ে না। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে রোজির দিকে। জীবন এত সুন্দর! ফিসফিস করে বদরুল বলে—

—জীবন না বলেন অপসন তিন এত সুন্দর?

—ঠিক বলছ অপসন তিন এত সুন্দর?

—হ্যাঁ, সায় দেয় রোজি। তারপর ফিসফিস করে বলে মানুষ খালি ভুল করে জীবনের ভুল অপসনগুলি নেয়। এই গল্পে আমরা ঠিক অপসনটাই নিছি তাই না? মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাথা নাড়ে বদরুল। আর ঠিক তখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে একসাথে কেঁপে ওঠে সমস্ত বাঁশঝাড়। কয়েকটা নাম না জানা পাখি শব্দ করে ডেকে উঠে ছুটে যায় ঠিক যেন চাঁদের দিকে। আর তাই কি সম্ভব চাঁদের দিকে যাওয়া! পুকুরের শান্ত কালো জলে তার প্রতিচ্ছবি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

## হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন

দিনটা ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইন ডে। ভালবাসাবাসি দিবস। এই দিনে একবার দেখা গেল এক বাড়ির ছোট ভাই কাপড়চোপড় পরে মাঞ্জা মেরে তৈরি হচ্ছে। পাশেই বসে ছিল বড় ভাই, পত্রিকায় চোখ। আড়চোখে দেখল ছোট ভাইয়ের সাজগোজ। আস্তে করে বলল—

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে একটা পার্টি থ্রো করেছি আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সেখানে যাচ্ছি।

—তা পার্টিতে হবেটা কী?

পার্টিতে যা হয় সুন্দরী মেয়েরা আসবে বান্ধবীরা আসবে হইচই ফুর্তি... খাওয়াদাওয়া হবে... তাং ফাং...

—তাং ফাং-টা কী?

—ও তুমি বুঝবে না।

—আমি তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। বড় ভাই গম্ভীর গলায় বলল।

—ভাইয়া আর যাই বল প্লিজ যেতে নিষেধ কোরো না।

—না যেতে আমি নিষেধ করব না কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি...

—বেশ বল কী কথা তোমার?

—কথাটা গুরুত্বপূর্ণ, আশা করি রাখবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—জি ভাইয়া বাখার চেষ্টা করব।

—আমি কি তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে পারি?

ছোট ভাই শেষ পর্যন্ত বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি। নেয়ার কথাও না। কেননা প্রেম-ভালবাসা এইসব খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর মধ্যে থার্ড পারসনকে কে টানে বা টানতে চায়।

তো বড় ভাই হতাশ হয়ে নিজেই একা একা বের হয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল কী করলাম একটা প্রেমও করতে পারলাম না এই জীবনে। একজন প্রেমিকা থাকলে আজ এই দিনটা কত অর্থবহ হয়ে উঠত। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বড় ভাই। ঠিক তখনই তার পাশে কে যেন ডেকে উঠল।

—স্যার?

—কে?

—স্যার আমি ফুলওলা ফুল বিক্রি করে খাই।

—তো কী ব্যাপার?

—স্যার আজ ভ্যালেন্টাইন ডে আপনার প্রেমিকার জন্য একটা ফুলের তোড়া নিয়ে যান। খুব সস্তায় দিচ্ছি।

বড় ভাই দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল 'না, আমার কোনো প্রেমিকা নেই'।

—সত্যি বলছেন স্যার?

—মিথ্যা বলতে যাব কেন?

—সেক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হবে স্যার আপনি দারুণ ভাগ্যবান একজন মানুষ... নিন ভাগ্যবানদের জন্য এই দিনে আমার তরফ থেকে ফ্রি রজনীগন্ধার একটা স্টিক।

... সেই একটা ঘটনা। তবে আরেক বাড়িতে। এবার বড় বোন ছোট বোন। ছোট বোন এইমাত্র বিউটি পার্লার থেকে এল। বড় বোন আড়চোখে খেয়াল করল ছোট বোনের মুখে প্রায় এক ইঞ্চির উপর মেকাপ, ভ্রু প্লাক করা, আই লেশ লাগানো। শ্যাওড়া গাছের একটা পেতনিকেও এর থেকে দেখতে ভালো লাগবে। ছোট বোন, সাজগোজ শেষ করে বলল 'আপা দরজাটা একটু লাগিয়ে দে তো আমি একটু বেরুচ্ছি।'

—যাচ্ছিস কোথায়?

—উফ আপা তুই এখনো সেই ক্ষেতই রয়ে গেলি। ভ্যালেন্টাইন ডে'তে মানুষ কোথায় যায়।

—সেটাই তো জানতে চাচ্ছি।

—পার্টিতে... আমার বান্ধবী ফ্লোরা একটা ভ্যালেন্টাইন ডে পার্টি থ্রো করেছে ওখানে আমার বান্ধবীরা সব তাদের বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসবে... অনেক মজা হবে।

—ভালো, তোরও বয়ফ্রেন্ড আছে নাকি?

—কী যে সব ক্ষেতের মতো এক একটা প্রশ্ন কর না আপা... আপাতত চার নম্বরটাকে লেজে খেলাচ্ছি... ও যদি বিদেশের স্কলারশিপটা পায় তা হলে ওর ব্যাপারে ফাইনাল চিন্তাভাবনা করব... যাই। হুস করে বেরিয়ে গেল ছোট বোন। বড় বোনের বুকের ভিতর থেকেও হুস করে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস!

বড় বোনও কী মনে করে কোনোরকমে একটা শাড়ি পরে বেরিয়ে পড়ল। ভালো লাগছে না তার। এই জীবনে প্রেম না করে কি তবে ভুলই করলাম? মন খারাপ করে ভাবতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাবতে হাঁটছিল বড় বোন। ঘটনাচক্রে সেও সেই ফুল বিক্রেতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ লোকটা বলে উঠল 'আপা'?

—কে?

—আপা আমি ফুলওলা, ফুল বিক্রি করে খাই।

—তো কী ব্যাপার?

—আপা আজ ভ্যালেন্টাইন ডে আপনার সঙ্গীর জন্য একটা ফুলের তোড়া নিয়ে যান। খুব সস্তায় দিচ্ছি।

বড় বোন দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল 'না, আমার কোনো সঙ্গী নেই'।

—সত্যি বলছেন আপা?

—মিথ্যা বলতে যাব কেন?

—সেক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হবে আপা আপনি দারুণ ভাগ্যবান একজন মানুষ ... নিন ভাগ্যবানদের জন্য এই দিনে আমার তরফ থেকে একটা ফ্রি রজনীগন্ধার স্টিক।

এদিকে উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল কিউপিড। সে বেচারা ভীষণ ক্লান্ত! আজ সারা দিন প্রেমিক-প্রেমিকাদের অসংখ্য তীর ছুড়তে হয়েছে। হঠাৎ দেখে একটা পার্কে দুই বেঞ্চিতে দু জন বসে। একজন তরুণী আর একজন তরুণ। তারা দু জনই বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে আছে। এটা তো হতে পারে না এই দিনে... সে ঠিক করল এখানে দু জনকে দুটো 'লাভ অ্যারো' ছুড়ে মারা দরকার। কিন্তু তীর মারতে গিয়ে খেয়াল হল তার তীর আছে মোটে একটা! এখন উপায়? নিয়ম অনুযায়ী দু জনকে দুটো তীর মারলে তাদের মধ্যে প্রেম হয়ে যায় কিন্তু একটা তীর দিয়ে দু জনকে কীভাবে... একটা হতে পারে তারা যদি পাশাপাশি বসে বা হাঁটে তা হলে এক তীরে গাঁথা যায় কিন্তু তারা কি সেভাবে বসবে বা হাঁটবে? কিউপিড কাছে-ধারে একটা গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

পার্কের বেঞ্চিতে বসে বড় ভাই তাকিয়ে দেখে তার ডান পাশের একটা বেঞ্চের পরে আরেকটা বেঞ্চে বসে আছে একজন তরুণী, একা! আশ্চর্য তার হাতেও মাত্র একটা রজনীগন্ধার স্টিক। ঠিক তার মতো! তবে কি তরুণীটিও তার মতো... ঠিক তখনই তরুণীটি উঠে হাঁটতে শুরু করে তার দিকেই আসছে। অবশ্য পার্ক থেকে বের হওয়ার রাস্তাটা তার বেঞ্চের সামনে দিয়েই গেছে।

সামনে দিয়ে হেঁটে পার হবার সময় এক সেকেন্ডের ১০০ ভাগের এক ভাগের জন্য চোখাচোখি হল তাদের।

কিউপিড দেখল এই চান্স। দু জন মোটামুটি এক লাইনে এসেছে। একজন বসে একজন সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ঠিকমতো সই করতে পারলে এক তীরেই গাঁথা যাবে দু জনকে। খুব সাবধানে দু জনকে টার্গেট করল কিউপিড... আর একটু... মেয়েটি ছেলেটির সামনে এলেই... আর তারপরই সাঁই করে ছুটে গেল তীরটা একটাই মাত্র তীর... কিন্তু একি! মেয়েটি ঠিক ছেলেটির সামনে এসে ছোট্ট একটা হোঁচট খেল, তীরটা তার গায়ে লাগল না। আর ছেলেটিও কেন যেন সরে বসল একটু! সে কি ভেবেছিল মেয়েটি তার পাশে বসবে? ফলে তীরটা তার গায়েও লাগল না। বেঞ্চে বাড়ি খেয়ে তীরটা ছিটকে এসে মাটিতে পড়ল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বড় ভাই দেখল কী একটা যেন পড়ল মাটিতে। মেয়েটি এগিয়ে গেছে অনেকখানি। মেয়েটির হাত থেকে পড়ল? দেখে ছোট্ট একটা অদ্ভুত ধরনের তীর। চট করে সে তুলে নিল। তারপর ছুটে গেল মেয়েটার পিছে পিছে।

—এক্সকিউজ মি?

—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ।

—কী ব্যাপার?

—আপনার হাত থেকে বোধহয় এটা পড়ে গিয়েছিল।

—আমার হাত থেকে? না না!

—ও আমি ভাবলাম...

—না ধন্যবাদ এটা আমার না...

—না মানে আপনি চলে যাওয়ার পরই হঠাৎ পড়ল আমি ভাবলাম... আপনার।

—জিনিসটা কী? বড় বোন হাঁটতে হাঁটতেই এবার একটু কৌতূহল দেখায় 'আমি বুঝতে পারছি না... দেখুন না।'

বড় বোন কিউপিডের ছোট তীরটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে 'মনে হচ্ছে একটা তীর'।

—হ্যাঁ তীর... তীরটা অদ্ভুত!

—নিন। তীরটা এগিয়ে দেয় বড় বোন।

—না না আপনি রেখে দিন।

—আমি রাখব কেন? জিনিসটা তো আমার না!

—আমারও না... যদি আপনার ভালো লাগে রেখে দিতে পারেন।

—না না।

—তীরটা তা হলে ফেলে দেই কী বলেন?

—ফেলে দেবেন কেন?

—রেখেই বা লাভ কী?

—সবকিছুতেই লাভ-ক্ষতির হিসেব করলে চলে?

—এইরকমভাবে 'আপ পহেলে আপ পহেলে' টাইপ সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলতে বলতে বড় ভাই আর বড় বোন এগিয়ে যায় বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। তখনো সিদ্ধান্ত হয় নি তীরটা কার কাছে থাকবে। এর মধ্যে এক ফাঁকে বড় ভাই জেনে নিয়েছে বড় বোন কোথায় যাবে মানে কোন দিকে যাবে।

—তীরটা কিন্তু আপনি চাইলে আমরা দু জনেই রাখতে পারি। সাহস করে বলে ফেলে বড় ভাই।

—মানে?

—মানে... অপ্রস্তুতের মতো হাসে বড় ভাই বলে 'আপনি বড় সুন্দর'।

এরকম করে কেউ বলে নি কখনো বড় বোনকে, লজ্জিত ভঙ্গিতে চট করে খালি বাসটায় উঠে পড়ে বড় বোন। আরে কী আশ্চর্য বড় ভাই দেখি একই বাসে উঠল। পাশাপাশি বসল দু জন। বাসটাও যেন আজ পার্কটার মতোই খালি।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আমি আপনার ঐদিকেই থাকি। লোকটা যে মিথ্যা বলল বুঝল পরিষ্কার বড় বোন। কিন্তু কিছু কিছু মিথ্যা শুনতে ভালো লাগে। কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

—তীরটা তা হলে কার কাছে থাকবে বলুন?

—আমাদের দু জনের কাছেই। আস্তে করে বলে বড় বোন।

অনেক উপরে আকাশের ট্রটোস্কেয়ার স্তর অতিক্রম করে উড়ে যেতে যেতে নিজের মনেই হেসে ওঠে কিউপিড। 'কখনো কখনো তা হলে তীরে না বিঁধেও কাজ হয়!'

## ভালো-মন্দের হিসাবনিকাশ

চোখ খুলতেই চমকে উঠল বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা মকবুল হোসেন। তার কাঁধের দু পাশে দু জন লোক বসে আছে। তারা কিঞ্চিৎ ঝুঁকে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দু জনেই দেখতে প্রায় একই রকম। দু জনের মাথায়ই পাগড়ি আর থুতনিতে পাকানো দাড়ি। অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে, চাইনিজ স্টাইলে!

—আ–আপনারা কারা?

—শশশ...শান্ত হোন, উত্তেজিত হবেন না। দু জনের একজন ঠোঁটে আঙুল চেপে বলে উঠল। কিন্তু মকবুল হোসেন অস্থির হয়ে ওঠে। উঠে বসতে গিয়ে টের পায় সে উঠতে পারছে না। তার কিছু একটা হয়েছে এবং সে খেয়াল করল সে আসলে ভাঙাচোরা একটা গর্তের মতো জায়গায় দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে। চারপাশে ইট বালি সিমেন্ট... যেন একটা ধ্বংসস্তূপ!

—আমি কোথায়? প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে মকবুল হোসেন। সে যেন কিছুটা ভয় পেয়েছে।

—চেঁচাবেন না। ভয়ের কিছু নেই যা হওয়ার হয়ে গেছে। বাম কাঁধের পাশে বসা লোকটি বলল।

—মানে?

—মানে আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি... এবার বলল ডান কাঁধের পাশে বসা লোকটি। আমি মনকির। মানুষের ভালো কাজের হিসাব নেই।

—আর আমি নকির, আমি নেই খারাপ কাজের হিসাব।

নাম দুটো চেনা চেনা লাগলেও ঠিক ধরতে পারল না মকবুল হোসেন ওরফে লেবু মিয়া।

—ভালো কাজ কী কী করছেন জলদি বলুন... এক এক করে...।

মকবুল খেয়াল করল, ডান কাঁধের মনকির নামের লোকটি একটা বাঁধানো খাতা খুলে বসেছে। হাতে একটা বেশ লম্বা ধরনের অদ্ভুত টাইপ কলম।

—মানে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এবার বাম কাঁধের লোকটি বলল, ঢাকা শহর গতকাল ক্র্যাশ করেছে। দুই শ ফুট মাটির নিচে তলিয়ে গেছে... বেশির ভাগ লোকই মারা গেছে।

—কী! কী বলছেন? নিশ্চয়ই ভূমিকম্প?

—না ভূমিকম্প হয় নি, ঢাকার মাটির নিচে পানি শূন্য হয়েছিল বহু আগেই... সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে মাত্র... মানে ফিলআপ দি ব্ল্যাংকস আর কি!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—বুঝেছি মকবুল বিড়বিড় করে 'তার মানে আমি মারা গেছি।'

—ঠিক ধরেছেন এখন শুরু করুন কী কী খারাপ কাজ করেছেন পৃথিবীতে। সিরিয়ালি বলতে থাকুন... এক নম্বর তো আমি জানি দু'নম্বর থেকে শুরু করুন।

—এক নম্বর জানেন মানে?

—ঢাকা শহরে বাস করতে আসাই হচ্ছে এক নম্বর খারাপ কাজ।

—নকির, খাতা বন্ধ কর। মকবুল হোসেন তাকিয়ে দেখে ডান কাঁধের পাগড়ি বাঁধা লোকটি ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

—কী হল তুমি ক্ষেপেছ কেন?

—আমি ওকে আগে প্রশ্ন করেছি... ভালো কাজের লিস্টগুলো ও আমাকে আগে বলবে... আমার তাড়া আছে...।

—ও তোমার তাড়া আছে আর আমার তাড়া নাই না?

মৃত মকবুল হোসেন আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করল পাগড়িওলা দুজন সরকারি দল আর বিরোধী দলের মতো লেগে গেল। ছি ছি মৃত্যুর পরও এসব? এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে মকবুল চেঁচিয়ে উঠল—

—আপনারা থামবেন না পুলিশ ডাকব?

—কি পুলিশ ডাকবে মানে? আমাদের পুলিশের ভয় দেখাও? জান আমরা কে? পৃথিবীর মৃত মানুষের ভালো-মন্দ কাজের সব হিসাব আমাদের হাতে?

—আমরা ইচ্ছে করলে ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো করে দিতে পারি মুহূর্তে।

—ঠিক আছে ঠিক আছে... আমার ভুল হয়েছে, স্লিপ অফ টাং মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে। এখন দয়া করে আপনারা সওয়াল-জবাব শেষ করে বিদায় হোন।

সওয়াল-জবাবে দেখা গেল মকবুল সাহেব তার জীবনে ভালো কাজ কিছুই করে নি। সবই খারাপ কাজ। নিয়মিত ঘুষ খেয়েছে। অন্যের জমির দলিল জালিয়াতি করে নিজের সম্পত্তি বাড়িয়েছে। শেষ বয়সে রাজনীতি করে দেশের সম্পদ পাচার করেছে। বাম কাঁধের নকির লিখতে লিখতে হাঁপিয়ে গেল। অন্যদিকে মনকির গালে হাত দিয়ে চিন্তিত মুখে বসে আছে!

—কী মনকির তুমি তো হাসিমুখে বসে থাকবে, মুখ গোমড়া করে বসে আছ যে? নকির প্রশ্ন না করে পারে না। 'কিছুই লিখতে হল না খাতায় তোমার'।

—এটা নিয়েই চিন্তায় আছি।

চিন্তিত মুখে বলে মনকির। 'এরকম চলতে থাকলে আমার চাকরি চলে যাবে। ভালো খাতায় লেখার কিছু না থাকলে খামাখা খামাখা লোক রাখবে কেন বল?'

—তা অবশ্য। নকির মকবুলের নারীঘটিত কেলেঙ্কারির কুকর্মগুলো লিখতে লিখতে বলে—

—আচ্ছা তোমরা মানুষরা পৃথিবীতে ভালো কাজ কিছু কর না কেন?

প্রশ্নটা মনকির মকবুলকে না করে পারে না। মকবুল যেন কিঞ্চিৎ লজ্জা পায় পৃথিবীতে কুকর্মগুলো করার সময় কাউকে জবাবদিহি করতে হয় নি। এখন মরার পর করতে হচ্ছে। আমতা-আমতা করছে মকবুল...

—আসলে... সত্যি কথা বলতে কী ... মানে আশপাশে সবাই খারাপ আমি একা ভালো হয়ে... মানে...


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—একা ভালো থাকতে সমস্যা কী? পৃথিবীতে বহু মানুষ একা ভালো থেকে গেছেন।... আমার ভালো থাকার আগের তলিটমগুলো দেখলেই বুঝবে...

—আহ্ একটু চুপ কর তো... এই হারামজাদার খারাপ কাজের লিস্ট তো লিখে শেষ করতে পারছি না। শুয়োরের বাচ্চা তো দেখছি পৃথিবীটাকে নরক বানিয়ে রেখে এসেছে!

মকবুলের কান দুটো লাল হয়ে গেল। এরকম প্রকাশ্যে সে অন্যদের অজস্র গালি দিয়েছে কিন্তু তাকে কেউ কখনো দিতে সাহস পায় নি।

—দেখুন মুখ খারাপ করবেন না। মকবুল না বলে পারে না।

—চোপ শালা আবার কথা বলে!

—নকির, তুমি কাজটা ঠিক করছ না। মৃত লোককে গালাগালি করার রাইট তোমার নেই। এটা সংবিধানবহির্ভূত।

—আরে রাখ... এই শালার বদ পাবলিকদের খারাপ কাজের লিস্ট করতে করতে আমার ডান হাতটা লুলা হওয়ার জোগাড়... সব সময় টনটন করে, ইচ্ছে করে শালাকে ধরে আচ্ছামতো প্যাঁদাই...!!

—ছি ছি এই প্যাঁদানোর কাজটা তুমি করতে যাবে কেন? ওর জন্য নরকের লোকজন আছে কী করতে?

—আর এ শালা যেরকম বদ দেখছি। দেখবেন নরকে গিয়েও শালা ঠিক ম্যানেজ করে ফেলবে!

—মানে?

—মানে নরকের লোকদের হাত করে ফেলবে আর কি!

—কী বলছ নরকে এসব হয় নাকি?

—হয় মানে এসবই তো হচ্ছে! আজকাল নরক কি আর নরক আছে? বেহেশত হয়ে উঠছে।

নরকে গিয়ে মকবুল প্রথমে যে কাজটি করল সেটা হচ্ছে নকিরের বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারি মামলা করল। এখানে আর যাই হোক উকিলের অভাব নেই। আশা করছে সে ঐ নকির ব্যাটাকে দিন কয়েকের জন্য হলেও জেলের ভাত খাওয়াতে পারবে।

### সোলায়মান সাহেবের মোবাইল ফোন

বৃদ্ধ সোলায়মান সাহেব এ পৃথিবীতে যে তিনটা জিনিস তার ছানি পড়া দু চোখে দেখতে পারেন না তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে মোবাইল ফোন, দুই নম্বর হচ্ছে মোবাইল ফোন এবং তিন নম্বরও মোবাইল ফোন। এই মোবাইল ফোন আসায় এ জাতির যে খুব তড়িঘড়ি উন্নতি হয়েছে তিনি তা মোটেই বিশ্বাস করেন না। মোবাইল ফোন যখন ছিল না তখন কি এ জাতির চলে নি? তিনি খেয়াল করে দেখেছেন ইদানীং বাসে উঠলে কোথাও একটু নিরিবিলি বসে গন্তব্যে যাবেন তা নয়... প্রায় প্রত্যেক যাত্রীর হাতে মোবাইল, কারোটা টুট টুট... কারোটা পিপ পিপ কত রকম আওয়াজ আর কত রকম কথাবার্তা! মানুষের যত ব্যক্তিগত কথাবার্তা এখন বাসে বসে শুনতে হয়। আসলে মোবাইল ফোন আসায় লাভ হয়েছে তিনটা শ্রেণীর। এক, সন্ত্রাসীদের... দুই, তরুণ-তরুণীদের... আর তিন, মোবাইল ফোনের ব্যবসায় নেমেছে যারা তাদের।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—খালু কার্ডটা একটু ভইরা দেন তো।

আচমকা রহিমার মার গলা শুনে চমকে ওঠেন খালু, মানে সোলায়মান সাহেব। রহিমার মা তার বাসার ঠিকা ঝি। আপাতত স্ত্রী নেই তাই খালি বাসায় এসে দুই বেলা রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়।

—তুমি আবার মোবাইল কিনলে কবে?

—ক্যা? গত মাসেই তো কিনছি... ডিজুসের প্যাকেজ।

—না আমি এসব ভরতে জানি না... যাদের থেকে কিনেছ তাদের থেকে ভরে নাওগে... আর তোমার মোবাইল ফোন কেনার কী দরকারটা পড়ল শুনি?

—কী কন? গরিব বইলা কী আমাগো সাধ আল্লাদ নাই? ... এইখানে ঐখানে কত জায়গায় খোঁজখবর লইতে হয়!

ডিজুসের নব্য গ্রাহক রহিমার মাকে বিদায় দিয়ে পুনরায় ভাবতে বসেন সোলায়মান সাহেব। তিনি ঠিক করেছেন এই দেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের মধ্যে ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জন মোবাইল ফোন কিনলেও তিনি কিনবেন না। নো নেভার...! মোবাইলে তার অ্যালার্জি আছে। মোবাইলের রিং শুনলেই তার গা কেমন চাকা চাকা লাল হয়ে ফুলে ওঠে। এটা অবশ্য তার ব্যক্তিগত ধারণা।

আজ তিনি আগে আগে শুয়ে পড়লেন। শরীরে জুত পাচ্ছেন না। আগে রাতে বসে বসে টিভি দেখতেন এখন তাও দেখা ছেড়ে দিয়েছেন।

মোবাইলের বিজ্ঞাপন দেখতে হবে বলে টিভি দেখেন না। এই তো সেদিন রিকশায় করে কোথায় যাচ্ছিলেন; ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল বলে রিকশাওয়ালা পায়ের কাছে প্লাস্টিকের পর্দা বিছিয়ে দিল। পর্দাটি অদ্ভুত! বাঘের ছাল যেন একটা।

—এ প্লাস্টিক কই পেলে? সোলায়মান সাহেব রিকশাওয়ালার কাছে জানতে চান।

—ক্যান মোবাইলওয়ালারা দিছে... আমার আগের ছিঁড়া পর্দাডা লয়া এইডা ফ্রি দিছে... জিনিস ভালো।

—দাঁড়াও দাঁড়াও।

—কী হইল যাইবেন না?

—না এই নাও ভাড়া... হতভম্ব রিকশাওয়ালাকে গন্তব্যে না গিয়েও ভাড়া দিয়ে নেমে পড়লেন তিনি। চোখ বন্ধ হয়ে আসে সোলায়মান সাহেবের। রাত কত হয়েছে কে জানে ঠিক এ সময় মোবাইল ফোনের রিরিংংংং... শব্দে জেগে ওঠেন তিনি। মোবাইল ফোন বাজল মনে হচ্ছে এ ঘরে? তিনি একা থাকেন। এখানে মানে এ ঘরে কোনো মোবাইল ফোন থাকার তো কথা না। আর ঠিক তখনই তার নজরে গেল কে যেন তারই ঘরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে মোবাইলে কথা বলছে...।

—আরে ধুর কামের মধ্যে ডিস্টার্ব... হ আমি এক বাড়িত চুরি করতে ঢুকছি...কী কবি ক... আচ্ছা... রাখলাম... পরে কথা কমুনে!

সোলায়মান সাহেব দেখলেন লোকটি মানে চোরটি মোবাইলটা পকেটে রেখে তার দিকে ফিরল।

—মুরুব্বি কি জাইগা গেছেন? না জাগলে ঘুমান... মোবাইল নিয়া সাধারণত চুরিতে বাইর হই না, আইজকা মিসটেক হয়া গেছে...

'খারান ভাইব্রেটে দিয়া রাখি' বলে সে ফের পকেট থেকে মোবাইল বের করে কী সব টিপাটিপি করল, বোধ হয় ভাইব্রেট অপশনে গেল। এবার সোলায়মান সাহেব কথা বললেন—



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তুমি কি আমার বাসায় চুরি করতে ঢুকেছ?

—জি মুরুব্বি। সামনে ঈদ বোঝেনই তো... নতুন বিয়া করছি বউডারে...

—বিরাট ভুল করছ।

—কী ভুল করছি বিয়া কইরা না আপনার বাসায় চুরি করতে ঢুইকা?

—দুইটাই।

—না ভুল কইলেন। বউডা আমার ভালো... তবে মানে আপনের বাসায় ঢুইকা বোধ হয় বিরাট মিসটেক করলাম... নেওয়ার মতো কিছুই তো দেখতাছি না... টিভিটা তো বোধহয় নষ্ট? আমরা আগে খোঁজ নিছি টিভি দেখেন না যখন... সোলায়মান সাহেব মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন। টিভি না দেখার জন্য।

—কোনো মোবাইল সেটও তো দেখতাছি না।

—আমি মোবাইল ব্যবহার করি না।

—ঠিক আছে আলমারির চাবিটা দেন।

—ঐটার চাবি আমার স্ত্রী যে কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছে আমিও জানি না। খুঁজে পেলে খুলে তোমার যা নেওয়ার নিয়ে চাবিটা আমাকে দিয়ে যেও বাপ। অবশ্য আমার বিশ্বাস ওর ভিতরে নেওয়ার মতো কিছু নাইও।

—জেমস ক্লিপ আছে? চোর জানতে চায়।

—জেমস ক্লিপ দিয়ে কী হবে?

—থাকলে দেন দেখেন না কী করি...

—ঐ টেবিলের উপর থাকতে পারে। চোর টর্চ দিয়ে খুঁজে মনে হল পেল একটা জেমস ক্লিপ। ক্লিপটাকে হাতে নিয়ে টেনে সোজা করে লম্বা তারের মতো বানাল, সেটাকে বিশেষ কায়দায় বাঁকাল, তারপর আলমারির কী হোলে ঢুকিয়ে খোঁচাখুঁচি করে...কী আশ্চর্য কুট করে খুলে ফেলল। তারপর টর্চ জ্বালিয়ে... ভিতরে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে চোর একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল!

—কী হল?

—হইব আর কি আপনের বাড়িত ঢুইকা দিনডাই আমার মাডি... আলমারির ভিতরে তো খালি লেপ-তোশক ঢুকাইয়া রাখছেন।

—আগেই বলেছিলাম তোমাকে।

—ফ্রিজও তো নাই। কিছু খায়া যে পেটটারে ঠাণ্ডা কইরা বাইর হমু... অবশ্য আপনের যে অবস্থা ফ্রিজ থাকলেও যে ভিতরে কিছু থাকত তার বিশ্বাস কী?... নেন ধরেন...

—কী?

—ঐ যে চাবি চাইলেন... চাবি পাই নাই জেমস ক্লিপটাই রাইখা দেন কী হোলে ঢুকায়া ডাইনে দুইবার বাঁয়ে একবার খোঁচা মারবেন... খুইলা যাইব। সোলায়মান সাহেব আগ্রহ নিয়ে জেমস ক্লিপটা নিলেন।

দেন আঙ্কেল ৩০০টা টাকা দেন যাইগা... চোরের এবারের কথায় অবাক হন সোলায়মান সাহেব।

—তিনশ টাকা কেন?

—আরে কয়েন না আপনার এই বাড়িতে ঢুকার আগে অন্তত ৫০টা ফোন করতে হইছে বাড়ি খুঁইজ্জা পাই না, তাই তো কার্ড শেষ... একটা কার্ড ভরতে হইব।

—নো নেভার।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—দেখেন মুরুব্বি আপনি বুড়া মানুষ... কিছু বললাম না। ঝামেলা কইরেন না, যা চাইছি দিয়া দেন। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে বাড়ি দিয়া মাথার ঘিলু বাইর কইরা ফেলতাম।

—দেখো বাপু মোবাইল ফোনের ব্যাপারে আমার যথেষ্ট অ্যালার্জি আছে... এ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কেউ আমার কাছে টাকা চাইলে আমি নাচার... তুমি বরং বাড়ি দিয়া আমার ঘিলুডা বের করে দিয়ে যাও! অবশ্য ভিতরে ঘিলু আছে কি না তাই বা কে জানে... ছোটবেলায় আমার বাবা তো সব সময় বলতেন নাই...

—তাইলে ট্যাকা দিবেন না?

—না।

—বুঝছি।

—কী বুঝছ?

—বুঝছি আপনের বউ আপনের লগে থাকে না ক্যান... এই রকম কাইষ্ঠা লোকের... এ সময় রিরিংংং করে ফের বেজে উঠল চোরের মোবাইল সেটটা। চোর চট করে সেট অন করল।

—আবার কী হইল?...কী কইলি? পুলিশ রেইড দিছে? কাম সারছে... আচ্ছা... বলে সে ফোনটা অফ করল। চিন্তিত ভঙ্গিতে হাঁটল কিছুক্ষণ।

—কী হয়েছে? প্রশ্ন না করে পারেন না, সোলায়মান সাহেব।

—আমি আপনের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকছি, পাশের বাড়িতে আমার বন্ধুরা ঢুকছে ডাকাতি করতে... কিন্তু ঐ বাড়ি পুলিশে রেইড দিছে... অবশ্য মনে হয় না ধরতে পারব... ওগো হাতে ভালো অস্ত্র আছে... শুনেন মুরুব্বি ঠিক আছে যান ৩০০ টাকা লাগব না। ধরেন এই মোবাইলডা রাখেন...

—আমি তোমার মোবাইল রাখব ক্যান?

—চারদিকে পুলিশে রেইড দিচ্ছে... আমিও পলাইতাছি। যদি পলাইতে পারি তো পলাইলাম। ধরা খাইলে আমার বউরে ফোন কইরা কয়া দিবেন আমি ধরা খাইছি।... এই যে নাম্বার... বউয়ের নাম লাকি...

—কিন্তু তুমি...

বাকিটা শেষ করতে পারলেন না সোলায়মান সাহেব। চোর আচমকা বিদ্যুৎ গতিতে পালিয়ে গেল।

পরদিন ভোরে খবর পাওয়া গেল। পাশের বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতি হয়েছে। পুলিশ রেইড দিয়েও ধরতে পারে নি। তবে এক ছিঁচকে দাগি চোর ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে।

সোলায়মান সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। চোরের বউকে এই খবরটা এখন তাকেই দিতে হবে। কীভাবে দেবেন। তিনি চোরের বউ লাকির নাম্বারে ফোন করলেন।

ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল 'আপনার অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা নেই... রিচার্জ করুন...

সোলায়মান সাহেব ছুটলেন কার্ড কিনতে। ৩০০ টাকার কার্ড নেই বাধ্য হয়ে ৬০০ টাকার কার্ড কিনলেন। ভরলেনও বহু কষ্টে। তারপর ফোন করলেন চোরের বউকে। চোরের মার বড় গলা। কিন্তু চোরের বউয়ের গলা দেখা গেল ছোট। প্রায় ফিসফিস করে বলল,

—কে বলছেন?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তুমি কি লাকি?

—জি, আপনি কে?

—আমি কেউ না, একটা খারাপ খবর দিতে ফোন করেছি...

—বুঝেছি, ও পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে?

—হ্যাঁ।

ওপাশে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দের মতো শুনলেন যেন সোলায়মান সাহেব অবশ্য তার ভুলও হতে পারে। মেয়েটি ফিসফিস করে বলল 'জানেন ওর আর আমার বিয়েটা আমার মা-বাবা মেনে নেন নি, ক'দিন আগে মেনে নিয়েছিলেন। ও কথাও দিয়েছিল চুরি ছেড়ে দেবে। কথা ছিল ওকে নিয়ে ঈদের আগে বাবা-মার বাসায় যাব। মানে ও যাবে শ্বশুরবাড়ি...ঈদের আগে সেই শ্বশুরবাড়িই গেল... তবে...!

—মা শোন এই ফোনটা তোমার স্বামীর...

—আমি জানি... ঐ ফোনটা থেকে ভালো কোনো খবর কিছু আসে না... ওটা আপনার কাছেই থাক। যদি কখনো ও ফিরে আসে আপনাকে খবর দেব। লাইন কেটে গেল। বিমূঢ় হয়ে মোবাইল ফোন হাতে বসে রইলেন সোলায়মান সাহেব।

মোবাইলবিদ্বেষী সোলায়মান সাহেবের হাতে এখন সব সময় মোবাইল ফোন দেখা যায়। তিনি কার্ড ভরে ভরে অপেক্ষায় থাকেন কবে একটি কল আসবে।

**হ্যাঙ্গিং লাভার ডটকম**

ঠিক ছ'টা বত্রিশে পাশা চব্বিশ তলা অ্যাপার্টমেন্টের নিচে এসে একটা ফোন দিল পিয়াকে। ওপাশে ফোন ধরতেই কম্পিত গলায় পাশা বলল—

—হ্যালো পিয়া, আমি এসেছি...

—চলে এস।

—ক' তলায়?

—২০ তলায় ডানদিক, ফ্ল্যাট নাম্বার 'টি-ওয়ান'।

—আচ্ছা আসছি।

লিফটে উঠে বুকটা ধকধক করতে লাগল পাশার। সে যাচ্ছে তার প্রেমিকার বাসায় ফ্ল্যাট নাম্বার 'টি-ওয়ান'। প্রেমিকা বাসায় একা। প্রেমিকা বিবাহিত। প্রেমিকার স্বামী এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। আজ তার নাইট ডিউটি বাসায় আসবে না। এই সুযোগ! পিয়াই তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সাঁই সাঁই করে লিফটে উপরের দিকে উঠছে। টানা উঠে এসে খট করে থামল ১৯ তলায়। নেমে পড়ল পাশা। ডানদিকে ঘুরেই দেখে ফ্ল্যাট নাম্বার 'টি-ওয়ান'। কলবেল টিপল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। দরজায় পিয়া দাঁড়িয়ে। ধকধক বুকটা আগেই করছিল, এবার ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। পিয়া কেমন এক চোখে তাকাল তারপর হাসল। হাত বাড়িয়ে পাশার শার্টের আস্তিন খামছে ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে যে কাজটা করল সে কাজটা সচরাচর ছেলেরাই জোর করে করে। অবশ্য পিয়া সব সময় বলত 'আমি অত ঠাণ্ডা টাইপের মেয়ে না।' পাশাও খেয়াল করেছে, অসম্ভব ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে পিয়া। আর পাশা ঠিক তার উল্টো, সবকিছুতে তার ভয়। যেমন—এখন তার ভয় হচ্ছে যদি পিয়ার স্বামী এসে পড়ে?

—তোমার হাজব্যান্ড এসে পড়বে না তো?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আহ বললাম তো ওর আজ নাইট ডিউটি, আসবে না। তবে তোমাকে কিন্তু ঠিক ভোর ছ'টায় বেব হয়ে যেতে হবে। ও আসবে ঠিক সাতটায়।

—কিন্তু আমি... কথা শেষ করতে পারে না। সাঁড়াশির মতো ধরে পিয়া দ্বিতীয় দফায় তার ঠোঁট জোড়া গোল করে নামিয়ে আনে পাশার ঠোঁটে। পাশার যেন দম আটকে আসে। তার হালকা অ্যাজমার টান আছে, শেষমেশ দম আটকে না মারা পড়ে। ঠিক তখনই দরজার ওপাশ থেকে কলিংবেল বেজে উঠল, একসঙ্গে আঁতকে উঠল দু জন। এ সময় তো কারো আসার কথা না। পিয়া কী হোলে চোখ দিয়ে প্রচণ্ড ভীত চোখে তাকাল পাশাব দিকে। পাশাকে টেনে নিয়ে এল বেডরুমের পাশের একটা জানালার কাছে, তারপর ফিসফিস করে বলল—

এরকমটা হওয়ার কথা না। ও চলে এসেছে...। তুমি এক কাজ কর, ততক্ষণে জানালা খুলে নিচের দিকে তাকাল পিয়া। তারপর ফের বলল, 'শোন ডার্লিং, তুমি জানালার নিচে ওই যে সানশেড দেখতে পাচ্ছ ওটায় ঝুলে থাক পারবে না কিছুক্ষণ? ... আমি এদিকে ম্যানেজ করছি, যেভাবেই হোক, ওকে বিদায় করে তোমাকে ডাকব... ততক্ষণ তোমাকে একটু কষ্ট করে ঝুলে থাকতে হবে... প্লিজ ডার্লিং আমার জন্য এ কষ্টটুকু কর... এ ছাড়া লুকানোর আর কোনো বুদ্ধি নেই... বলে এক রকম ঠেলে জানালা দিয়ে বের করে দেয় পাশাকে। পাশার তখন কলিজা উড়ে গেছে... পারলে সে জানালা দিয়ে লাফ দেয়। সে দেরি করে না, দ্রুত জানালার নিচে সানশেডে ঝুলে পড়ে দু হাতে। ঝুলতে ঝুলতে একবার নিচে তাকাল... জান উড়ে গেল তার। পিঁপড়ের মতো মানুষ-গাড়িঘোড়া চলছে। ঝুলতে থাকল পাশা, উপরে পিয়া জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিয়েছে। পাশার সামনেই আরেকটি জানালা সেখানেও পর্দা টেনে দেয়া। পাশা ঝুলতে থাকল... সারা রাত ঝুলল... উপরে পিয়া জানালা খুলল না, ভোর হল। দুএকটা কাক এসে একটু ডিস্টার্ব করল তাকে। সে হুসহাস করে উড়িয়ে দিল। সারা দিন ঝুলল... জানালা খুলল না। পাশা ঝুলতে থাকল... পাশা ঝুলতে থাকল... ঝুলতে থাকল...

এভাবে টানা পঁচিশ বছর ঝুলল পাশা। বাই দিস টাইম সে বিখ্যাত হয়ে গেছে। পরকীয়া প্রেমের এরকম বিরল দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। গিনেস বুক অব রেকর্ডে তার নাম উঠে গেছে। দেশের চ্যানেলগুলোতে তাকে প্রায়ই ঝুলন্ত অবস্থায় ইন্টারভ্যু দিতে দেখা যায়। এই তো সেদিন ইউটিভি থেকে এক ভি. জে. এসেছিল নিচের জানালা খুলে তার ইন্টারভ্যু নিল—

—স্যার আপনি কত বছর ধরে ঝুলছেন?

—হবে বিশ-পঁচিশ বছর।

—কিন্তু কেন?

—উফ এক প্রশ্নের উত্তর কয়বার দিব?

—প্লিজ স্যার আমাদের ইউটিভি একটি নতুন স্যাটেলাইট চ্যানেল... এ চ্যানেলে আপনি প্রথম সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন... দর্শক আপনাকে চায়। আপনি কি জানেন আপনি এখন কত ফেমাস। আপনার নামে দেশে-বিদেশে দু শ ছত্রিশটা ফ্যান ক্লাব আছে, আপনার নামে ওয়েবসাইট আছে প্রায় এক শ ত্রিশটা, তার মধ্যে 'হ্যাঙ্গিং লাভার ডটকম'টা তো অসাধারণ। ওই ওয়েবসাইটটা শুনেছি ১০০ মিলিয়ন ডলারে একজন কিনে নিয়েছে। আর দেশের পর্যটনশিল্প তো আপনার নামেই উঠে গেল। নেপাল, ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এখন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর কেউ যায় না, সবাই বাংলাদেশে ছুটছে... আপনাকে দেখতে প্রতিদিন ফরেনাররা আসছে, ওই যে নিচে তাকিয়ে দেখুন কত লোক দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে আপনাকে দেখছে। নিচে সরকার একটা স্টেডিয়ামের মতো করবে বলে শোনা যাচ্ছে। অলরেডি সংসদে বিল পাস হয়ে গেছে, এখন টেন্ডার নিয়ে চাঁদাবাজি চলছে... সরকারি দল আর বিরোধী দলে... বেশ বড় কাজ। প্লিজ বলুন...

পাশা তখন উপরের বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে বলে পিয়ার কথা, একদিন পিয়া জানালা খুলে বলবে 'ডার্লিং চলে এস, ও চলে গেছে... জলদি উঠে আস'... সেই অপেক্ষায় আজ দুই যুগ ধরে ঝুলছে পাশা। অবশ্য পাশাকে গত পঁচিশ বছরে কেউ কেউ জানিয়েছে, পিয়া বা পিয়ার স্বামী বলে ফ্ল্যাট নাম্বার 'টি-ওয়ান'-এ এখন আর কেউ থাকে না। কিন্তু পাশা বিশ্বাস করে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস পিয়া ওখানেই আছে। কোনো কারণে সে জানালা খুলে ডাকতে পারছে না। একদিন নিশ্চয়ই ডাকবে, ডাকবেই... এভাবে আরো পঁচিশ বছর ঝুলল পাশা... সানশেডের উপর মাঝে মধ্যে একটা-দুটো কাক এসে বসে... কখনো বা কবুতর এসে বসে... তারা এখন আর পাশাকে ভয় পায় না। পাশের সানশেড থেকে একটা বিড়ালও আসে... মাঝে মধ্যে সামনের ঝুলন্ত জানালা খুলে তাকে চা-নাশতা দেয়া হয়... পাশা খায় আবার কখনো খায় না। সে যেন এই চব্বিশ তলা ভবনের সানশেডের মতোই একটা জরুরি জ'র অংশ হয়ে গেছে... একদিন একটা বাদুড় এসে তার পাশে ঝুলে রইল... বাদুড়টার সঙ্গে কথা হল, 'তুমি তা হলে বহু বছর ধরে এই কার্নিশে ঝুলছ'।

—হুম।

—আমার মনে হয় তোমার ঝোলাটা ভুল হচ্ছে।

—মানে?

—মানে আমার মতো করে ঝুললে দেখতে পৃথিবীটা সঠিক চলছে।

—তুমি তো উল্টো হয়ে ঝুলছ।

—সেজন্যই বলছি...

আমি তো এ পৃথিবীটা কেমন চলছে সেটা বোঝার জন্য ঝুলছি না...

এরও অনেক দিন পর... হঠাৎ এক সকালে। কত বছর পর কে জানে... কাঁচা কুসুমের মতো এক খণ্ড রোদ এসে স্পর্শ করেছিল পাশার কাঁধে, আরাম লাগছিল তার... সময়টা শীতকাল বলেই হয়তো... আর ঠিক তখনই... জানালায় শব্দ হল... ধক করে উঠল বুকটা পাশার, আর তখনই হুট করে খুলে গেল জানালাটা... এক খুনখুনে বুড়িকে দেখা গেল। পাশা চিনতে পারল না। বুড়ি মাথা ঝুঁকিয়ে বলল।

—প্রিয়ে চিনতে পারছ না? আমি তোমার পিয়া।

—পিয়া?

—হ্যাঁগো... অনেক কষ্ট দিলাম তোমায়, এবার উঠে এস... ও মারা গেছে...

—কিন্তু...

—কোনো কিন্তু না, চলে আস ডার্লিং... আমাদের মিলনে আর বাধা দেয়ার কেউ নেই। তোমার আমার ভালবাসার পরীক্ষা এখন পৃথিবীর এক নম্বর বিষয়... এই দেখ তাকিয়ে, নিচে কত হাজার হাজার টিভি চ্যানেল ক্যামেরা তাক করে আছে... এ যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনাকে ক্যামেরাবন্দি করতে... প্রিয়ার ভালবাসা এমনই এক শক্তি...


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ পৃথিবীতে ভালবাসার চেয়ে বড় শক্তি আছে।

— কী রকম?

অভ্যাস... অভ্যাসের চেয়ে বড় শক্তি আর কী আছে বল? আমি ৫০ বছর ধরে এই সানশেডে ঝুলে ঝুলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর উঠে আসতে পারছি না...

— বেশ তবে ঝুলেই থাক... আমি চলে আসছি।

— মানে?

— মানে সোজা, এখন থেকে তুমি আর আমি একসঙ্গে কার্নিশে ঝুলব...

কারণ আমার কাছে ভালবাসাই পৃথিবীর এক নম্বর শক্তি। অভ্যেসটাকেও মানুষ কখনো কখনো ভালবেসে ফেলে বলে সেটা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়... সেটা আসলে আসল শক্তি... নয়... আসল শক্তি...

—'ভালবাসা!' বিড়বিড় করে বলে পাশা।

—ঠিক ধরেছ! পাশার পাশে কার্নিশ ধরে ঝুলতে ঝুলতে বলে পিয়া।

তারপর পৃথিবীর হাজার হাজার ক্যামেরা অবাক বিস্ময়ে দেখল দুই বৃদ্ধ নর-নারী কার্নিশে ঝুলছে... আহ ভালবাসার কী ব্যাকুল পরাকাষ্ঠা...এই বিস্তীর্ণ মহাবিশ্বে লক্ষ-কোটি অযুত-নিযুত, গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে ঝুলে আছে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র সূর্য... তাকে কেন্দ্র করে ঝুলে আছে পৃথিবী... আর সেই পৃথিবীর এক প্রাচীন অ্যাপার্টমেন্টের কার্নিশে ঝুলে আছে একজোড়া মানব-মানবী... তারা তখন পতাকার মতো উড়ছে বাতাসে... উড়ছেই...!

## চেরাগ বিষয়ক জটিলতা

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বদরুল আলম, একজন সরকারি চাকুরে। আজ হেঁটেই যাচ্ছিল। অফিসের বাস নষ্ট। কোনো সিএনজিই মিরপুরে যাবে না। আর রিকশাওয়ালাদের তেল তো মনে হচ্ছে চুয়ে চুয়ে পড়ছে, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করলে মুখ ফিরিয়েও দেখে না। তাই ইলেভেন সেপ্টেম্বরই ভরসা। মাসটাও যে সেপ্টেম্বর পড়েছে।

হঠাৎ দেখে রাস্তার ধারে ফুটপাতের ওপর ময়লার মধ্যে একটা চেরাগ পড়ে আছে। সে বুঝতে পারল এটা কোনো জিনের চেরাগ হবে। ঘষা দিলেই জিন বের হয়ে আসবে। বলবে, 'হুকুম করুন মালিক... ইত্যাদি ইত্যাদি'। মোস্ট বোরিং। জিন-ভূতে বদরুল আলমের কিঞ্চিৎ অ্যালার্জি আছে। একবার তাদের গ্রামের বাড়ির তেঁতুলগাছে একটা পেতনি ভর করেছিল। সেটা দেখতে গিয়ে দু হাতের তালুতে চাকা চাকা হয়ে ফুলে গেল। সবাই বলে, হাতের তালু চুলকালে নাকি টাকা আসে। কোথায় কী! উল্টা দুই হাতের তালুতে ঘায়ের মতো হয়ে গেল। গুচ্ছের টাকা খরচ করে স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে দৌড়াতে হয়েছে মাসখানেক। তারপর কোনোমতে রক্ষা পায় সেবার। তারপরও কী মনে করে বদরুল আলম ওরফে ঝিকু সাবধানে চেরাগটা উঠিয়ে নিল, তবে ঘষা দিল না।

বাসায় এসে চেরাগটা রেখে দিল টেবিলের ওপর। তারপর একটা ঘুম দিল। আজ বড্ড পরিশ্রম গেছে অফিসে। দু দিন ছুটি হয়ে হয়েছে আরেক ঝামেলা। আগে অফিসে দিনে ঘুমাত ছয় দিন। বাসায় এক দিন। এখন অফিসে দিনে পাঁচ দিন ঘুমাতে হয় বলে সপ্তাহের বাকি দুই দিন বাসায় ঘুমটা ঠিকমতো হচ্ছে না। মানে নতুন সিস্টেমে শরীরটা ঠিক অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। তবে আজ কী হল, শোয়ামাত্রই ঘুম। স্ত্রী গেছে বাপের বাড়ি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সপ্তাহখানেকের জন্য... কানের কাছে 'নাই নাই' বলারও কেউ নাই। নিশ্চিন্তে নাক ডাকতে লাগল বদরুল আলম।

রাত তিনটার দিকে ঠকঠক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বদরুলের। 'ব্যাপার কী! এত রাতে কে এল?' উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে কেউ নেই, কিন্তু ঠকঠক শব্দ হচ্ছেই। সারা বাড়ি খুঁজেও শব্দের উৎস যখন খুঁজে পেল না তখন হঠাৎ নজর পড়ল টেবিলের ওপর। শব্দটা আসছে চেরাগ থেকে। মানে চেরাগের ভেতর থেকে।

চেরাগ হাতে নিয়ে কানের কাছে ধরল। ঠিক যা ভেবেছে তাই, শব্দটা চেরাগের ভেতর থেকেই আসছে। কেউ যেন চেরাগটার ভেতর থেকে টোকা দিচ্ছে ঠক ঠক ঠক...

—কে? চেরাগটার দিকে তাকিয়ে চেঁচাল বদরুল।

—মালিক আমি! অবাক হয় বদরুল। তারপর বলে, 'তুমি কে?'

—আমি এই চেরাগের ভিতরে আছি, মালিক।

—ও জিন?

—জি মালিক... আপনি চেরাগে ঘষা দিচ্ছেন না কেন? তা হলেই তো আমি বেরিয়ে এসে আপনাকে দুটা বর দিতে পারি।

—আমার বরের দরকার নেই।

—কী বলছেন মালিক? আপনি কি নেশা করছেন? কী সব উল্টাপাল্টা বলছেন? দুটা বরে আপনি যা চাইবেন সব পাবেন।

—নারে ভাই, আমার অন্য সমস্যা আছে।

—কী সমস্যা?

—জিন-ভূতে আমার অ্যালার্জি আছে। একবার গ্রামের বাড়িতে পেতনি দেখতে গিয়ে দু হাতের তালুতে একজিমার মতো হয়ে গিয়েছিল। বহু টাকা গেছে স্কিন স্পেশালিস্টের পেছনে। আর আমাদের দেশের স্কিন স্পেশালিস্ট মানে তো বোঝেন.. বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, আর স্কিন স্পেশালিস্ট ছুঁলে ছত্রিশ ঘা...

—কিন্তু মালিক, আপনি ঘষা না দিলে তো আমার মুক্তি নেই। বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে জিন।

—দেখ বাবা, খামাখা বাইরে আসবে কেন? দেশের অবস্থা ভালো না। শুধু দেশ কেন, সারা পৃথিবীতে যা শুরু হয়েছে... মৌলবাদী... বোমাবাজি... ভূমিকম্প... সাইক্লোন-বন্যা...সুনামি...বরং ওই চেরাগের ভেতর আছ ওখানেই থাক না কেন। আমি বরং আলমারিতে সুন্দর করে চেরাগটা তুলে রাখি?

—না মালিক... এটাকে কোনো থাকা বলে না... বদরুল আলম শুনতে পান, চেরাগের ভেতর জিনটি খুনখুন করে কাঁদছে! বড্ড মায়া লাগল বদরুল আলম ওরফে ঝিকুর।

—আচ্ছা হাতে না ঘষে পায়ে ঘষলে হবে?

—হবে, জলদি ঘষা দিন। কিন্তু অন্য জিনেরো যেন না জানে, তা হলে আমার মান-ইজ্জত যাবে, মালিক।

শেষমেশ পায়েই ঘষা দিল। মুহূর্তে ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেল। তারপর সেই অন্ধকার ধোঁয়া ভেদ করে জিনকে দেখা গেল। যথারীতি নিয়ম অনুযায়ী জিন একটা অট্টহাসি দিল। ভয়ে কলজে উড়ে গেল বদরুল আলমের! এখন যদি জিন তার গলা টিপে মেরে ফেলে। কিন্তু না জিন ভদ্রভাবে বলল—



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—হুকুম করুন মালিক। কী চাই আপনার?

—প্রথমেই একজন ভালো স্কিন স্পেশালিস্টের ঠিকানা, আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না।

মুহূর্তে দেশের বিখ্যাত স্কিন স্পেশালিস্টের ঘাড়ে ধরে তার সামনে হাজির করল জিন।

—ছি ছি, এ কী করেছ! এত রাতে ওনাকে নিয়ে এসেছ কেন? আমি খালি ওনার ঠিকানাটা চাচ্ছিলাম। ঠিক এ সময় বাইরের দরজায় ঠকঠক শব্দ। বদরুল বলল, আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথা বলি, তুমি চট করে দেখে এস তো কে এল। জিন চলে গেল দরজা খুলতে। এদিকে দেশের বিখ্যাত চর্ম ও ইয়ে...বিশেষজ্ঞের কাছে দুঃখ প্রকাশ করল বদরুল এত রাতে এভাবে তাকে আনার জন্য। ডাক্তার ভেতরে রাগে গিরগির করলেও মেনি বিড়ালের মতো মিনমিন করে বলল—'না না, ঠিক আছে... আপনার সমস্যা কী বলুন?' 'না না, এখনো কোনো সমস্যা হয় নি'... তখনই জিন ফিরে এল।

—কে এসেছে?

—মনে হয় আপনার বাড়িওয়ালা।

—এত রাতে কী চায়?

—সে এখন সব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে মালিক।

—মানে?

—মানে হঠাৎ করে আমাকে দেখে হার্ট অ্যাটাকে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছেন মনে হচ্ছে।

—কী বলছ তুমি? জলদি ওকে প্রাণে বাঁচাও।

—সেটা সম্ভব নয়। বর আপনার দুটো ছিল... দুটোই পালন করেছি।

—কোথায় দুটো পালন করেছ, একটামাত্র পালন করেছ... ডাক্তারকে এনেছ...

—না, ওই যে দরজা খুলতে বললেন... চলি মালিক...!! বলে জিন হুস করে উধাও হয়ে গেল।

তার পরের ইতিহাস মর্মান্তিক! বাড়িওয়ালার রহস্যময় মৃত্যুতে বদরুল আলম ওরফে ঝিকুকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল র‍্যাব। ক্রসফায়ারে ফেলবে কি না কে জানে। আর দেশবিখ্যাত স্কিন স্পেশালিস্টও একটা মামলা করলেন বদরুলের বিরুদ্ধে, মানহানির মামলা, মধ্যরাতে তাকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার জন্য। বদরুল আলম এখন আপাতত জেলের ঘানি টানছে। কী হবে সামনে কে জানে? তবে সে জেলে বসে জাতির জন্য একটা সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ পাঠিয়েছে। সেটা এ রকম—

**'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :** জিন আছে এমন চেরাগ হাতে নেবেন না, নিলেও হাতে-পায়ে ঘষা দেবেন না। বরং চেরাগ কটকটিওয়ালার কাছে বেচে কটকটি খান তাও ভালো।'

**ঝন্টু-মন্টু**

মন্টু?

—জি বাবা।

—তুই তা হলে বিয়ে করবি না?

—না।

—কথাটা ভেবে বলছিস তো?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—হুঁ।

—বেশ তা হলে আমি ঝন্টুর বিয়ের ব্যবস্থা করছি।

—কর।

—আরেকটা কথা, তোকে তোর রুমটা ছেড়ে দিতে হবে।

—মানে?

মানে আবার কী, ঝন্টু বিয়ে করে বউ নিয়ে উঠবে কোথায়? তোর ঘরটা বড় আছে, বউ নিয়ে ওখানেই উঠবে।

—তা হলে আমি কোথায় থাকব?

তুই কোথায় থাকবি সেটা তোর ব্যাপার। ব্যাচেলরের আবার থাকা নিয়ে সমস্যা নাকি? যেখানে রাইত সেখানে কাইত...

মন্টু মুখ অন্ধকার করে বাবার সামনে থেকে উঠে গেল। মন্টু পরিবারের বড় ছেলে। ঘোর নারীবিদ্বেষী, সে নারী জাতিকে দু চোখে দেখতে পারে না। তাই বিয়েও করবে না বলে ঠিক করেছে। এদিকে তার কারণে ছোট ভাই ঝন্টুর বিয়ে হচ্ছে না বলে ঝন্টু ঘোষণা দিয়েছে এক মাসের মধ্যে তার বিয়ের ব্যাপারে ফাইনাল ডিসিশনে না এলে এ বাড়ি ছেড়ে চাকরি ছেড়ে... না হিমালয়ের দিকে.. না, ওদিকটায় বড্ড ঠাণ্ডা, ঝন্টুর আবার বেশি ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। সে যাবে সাহারা মরুভূমির দিকে।

মন্টু নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আজ অফিস নেই, ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা দরকার। ঠিক ওই সময় দরজায় নক হল।

—কে?

—আমি ঝন্টু।

—কী চাই?

—ভাইয়া দরজাটা একটু খোল।

দরজা খুলল মন্টু। 'কী ব্যাপার?'

—ইয়ে ভাইয়া ঘরটা কবে ছাড়ছ?

—মানে?

—কেন বাবা কিছু বলে নি তোমাকে?

—বলেছে... কিন্তু এখনই কেন?

—না মানে আমি বাথরুমে তো নতুন টাইলস বসাব... ঘরের টুকটাক কাজ করতে হবে। ঘরটাকে যা বানিয়ে রেখেছ তাতে করে... শাপলাকে নিয়ে... ঢুকলে...

—শাপলাটা কে?

—শাপলাকে চিনলে না, এ পাড়াতেই তো থাকে। ওই যে তোমার ফ্রেন্ড মকাব ফোন-ফ্যাক্সের দোকানের পাশের বাড়িটাও তো ওদের।

—ও আচ্ছা। মন্টু প্রসঙ্গ এড়াতে চায়।

—ভাইয়া তা হলে কাল সকালেই তোমার সব জঞ্জাল সরাচ্ছ?

জঞ্জাল! মন্টুর ইচ্ছে হল কষে একটা চড় কষায় ঝন্টুর গালে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় কারণ সাইজে ঝন্টু মন্টুর চেয়েও বেশ লম্বা-চওড়া। দুষ্ট লোকরা বলে মন্টু আর ইঞ্চিখানেক শর্ট হলে আপসে ঢাকার যে কোনো চাইনিজ রেস্টুরেন্টের দারোয়ানের চাকরি পেয়ে যেত। যা হোক মন্টুর হাত ঝন্টুর গাল পর্যন্ত পৌঁছাবে না। বহু কষ্টে রাগ সামলাল মন্টু। 'এ নিয়ে তোর সঙ্গে পরে কথা বলব।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—পরে না, তুমি কাল ঘরটা ছেড়ে দাও। আমি মিস্ত্রিদের বলে দিয়েছি আসতে। বলে ঝন্টু খুব ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। মন্টু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার ঘরের দরজায়। হঠাৎ করে তার নিজের ঘরটাকে অসহ্য লাগতে লাগল মন্টুর। শার্ট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। মোড়ের কাছের মকার ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে গিয়ে একটু আড্ডা মারলে যদি মনটা ভালো হয়!

—কী রে গিটঠু অফিস নাই?

—না।

মন্টুকে মকা গিটঠু বলেই ডাকে। এতে সে মাইন্ড করে না। কারণ ছেলেবেলার বন্ধু। কিন্তু আজ ভীষণ মেজাজ খারাপ হল। কারণ একটা মেয়ে ফোনে কথা বলছে! তার সামনে এভাবে... অবশ্য মেয়েটা ফোন করা নিয়ে ব্যস্ত, হয়তো শোনে নি। মন্টু একটা চেয়ারে বসে কান খাড়া করে মেয়েটা কী বলছে শোনার চেষ্টা করে। যদিও এটা অনুচিত। তারপরও মকার ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে এলে সে এই ব্যাপারটা এনজয় করে। মেয়েটার গলাটা বেশ মিষ্টি।

—কী বললে?... তাই?... কিন্তু তোমার বড় ভাই তো শুনেছি পিছলা টাইপ ঘর ছাড়তে রাজি হল?...বাকি কথা আর কানে ঢুকল না মন্টুর... এ মেয়ে যে শাপলা তা বুঝতে মন্টুর শার্লক হোমস হওয়ার দরকার নেই। সে চট করে উঠে পড়ল।

—কীরে গিটঠু যাস নাকি?

—হুঁ।

হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে মন্টু তার জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল। তার বিয়ে না করার ধনুকভাঙা পণ সে আজ এই মুহূর্তে বাতিল করল। সে বিয়ে করবে এবং নিজের ঘরটা দখলে রাখার জন্য সম্ভব হলে এই মুহূর্তে বিয়ে করবে। কিন্তু কীভাবে? কাকে?

পার্কের একটা খালি বেঞ্চে বসে আছে মন্টু ঘণ্টাখানেক ধরে একা একা। এ সময় লম্বা একটা মেয়ে হেঁটে গেল তার পাশ দিয়ে। আড়চোখে মেয়েটিকে মাপল মন্টু। শুধু লম্বা বললে মেয়েটিকে অপমান করা হয়। এই মেয়ে কি বিবাহিত? অবশ্য এ মেয়ের যে হাইট বিখ্যাত বাস্কেট বল প্লেয়ার করিম আব্দুল জব্বার ওকে বিয়ে করলেই শুধু মানাবে...! ভাবতে ভাবতে মেয়েটির চলে যাওয়া দেখছিল মন্টু আর তখনই মেয়েটি ঝট করে ঘুরে ফের আসতে লাগল মন্টুর বেঞ্চের দিকে।

—তুমি গিটঠু না?

—ভয়ানকভবে চমকে উঠল মন্টু।

—আ আপনি?

—আমি দীপ্তি... মনে নেই?

—দীপ্তি? চট করে সব মনে পড়ে গেল, আরে তাই তো ছাত্রজীবনে তাদের ক্লাসের মিস পামট্রি... ওরফে দীপ্তি! দীপ্তি এত লম্বা হয়েছে। আগের চেয়েও লম্বা হয়েছে!

তারপর দু'জনের আলাপ জমতে বেশি সময় লাগল না।

—কিন্তু তুমি পার্কে একা একা কী করছ?

মন্টু জানতে চায়।

—সত্যি কথাটা বলব?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—বল।

—বাবা বলেছে আমাকে বিয়ে করতে হবে একটা বাঁটকু ছেলেকে। কারণ আমার সঙ্গে মানায় এমন লম্বা ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা বাঁটকু ছেলে নাকি রাজি হয়েছে পিএইচডি করে এসেছে, আরেক বাঁটকুর দেশ থেকে মানে জাপান থেকে...! আজ আসছে বাসায়... এনগেজমেন্ট হবে। তাই পালিয়ে এসেছি... অবশ্য ছেলে তোমার থেকে লম্বা। বলে খিলখিল করে হাসল দীপ্তি। এই প্রথম মন্টু মুগ্ধ হল। মেয়েটি এত সুন্দর করে হাসে!

—তা তোমার সমস্যা কী? তুমিইবা পার্কে একা একা কী করছ গিটঠু সাহেব? মাইন্ড করছ না তো আবার এত বছর পরে তোমাকে গিটঠু নামে ডাকছি বলে?... তোমার এই গিটঠু নাম কিন্তু আমারই দেয়া।

—মনে আছে। গম্ভীর হয়ে মন্টু বলে।

—তা তোমার সমস্যাটা কী?

—আমার সমস্যাটা একটু জটিল।

—কী রকম?

—আমি ঠিক করেছিলাম বিয়ে-টিয়ে করব না। বাসায় পরিষ্কার বলেও দিয়েছি। ছোট ভাইয়ের বিয়ের আয়োজন করছে বাবা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার ঘরটা নাকি ছেড়ে দিতে হবে তাকে... তাই ভাবছি...

—কী ভাবছ? দীপ্তি জানতে চায়।

—ভাবছি বিয়ে করব। অন্তত আমার ঘরটা রক্ষা করতে। তাই পার্কে বসে ভাবছিলাম। আর এই সময় তুমি...

—তুমি যদি আর ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হতে তা হলে অন্তত ভেবে দেখা যেত... ফের খিলখিল করে হেসে উঠল দীপ্তি। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল দীপ্তি। 'আমি চললাম, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমার পিএইচডি জামাই বিদেয় হয়েছে হীরের আংটি নিয়ে... এই মন্টু ফোন কোরো কিন্তু'।

মন্টু উঠে দাঁড়ায়।

—চল তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। আমার তো আসলে এখানে কোনো কাজ নেই।

—বেশ চল। তবে বাসায় ঢুকে আবার চা খেতে চাইবে না।

—না আমি চা-সিগারেট খাই না।

—গুড!

তারা একটা সবুজ সিএনজিতে উঠল।

তবে সিএনজিটা দীপ্তিদের বাসার দিকে গেল না। এদিক-ওদিক উল্টাপাল্টা ঘুরল কিছুক্ষণ। ১২ টাকা থেকে মিটার উঠল ১১২ টাকায়। তারপর ঘুরে গিয়ে থামল একটা বাড়ির সামনে। বাড়ির সদর দরজায় ছোট একটা সাইনবোর্ড তাতে লেখা 'কাজী অফিস'।

রাত সাড়ে দশটায় মন্টু এল। সঙ্গে দীপ্তি।

—বাবা আমি বিয়ে করেছি। এ দীপ্তি। দীপ্তি লাজুক মুখে মন্টুর বাবাকে সালাম করে দাঁড়িয়ে রইল। মা জীবিত নেই বলে সালাম করতে হল না।

বাবা তার জীবনে বহুবার হতভম্ব হয়েছেন। কিন্তু আজকের হতভম্ব ভাবটা দ্রুত কাটিয়ে উঠে দু হাত দু জনের মাথায় রেখে আশীর্বাদ করতে গেলেন। মন্টুর মাথায় হাত রাখতে পারলেও দীপ্তির মাথায় হাত রাখতে পারলেন না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঝন্টু বাসায় ছিল না। বাবা কী মনে করে নিজেই গেলেন মিষ্টি কিনতে। ঝন্টু এল তার পরপরই। এসেই সোজা গেল মন্টুর ঘরে। মিস্ত্রির ব্যাপারটা ফাইনাল করা দরকার। কাল মিস্ত্রি আসছে।

—ভাইয়া দরজাটা খোল।

দরজা খুলল দীপ্তি। 'তুমি ঝন্টু? আমার একমাত্র দেওর? শাপলার মাথামোটা প্রেমিক?... হাঁ করে দেখছ কী মাছি ঢুকবে তো... আমি তোমার বড় ভাবি সালাম কর... আর কাল মিস্ত্রিদের আসতে নিষেধ করে দিও।'

পিছনে হো হো করে হেসে উঠল মন্টু। দীপ্তি ভাবে মানুষটা ছোটখাটো হলে কী হবে হাসিটা কিন্তু বিরাট!

**মামা-ভাগ্নে**

মামার অনেক দিনের শখ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে ছবি তুলবেন। অসম্ভব একটা শখ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করার বুদ্ধি দিল তার সুযোগ্য ভাগ্নে।

—বাঘের সঙ্গে ছবি তোলা কোনো ব্যাপার না।

—কীভাবে?

—চিড়িয়াখানায় গিয়ে।

—সে তো খাঁচার ভিতর বাঘ বোঝাই যাবে।

—না কায়দা করে তুললে বোঝা যাবে না।

—কী রকম?

—এটাকে বলে ক্যামেরা প্যান করা।

—মানে?

—তুমি বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়াবে। বাঘটা যখন খাঁচার ভিতর হাঁটা শুরু করবে তখন বাইরে আমিও ক্যামেরা নিয়ে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করব।

—তা হলে কী হবে?

—তখন দেখবে খাঁচার শিকগুলো আর দেখা যাবে না। মনে হবে তুমি দাঁড়িয়ে আছ আর একটা বাঘ হেঁটে যাচ্ছে তোমার পিছন দিয়ে।

—বলিস কী এও কি সম্ভব?

—সম্ভব।

—তুই জানলি কীভাবে?

—বাহ আমি ফটোগ্রাফির ওপর কোর্স করছি না। তিনটা সার্টিফিকেট আছে আমার। যে পদ্ধতিটা বললাম এটাকে বলে ক্যামেরা প্যান করা।

—তা হলে ভাগ্নে তুই আমার একটা ছবি তুলে দে, কবে তুলে দিবি?

—দেখি... এবার ভাগ্নে হালকা 'ভাব' নেয়।

যাহোক মামা-ভাগ্নে এক শুক্রবার ক্যামেরা নিয়ে মিরপুর চিড়িয়াখানায় ঢুকল। চিড়িয়াখানা ঘুরে-টুরে অবশেষে বাঘের খাঁচার সামনে এল দু জন। মামা খাঁচার কাছে যতটা যাওয়া যায় গিয়ে পোজ নিল। ভাগ্নে ক্যামেরা নিয়ে রেডি। খাঁচার ভিতর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে। উঠে হাঁটা দিলেই ভাগ্নেও হেঁটে ক্যামেরা প্যান করবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখন বাঘ দয়া করে উঠলে হয়। হঠাৎ উঠল এবং বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে কেউ কিছু বোঝার আগেই দুই শিকের ফাঁক দিয়ে থাবা বসাল ঠিক মামার ঘাড়ের ত্যাড়া রগ বরাবর। থাবায় রগটা সোজা হল কি না বোঝা গেল না। তবে মামা গুনে গুনে সাড়ে তিন হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লেন মাটিতে, আর উঠলেন না। চারদিকে একটা হায় হায় রব উঠল। ভাগ্নে ভাবল এই বেলা বোধহয় চিড়িয়াখানার ভিতরই সাড়ে তিন হাত মাটি খুঁড়ে মামাকে রেখে যেতে হবে। কিন্তু না মামা উঠে বসল। কাঁধের দিকে রক্ত ঝরে পড়ছে, বাঘের থাবা বলে কথা। না মামা মরেন নি।

—জলদি ডাক্তারের কাছে নিন। আশপাশ থেকে আওয়াজ এল।

—কাছাকাছি হাসপাতাল কোথায়?

—চিড়িয়াখানার ভিতরই একটা পশু হাসপাতাল আছে। কে যেন বলল। 'সেখানেই নিন আপাতত' পাশ থেকে আরেকজন বলল!

পশু হাসপাতাল শুনেই কি না কে জানে মামা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন। 'আমার কিছু হয় নাই বাড়ি চল' বলে নিজেই হাঁটা শুরু করলেন।

চিড়িয়াখানা থেকে বের হয়ে এসে মামা-ভাগ্নে জলদি একটা সিএনজি নিল। আঘাত তেমন গুরুতর নয় আবার উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। আফটার অল বাঘের থাবা। সিএনজি ছুটছে। আপাতত টার্গেট কাছে-ধারের কোনো ক্লিনিক বা হসপিটাল যেটাই পাওয়া যায়।

—মামা কেমন বুঝছ? ভাগ্নে জানতে চায়।

—ভালো। মনে হয় তেমন কিছু হয় নাই একটু খামচির মতো লেগেছে। জায়গাটা একটু জ্বলছে এর বেশি কিছু না।

হঠাৎ পুউউউউ... বাঁশির আওয়াজ পুলিশের বাঁশি। পুলিশ তাদের সিএনজি থামাল। রুটিন চেকআপ।

—গায়ে রক্ত কেন?

—বাঘে থাবা মেরেছে।

—ঢাকা শহরে বাঘ এল কোথা থেকে?

—না না চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম!

—চিড়িয়াখানার বাঘ থাকে খাঁচার ভিতর। আমার সাথে ফাজলামো কর? এ সময় পাশ থেকে আরেক পুলিশ বলে ওঠে 'স্যার এ মনে হচ্ছে দাগি আসামি কোনো খুনখারাবি করে পালাচ্ছে... শালার গায়ে রক্ত, নিশ্চয়ই কোপ খেয়েছে।'

—এই তোমরা নাম জলদি। আরো দু-তিন জন পুলিশ জমে গেল। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। একুনে কত ঘা হল? আঠার যোগ ছত্রিশ মোট চুয়ান্ন ঘা!

পুলিশের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে ছাড়া পেল মামা-ভাগ্নে সেই বিবরণে গেলাম না—এ বড় মর্মান্তিক। চুয়ান্ন ঘা নিয়ে যখন মামা-ভাগ্নে বাড়ির কাছে-ধারে একটা ক্লিনিকে ঢুকল তখন মামার অবস্থা কোরোসোয়াবিন... (কোরাসিন + সোয়াবিন) মামা চিঁচি করে বলল

—ভাগ্নে বাঁচব তো?

—বাঘের থাবা থেকে বাঁচলেও পুলিশ যে থাবা মেরেছে তাতে করে তোমার প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে পারব কি না কে জানে, মনে হচ্ছে পুঞ্জিতে টান পড়বে। তুমি থাক আমি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখি ক্যামেরাটা কারো কাছে বন্ধক রেখে কিছু মালপানি জোগাড় করতে পারি কি না। পরে কিন্তু দিয়ে দিও।

—অবশ্যই যদি বেঁচে যাই এ যাত্রা।

শেষ পর্যন্ত একটা ক্লিনিক থেকে মামা যখন চুয়ান্ন গ্লাস আরো গোটা কতক ঘা নিয়ে বের হয়ে এল (দুই ইনজেকশনের ঘা) তখন মামার অবস্থা যায় যায়। নিজের ঘরে এসে কোনোরকমে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে জ্ঞান হারালেন মামা। আর পাশের বেডে প্রায় জ্ঞান হারাল ভাগ্নে। সারা দিন ধকল কম যায় নি।

পরদিন সকালে পেপার খুলে মামা দেখে পত্রিকার প্রথম পাতায় বক্স নিউজ 'মামা-ভাগ্নে বাঘের কবলে'। ভাগ্নের ছবি নেই তবে মামার ছবি স্পষ্ট। মামা হায় হায় করে উঠলেন। 'মানইজ্জত গেল রে ভাগ্নে'।

—কী বলছ এতে তোমার প্রেস্টিজ আরো বাড়ল... বাঘের থাবা খেয়েছ...

—কিন্তু ঐ ছবি তোলার ব্যাপারটা?

—আরে রাখো প্রচারেই প্রসার...

ঠিক তখনই বাইরে দরজায় একসঙ্গে অনেকগুলো কড়া নাড়া শোনা গেল।

—কে?

—আমরা।

—আমরা কারা? দরজা খুলে দেখে গোটা চারেক চ্যানেলের লোকজন দাঁড়িয়ে, হাতে মাইক্রোফোন। প্রচার মনে হচ্ছে এখন আর প্রসার নয়... স্রেফ প্রেসার। মামা আর দেরি করলেন না বাঘের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়লেন... না, চ্যানেলের লোকজনদের ওপর না সোজা খাটের নিচে...। কিন্তু ওখানে যে বাঘের মাসি সংসার পেতে বসেছে কে জানত? কী আর করা দুই মার্জার শিশুর পাশে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইলেন মামা... অবশ্য একটু দূরত্ব রেখে তিনি আর মার্জার মাতার থাবা খেতে রাজি নন। আগে তো চ্যানেলের লোকজন বিদেয় হোক তারপর দেখা যাবে। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে হল্ট করে!!

### এক নারীবাদীর গল্প

সোলায়মান সাহেব সাধারণত অফিস থেকে ফেরেন সাড়ে পাঁচটায়। আজ পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে ঘরের দরজায় পা রাখতেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন তার প্রিয়তমা ইস্ত্রি (আসলে স্ত্রী, কিন্তু তিনি এতই নিরেট এতই কঠিন স্ত্রী... যে বরং স্ত্রী না বলে ইস্ত্রি বলাই মঙ্গল)

—এই তোমার আসার সময় হল? জান না আজ আমার মিটিং আছে।

—ইয়ে মানে সিএনজি পাচ্ছিলাম না... মিনমিন করে সোলায়মান সাহেব।

—সিএনজি পাচ্ছ না বাসে আসবে... দেশে বাস নেই? এর জন্য দেরি করতে হবে কেন? ... যাও চট করে আমাকে চা দিয়ে মন্টুকে আনতে যাও কোচিং থেকে...

সোলায়মান সাহেব অফিসের ফাইলপত্র রেখে ঝড়ের বেগে ঢুকলেন রান্নাঘরে। লাল চা তিনি ভালোই বানান। তার ইস্ত্রি মানে স্ত্রী বেশ পছন্দ করেই খান। পান করেন বললে ভালো হত কিন্তু তিনি যেভাবে সবকিছু চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন তাতে করে মনে হতে পারে বুঝি চা-টাও খান... মানে চিবিয়ে পান করেন।

স্ত্রীর সামনে ধূমায়িত চা-টা রেখে ছুটলেন সিগারেট আনতে। তিনি নিজে সিগারেট খান না তবে স্ত্রীর জন্য সিগারেট আনা হয় নি। এসে দেখেন তার নারীবাদী স্ত্রী ইঞ্জিনের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মতো সিগারেট ফুঁকতেন। সিগারেটের গন্ধ সোলায়মান সাহেবের অসহ্য লাগে। মনে আছে কলেজে থাকতে একবার ফার্স্ট ইয়ারে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একটা স্টার সিগারেটে সুটো টান দিয়েছিলেন। তাতেই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। তাকে নিয়ে তখন সে কী হাসাহাসি। সেই শেষ তারপর আর কখনো সিগারেটের ফিল্টার ছোঁয়ান নি ঠোঁটে! অব সেই তার ভাগ্যেই কিনা পড়ল একজন ধূমপায়ী স্ত্রী। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন সোলায়মান সাহেব।

—কী হল? তুমি এখনো দাঁড়িয়ে?

—এই যাচ্ছি।

ছুটে বেরিয়ে গেলেন সোলায়মান সাহেব তাদের একমাত্র পুত্র মন্টুকে আনতে কোচিং থেকে। রিকশায় করে যেতে যেতে তার মনে পড়ল তার নারীবাদী স্ত্রী আসলে এতটা নারীবাদী কখনই ছিল না। শুরুতে একজন সাদাসিধে সাধারণ নারীই ছিল। তারপর তারই এক বান্ধবীর পাল্লায় পড়ে ধীরে ধীরে এই মর্মান্তিক মাইগ্রেশন।

মন্টুর কোচিংয়ে গিয়ে শোনেন ছুটি হতে আরো এক ঘণ্টা দেরি আছে। কী করা এ তো মহা জ্বালা দেখছি। কাছে-ধারে অবশ্য তার স্কুলজীবনের এক বন্ধু আছে ওখানে সময়টা কাটিয়ে এলে কেমন হয়?

—আরে দোস তুই?

—এলাম আর কি, তোর এখানে আসাই হয় না। আজ মন্টুর কোচিঙের সুবাদে চলে এলাম। ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া গেল।

—ভালো করেছিস কী খাবি বল?

—কিছু না।

—কিছু না কেন আমি তো যদ্দূর জানি তুই ভাবির সেবাযত্ন করতে করতে শেষ হয়ে যাচ্ছিস... নিজে খাওয়ার সময়ই পাস না। হাসার চেষ্টা করে সোলায়মান সাহেব। তাঁর হাসিটা ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছায় না যেন।

—শোন তোকে একটা ভালো বুদ্ধি দেই।

—কী?

—আমার জানা মতে একজন ভালো এলেমদার লোক আছে তার কাছে খালি ভাবির মাথার কোয়ার্টার ইঞ্চি চুল পৌঁছাতে হবে... ব্যস তারপর সেই এলেমদার এমন জাদুটোনা করবে নারীবাদী কই যাবে, স্ত্রীর সেবা পেতে পেতে তোর নাভিশ্বাস উঠে যাবে।

—ভুল বললি।

—মানে?

—আমি স্ত্রীর সেবা পেতে চাই না। আমি চাই সুস্থ-স্বাভাবিক একজন স্ত্রী সুখে-দুখে আমার পাশে থাকবে। মাঝে মাঝে বেড়াতে যাব আমরা মন্টুকে নিয়ে। শাড়ি কিনে দিব ওকে... ভাবের ঘোরে চলে যায় সোলায়মান সাহেব।

—ঐ কাজই করিস না।

—মানে?

—মানে ঐ যে বললি শাড়ি কিনে দিবি ঐ জিনিসটা নিজের হাতে একবার দিয়ে দেখবি বউ নারীবাদী থেকে শাড়িবাদী হয়ে উঠবে সে আরো বড় বিপদ হবে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আমি একজন স্বাভাবিক স্ত্রীর গ্যারান্টি চাই।

—আরে সেই জন্যই তো বলছি শুধু একটু চুল এনে দে ভাবির। ঐ এলেমদার পীরের খরচা আমি সামলাব।

—সেটা সম্ভব না?

—কোনটা?

—ঐ যে চুলের কথা বললি।

—কেন সম্ভব না?

—ওর মাথায় আর চুল নেই!

—কী বলছিস তার না কোমর পর্যন্ত চুল ছিল।

—ছিল... নারীবাদী হওয়ার পর এখন কমিয়ে ফেলেছে... এখন চুলের ক্ষেত্রে সে সুচিত্রাবাদী মানে সুচিত্রা সেনের স্টাইলে চুলে বাটি ছাঁট দিয়েছেরে!

—বলিস কী?

—তবে আর কী বলছি।

তারপরও শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি নিতে রাজি হল সোলায়মান। কাঁচি দিয়ে সামান্য পরিমাণ চুল হলেই নাকি হবে তারপর পীর এমন তুকতাক করবে যে...

মন্টুকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভাবে সোলায়মান তার মতো একজন আধুনিক মানুষও খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়। তার হয়েছে সেই অবস্থা...

—বাবা আজো কি তোমরা ঠাট্টা করবে?

সোলায়মান সাহেব অস্বস্তিতে ঢোক গেলেন। তার নারীবাদী স্ত্রী মাঝে মধ্যে তাকে হালকার উপর পাতলা 'মার-ধোর' করেন। মারটা না দিলেও ধোরটুকু নিয়মিতই করেন। (এখানে বলে নেয়া ভালো স্ত্রী আকার-আকৃতিতে সোলায়মান সাহেবের চেয়েও বেশ বড়সড় ভারীর দিকেই ফলে ঠাট্টা-তামাশার সময় তিনি বেশি সুবিধা করতে পারেন না)। মন্টু একবার দেখে ফেলায় তাকে ব্যাপারটা ঠাট্টা বলে বুঝ দিয়েছিলেন। এখন এর উত্তর মাঝে মধ্যে দিতে হয়।

—না বাবা সব সময় ঠাট্টা-তামাশা করা ঠিক না।

—তা হলে আজ হবে না?

—বোধ হয় না। ঢোক গেলেন বাবা ওরফে সোলায়মান সাহেব।

স্ত্রী বাসায় ফিরলেন বেশ রাত করে।

তোমরা খেয়ে নাও আমি খেয়ে এসেছি।

—মিটিং হয় নি?

—হবে না কেন?

—কী সিদ্ধান্ত হল? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন সোলায়মান সাহেব। স্ত্রীর নারীবাদী কর্মকাণ্ডে তিনি যে গর্বিত সেটাই বুঝাতে মাঝে মধ্যে টুকটাক প্রশ্ন করে আগ্রহ প্রকাশ করা আর কি।

—আজকের মিটিংয়ে আমরা পরের মিটিঙের ডেটটা ফাইনাল করলাম ।

—বাহ্ দারুণ অগ্রগতি...

—শোন কাল অফিস থেকে ফেরার পথে একটু আমাদের বাসায় যেও তো। মা আমায় কেন ডেকেছেন শুনে এস। ওদের ফোনটা বোধ হয় নষ্ট। কাল আমাদের সেমিনার আছে আমি যেতে পারব না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কিন্তু আমার অফিস?

—অফিস? ঝঙ্কার নয় টঙ্কার দিয়ে ওঠেন যেন স্ত্রী। কিসের অফিস?? অফিসে বসে কী কর জানি না? সরকারি অফিসে কী হয় আমরা বুঝি না? আগে ছদিন অফিসে ঘুমাতে একদিন ঘুমাতে বাসায়... আর এখন পাঁচদিন অফিসে ঘুমাও আর বাসায় দুদিন... আমাকে অফিসের দোহাই দিতে এস না...

শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে শুনে কলজে শুকিয়ে যায় সোলায়মান সাহেবের। আবার শাশুড়ির মুখোমুখি হতে হবে? এর চেয়ে বরং..সোলায়মান সাহেব আব ভাবতে পারেন না।

স্ত্রী ঘুমাচ্ছেন। কোয়ার্টার ইঞ্চি চুল কাটার এই মোক্ষম সময়। তিনি বড়সড় একটা স্টেইনলেস স্টিলের কাঁচি নিয়ে নিঃশব্দে এগুতে থাকেন। কাজটা করতে হবে সাবধানে। নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু! স্ত্রী টের পেলে সর্বনাশ... ইহকাল পরকাল সব একসঙ্গে যাবে। কিন্তু কথায় আছে না যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই লোডশেডিং... কী যে হল পাশের ঘরে ঝনঝন করে কিছু পড়ল। হাতের কাঁচিটা লুকানোর সময়টুকু পেলেন না সোলায়মান সাহেব। মুহূর্তে চোখ খুলে তাকালেন স্ত্রী... তাকিয়ে দেখেন তার নিরীহ স্বামী মাথার কাছে বিশাল এক কাঁচি হাতে দাঁড়িয়ে! নারীবাদী স্ত্রী এবার একটা আর্তচিৎকার দিলেন।

পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা ছিল সোলায়মান সাহেবের। সেই শ্বশুরবাড়িই গেলেন। তবে তিন মাসের জন্য। অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। নারী ও শিশু আইনে কেস। জামিন পাওয়া যায় নি। সোলায়মান সাহেব চিন্তিত অন্য কারণে এই তিন মাস মন্টুর কী হবে ওকে স্কুলেই বা নিবে কে কোচিং থেকেই বা আনবে কে?

**মাত্র একজন সৎ মানুষ!**

অবশেষে সে ধরা পড়ল। আসলে তাকে ধরতে খুব একটা সমস্যা হয় নি। সে খুব একটা বাধাও দেয় নি। সবাই অপেক্ষায় ছিল ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে। নিশ্চিত হওয়া মাত্র তাকে ধরা হল। হ্যাঁ এখন এ ব্যাপারে সবাই শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত সেই পৃথিবীর একমাত্র কিংবা কে জানে শেষ সৎ ব্যক্তি। তাকে কী করা হবে এ নিয়ে হাউকাউ শুরু হয়ে গেল। কেউ বলল 'গুলি করে মারা হোক', কেউ বলল 'ফাঁসিতে ঝোলানো হোক', কেউ বা বলল 'শালাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে কাবাব বানানো হোক...'

যাকে নিয়ে এত হাউকাউ বলাই বাহুল্য হয়তোবা সেই এই পৃথিবীর শেষ 'সৎ ব্যক্তি...' একটা সময় সবারই ধারণা ছিল, সততাই সম্ভবত মানুষের এক নম্বর গুণ। কিন্তু এখনকার মানুষ তা বিশ্বাস করে না। বহু বছর আগে তারা এই ফালতু বিশ্বাস থেকে নিজেদের অবস্থান সরিয়ে এনেছে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে।

—তাকে তা হলে হত্যা করা যাবে না?

—না।

—তো তাকে আমরা মাথায় নিয়ে নাচি? চারিদিকে একটা হাসির রোল উঠল।

—দেখুন... গলা কেশে পরিষ্কার করল স্থানীয় নিরাপত্তা প্রধান কর্মকর্তা 'আপনারা এর মৃত্যু চাইছেন? একজন সচেতন মানুষ হিসেবে সেটা আমিও চাচ্ছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আইন অনুযায়ী কাজটা করতে হবে। আপনারা তো জানেন পৃথিবীর নীতিনির্ধারকরা মানুষের আদি গুণ... এই সময় একটা হাউকাউ শুরু হল 'কিসের গুণ। কী সব বলছেন উল্টাপাল্টা?' প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা হাত তুলে সবাইকে শান্ত করলেন 'প্লিজ আপনারা শান্ত হোন


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাকে বলতে দিন।... আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে... মানুষের আদি গুণ হিসেবে সততাকেই এখনো সংবিধান করে রাখা হয়েছে। এটা অতি শীঘ্র অবশ্য রদ করা দরকার। কিন্তু যেহেতু রদ করা হয় নি সেহেতু প্রচলিত নিয়মে আমরা তাকে হত্যা করতে পারি না। তাকে আমরা অবশ্যই হত্যা করব কিন্তু প্রচলিত নিয়মে নয়।

—তা হলে কীভাবে সেটা করা হবে?

—সেটা আপনারাই ঠিক করুন। আপনারাই ভেবে বের করুন। এই স্বাধীনতাটুকু আপনাদের দেয়া হল। আর যেহেতু এই এলাকায় সে ধরা পড়েছে আর এই এলাকার প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা... সেহেতু আপনারা তাকে হত্যার যে পরিকল্পনা করবেন সেটা পালন করতে আমি সর্বাত্মক সহায়তা করব। এর জন্য আমাকে উপরে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। কারণ উপর মহল থেকেও নির্দেশ এসেছে দ্রুত তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু আমার একটাই অনুরোধ আপনারা অন্য একটা পদ্ধতি বের করুন। চারিদিকে একটা হর্ষধ্বনির মতো আওয়াজ উঠল। সবাই খুশি।

—আচ্ছা আমাদের হাতে সময় কত আছে?

—খুব বেশি নয় ধরুন ৪৮ ঘণ্টা।

—যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা কোনো পদ্ধতি বের করতে না পারি তা হলে কি তাকে ছেড়ে দেয়া হবে?

—না। নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে একটু চিন্তিত মনে হল। কারণ তিনি নিজেও জানেন না তখন কী করতে হবে। তবে তখন তার চাকরি যে থাকবে না সেটা একটা প্রধান বিষয়।

—কী, তা হলে কি তাকে ছেড়ে দেয়া হবে? দ্বিতীয় একজন প্রশ্ন করল তার হাতে একটা রেকর্ডার। বোধ হয় লোকটা একজন সাংবাদিক।

—বললাম তো না। সেক্ষেত্রে... প্লিজ এর উত্তর দেয়া আমার জন্য একটু অসুবিধা আছে... আপনারা বরং জলদি একটা পদ্ধতি খুঁজে বের করুন ৪৮ ঘণ্টা অনেক সময়।

শেষ পর্যন্ত একটা পদ্ধতি বের করা হয়েছে। লোকটিকে মানে পৃথিবীর শেষ সৎ লোকটিকে ফেলা হবে এলাকার প্রধান 'গারবেজ হোলে'। এই ভয়ঙ্কর গর্তটায় প্রতিদিন টন টন ময়লা ফেলা হয়। এর থেকে বের হওয়ার কোনো বুদ্ধি নেই। সবাই এই পদ্ধতিটাকে মেনে নিল। প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তাও পদ্ধতিটাকে পছন্দ করলেন। এটা খারাপ না এক ঢিলে তিন পাখি। পাবলিকও খুশি লোকটাও মরল আর প্রচলিত আইনে তাকে হত্যা করতে হল না।

লোকটিকে মানে পৃথিবীর শেষ সৎ লোকটিকে হত্যার সময়ও নির্ধারিত হয়েছে মানে ঠিক কখন তাকে গারবেজ হোলে ফেলা হবে। ভোরবেলাই সঠিক সময়, সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে। জনগণ চাইলে এই দৃশ্য সরাসরি দেখতে পারে। প্রাইভেট চ্যানেলগুলোতে তো হবেই। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

ভোর রাতের দিকে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা গেলেন লোকটির সঙ্গে দেখা করতে। নিয়ম অনুযায়ী তাকে জানাতেও হবে যে আগামীকাল তাকে হত্যা করা হবে। প্রধান কর্মকর্তাকে দেখে লোকটি উঠে দাঁড়াল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ঘুমাও নি তুমি?

—নাহ ঘুম আসছে না, অপরিচিত জায়গায় আমার ঘুম পায় না। প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা খেয়াল করলেন লোকটি বয়সে খুবই তরুণ। লোক বলা উচিত না তাকে তরুণই বলা উচিত।

—আমাকে কী করা হবে তা হলে? বলতে একটু ইতস্তত করলেন প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা। তারপর একটু কেশে বলে ফেললেন—'কাল ভোরে সাতটা ত্রিশে তোমাকে গারবেজ হোলে ফেলা হবে'।

—সে কী গারবেজ হোলে কেন? লোকটি ভীষণ অবাক হল যেন!

—প্রচলিত আইনে তোমাকে হত্যা করা যাবে না বলে জনগণই এই পদ্ধতি খুঁজে বের করেছে।

তরুণটি এবার হেসে উঠল। তার হাসি থেকেই বোঝা যায় নিজের পরিণতিতে সে মোটেই ভীত নয়। প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন।

—তুমি কি কারো সাথে দেখা করতে চাও?

—কার সাথে?

—তোমার কোনো প্রিয়জন? বাবা-মা?

—আমি তো ক্লোন চাইল্ড।

—ও আচ্ছা।

—তোমার কিছু বলার আছে?

—না।

—কোনো বাণী?

—মানে?

—মানে পরে সাংবাদিকরা আমাকে ধরতে পারে তুমি শেষ মুহূর্তে কিছু বলে গেছ কি না। ফের হেসে উঠল তরুণটি। বলল 'সেটা বরং বুদ্ধি করে আপনিই একটা কিছু ভালো বলে দিয়েন'। প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ফিরে চললেন। হঠাৎ কী মনে করে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আচ্ছা একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—পারেন।

—তুমি তো জীবনে কখনো মিথ্যা বল নি?

—না।

—তাতে কোনো সুবিধা পেয়েছ কি?

—না, তবে দশটা দরজার নটাই বন্ধ হয়ে গেছে... একটামাত্র খোলা আছে।

—মানে?

—মানে ঐ যে আপনাকে সত্য কথা বলতে হবে সৎ থাকতে হবে। প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা আর দাঁড়ালেন না।

ঠিক সাতটা ত্রিশেই তাকে ফেলা হল গারবেজ হোলে। চারিদিকে একটা হর্ষধ্বনি উঠল অর্থাৎ জনগণ খুশি। শেষ পর্যন্ত তাদের পদ্ধতিতেই কাজটা করা হয়েছে। এর মধ্যে এলাকার মেয়র একটা প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন আপনাদের যার যার ঘৃণা এই লোকটির প্রতি প্রকাশ করতে সরাসরি নিজ উদ্যোগে ময়লা ফেলতে পারেন তার উপর। আইডিয়াটা অনেকের পছন্দ হল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এরপর ছোট্ট একটা খবর রটে গেল চারিদিকে। যারাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ময়লা ফেলতে গেছে তারাই দেখেছে গহিন গর্তের ভিতর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির উপর ময়লা ফেলামাত্র লোকটি নেচে উঠছে এ বড় মজার দৃশ্য। সবাই তখন ছুটল ময়লা নিয়ে এই মজার দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখার জন্য এবং সত্যি সত্যি প্রতিবার ময়লা ফেলামাত্র লোকটি অদ্ভুতভাবে নেচে উঠছিল। দৃশ্যটা ভীষণ কৌতুককর।

কিন্তু ব্যাপারটা আসলে মোটেই কৌতুককর ছিল না সৎ লোকটির জন্য। যখনই তার উপর হুড়মুড় করে ময়লা এসে পড়ছিল সে চেষ্টা করছিল কোনোমতে লাফিয়ে ময়লার উপর উঠে আসতে। তার ঐ লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গিটাকেই সবাই ভাবছিল নাচ। সে কোনো অদ্ভুত কায়দায় নেচে উঠছে।

দু দিন হয়ে গেল। লোকটি এখনো মরে নি। উৎসাহী জনগণ ময়লা ফেলে চলেছে। আর সে সেই অদ্ভুত কায়দায় নেচে উঠছে... আশ্চর্যের ব্যাপার সে যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল আস্তে আস্তে। তারপর হঠাৎ এক সকালে ময়লা ফেলতে গিয়ে কিছু লোক আবিষ্কার করল লোকটি গর্তের ভিতর থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এল!

—এটা কী করে সম্ভব? তুমি বাইরে এলে কী করে?

—ঐ যে তোমরা দ্রুত ময়লা ফেলে ফেলে গর্তটা ভরে ফেলেছ আর আমিও ময়লার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বের হয়ে এলাম। এ তো সোজা হিসাব। উপস্থিত সাধারণ মানুষের মুখ হাঁ হয়ে গেল। তারা এই সোজা হিসাবটাকে সোজা হিসেবে নিল না। মুহূর্তে চারিদিকে রটে গেল গারবেজ হোল থেকে সৎ লোকটি বেরিয়ে এসেছে কারো সাহায্য ছাড়াই... মরে নি!! এও কি সম্ভব?

আর আশ্চর্যজনকভাবে এ ঘটনার পরপরই কোনো কারণ ছাড়াই পৃথিবীর সব মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো নিশ্চিত হল যে সৎ হওয়া দরকার। সৎ হতে হবে সম্ভবত সেটাই মানুষের জন্য সবচাইতে প্রথম এবং শেষ স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যাই বলুন না কেন!

## মহারাজা

ইতিহাস ভূগোল পৌরনীতিহীন এক রাজ্যের রাজা চলেছেন নদীপথে নৌবিহারে। সঙ্গে আছে তার একান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন। তারা যে নদীপথে চলেছেন সেই নদীপথের দুধারের দৃশ্য বড় মনোরম। একদিকে খাড়া পাহাড় আরেকদিকে সবুজ শ্যামলিমা। একদিকে রুক্ষ রুদ্রকঠিন প্রকৃতি আরেকদিকে সবুজ শ্যামল দিগন্ত। একদিক থেকে ধেয়ে আসছে শান্ত সমাহিত সমীরণ আরেক দিক থেকে তপ্ত তাওয়ার হাওয়া... মাঝখান দিয়ে চলেছেন আমাদের রাজা মহারাজ।

মহারাজার মনটা ফুরফুরে। নৌকার পাটাতনে বসে সুরা পান করেছেন। আঙুর বেদানা নাশপাতি... নানা ধরনের ফল তার সামনের টেবিলে। মহারাজার হুঁশ নেই। তিনি খেয়ে চলেছেন সুরা। একসময় এগিয়ে এল জনসংযোগ সচিব ধরনের কেউ।

—মহারাজা আর পান করবেন না।

—কেন?

—তা হলে আজকের এই নদীপথের ভ্রমণ আপনি উপভোগ করতে পারবেন না।

—তা বটে। মহারাজা গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। ঠিক এই সময় একটা হইচই কানে এল। দেখা গেল নদীর ধারে একদল দরিদ্র জনগোষ্ঠী চেঁচামেচি করে মহারাজার দিকে জুতা দেখাচ্ছে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ওরা কী দেখাচ্ছে?

—জনসংযোগ সচিব কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বলল 'আজ্ঞে মহারাজা জুতা'।

—জুতা? আমাকে জুতা দেখাচ্ছে??? মহারাজার নেশা ছুটে গেল যেন।

—লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজা।

—মহারাজা উত্তেজিত হবেন না।

—কী বল আমার মতো একজন জনপ্রিয় রাজাকে জুতা দেখাচ্ছে আমারই প্রজাকুল... সেনাপতি কই বজরা ভেড়াও সব কটার কল্লা কাটার ব্যবস্থা কর...

—মহারাজা দয়া করে আপনি বিষয়টা একটু ঠাণ্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করুন।

—এর আর বুঝাবুঝি কী?

—ওরা কেন আপনাকে জুতা দেখাচ্ছে?

—কেন?

—ওরা আসলে আগে খালি পায়ে থাকত আপনার সুশাসনের ফলে এখন জুতা পরতে পারছে তাই আপনাকে দেখতে পেয়ে জুতা দেখাচ্ছে।

—তুমি ঠিক বলছ?

—অবশ্যই।

মহারাজা শান্ত হয়ে বসলেন। জনসংযোগ সচিব নিজের উপস্থিত বুদ্ধিতে চমকিত হয়ে নিজের পিঠটা নিজেই চাপড়ে দিল... অবশ্য মনে মনে।

মহারাজার বজরা এগিয়ে চলেছে। এ সময় সামনে একটা দ্বীপের মতো দেখা গেল। বড় সুন্দর দ্বীপ। পাথর পাহাড় আর সবুজে মিলেমিশে এক অপরূপ দৃশ্য। বড় চমৎকার মুগ্ধ হলেন।

—ওহে ওখানেই বজরা ভেড়াও।

—জো হুকুম জাঁহাপনা।

—ওখানে বাঘ-ভালুক নেই তো? বড্ড ঘন জঙ্গল মনে হচ্ছে।

—না জাঁহাপনা বাঘ আসবে কোথা থেকে আর তা ছাড়া আপনার সুশাসনে বাঘে-ভালুকে এক ঘাটে পানি খায়... আজ বিশ বছর।

—বিশ বছর কেন আমার শাসনকাল তো পঁচিশ বছর?

—মহারাজা ভুলে যাচ্ছেন ঘাট তৈরি হয়েছে আপনার শাসনকাল শুরুর পাঁচ বছর পর।

—ও আচ্ছা।

মহারাজা মনে মনে জনসংযোগ সচিবের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করে পারলেন না। ছোঁড়ার মাথা ভালো সব মনে রাখে। মনে মনে ছোঁড়ার পিঠ চাপড়ালেন তিনি।

মহারাজা পালকি চড়ে নামলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি পুলকিত হলেন এই ভেবে যে এই দ্বীপে তিনিই প্রথম নামলেন। ব্যাপারটা জনসংযোগ সচিবের সাথে শেয়ার করতে গিয়ে জানতে পারলেন এই দ্বীপে আরেকজন আছে।

—আরেকজন আছে?

—জি জাঁহাপনা।

—কে সে?

—এক সাধু।

—সাধু??

—কত বছর ধরে আছে?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তা প্রায় ধরেন পঁচিশ বছর।

—পঁচিশ বছর ধরে আমার রাজ্যে এক সাধু বাস করে আর আমি জানি না। ব্যাটাকে এখনই ঘাড় ধরে নিয়ে আস।

—ইয়ে... জাঁহাপনা সেটা বোধ হয় সম্ভব না।

—মানে?

—মানে সাধু একটা সিংহের পিঠে বসে ধ্যানরত। ভয়ানক সিংহ আমাদের দেখে যেভাবে দাঁত খিচুনি দিল রে বাপরে!

জনসংযোগ সচিব শিউরে ওঠার একটা নীরব ভঙ্গি করল। রাজার চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'তুমি না বললে এই দ্বীপে বাঘ-ভালুক নেই'।

—আজ্ঞে তা নেই তবে সিংহ নেই তা তো বলি নি।

—তুমি বললে আমার সুশাসনে বাঘে-ভালুকে এক ঘাটে পানি খায়।

—আজ্ঞে তা খায় কিন্তু সিংহকে কখনো ঘাটে যেতে দেখি নি। পশুর রাজা কিনা বড় ত্যাঁদড়।

—তা এখন আমাদের কী করা উচিত?

—আমার মনে হয় বজরায় ফিরে যাই মহারাজ, অন্য কোনো দ্বীপে নামি।

—কী বলছ ঐ এক সাধুর ভয়ে?

—সাধুর কথা না হয় বাদই দিলাম সিংহটা... তা ছাড়া আমরা এসেছি ঘুরতে সৈন্যসামন্ত বেশি আনিও নি। ধরেন হঠাৎ যদি সিংহটা... ওরে বাপরে!!

—কী হল?

—মহারাজা ঐ দেখুন সাধু সিংহের পিঠে চড়ে আসছে... বোধ হয় ধ্যান ভেঙে যাওয়ায়... ক্ষে-ক্ষেপেছে!

এত বড় সিংহ মহারাজা এর আগে কখনো দেখেন নি। তিনি ঢোক গিললেন। সাধু মহারাজার সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। আর সিংহটা নিরাপদ দূরত্বে বসল। রাজা মনে মনে সাধুর প্রতি বিশেষ প্রীত হলেন। ব্যাটা আদব-কায়দা জানে দেখছি। মহারাজা মাথা ঝুঁকিয়ে তার সম্ভাষণ গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন

—সাধু তুমি শুনলাম এখানে পঁচিশ বছর ধরে ধ্যান করে চলেছ?

—জি জনাব।

—তা ধ্যান করে কী পেলে?

—এখনো কিছুই পাই নি শুধু ঐ গাধাটাকে বশ করা ছাড়া।

—গাধা?

—জি জনাব সিংহটাকে দেখায় সাধু।

—ওটা গাধা? অবাক হয় মহারাজা!

—গাধাই তো গাধা না হলে পশুর রাজা হয়ে আমার মতো সাধারণ মানুষের বশ হয় বলুন? সাধু হাসে। কথাটা মন্দ বলে নি সাধু। মহারাজার পছন্দ হয় সাধুকে।

—তুমি কী চাও আমার কাছে?

—আমি যা চাই তা কি আপনি পারবেন মহারাজা?

—কেন নয়?

—আমি চাই আপনার ঐ বজরায় চড়ে ফিরে গিয়ে আপনার সিংহাসনে বসতে... আর আপনি থাকুন এই দ্বীপে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাধু মিটিমিটি হাসে আর রাজার মাথায় এবার রক্ত চড়ে গেল যেন... ফাজিলটা বলে কী! ঐ সিংহটার মতিগতি কিছু বোঝা যাচ্ছে না। না হলে এখনই সাধুর কল্লাটা ফেলে দিতেন। তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন সাধুর রসিকতাটা তিনি উপভোগ করেছেন। তিনি তার জনসংযোগ সচিবকে ইশারা করলেন। এর মানে চল ফেরা যাক।

মহারাজা তার রাজ্যে ফিরে গেলেন। সাধু তার জঙ্গলে।

মহারাজা ফিরে গিয়ে প্রধান সেনাপতিকে হুকুম দিলেন ঐ সিংহটাকে যেভাবেই হোক বন্দি করে এনে তার ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় ঢোকানো হোক আর সাধুকে হত্যা করা হোক। মহারাজার কথা বলে কথা। তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনাপতি একদল সৈন্য আর সিংহ ধরার জাল নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল ঐ দ্বীপের উদ্দেশে।

ক'দিন পর যথারীতি মহারাজার কাছে খবর এল সিংহকে বন্দি করে তার খাঁচায় ভরা হয়েছে। আর সাধুকে হত্যা করা হয়েছে। মহারাজা শুনে নিশ্চিত হলেন। রাতে তিনি তার তিন প্রিয় রানীকে নিয়ে গেলেন সিংহ দেখতে। সিংহের খাঁচার সামনে গিয়ে রানীরা বলাবলি করতে লাগলেন এত বড় সিংহ তারা কেউ কখনোই দেখেন নি। তারা মহারাজার প্রশংসা করতে লাগলেন রাজ্যে এত বড় একটা সিংহ ধরে আনার জন্য। কিন্তু মহারাজা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন খাঁচার ভিতর কোনো সিংহ নেই একটা গাধা দাঁড়িয়ে আছে। নিরীহ একটা গাধা। রাজা বুঝতে পারলেন প্রধান সেনাপতি এখানে একটা খেলা খেলছে। সে একটা গাধা ধরে এনে সবাইকে বলে দিয়েছে সিংহ বলতে, আর সাধুকেও হয়তো মারে নি। তিনি খবর পেয়েছেন এই সেনাপতি একই সঙ্গে অতি ধুরন্ধর আর বুদ্ধিমান এবং বেশ জনপ্রিয়ও... সুদর্শন তো বটেই তার স্ত্রীরাও তাকে বেশ পছন্দ করে। তিনি চিন্তিত মুখে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

গভীর রাতে মহারাজা এবার একাই গেলেন। না কোনো ভুল নেই একটা গাধাই দাঁড়িয়ে আছে। স্রেফ একটা গাধা। গার্ডকে ডাকলেন। রক্ষী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

—ওটা কী প্রাণী?

—সিংহ জাঁহাপনা।

—হুম, প্রধান সেনাপতিকে খবর দাও।

রক্ষী ছুটল খবর দিতে। কিছুক্ষণ বাদেই ছুটে এল প্রধান সেনাপতি।

—জাঁহাপনা কোনো সমস্যা?

—না সমস্যা না। আচ্ছা এই যে প্রাণীটিকে তুমি ধরে এনেছ ওটা সিংহ তুমি নিশ্চিত?

—অবশ্যই কেন জাঁহাপনা আপনি এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন!

—না ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে একটু রসিকতা করলাম। আচ্ছা সাধুকে তো হত্যা করা হয়েছে?

—জি।

—তুমি নিজের হাতে হত্যা করেছ?

—জি জাঁহাপনা আমি নিজের হাতে ওর শিরচ্ছেদ করেছি।

—সেই মুহূর্তে সে কিছু বলেছিল?

—হ্যাঁ আমি তাকে হত্যা করার আগে বলেছি তার কিছু বলার আছে কি না।

—সে কিছু বলল?

—হ্যাঁ মুচকি হেসে শুধু একটা কথাই বলল।

—কী বলল?

—বলল... শুধুমাত্র স্বজাতিরাই স্বজাতিকে দেখবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—এর মানে কী?

—আমিও বুঝি নি জাঁহাপনা।

কিন্তু মহারাজা মনে হয় হঠাৎ সাধুর কথাটা বুঝে ফেললেন। তিনি তাকিয়ে দেখেন খাঁচার ভিতর সিংহ নয় একটা গাধা দাঁড়িয়ে আছে, স্রেফ একটা গাধা।

গল্পটা এখানে শেষ হলেও তবু একটা অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু গল্প এখানে শেষ হল না। সেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ডেফিনেশনের মতো আর কি শেষ হইয়াও হইল না শেষ... রয়ে গেছে একটু গ্যাস।

রাজা বুঝে গেলেন ওটা আসলে একটা গাধাই। দেশের প্রতি মানুষ তাকে বোকা বানানোর জন্য বলছে সিংহ। তখন তিনি নতুন এক খেলা শুরু করলেন। প্রতিদিন সাতজন করে লোক আনেন ঐ খাঁচার সামনে আর তাদের আলাদা করে জিজ্ঞাসা করেন?

—ওটা কী প্রাণী?

—সিংহ জাঁহাপনা।

ব্যস তারপর মিথ্যা বলার জন্য বা রাজাকে বোকা বানানোর জন্য একে একে সাতজনকে কতল করা হয়। ...এভাবে চলতে থাকল সাতজন সাতজন করে গণহত্যা। জনসাধারণ মরে শেষ হল... রাজার রাজপরিষদ মরে শেষ হল... প্রধান সেনাপতিসহ সৈন্যসামন্ত মরে শেষ হল... শেষে মহারাজার রানীরাও একে একে কতল হতে লাগল... রাজপুত্ররা মরল...মরল রাজকন্যারাও... রক্তের বন্যায় ভাসতে লাগল সেই রাজ্য!

তারপর এমন একদিন এল যেদিন জল্লাদ আর মহারাজা শুধু জীবিত। আর কেউ বেঁচে নেই।

—জাঁহাপনা আর তো কেউ বেঁচে নেই এখন কী করব?

—এবার তুমি বল ওটা কী প্রাণী?

—জাঁহাপনা জান বাঁচাতে তো বলা উচিত গাধা... কিন্তু তরোয়ালটা এখনো যেহেতু আমার হাতেই আছে তখন আমি বলব প্রাণীটা আসলে সিংহই!

বলে জল্লাদ তরোয়ালটা মহারাজার গর্দান বরাবর চালাল। রাজা টুঁ শব্দ করারও সময় পেলেন না।

তারপর সেই সিংহের পিঠে বসে জল্লাদ রওনা দিল সেই দ্বীপের উদ্দেশে যেখানে একদা এক সাধু ঈশ্বরের সন্ধানে ধ্যান করতেন। জল্লাদের বুকের ভিতর তখন অন্যরকম এক অনুভূতি। চারিদিক জনমানবহীন... নৈঃশব্দ্য... শ্যামলিমা... সিংহের পিঠে চলতে চলতে জল্লাদ ভাবে আমি কাকে খুঁজব? মানুষ না ঈশ্বর? কেউ তো নেই!

## মার্জার কাহিনী

বর্ষাকাল। হুলো ক্যাটস অ্যান্ড বুল ডগস বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রায় ভিজতে ভিজতে বাসায় আসছিলাম। মাথার উপর একটা ছাতা অবশ্য ছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয় নি কিছুই, তালুর দিকের গোটা কয়েক চুল শুকনো ছিল তার বেশি কিছু নয়।

বাসার গেটে এসে দেখি একটা ছোট্ট বিড়ালের বাচ্চা কাকভেজা হয়ে কা কা না করে মিউমিউ করছে। বিড়াল আমার প্রিয় প্রাণী। একসময় ছোটবেলায় বিড়াল পালতাম। তো দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে বাসায় ঢুকলাম। বাসায় অবশ্য এই অনাহূত অ্যাকোয়া ক্যাটকে কেউ স্বাগত জানাল না শুধু আমার মেয়ে আর ভাগ্নি আনন্দে চিৎকার দিল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্যস ঘরে আনা পর্যন্তই আমার ডিউটি তারপর দুধ খাওয়ানো, মাছ-ভাত দেয়া সব করতে লাগল বাসার ছোটরা। অচিরেই সে হয়ে উঠল আমাদের বাসার এক অতি আবশ্যিক মেম্বার।

খুব শিগগির দেখা গেল সে অতি ধার্মিক বিড়াল। আমার মার জায়নামাজ ছাড়া তার ঘুম আসে না। এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক কার্যাদি সে করতে শুরু করল ড্রইংরুমের সোফায় এবং এ নিয়ে শুরু হল আমার দাম্পত্যকলহ। কিন্তু কী করে তার এই কর্ম বন্ধ করব? সেই ট্রেনিংটাই বা দেই কী করে। যারা প্রফেশনাল বিড়াল পালক তারা অবশ্য বুদ্ধি দিল এটার নিয়ম হচ্ছে সে যখন প্রাকৃতিক কাজ করতে শুরু করবে ঠিক তখনই তার ঘাড়ের চামড়া ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা নিজেকে দিয়ে চিন্তা করে আমি শিউরে উঠলাম। আমি বাথরুমের হাই কমোডে বসেছি... প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আর ঠিক তখন আমার ঘাড়ে ধরে কেউ বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। নো নেভার! ফলে যা হল ড্রইংরুমটাকেই তার টয়লেট ধরে নিয়ে সে বড় হতে লাগল। আর আমি তার ইয়ে পরিষ্কার করতে লাগলাম। পরে এমন অবস্থা হল আমার বাসায় আত্মীয়স্বজন আসা কমে গেল। আমার মেজো ভাবি ঘোষণা দিলেন বিড়াল বিদায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর এই বাসায় আসবেন না। খোদা হাফেজ।

তো সেই বিড়াল একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেল। অদ্ভুত অসুখ। হঠাৎ করে গোল হয়ে চরকির মতো ঘুরতে থাকে। তারপর উল্টে গিয়ে সারা শরীরে খিঁচুনির মতো হতে থাকে। সে সময় তাকে দেখলে ভয় লাগে। আমার স্ত্রী ওকে ইমিডিয়েট ডাক্তারের কাছে নিতে বলল। আমি নিজে এসব ব্যাপারে যথেষ্ট অলস প্রকৃতির, নিজের হার্টের 'মাসিক কোলেস্টেরল চেক'-এর এক বছর পূর্তি পালন করলাম ক'দিন আগে! এখন বিড়াল নিয়ে... আমি গাঁইগুঁই করি। কিন্তু না শেষ পর্যন্ত দেখলাম বিড়ালটার অবস্থা সিরিয়াস বললে কম বলা হয়। তার অবস্থা ভিসুভিয়াস। অবশেষে খোঁজ লাগালাম। কোথায় কাকে দেখানো যায়। একজনকে পাওয়া গেল তার ভিজিট ১০০০ টাকা। হাউস কলে আসেন তবে বিদেশীদের বিড়াল ছাড়া দেখেন না। একজন বুদ্ধি দিল, মিরপুর চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে। সেখানে ভেটেরিনারি ডাক্তার আছেন। গেলেই চিকিৎসা।

তো গেলাম একদিন চিড়িয়াখানায় রোগীকে একটা ঝুড়িতে নিয়ে। সেখানে গিয়ে শুনি অসুস্থ প্রাণীকে নিয়ে চিড়িয়াখানার ভিতরে ঢোকা যাবে না বা নিয়ম নেই। খবর দিলে ভেট এসে দেখে যাবেন। খবর দিলাম। ভেটের নাম সম্ভবত রণজিৎ বাবু। তাকে একাধিকবার খবর দিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক (!) এলেন না। আমি গেটে রাগারাগি করে চলে এলাম, মানে একটা ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে সোজা ফুলবাড়িয়ায় কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতালে।

প্রথমেই এখানে টিকিট কাটার নিয়ম। একজন মহিলা টিকিট দিচ্ছেন। তার কাছেই গেলাম।

—রোগী কই? আমি ব্যাগের ভিতর বিড়াল দেখালাম।

—নাম?

—অ্যাশি।

—আপনার নাম অ্যাশি? ভদ্রমহিলা অবাক হলেন। আমি বললাম না বিড়ালের নাম অ্যাশি।

—আমি আপনার নাম জানতে চাচ্ছি। যাহোক নাম-ঠিকানা দিয়ে জানতে চাইলাম কত দিতে হবে?

—এখানে কোনো টাকা লাগে না। আমি চমৎকৃত হলাম। দেশে তা হলে অন্তত একটি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে কোনো টাকা লাগে না! টাকাপয়সা লেনদেনের কারবার নেই। খুব



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভালো লাগল। যাহোক টিকিট নিয়ে চলে গেলাম চার নম্বর রুমে। সেখানে একজন ভেট সার্জন বসেন। তিনি দেখলেন আমার রোগীকে। তারপর একজন নার্স ডেকে বললেন টেম্পারেচার নিতে। টেম্পারেচার যে পদ্ধতিতে নেয়া হল তা আর এখানে বর্ণনা না করাই ভালো। বুদ্ধিমান পাঠককে বুঝে নিতে হবে। টেম্পারেচার ১০৪ ডিগ্রি। ভেট ডাক্তার বললেন ওকে ইমিডিয়েট দুটো ইনজেকশন দিতে হবে। আরেকজন নার্স সিরিঞ্জ নিয়ে ছুটে এলেন। পরপর দুটো ইনজেকশন দেয়া হল উরুতে। বিড়ালের মালিক হিসেবে তাকে ধরে থাকতে হল আমার। ক্ষুদ্র একটি প্রাণী কিন্তু কী তার শক্তি কিছুতেই ইনজেকশন দিতে দেবে না সে।

যাহোক ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তারের কিছু পরামর্শ নিলাম। তিনিই দিলেন। তিনি জানালেন শীতের সিজনেই বিড়ালদের অসুখবিসুখ হয় বেশি। সাবধানে রাখতে হয়। বিশেষ করে বাচ্চা বিড়ালদের। ভেট চিকিৎসকের সঙ্গে গল্পে গল্পে বেশ খাতির হয়ে গেল। দেখা গেল উনার দাদার বাড়ি আর আমার নানার বাড়ি একই জায়গায়। তিনি লাল চা খাওয়ালেন। তারপর তার কার্ড নিয়ে ফিরে এলাম বাসায়। সেদিন বোধহয় কোনো অবরোধ বা কিছু একটা ছিল। দেখি যানবাহন কিছু নেই! ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে একটা তাতেই উঠে কিছুটা পথ চললাম। যেন... 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ বিড়াল নিয়া চলিল।' তারপর একটা সিএনজি পাওয়া গেল। তাতে চড়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরছি। পথে পুলিশ আটকাল।

—ব্যাগে কী?

—বিড়াল।

—বিড়াল কেন?

—ভাইরাস আক্রান্ত বিড়াল পশু হাসপাতালে গিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য। আর ঠিক তখনই আমার ক্ষুদ্র মার্জার ছানা ছোটখাটো একটা হুঙ্কার দিল। পুলিশ দুজন একসঙ্গে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল। বাকি রাস্তায় আর কোনো সমস্যা হয় নি।

ক'দিন বিড়াল বেশ ভালই ছিল। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক পর আবার তার সমস্যা শুরু হল। আমি এবার কনফিডেন্ট। পশু হাসপাতালে আমার পরিচিত ভেট চিকিৎসক আছেন একজন, চিন্তা কী! তবে বলে নেয়া ভালো যাদের প্রাণী পালার শখ আছে তাদেরও চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঢাকা শহরে প্রচুর ভেট চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। আইসিডিডিআরে একটা পশু শাখা আছে। মিরপুর রোডে কাজীপাড়ায় ইউনিসেফের তত্ত্বাবধানে একটা মিনি পশু হাসপাতাল আছে। একজন ডাক্তার সেখানে নিয়মিত বসেন। শ্যামলীতে একটা আছে। বনানীতে আছে... মোট কথা পালা পশুদেরও চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

তো যাহোক আমি বিড়াল নিয়ে আবার একদিন রওনা হলাম পশু হাসপাতালে। পৌঁছে দেখি সাড়ে সর্বনাশ। আমার পরিচিত ডাক্তার ভদ্রলোক গেছেন কলে। আমি তাকে ফোন করলাম। তিনি জানালেন তার ফিরতে দেরি হবে। আমি বরং অন্য আরেকজনকে যেন দেখিয়ে ফেলি। তিনিই বলে দিলেন কাকে দেখাতে হবে।

এবারে ভেট একজন সিনিয়র ডাক্তার। যথেষ্ট গম্ভীর প্রকৃতির। আমি ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম। তার ওখানে আরো দু জন বসে ছিলেন। একজন এসেছেন কুকুর নিয়ে একজন ছাগল নিয়ে।

—সমস্যা কী? ভেট জানতে চাইলেন।

আমি বিড়ালের কথা বললাম। আগের প্রেসক্রিপশন দেখালাম। তিনি দেখলেন তারপর একজন নার্সকে ডেকে বললেন 'উনাকে ওটিতে নিয়ে যান'। আমি ভয় পেয়ে গেলাম।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জীবনে কখনো ওটিতে ঢুকতে হয় নি আমাকে! এখন পশু হাসপাতালের ওটিতে ঢুকতে হচ্ছে! নার্সের পিছু পিছু গেলাম ওটিতে। ওটি দেখে তো আমি মুগ্ধ। দুটো বেড পাশাপাশি। এক বেডে একটা বাছুরের অপারেশন চলছে। বাছুরের নাভিতে ইনজেকশন। পেটা কেটে বাদ দেয়া হচ্ছে। আমাকে বলা হল বিড়াল বের করে আরেকটা বেডে শুয়াতে। আমি হুকুম পালন করলাম। আমার ছোটখাটো রোগীটি তখন তেরিয়া হয়ে উঠেছে। তার চার পায়ের সবগুলো নখ বের করে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। বহু কষ্টে তাকে বসালাম পশুদের অপারেশন টেবিলে। ভেট সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। তিনি তাকে টিপেটুপে দেখলেন। একজন নার্সকে বললেন টেম্পারেচার নিতে। নার্স যথারীতি আগের প্রক্রিয়ায় টেম্পারেচার নিল। ভেট তাপমাত্রা দেখে বিশেষ চিন্তিত হলেন। বললেন আপনি ধরে থাকুন ওকে ইনজেকশন দিতে হবে। আমি ধরে বসে রইলাম। হঠাৎ দেখি আমার চারপাশে দশ-বারজন তরুণ-তরুণী এসে ভিড় করে ধরেছে! সবার হাতে খাতা-কলম গায়ে সাদা অ্যাপ্রন পরা।

—আপনার নাম?

—আপনার বাসা কোথায়?

—বিড়ালের নাম কী? বয়স কত?

—কত দিন ধরে সমস্যা?

—কী সমস্যা?

—কেন সমস্যা...??? দেশের একমাত্র কার্টুন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে, কার্টুনিস্ট হিসেবে, রম্য লেখক হিসেবে নানারকম সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়েছে। কিন্তু একসঙ্গে এত প্রশ্নের উত্তর আর কখনো দিতে হয় নি। তবে সত্যি কথা বলতে কি আমার ভালোই লাগছিল। তাদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম বিড়ালের লোম পেটে গেলে ডিপথেরিয়া হয় এই কথাটি মিথ্যা। বড়জোর ইনডাইজেশন হতে পারে। তার বেশি কিছু নয়।

যাহোক কিছুক্ষণ বাদেই নার্স সিরিঞ্জ নিয়ে ছুটে এলেন। আমাকে বললেন শক্ত করে ধরে রাখতে। কারণ কে নাকি ক'দিন আগে একটা বিড়াল নিয়ে এসেছিল। তার বিড়ালকে ইনজেকশন দেয়ার সময় হঠাৎ লাফিয়ে ছুটে পালায়। তারপর সেই বিড়াল মালিকের কান্না দেখে কে!! তার আকুল কান্নার কারণে হাসপাতালের লোকজনও খুব চেষ্টা করল বিড়ালটিকে ধরতে তবে ব্যর্থ হয়। শুনে আমি আমার ক্ষুদ্র বিড়ালটিকে শক্ত করে ধরে থাকলাম। পরপর দুটো ইনজেকশন দেয়া হল। এর কিছুক্ষণ পর দেয়া হল ভ্যাকসিন। পরপর তিনটি ইনজেকশন খেয়ে আমার বীর পুঙ্গব মনে হল নেতিয়ে গেল একদম। অবশ্য ভ্যাকসিন দিতে কিছু টাকা দিতে হল। ভ্যাকসিন ইনজেকশন দিতেই টাকা লাগে (চারশ) আর কোনো খরচ নেই। কেউ হাসপাতালে না গিয়েও ইনজেকশন দেয়াতে পারেন। তাদের কল দিলেই হয়। তারা চলে আসেন। মোট কথা ঐ হাসপাতালের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আমি মুগ্ধ। মানুষের হাসপাতালগুলোর যে অবস্থা সে তুলনায় কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতাল একটি চমৎকার হাসপাতাল।

আমি বিড়াল নিয়ে চলে এলাম। ভেট আরো কিছু ওষুধপত্র দিয়ে দিলেন। সবই মানুষের ওষুধ। বিড়ালের ক্ষেত্রে মানুষের ওষুধ চলে। আপাতত তার স্যালাইন চলছে ড্রপারে। তবে অ্যাশি ভালো আছে। বলা যায় ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে। সেদিন দেখি একটা মরা তেলাপোকা নিয়ে যেভাবে লাফঝাঁপ শুরু করেছে যেন অ্যানিমেল ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে কোনো বাঘ হরিণ ধরেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তো স্যার... আমি ঠিক করেছি এই লাস্ট ২৪ ঘণ্টা আমরা কাউন্ট ডাউন করব...একটা মোবাইল ফোনের কোম্পানি স্পন্সর করতে রাজি হয়েছে। বাইরে ডিজিটাল বোর্ডে কাউন্ট ডাউন হবে... একটা বিউগলের দলও রেডি আছে!

বিউগলের দল কেন?

—না, মানে যেই মুহূর্তে আপনি এই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করবেন সেই মুহূর্তে লাস্ট পোস্টের সুর তুলবে ওরা... দারুণ ট্র্যাজিক একটা ব্যাপার হবে স্যার... ইউ কান্ট ইমাজিন। চৌধুরী বাকিউল্লাহ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন তার বিশ্বস্ত কিন্তু বেকুব তরুণ ম্যানেজারের দিকে। ফিসফিস করে কোনোরকমে বললেন, 'মিনা কই?'

—মিনা ম্যাডামের সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়েছে। তিনি জ্যামে পড়েছেন, এখনই চলে আসবেন।

—আর ছেলেরা?

—স্যার উনাদের ই-মেইল করেছিলাম। তারা জানিয়েছেন, তারা আসছেন না। মানে আসতে পারছেন না।

—মা-মানে? বাবা মৃত্যুশয্যায় তারা আসবেন না?

—জি আসবেন না। তারা বললেন, গত বছর যখন আপনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন সেবার এসে উনারা ডজ খেয়েছেন বলে এবার আর আসতে চাচ্ছেন না... খামাখা ইউরো-ডলারের অপচয়... যদি এবারও ডজ খান।

—শিরিন?

—ম্যাডাম রওনা হয়েছেন। বিমানের টিকিট পান নি। বাসে আসছেন। চৌধুরী বাকিউল্লাহ হাত নাড়লেন। যার অর্থ হচ্ছে 'এখন বিদায় হও, একা থাকতে দাও।' ম্যানেজার বেরিয়ে এল। চ্যানেলগুলোতে ফোন করতে হবে। ওরা সময়মতো কাভারেজ না দিলে সব ভজকট হয়ে যাবে। বহুদিন পর কাজ দেখানোর একটা সুযোগ এসেছে তার। স্যারের মেয়ে শিরিন যে পুরো ব্যাপারটায় কী রকম 'টাশকি' খাবে এটা চিন্তা করে মাথা গরম হয়ে ওঠে তরুণ ম্যানেজার রাগিবের। বুকটাও ধড়ফড় করে ওঠে। এ অন্যরকম ধড়ফড়ানি।

মিনাকে সব খুলে বলতে হবে। এই শেষ বেলায় এসে নিজের অপরাধ সব স্বীকার করে যাবেন বলে ঠিক করলেন চৌধুরী বাকিউল্লাহ। মিনা আসছে না কেন? নাকি ছেলেদের মতো শেষ বেলায় সেও আসবে না। তখনই ঢুকলেন মিনা। মিসেস মিনা বাকিউল্লাহ। স্ত্রী মিনাকে দেখে অবশ্য খুব উদ্বিগ্ন মনে হল না স্বামী বাকিউল্লাহর। মিনা কি জানেন না তিনি আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আছেন এই নিষ্ঠুর ধরাধামে?

—ওগো শুনেছ কিছু? বাকিউল্লাহ স্ত্রীর হাত চেপে ধরেন আবেগে।

—কী?

আমি আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আছি। মিনা মাথা নাড়েন। তার মানে তিনি শুনেছেন।

—ওগো তোমাকে কিছু বলার ছিল আমার। ধরা গলায় বলেন বাকিউল্লাহ।

—বল।

—আমি আসলে সারা জীবন তোমার সঙ্গে চিট করেছি।

—আমি জানি।

—তুমি জান? চৌধুরী বাকিউল্লাহ অবাক হন 'তুমি জান অন্য আরো অনেক নারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল?'

—জানতাম।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—জান? চৌধুরী বাকিউল্লাহ হতভম্ব হয়ে যান।

—না জেনেই কি মনে কর গত রাতে তোমাকে বিষ খাইয়েছি?

অবশেষে কাউন্ট ডাউন প্রজেক্ট সাকসেসফুল। বাংলাদেশে এক ঘণ্টার স্লটে যখন বিদ্যুৎ যায় তখন ঠিক এক ঘণ্টার জন্যই যায়, এক মিনিট আগেও না, পরেও না। চৌধুরী বাকিউল্লাহর ক্ষেত্রেও প্রায় তাই হল। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিটে তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলেন। আর ষাট মিনিটে এসে হাজির হলেন তার মেয়ে শিরিন। শিরিন হক। শিরিন এসেই অবশ্য বাবার কাছে ছুটে গেলেন না। প্রথমেই খুঁজলেন 'এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট' ম্যানেজমেন্ট প্রা. লিমিটেডের ম্যানেজার রাগিবকে। রাগিব ছুটে এল। তাকে একটা চড় কষালেন শিরিন হক। কারণ বাসে আসতে আসতে বাসের টিভিতে বাবার মৃত্যুদৃশ্যের কাউন্ট ডাউন দেখতে দেখতে আসতে হয়েছে তাকে।

ম্যানেজার রাগিব ভেবেছিল বসের মৃত্যুতে খানিকটা কাঁদবে। কিন্তু আচমকা চড়টা খেয়ে সব কান্না যেন শুকিয়ে গেল।

মাসখানেক পরের ঘটনা। 'এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রা. লিমিটেড'-এর বর্তমান এমডি শিরিন হক। আগের চাকরি ছেড়ে বাবার অফিসের সব দায়িত্ব সে বুঝে নিয়েছে। দায়িত্ব বুঝে নিয়েই প্রথম যে কাজটি করল নতুন এমডি, সেটা হচ্ছে... চাকরি খেল ম্যানেজার রাগিবের।

সদ্য বেকার রাগিব এই মুহূর্তে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে নতুন এমডির সামনে। রাগে তার গা জ্বলছে কিন্তু কিছু বলতেও সাহস হচ্ছে না। এই মহিলাকে তার চিকনে ভালো লাগে... কিন্তু সামনাসামনি হলে সব কেমন গুবলেট লেগে যায়। আজকে যেমনটা হল। ইচ্ছে হচ্ছে মুখের ওপর দু কথা শুনিয়ে চলে যাবে কিন্তু সেটাও কেন যে পারছে না!

—হ্যাঁ আসুন। আড়চোখে তাকিয়ে বলে শিরিন হক। শিরিন হকের ঠোঁটের কোণে একটা ব্যঙ্গের হাসি কি ছিল? থাকলেই কি, কে পরোয়া করে। একরকম গটগট করেই বের হয়ে আসে রাগিব।

অফিসের বাইরে এসে বড় করে শ্বাস নেয় এক্স ম্যানেজার রাগিব। বুকের কোথায় যেন চিনচিন করছে একটা ব্যথা। চাকরি হারানোর ব্যথা না, অন্য কিছু হারানোর ব্যথা। আর তখনই লাল একটি গাড়ি এসে দাঁড়াল পাশে। নতুন এমডির গাড়ি। গাড়ির দরজা খুলে গেল।

—উঠে আসুন। শিরিন হকের গলা।

—আ-আমি?

—আপনি ছাড়া আর কে আছে?

গাড়ির ভেতর নতুন এমডির সঙ্গে সদ্য চাকরিচ্যুত ম্যানেজারের নিম্নরূপ কথাবার্তা হল।

—আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব এবং বোকা একজনকে বিয়ে করব... আপনার কি সময় হবে?

—আমার?

রাগিবের মনে হল দ্বিতীয় একটি চড় খেল সে। তবে বড় মধুর চড় এটি। খুব বুদ্ধিমানের মতো একটি মন্তব্য করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রাগিব। কারণ সে এটা অন্তত জানে যে, বেশিরভাগ মানুষই নিজেকে অতি বুদ্ধিমান মনে করে বলেই পৃথিবীতে এখন বোকার সংখ্যা বেশি।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# নৈব নৈব চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**কেঁচো খুঁড়তে সাপ।**

এক লোক চলেছে বড়শি হাতে নদীর দিকে। তার পিছনে চলেছে ঝাঁপি আর বাঁশি হাতে এক সাপুড়ে। তাই দেখে পথে এক লোক প্রশ্ন করল বড়শি হাতের লোকটাকে।

—কোথায় চললেন?

—মাছ ধরতে।

—সে তো হাতে বড়শি দেখেই বুঝেছি কিন্তু সাথে সাপুড়ে কেন?

—আজকাল কেঁচো খুঁড়তে ঘন ঘন সাপ বেরুচ্ছে। মাছ ধরতে কেঁচো লাগবে না? খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বের হয় তাই সাপুড়ে ভাইকে কন্ট্রাকে সাথে নিয়ে নিয়েছি। প্রতি সাপে উনি কমিশন দিবেন আমাকে। কেঁচো খুঁড়তে শুধু সাপ না, ইদানীং এনাকোন্ডা সাপও বেরুচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা গল্প (নাকি সত্যি?), একবার এক ছেলেকে দেখা গেল কেঁচো খুঁড়ছে। হঠাৎ এক বিশাল সাপ তো সাপ মহাসাপ মানে অজগর বের হয়ে এল।

—এবার তোকে গিলে খাব। বলে উঠল অজগর। ছেলেটি খুব বিরক্ত হল, বলল, 'আরে বাবা আমাকে খাবে মানে? তোমাকে তো আমি চাই নি। আমি কেঁচো খুঁজছি...'।

—আরে মাছ ধরতে কেঁচো লাগে। সেই কেঁচো খুঁড়তে মাঝে মাঝে বিশেষ কেসে সাপ বেরুত, ইদানীং মানুষ যা শুরু করেছে তাতে করে ঘন ঘন সাপ বেরুচ্ছে তাও যে সে সাপ না, আমার মতো বিশাল অজগর বা এনাকোন্ডা সাপ।

—দেখ, আমি মাছ ধরার জন্য কেঁচো খুঁজছি না। ইনফেক্ট আমার কেঁচো দরকার বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য। আমাকে কম করে হলেও দুটো কেঁচো ধরে নিয়ে যেতে হবে বায়োলজি ল্যাবে। তারপর কেটে স্যারকে দেখাতে হবে। আর কেঁচো যদি নাই পাই তখন বাধ্য হয়ে না হয় তোমাকেই ধরে নিয়ে কাটব। সঙ্গে যন্ত্রপাতি নিয়েই এসেছি। শুনে ঘাবড়ে গেল অজগর। বলে কী ছেলে?

তখন বাধ্য হয়ে অজগর ওই ছেলের সাথে একটা আপসরফায় এল। বলল, 'দেখ, দিনকাল উল্টে গেছে, এখন কেঁচো খুঁড়লেই সাপ বেরুবে বরং তুমি এক কাজ কর...'।

—কী কাজ?

—তুমি সাপ খুঁড়ো তা হলে যদি কেঁচো পাও।

—তা মন্দ বল নি। ঠিক আছে তা হলে আমাকে দুয়েকটা সাপের গর্ত দেখিয়ে দাও। অজগর তখন ছেলেটাকে কয়েকটা গর্ত দেখিয়ে বিদায় নিল। ছেলেটি একটা সাপের গর্ত খুঁড়তে লাগল। কিন্তু একি কেঁচো কোথায় এ যে দেখছি...আস্ত একটা মানুষ বসে আছে!!

—এই আপনি কে?!

—মানুষ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—সে তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু কোন ধরনের মানুষ?

—আমি রাজনীতি করতাম।

—কিন্তু সাপের গর্তে লুকিয়ে আছেন যে?

—কী করবরে ভাই...যে টাইপের রাজনীতি করতাম তাতে তো বিদেশে পালানোর কথাই ছিল। কিন্তু সময় পেলাম না, তাই শেষমেশ এই গর্তে...কোনোরকমে গা ঢাকা দিয়েছি...কিন্তু তুমি কে? এখানে কী খোঁড়াখুঁড়ি করছ? তুমি যৌথবাহিনীর লোক না তো?

—না না আমি স্টুডেন্ট, কেঁচো খুঁজছি...বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য।

—তা পেলে?

—না।

—আচ্ছা বাইরের অবস্থা কী? পত্র-পত্রিকায় কী লিখছে?

—ওই খবর একটাই 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ'।

—ঠিক আছে গর্তটা ঢেকে দাও আর কাউকে বোলো না আমি এখানে আছি।

—আচ্ছা একটা প্রশ্ন করব?

—কর।

—আপনারা এমন রাজনীতি কেন করেন যে শেষ পর্যন্ত আপনাদের পালাতে হয়? প্রশ্ন শুনে রাজনীতিবিদ ঝিম মারল একটুক্ষণ, তারপর একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল।

—এটা কী?

—আমার স্ত্রীর ঠিকানা। প্রশ্নটা তাকে কর।

সবশেষে একটু জ্ঞানের কথা, ওই সাপ নিয়েই। সাপ হচ্ছে এমন একটা প্রাণী যার লম্বা হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। সাপ যতদিন বাঁচে ততদিনই লম্বা হয়। তার মানে কোনো প্রজাতির সবচে বয়স্ক সাপটিই সবচেয়ে লম্বা সাপ।

**সুটকেস সমাচার!**

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম রাষ্ট্রপতি ভবন ত্যাগ করার সময় মাত্র দুটি সুটকেস নিয়ে বের হন। আমাদের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানেরও একটি সুটকেসের গল্প আছে। তবে ওই সুটকেস পর্যন্তই। তার পরের ইতিহাস আমরা জানি...এখনো জানছি...

বরং সুটকেস নিয়ে একটা গল্প শোনা যাক। এক ব্যবসায়ী মৃত্যুশয্যায়। তাকে ঘিরে আছে তার পুত্ররা, শেষ বেলায় কী দিয়ে যান না যান...কিন্তু হায় শেষ মুহূর্তে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন, তিনি শুধু একটা হাত দিয়ে খাটের তলাটা ইঙ্গিত করলেন। তারপর 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া...'।

মৃত্যুর পর দাফন-কাফনের পরে পুত্ররা খাটের তলে উঁকি দিয়ে দেখে ইয়া বড় একটা সুটকেস। খোলা হল সুটকেস। কিন্তু এ কী! ভিতরে আরেকটা সুটকেস! সেটা খোলা হল, এ কী? ভেতরে আরেকটা সুটকেস!! সেটা খোলা হল, এ কী??? ভেতরে আরো একটা সুটকেস!!!...এভাবে চলতে লাগল, একটার পর একটা সুটকেস বের হতে লাগল! আর সুটকেসের সাইজ ছোট হতে লাগল! সারা দিন গেল, সন্ধ্যায় সর্বশেষ সুটকেসের ভেতর পাওয়া গেল একটা খাম! পুত্ররা উত্তেজিত হয়ে উঠল 'পাওয়া গেছে!!' খাম খুলে দেখে একটা

ছোট্ট চিঠি, বাবার হাতের লেখা...তাতে লেখা 'হারামজাদারা সারা দিন সুটকেস নিয়ে পড়ে থাকলে ব্যবসা দেখবে কে?'

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতির কাছে কিংবা বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের শেখার আছে বা ছিল...হ্যাঁ, একটি মাত্র সুটকেসে যতটা আঁটে তাই দিয়ে একটা জীবন পার করে দেয়া সম্ভব। সেরকম সত্যি গল্প এই পৃথিবীতে ভূরি ভূরি আছে...সেই যে এক বিখ্যাত দার্শনিক...তাকে আটকালো রোমান সৈন্যরা...তারা দার্শনিককে চেনে।

—কোথায় চলেছ?

—পাশের রাজ্যে।

—দাঁড়াও, আগে তোমার 'পোঁটলা' চেক করতে হবে। তখন সুটকেস ছিল না, ছিল হয়তো পোঁটলা জাতীয় কিছু। বিখ্যাত দার্শনিক তার পোঁটলা তুলে দিল সৈন্যদের হাতে। সৈন্যরা পোঁটলা খুলে দেখে ভেতরে কয়েকটা পিঠা আর একটা বোতলে সামান্য পানি। 'এই তোমার সম্পদ?'

বিরক্ত সৈন্যরা!

—হ্যাঁ এই...

—সেক্ষেত্রে তোমাকে যেতে দেয়া যাবে না।

—কেন?

—আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে।

হেসে উঠলেন মহান দার্শনিক। বললেন, 'আমার সঙ্গে আরো একটি পোঁটলা আছে, সেটা হয়তো–বা অনেক দামি!'

—কোথায়? জানতে চাইল সৈন্যরা।

—এইখানে। দার্শনিক টোকা দিলেন নিজের মাথায়।

জাগতিক লোভ–লালসা বাদ দিয়ে এখন মনে হয় আমাদের মাথায় টোকা দেয়ার সময় হয়েছে। একটি বিখ্যাত কোটেশন আছে এ প্রসঙ্গে, 'তুমি একটি নতুন স্কুল খোল, দেখবে দশটি জেলখানা বন্ধ হয়ে যাবে।'

ইদানীং আমাদের জেলখানাগুলো ক্রমে ক্রমে ভরে উঠছে। জেলখানায় যারা ঢুকছেন তারা বাইরে ক'টা সুটকেস রেখে এসেছেন আর ভিতরে কয়টা নিয়ে ঢুকলেন সেটা উপরে জানেন ঈশ্বর আর নিচে জেলখানার জেলার। তবে শেষ কথা হচ্ছে—'চলেন সবাই মিলে ভালো হয়ে যাই...তা হলে আর কাউকেই জেলে ঢুকতে হবে না!'

**মরিচডলা**

আগের মাছ বিক্রি হত ভাগায়। এখন মরিচ বিক্রি হয় ভাগায়। হ্যাঁ সেদিন বাজারে গিয়ে দেখি এক ভাগা মরিচ বিক্রি হচ্ছে দশ টাকা। এত জিনিস থাকতে মরিচ নিয়ে পড়লাম কেন? তা ছাড়া সব জিনিসের দাম বাড়তি শুধু মরিচের উপর নজর কেন? আসলে মরিচ সবজি সিম্বলিক। একে নিয়ে নানান বাক্য আছে বাংলা ভাষায়, যেমন—

ছোটখাটো আকারের কেউ গরম গরম কথা বললে আমরা বলি, 'ছোট মরিচে ঝাল বেশি'। কারো উপর কোনো কারণে খেপলে আমরা বলি, 'শালারে ধরে মরিচডলা দেয়া উচিত'...আর ছোটবেলায় মরিচ বাজি পোড়ানোর কারণে কত কানডলা খেয়েছি তার কোনো হিসাব নেই। মোটকথা মরিচের ইতিহাস...জটিল ইতিহাস। সেদিন পেপারে দেখি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারতের মূক ও বধির এক বাচ্চা কথা বলে না দেখে তার বাবা-মা মরিচ খাইয়ে দিয়েছে বেশ গোটা কতক। তাদের ধাবণা বাচ্চা ঝালের চোটে চিৎকার করে কথা বলে উঠবে। কিন্তু তাদের গুড়ে বালি না স্রেফ মরিচ। এখন বাবা-মার মরিচ কিনতে কিনতে অবস্থা কেরোসিন। কারণ বাচ্চার মরিচে কিছু হয় না। সে খুব আগ্রহ করে মরিচ খাচ্ছে...এবং খাচ্ছেই! এখন বাচ্চাটি যদি বাংলাদেশের হত তা হলে তাদের বাবা-মার অবস্থাটা কী হত? মরিচের কেজি সর্বোচ্চ উঠেছিল ২৪০ টাকা পর্যন্ত।

বরং মরিচ নিয়ে একটা জোক হয়ে যাক। প্রিয় পাঠক ক্ষমা করবেন জোকটা একটু ইয়ে আছে। কারণ এই জোকের উৎপত্তি গ্রামে। আব জানেন তো গ্রামের মানুষ হাসিঠাট্টার ব্যাপারে একটা ইয়ে হয় আর কি...!

এক কৃষক হাল চাষ করতে পারে না তার গরু দুটি যথেষ্ট অলস বলে। গরু দুটি ক্ষেতে হাঁটবে কি পারলে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন একজন বুদ্ধি দিল—'তুমি অমুকের কাছে যাও সে এ ব্যাপারে তোমাকে ভালো সাহায্য করতে পারবে।' লোকটি গেল তার কাছে। সব শুনেটুনে বুদ্ধিদাতা লোকটি তার মরিচ ক্ষেত থেকে দুটো মরিচ ছিঁড়ে এনে দিল। একটা সবুজ মরিচ একটা লাল মরিচ।

—এটা দিয়ে কী হবে? এ তো মরিচ।

—এ দিয়েই কাজ হবে। এ মরিচে বড় ভয়ঙ্কর ঝাল।

—কীভাবে কাজ হবে?

—এ মরিচে বড় ভয়ঙ্কর ঝাল। যখন হাল চাষ করবে তখন দুটো মরিচই সাথে রাখবে। গরু যখন হাঁটতে চাইবে না তখন তার পিছনে শুধু সবুজ মরিচটা ছোঁয়াবে। দেখবে, তোমার দুই গরু ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে ছুটবে।

—সত্যি?

—তবে আর বলছি কী!

—আর লালটা?

—ওটা ছোঁয়ালে গরু ছুটবে ত্রিশ মাইল বেগে। তবে আশা করি ওটা ছোঁয়াতে হবে না। সবুজ মরিচেই কাজ হবে। কৃষক খুশি মনে দুই মরিচ নিয়ে বাড়ি ফিরল। পরদিন দুই গরু নিয়ে গেল হাল চাষে, সঙ্গে দুই মরিচ। যথারীতি তার গরু নড়ে না, একটু হেঁটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কৃষক মুচকি হাসল! দাঁড়াও বাছাধন হাঁটবে না? তা হলে ব্যবস্থা নেই, বলেই সবুজ মরিচ বের করে দুই গরুর পিছনে ঠেকাল। ওরে বাপরে দুই গরু হাল-টাল ভেঙে দে ছুট...ছুট ছুট এমন ছুট লাগাল কৃষক দেখল বিপদ। গরু যেভাবে ছুটছে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হারিয়ে যাবে। হায় হায় এখন কী করা? আর ঠিক তখনই ক্লিক করে তার মাথায় বুদ্ধির বাল্‌বটা জ্বলে উঠল।

প্রিয় পাঠক বাকিটুকু আপনাদের কল্পনা করে নিতে হবে। কারণ পরবর্তীতে দেখা গেল লোকটি ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটে গিয়ে তার বিশ মাইল ছুটন্ত গরু দুটিকে ধরে ফেলেছে।

শেষ একটি গল্প দিয়ে লেখাটি শেষ করি। এটাও ওই মরিচ নিয়েই। এক বাসায় এক চোরকে ধরা হল। লোকজন ঠিক করল, একে মরিচডলা দেয়া যাক। যেই কথা সেই কাজ। দেশি মরিচ আনা হল রান্না ঘর থেকে এবং রামডলা দেয়া হল। কিন্তু কিসের কি? চোরের মুখ হাসি হাসি। 'কী হল, মরিচডলায় তোমার গা হাত পা জ্বলছে না?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—অবশ্যই জ্বলছে। হাসিমুখে বলে চোর।

—তা হলে চিৎকার করে কাঁদছ না কেন?

—নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে স্যার...আনন্দে।

—মানে?

—স্যার, আর একটা বাসা আগে ধরা পড়লেই মরছিলাম।

—কেন?

—ওই বাসার রান্নাঘরে স্যার সব বোম্বাই মরিচ ছিল।

**একজন বন্যার্ত।**

বন্যার পানি সরে যাচ্ছে। ফলে রোগবালাই বন্যার্ত মানুষকে ধরছে। মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা দেখে সাধারণ মানুষও এগিয়ে এসেছে। যে যা পারে সাহায্য করছে, ভূপেন হাজারিকার সেই বিখ্যাত গান 'মানুষ মানুষের জন্য...' অবশ্য সব মানুষই যে মানুষের জন্য তা কিন্তু নয়। যেমন একদল তরুণ বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করছে। বাসায় বাসায় যাচ্ছে। সবাই দিচ্ছে, কেউ টাকা দিচ্ছে, কেউ চাল দিচ্ছে, কেউবা কাপড় দিচ্ছে। কিন্তু এক বাসায় গিয়ে সমস্যা হল। গেটে দারোয়ান আটকালো।

—ভাই আমরা বন্যার ত্রাণ সংগ্রহ করতে এসেছি।

—হবে না ভাই আগে বাড়েন।

—মানে?

—মানে আমাদের সাহেব কিছু দিবেন না।

—আপনি কী করে বুঝলেন তিনি দিবেন না? ভেতরে গিয়ে বলুন আমরা এসেছি বন্যার্তদের ত্রাণের জন্য, তারপর যদি না দেয় আমরা না হয় চলে যাব।

—ভাইরে ওনার ঘরেও পানি, গলা পানি...।

—কী বলছেন? শুকনা খটখটে এত বড় আধুনিক বাড়িতে বন্যার পানি আসবে কোত্থেকে?

এবার দারোয়ান গলা নামিয়ে আনল।

প্রায় ফিসফিস করে বলল, সকাল থেকে টানছেন উনি। গলা পর্যন্ত লোড। তাই বলছিলাম... এখানে গলা পানি!

ত্রাণ সংগ্রহের আরেক গল্প। এক বাড়ির স্ত্রী মিসেস মঞ্জু নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তো একদিন সকালে বাড়ির কর্তার ঘুম ভেঙে গেল। হায় হায় অফিসের দেরি হয়ে গেছে। কোনোরকমে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ওয়ারড্রব খুললেন প্যান্ট-শার্ট পরার জন্য, কিন্তু একি, ওয়ারড্রবে খালি কয়েকটা হ্যাঙার ঝুলছে শুধু! মানে? কাপড়চোপড় সব কই গেল? এই সময় স্ত্রীর গলা পেলেন। মনে হয় ড্রইংরুম থেকে আসছে তার গলা। ছুটে গেলেন ড্রইংরুমের দিকে। হঠাৎ কানে এল শুধু স্ত্রী নয়। অনেক মহিলার গলা। এর মধ্যে অপরিচিত একটি নারীকণ্ঠ বলছে, 'আমরা এবার সবচে বেশি কাপড় দান করার জন্য মিসেস মঞ্জুকে আমাদের সংগঠনের সেরা দাতা হিসেবে তালি দিয়ে অভিনন্দন জানাব...' তারপর সম্মিলিত তালির আওয়াজ। পর্দার ফাঁক দিয়ে মি. মঞ্জু দেখেন—টেবিলের উপর একগাদা শার্ট-প্যান্ট। বলাই বাহুল্য সবই তার। সেদিন আর অফিস করা সম্ভব হয় নি মি. মঞ্জু সাহেবের পক্ষে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ত্রাণের সর্বশেষ ঘটনাটি আরো মর্মান্তিক। এক লোক ব্যক্তিগত উদ্যোগে একগাদা ত্রাণ নিয়ে চলেছে বন্যার্ত শিবিরে। পথে এক লোক আটকালো। করুণ চেহারা করে বলল—

—ভাই এত বড় প্যাকেট নিয়ে কই যান?

—ত্রাণের প্যাকেট ভাই।

—ভাই আমিও একজন বন্যার্ত। এই পর্যন্ত কোনো রিলিফের মাল পাই নাই, খালি একজন দয়া কইরা এই ছুরিডা দিছে। বলে ঝকঝকে ফলার একটা ছ'ইঞ্চি ছুরি দেখায়। বিকেলের শেষ আলোয় ঝকমক করে ওঠে ফলাটা। তারপর আর কি, ভদ্রলোককে কষ্ট করে ত্রাণের শিবির পর্যন্ত যেতে হয় না। সেই একমাত্র ছুরি রিলিফ পাওয়া তরুণের হাতে ত্রাণের মালামাল তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন বাড়িতে।

সবার বাসায় বন্যার পানি অথচ ওদের বাসায় কোনো পানি নেই বলে মন খারাপ ক্লাস ওয়ানে পড়া এক ছাত্রের। সব সময় প্রশ্ন করে জ্বালিয়ে মারছে বাবা-মাকে, 'আমাদের বাসায় পানি আসবে কবে? আমাদের বাসায় পানি আসবে কবে?' অবশেষে তাদের বাসায় একদিন সত্যি সত্যিই পানি এল।

—পানি এসেছে বাবা?

—এসেছে। বাবা খুবই গম্ভীর।

—কোথায়?

—তোমার দাদুর ফুসফুসে।

**বেগার লাঞ্চ!**

এক ভদ্রলোক যিনি বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে ফকির খাওয়াতে পছন্দ করেন। যথারীতি পহেলা বৈশাখে তিনি তার বাসার কাজের ছেলেকে হুকুম দিলেন তিনজন ফকির ধরে আনতে। মেনু খিচুড়ি, মাছ ভাজা, সাথে টুকটাক শাকসবজি নানান ভাজিভুজি। স্ত্রীকে আগেই বলে রেখেছিলেন। স্ত্রী ব্যবস্থা করে রেখে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছেন বেড়াতে, বৈশাখীর বিশেষ বেড়ানো। ঘণ্টাখানেক পর কাজের ছেলে এল।

—কীরে, ফকির এনেছিস?

—হ্, বহু কষ্টে একজনরে পাইছি। ভদ্রলোক নিজেই গেলেন তার অতিথিকে পর্যবেক্ষণ করতে। মধ্যবয়স্ক এক ফকির। মাথায় ময়লা টুপি, থুতনিতে গোটা দশেক আধাপাকা দাড়ি, কাঁধে ঝোলা, হাতে লাঠি। লাঠিটা অবশ্য বেশ চকচকে ঝকঝকে।

—আমার বাসায় দুপুরে আজ খাবেন। আপনি আজ আমার অতিথি। অসুবিধা নাই তো?

—না অসুবিধা কী? তয় খাওন কী? ফকিরের প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক ভেতরে ভেতরে একটু বিরক্ত হলেন। আরে ব্যাটা খাওন কী তা দিয়ে তোর দরকার কী? তুই খাবি এটাই বড় কথা। 'কেন? আপনার কি খাওয়াদাওয়ায় কোনো বাধা আছে?'

—না, কইতাছি মুরগি আর ডিম হইলে আমারে মাফ করেন। ভদ্রলোক হতভম্ব। সারা জীবন ফকিরকে 'মাফ কর' 'মাফ কর' বলে এসেছেন, এখন কিনা উল্টো ফকিরই তাকে মাফ করতে বলছে!!...কলি কলি...ঘোর কলি!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—(বিরক্তি চেপে) মুরগি-ডিম না, খিচুড়ি-মাছ ভাজা...

ভদ্রলোক দেখলেন ফকির সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে। 'কী হল?' ভদ্রলোক জানতে চান, 'খাবেন না?'

—মাছ খায়া মুই মরুম? ঢাকা শহরের মাছে বিষ। বিড়বিড় করতে করতে নেমে যায় ফকির। হতাশ ভদ্রলোক কাজের ছেলেকে আবার পাঠালেন। ভদ্রলোকের একটা ফকির ধরে আন। ঘণ্টাখানেক পর আবার আরেকজনকে ধরে আনা হল।

—আমার বাসায় দুপুরে আজ খাবেন। আপনি আজ আমার অতিথি।

—জে।

—অসুবিধা নাই তো?

—না, অসুবিধা কী? তয় একটু দিরং হইব...

—মানে?

—মানে আরেক বাসায় বিরানির খাওন আছে। একটু ঘুল্লা দিয়া আহি। আপনে আমার খাওনডা...বলে সে ঝোলা থেকে ঝকঝকে চকচকে একটা টিফিন ক্যারিয়ার বের করে বাড়িয়ে ধরে 'এইডার মধ্যে এট্টু ভইরা ফ্রিজে রাইখা দিয়েন, আবার ডিপ ফিরিজে রাইখেন না। আমি সন্ধ্যাকালে আয়া নিয়া যামু।' ভদ্রলোক অবশ্য তাকে হাঁকিয়ে দিলেন। বাকিতে ফকির খাওয়ানোতে তার আপত্তি আছে। কাজের ছেলেকে দান দান তিন দান আবার পাঠালেন। এবার তাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, ভালো ফকির আনতে না পারলে তার চাকরি নট হয়ে যাবে। কাজের ছেলে অবশ্য 'চাকরি নটে' বিশেষ বিচলিত হল বলে মনে হল না। কারণ দিনে শতেক বার তার চাকরি যায় আসে যায় আসে...।

শেষ বিকেলের দিকে তৃতীয় যে ফকির আনা হল। সে একজন বয়স্ক মহিলা। এবারো সেই প্যাকেজ নাটকের পুনরাবৃত্তি

—আমার বাসায় দুপুরে আজ খাবেন। আপনি আজ আমার অতিথি।

—জে।

—অসুবিধা নাই তো?

—না অসুবিধা কী? তয় রানছে কে? আপনার পরিবার? না বুয়া?

—কেন বুয়া। বৃদ্ধা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে উঠে পড়ে।

—কী হল?

—মনে কিছু নিয়েন না গো বাজান বাসাবাড়ির বুয়াগো রান্না আমার পেডে সয় না। বলে সে সিঁড়ি দিয়ে টুকটুক করে নামতে থাকে। তারপর? তারপর আর কি শেষ বিকেলে ভদ্রলোক নিজেই খেতে বসলেন। খিদেও লেগেছিল। মেনু খিচুড়ি আর মাছ ভাজা সাথে টুকটাক শাকসবজির নানা ভাজিভুজি। খিচুড়ি তার প্রিয় খাদ্য হলেও আজ কেন যেন বিস্বাদ লাগছে। তবে একটা কথা মনে পড়ে একটু ভালো লাগল। তার দাদার বাবা ছিলেন বিখ্যাত 'ফকির মুনশি মইনুদ্দীন'। সেই অর্থে তিনিও ফকির বংশের লোক...মানে ফকিব আর কি। ফকির খাওয়ানোর পরিকল্পনা যে একবারে মাঠে মারা গেল তা বলা যাবে না।

**কাহিনী ঝিরঝির।**

২১ আগস্টের সেই দুঃসহ স্মৃতি তো সবারই মনে আছে! সেই পল্টনের গ্রেনেড বৃষ্টি!! ওই মর্মান্তিক বৃষ্টির মেঘের ভূমিকায় যারা ছিল তারা তো এখনো মেঘের আড়ালেই রয়ে গেল!!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কবে বিচার হবে কে জানে। বহু আগে একবার একটা খবর পড়েছিলাম, কুমিল্লার কোনো অঞ্চলে নাকি মাংস বৃষ্টি হয়েছে? কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? পরে আমার এক 'বিজ্ঞানমনস্ক' বন্ধু ব্যাখ্যা দিয়েছিল, হতে পারে কোনো টর্নেডো ঘুরতে ঘুরতে কসাই পাড়ার সব মাংস আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। একটা সময় বায়ুচাপ কমে সেই 'মাংসে মেঘ' ধরে রাখতে না পেরে মাটিতে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়েছে!!

মাছ বৃষ্টির কথা প্রায়ই শোনা যায়। এটা হয়তো সম্ভব সমুদ্রের পানির একটা বিশাল অংশ (মাছসহ) টাইফুনে বা হারিকেনে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে...পরে বৃষ্টির আকারে...ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে ছোটবেলায় ইংরেজি ট্রান্সলেশন পড়েছিলাম মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে Cats and dogs. তো এই নিয়ে একটা গল্প আছে--

বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। ছোট বাচ্চা বাসায় ইংরেজিই পড়ছিল মুষলধারে বৃষ্টি মানে Cats and dogs...এ সময় বাইরে থেকে তার বাবা ভিজতে ভিজতে ফিরল!

ছেলে : বাবা বাইরে কি Cats and dogs...বৃষ্টি হচ্ছে?

বাবা : তাই হবে, গেটের কাছে একটা বিড়ালের লেজে পাড়া পড়েছিল।

এই যুগের এক প্রেমিক-প্রেমিক কথা বলছিল। খুবই আবেগঘন কথাবার্তা...

—এই জানো, আমার খুব ইচ্ছা হয়...

—কী ইচ্ছে হয়? জানতে চাইল প্রেমিক।

—ইচ্ছে হয় তোমার হাত ধরে বৃষ্টিতে ভিজি।

—ওহ দারুণ আইডিয়া...তারপর?

—তারপর ভিজতে ভিজতে ছুটে যাই কোনো পাহাড়ের খাদের ধারে...সেখানে আশপাশে কেউ নেই।

—ওহ ব্রিলিয়ান্ট...তারপর? প্রেমিক উৎসাহিত।

—সেই বিশাল উঁচু পাহাড়ের খাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি শুধু তুমি আর আমি আর অনেক নিচে বয়ে চলেছে উত্তাল জলরাশি...।

—আর বৃষ্টি?

—বৃষ্টি তো হচ্ছেই...ঝির...ঝির...ঝির...ঝির...।

—ওহ সত্যি খুবই রোমান্টিক...তারপর?

—তারপর ছোট্ট একটা ধাক্কা দিলাম তোমাকে...তুমি তলিয়ে গেলে খাদের নিচের গভীর জলরাশিতে।

—কী কী বলছ?

—হ্যাঁ...তারপর ঝিরঝির বৃষ্টিতে একাই ফিরে এলাম বাসায়। এসে দেখি ফোন বাজছে! কে ফোন করেছে জান?

—কে?

—তুমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে সেই যে ছেলেটা খুব বড়লোক...দেখতে হ্যান্ডসাম...গাড়ি আছে...।

—(ঢোক গিলে) সজল?

—হ্যাঁ, সজল।

—তারপর?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তারপর আর কি হোলে [illegible] করা আছে, সারা রাত কলার বৃষ্টি...আর বাইরে তখনো বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝির...ঝিরঝির...।

প্রেমিকের অবশ্য তখন কাহিনী পুরাই ঝিরঝির! উৎকণ্ঠিত গলায় বলল—

—কিন্তু আমার কী হল?

—তুমি সাঁতার জান? পাল্টা প্রশ্ন করে প্রেমিকা।

—না।

—তা হলে তো হয়েই গেল, তুমি পানিতে হাবুডুবু খেতে খেতে চিৎকার করে বললে, 'বাঁচাও! আমি সাঁতার জানি না।'

—তারপর তু-তুমি কী করলে?

—আমি উপর থেকে চিৎকার করে বলব—

—কী বলবে? প্রেমিকের দু চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসার জোগাড়। এই কাল্পনিক গল্পের সবশেষের সংলাপে নিশ্চয়ই ভালবাসায় পুনঃ প্রকাশ ঘটবে...। আমি বলব—'আমিও তো অনেক কিছুই জানি না সেটা চেঁচিয়ে জানাতে হবে?'

## ফালতু বাত্!

ছোট ছোট বাচ্চারা বর্ষায় জমা পানিতে দাপাদাপি করছিল। তাই দেখে বয়স্ক এক লোক ধমক দিলেন

—এই, এসব কী হচ্ছে?

—খেলছি!

—এই নোংরা পানিতে খেলা! ছি ছি। শোন তোমাদের বয়সে আমি পুকুরে এপার-ওপার তিনবার সাঁতরে পার হতাম...

শুনে বাচ্চারা হো হো করে হেসে উঠল। 'কী হল হাসলে কেন?' বয়স্ক লোক অবাক হলেন!

—হাসব না, আপনার অবস্থা চিন্তা করে হাসছি।

—মানে?

—মানে আপনি যখন নেংটি পরে বাসায় ফিরতেন তখন লোকজন আপনাকে দেখে হাসত না?

—নেংটি পরে বাসায় ফিরব কেন?

—বাহ্, আপনি বললেন তিনবার পুকুর সাঁতরে পার হতেন। কাপড় খুলে একবার পার হলেন, একবার ফিরলেন আবার পার হলেন তারপর?

বয়স্ক লোক বুঝলেন একটু ভুল করে ফেলেছেন তিনি। তিনবার বলা ঠিক হয় নি! তো, সেই ভদ্রলোক ঠিক করলেন এরপর থেকে কথা বলার সময় আরো সাবধান হতে হবে, এ যুগের ছেলেপেলে বড় ত্যাঁদড়!

সেই ছেলেগুলোই আরেক দিন খেলছিল একটা বাগানের মতো জায়গায়। বয়স্ক লোক যথারীতি তার নোংরা নাকটা গলালেন

—এই, এখানে কী হচ্ছে?

—খেলছি।

—এটা কী রকম খেলা?

—পাখি শিকার করছি গুলাল দিয়ে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ধুৎ, এটা একটা খেলা হল? খেলেছি আমি...তোদের বয়সে এয়ারগান দিয়ে একবার বাঘ মেরেছিলাম, দৈর্ঘ্যে হবে ধর পঞ্চাশ হাত...বলেই বয়স্ক লোক টের পেলেন বেশি বলে ফেলেছেন!

—আর প্রস্থে? হাসি হাসি মুখে একটা ছেলে জানতে চায়।

—প্রস্থে?...ভদ্রলোক এবার সতর্ক, 'প্রস্থে ধর পাঁচ আঙুল', না এবার আর ছেলেগুলো আগের মতো হো হো করে হেসে উঠল না। তবে একজন শুধু গম্ভীর হয়ে বলল

—আঙ্কেল ওটা নিশ্চয়ই একটা 'কার্টুন বাঘ' ছিল তাই না? এবার সবাই একযোগে হেসে উঠল!

আসলে কথাবার্তায় ঠিক কোন জায়গাটায় থামা উচিত সেটা জানাটা একটা বিরাট আর্ট, শিল্পী যেমন তার ছবি আঁকতে গিয়ে কখনো বেশি এঁকে ফেলে কখনো বা কম এঁকে ফেলে, সঠিক জায়গায় থামতে যে শিল্পী পাবে সেই নাকি আসল শিল্পী। সেরকম কথাবার্তায়ও তাই জায়গামতো থামতে জানাটাই নাকি আসল কথা বলিয়ের মুনশিয়ানা। তবে এখন মোবাইল ফোন আসায় জায়গামতো থামার তো প্রশ্নই ওঠে না। থামারই দরকার নেই। নন স্টপ এফএনএফ!! একজন এফএনএফ-এর এব্রিবিয়েশন করেছে এরকম 'ফালতু অ্যান্ড ফরনাথিং!' সবশেষে একটা ইতালীয় প্রবাদ ঐ কথা বলা প্রসঙ্গেই...'অপ্রয়োজনীয় ফালতু কথা বলা দোষের নয়...মুখের ব্যায়াম তো হয়!'

**সৎমা-আসল মা...**

মাদার'স ডে'তে এক বাচ্চা মেয়ে তার ভয়ঙ্কর সৎমায়ের জন্য ভয়ে ভয়ে কয়েকটা গোলাপ ফুল নিয়ে গেল। সৎমা ফুল দেখে হুঙ্কার দিলেন।

—নিশ্চয়ই আমার বাগানের ফুল চুরি করেছিস? তবে রে হারামজাদি...

—না না। আমি কিনে এনেছি।

—তবে রে বদমাশ পয়সা পেলি কোথায়? নিশ্চয়ই চুরি করেছিস?

—না না, চুরি করি নি, টিফিনের পয়সা জমিয়ে...

—টিফিনের পয়সা? টিফিনের পয়সা তোকে কে দেয়?

—কেন বাবা।

—বটে? তলে তলে এত? আসুক আজ মিনসে...। ততক্ষণে বাচ্চা বুঝে গেছে মাদার'স ডে'তে সৎমায়ের জন্য ফুল আনা বিরাট মিসটেক হয়ে গেছে। তারপরও সাহস করে ফুলগুলো বাড়িয়ে ধরল।

—কিন্তু ফুল কেন শুনি? মতলবটা কী? সৎমা সন্দেহের চোখে তাকায় সৎমেয়ের দিকে।

—আজ মাদার'স ডে যে।

—মাদার'স ডে? এসব তো আগে শুনি নি! এ সবই ইউরোপিয়ানদের অপসংস্কৃতি। এসব আমার ঘরে ঢোকা চলবে না। কে আছ চাবুকটা আন আমার ঘরে অপসংস্কৃতি ঢোকানোর মজাটা আজ বুঝবে। তারপর আর কি সপাং সপাং চাবুক চলল বাচ্চা মেয়ের পিঠে। মারধর খেয়ে পেঠের ব্যথা, মনের ব্যথা আর সেই দুমড়ানো মুচড়ানো ফুল তিনটা নিয়ে মেয়েটি চলল কবরস্থানের দিকে। যেখানে তার নিজের মা শুয়ে আছেন মাটির নিচে। গিয়ে দেখে তারই মতো আরেকটা বাচ্চা ছেলে সেও এসেছে ফুল নিয়ে। নিশ্চয়ই তারও নিজের মা মারা গেছেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তোমারও তা হলে নিজের মা...

—না না, আমি এসেছি আমার সৎমার কবরে ফুল দিতে। ছেলেটি বলে।

—সৎমার কবরে ফুল দিতে?

—হ্যাঁ, আমার দুই মা। আসল মা বদের বদ। কথায় কথায় চাবুক মারে। এই দেখ না আজ পিঠের কী অবস্থা করেছে। আর আমার সৎমাটা ছিল অসাধারণ। বেচারি মারা গেছে। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে যেন ছেলেটির। মেয়েটি বলল, 'তোমার নিজের মা তোমাকে চাবুক মারল? কেন?'

—তা হলে শোন বলি। ছেলে বাচ্চাটি বলা শুরু করল তার করুণ কাহিনী—'আমার মনে ছিল না আজ মাদার'স ডে। বাসায় গেছি। মা ধরল

—কীরে বাইরে গেলি আমার জন্য কিছু আনিস নি?

—কী আনব? আমি অবাক।

—কেন জানিস না? আজ মাদার'স ডে মায়ের জন্য একটা ফুলও আনতে পারলি না হারামজাদা?

—ওহ্ ভুলে গিয়েছিলাম মা।

—তা তো ভুলবেই বাপের খাসলত পেয়েছিস। বাপ যেমন আমার জন্মদিন, ম্যারেজ ডে মনে রাখতে পারে না...তুমিও তো তাই হবে। দাঁড়াও তোমাকে মনে রাখার ব্যবস্থা করছি। ওরে কে আছিস চাবুকটা আন।

তারপর আর কি সপাং সপাং চাবুক নৃত্য ছেলের পিঠে।

—আশ্চর্য তোমার আর আমার ভিতর কি মিল।

—ঠিক বলেছ। আবার কি অমিল। তোমার আসল মা ভালো, সৎমা ভালো না আর আমার আসল মা ভালো না সৎমা ভালো। তাদের দুইজনের এতই বন্ধুত্ব হল যে তারা ঠিক করল আর বাসায় ফিরে যাবে না। চলে যাবে এমন এক জায়গায় যেখানে সব মা-ই ভালো। 'চল সুপার আর্থে যাই?'

—সুপার আর্থ?

—কেন তুমি জান না, সৌরজগতে নতুন একটা গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। যার পরিবেশ একদম পৃথিবীর মতো। সবকিছু পৃথিবীর মতোই শুরু হতে পারে।

—'গুড আইডিয়া তা হলে চল ওখানেই যাই। কিন্তু যাব কীভাবে?' ঈশ্বরের কী খেলা হঠাৎ ওখানে তখন একটা সসার এসে নামল। সসারের ভেতর থেকে নামল একটা অ্যালিয়েন।

—আপনি নিশ্চয়ই একজন অ্যালিয়েন?

—হ্যাঁ, আমি এসেছি তোমাদের পৃথিবী থেকে দু'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষ স্যাম্পল হিসেবে নিয়ে যেতে। কিন্তু এখানে পূর্ণবয়স্ক কোনো মানুষ দেখছি না। তোমরা তো বাচ্চা।

—এটা তো কবরস্থান। এখানে মানুষ পাবেন কোথা থেকে লোকালয়ে যান।

—ধন্যবাদ তোমাদের। আচ্ছা, লোকালয়টা কোন দিকে?

—কোন দিকে বলছি তার আগে আমাদের একটা অনুরোধ রাখবেন? আমাদেরকে যাওয়ার পথে সুপার আর্থে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারবেন?

—কোনো ব্যাপার না। আমার গ্রহও ঐদিকেই। তোমরা এখানেই একটু অপেক্ষা কর। আমি স্যাম্পল দুটো ধরে আনি তারপর তোমাদের উঠিয়ে নিব। ওরা তখন লোকালয়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনদিকে দেখিয়ে দিল। মুহূর্তে সসার ধুলো উড়িয়ে গায়েব হয়ে গেল। আবার মুহূর্তেই ফিরে এল।

—তোমরা উঠে এস। সসারের ভেতর থেকে অ্যালিয়েন চেঁচাল। ওরা ছুটে গিয়ে সসারে উঠে বসল। কিন্তু একি? অ্যালিয়েনের পূর্ণবয়স্ক স্যাম্পল দু জন তো খুব চেনা। এবং স্যাম্পল দু জন একসঙ্গেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল তবে রে হারামজাদা... হারামজাদি তোরা এখানে...তোদের সুপার আর্থে যাওয়া বের করছি। আপা চাবুকটা দেন তো।

—এই নিন, ওদের পিঠে দু ঘা দেয়ার আগে ওই ফাজিল অ্যালিয়েনটার পিঠে কয়েক ঘা দিয়ে নিন।

—ঠিক ঠিক।

সসার তখন ছুটে চলেছে সুপার সনিক গতির চেয়েও বেশি গতিতে সুপার আর্থের দিকে... নাকি কোন দিকে কে জানে!

**বাজার কাহিনী**

এক ভদ্রলোক ছোটবেলায় নিয়মিত বাজার করতেন। এবং যথারীতি বাজার থেকে টুকটাক পয়সা সরাতেন। তো সেই ভদ্রলোক একদিন বড় হলেন, বড় চাকুরেও হলেন, বিয়েশাদি করলেন। কিন্তু ছোটবেলার অভ্যেস গেল না। এখনো বাজার করতে গেলে টুকটাক সরান। যদিও নিজের পয়সা থেকে নিজেই সরাচ্ছেন, তাতে কী, এই টু পাইস ইনকামে অন্যরকম মজা। ছোটবেলায় বাজারের টাকা সরিয়ে সরিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইসাইকেল কিনেছিলেন। আর বড়বেলায় এসে কিনলেন একটা গাড়ি ব্যস সঙ্গে সঙ্গে কট...

—গাড়ি কেনার টাকা কোথায় পেলেন? টাকার উৎস কী?

—ইয়ে মানে দেখুন...এটা বলা একটু মুশকিল আছে।

—তার মানে আপনি দুর্নীতি করেছেন...ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

—না না...দেখুন মানে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন, ছোটবেলার অভ্যেস...কে কার কথা শোনে, তাকে সোজা জেলহাজতে ঢোকানো হল! হাজতে গিয়ে কয়েকজনের সাথে পরিচয় হল। কেউ ছিঁচকে চোর, কেউ কেউ রুই-কাতলা, মৃগেল, বোয়াল... একজন জিজ্ঞেস করে বসল।

—ভাই সরকারের কত টাকা সরাইছিলেন?

—না না, আমি সরকারের টাকা সরাই নি।

—তা হলে কি ত্রাণের টিন?

—না, না।

—তা হলে?

—একটা গাড়ি কিনেছিলাম...কিন্তু...টাকার উৎসটা লজ্জায় বলতে পারলাম না, তাতেই...

—তা উৎসটা আমাদের বলুন।

—না না ভাই সেটা বলা যাবে না...বরং আপনারটা শুনি, আপনি এখানে?

—আমি আর কী বলব রে ভাই। টাকাপয়সা তো ভালোই সিস্টেম করছিলাম হঠাৎ দাবার ছকটা উল্টে গেল। তাতেই...


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারা জেলখানায় কথাবার্তা বলতে থাকুক এই ফাঁকে আমরা দাবার ছক নিয়ে একটু চাপার ব্যায়াম করে নেই। প্রাচীনকালে এখনকার মতো দাবার ছক কিন্তু উল্টাত না। কারণ তখন বিশাল দাবার ছক থাকত মাটিতে ফিক্সড। আর পাত্রপাত্রী ছিল জীবন্ত নর-নারী। এটা অবশ্য আমি মোগল সম্রাটদের সময়কার কথা বলছি। তাদের দাবার ছক ছিল মাটিতে কংক্রিটে স্থায়ী, অতএব উল্টায় কার সাধ্যি? আর পারস্যের দিকে দাবার ছক ছিল আরো মজার। সম্রাট দারায়ুসের দাবার ছক মাটিতে ফিক্সড তো ছিলই আবার দাবার চেয়ারের পেছনটা ছিল আকাশছোঁয়া। কারণটা কী? কারণ খেলার সময় তারা মাঝে মাঝে এতই নিমগ্ন হয়ে যান যেন পেছন থেকে আততায়ী এসে হত্যা করতে না পারে। দাবা খেলায় নিমগ্ন হওয়ার আরেকটি ঘটনা আছে। এক চায়নিজ সম্রাট, তার অপারেশন হবে কিন্তু তখন ব্যথানাশক কিছু নেই বলে ঠিক করা হল দাবাভক্ত এই সম্রাটকে অপারেশনের সময় দাবা খেলতে বলা হবে। তিনি খেলায় নিমগ্ন থাকবেন টেরই পাবেন না অপারেশনের ব্যথা। যেই কথা সেই কাজ। অপারেশন আর খেলা একসাথে শুরু হল। সম্রাট টেরই পেলেন না অপারেশনের ব্যথা। পরে সম্রাটকে বলা হল

—আপনি খেলায় এতই নিমগ্ন ছিলেন যে ব্যথা টেরই পান নি!

—না ব্যাপারটা আসলে তা নয়।

—তা হলে?

—খেলায় আমি আসলে হারছিলাম। হারার বেদনায় অপারেশনের ব্যথা টের পাই নি।

তবে দাবা নিয়ে বোধহয় সবচেয়ে মজার কার্টুনটি এঁকেছিলেন এক আমেরিকান কার্টুনিস্ট। কার্টুনটি এরকম—দু জন দাবা খেলছে দু দিকে বসে। দু জনের গায়ে মাথায় চারদিকে মাকড়সায় জাল ঝুল... ভাব দেখে মনে হচ্ছে তারা বহুদিন ধরে একভাবে স্থির হয়ে বসে আছে নিশ্চুপ, হঠাৎ একজন বলে উঠল।

—এরপর যদি দান দিতে আর এক বছর দেরি কর আমি কিন্তু খেলব না।

আমি এক বাসায় একটা দাবার বোর্ড পেয়েছিলাম যার একদিকে লুডু আরেকদিকে দাবার বোর্ড। সেই বোর্ডে দুই কিশোর লুডু খেলছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী তোমরা লুডু খেলছ কেন? বরং দাবা খেল, বুদ্ধির খেলা, মস্তিষ্কের ব্যায়াম হবে' তারা উত্তরে বলল,

—পাগল...দাবার ছক যদি উল্টায়। তারা কী ভেবে কথাটা বলেছিল কে জানে। বরং আমরা জেলখানায় ফিরে যাই। সবাই সেই ভদ্রলোকের পেছনে তখনো লেগে আছে। 'কী ভাই বললেন না তো আপনার টাকার উৎসটা?' অবশেষে লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কীভাবে বাজার থেকে নিজের টাকা মেরে মেরে...

শুনে অন্যরা হায় হায় করে উঠল, 'ওহ দারুণ বুদ্ধি! এটা স্বীকার করলে তো পার পাওয়া যেত বোধহয়...'

### হঠাৎ কার্ফু!

যেদিন জরুরি আইন জারি হল সেদিন আমি ঢাকার বাইরে একটা বিয়ের দাওয়াতে। সাধারণত সব বিয়ের আসরে যা হয়, জামাই (যেহেতু একদিনের বদশাহ) যতটা সম্ভব দেরি করে আসার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। এর মধ্যে হঠাৎ বাসা থেকে ফোন এল জলদি চলে আসতে হবে কারণ জরুরি আইন জারি হয়েছে এবং কার্ফু রাত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এগারটা থেকে। এই প্রথম দেখলাম জামাইয়ের আসার অপেক্ষা তোয়াক্কা না করে দ্রুততম সময়ে খাবার পরিবেশন করা হল। খেতে খেতে টের পেলাম, জামাইও চলে এসেছে এবং এই প্রথম বোধ হয় জামাইকে পেটে ধরা হল না। সময় কই? বউ নিয়ে বাসায় ফিরতে হবে এগারটার আগে।

খেয়েদেয়ে রাস্তায় এসে ধরা খেলাম। কেউ কোথাও যাবে না, না সিএনজি না রিকশা না বাস... কিন্তু সবাই ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে বাসার দিকে। এগারটায় কার্ফু। তখন বাজে দশটার মতো। থাকি পল্লবী, শহরের আরেক প্রান্তে। এখন উপায়? আমার সঙ্গে আছে উন্মাদের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ তানিম। সে বেচারা মনে হচ্ছে একটু ঘাবড়েছে কারণ তার বাসা থেকে ঘন ঘন ফোন আসছে চলে আসার জন্য। সেও আমার এলাকাতেই থাকে। কিছু না পেয়ে আমরা দ্রুত পা চালালাম। তানিম কম্পিত গলায় বলল, 'হাবীব ভাই, এগারটার মধ্যে পৌঁছতে পারব তো?'

—পারব।

—যদি না পারি?

—না পারলে, আর্মি নেমে যাবে...বরং একটা গল্প শোন...আমি তাকে গল্প শোনাই।

'এরকমই সিচুয়েশন, হঠাৎ করে কার্ফু জারি হল। সবাই যে যার মতো বাড়ির দিকে ছুটছে, হাতে সময় নেই, আর মাত্র পনের মিনিট সময়। আর্মির কনভয় নেমে গেছে। কনভয় থেকে লাফিয়ে নামছে ভারী অস্ত্র হাতে গম্ভীর মুখে আর্মি। কার্ফু শুরু হতে এখনো সময় আছে তবে মাত্র দশ মিনিট। ঠিক তখনই 'ধুম' করে একটা গুলির শব্দ। আর্মির এক ক্যাপ্টেন এগিয়ে এলেন।

—কে গুলি করল?

—স্যার আমি। ভারী অস্ত্র হাতে এক জোয়ান এগিয়ে এল। তার অস্ত্রের নল দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পাশেই পড়ে আছে একজন সাধারণ মানুষের লাশ।

—তুমি একে গুলি করে মেরেছ?

—জি স্যার।

—কেন?

—স্যার এর বাড়ি পল্লবী। দশ মিনিটে পৌঁছাতে পারবে না, তাই...

আমার গল্প শুনে হাসি তো দূরে মনে হল তানিম আরো ঘাবড়ে গেল। আমি তাকে সাহস দিলাম 'ইয়াং ম্যান জীবনে তো একবারই মরবে...'

—মরতে আপত্তি নেই কিন্তু।

—কিন্তু।

—কিন্তু রিকশা সিএনজি বাস না পেয়ে কার্ফুতে রাস্তায় মরতে আপত্তি আছে।

আমি ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি পৌনে এগারটা। কার্ফু এগারটায়। আমরা তখনো রাস্তায়। খেয়াল করে দেখলাম সিটিং সার্ভিস বাসগুলোতেও জনসাধারণ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার মানে যে কোনো মূল্যে এখন সবাই বাসায় ছুটছে শুধু আমি আর তানিম পদব্রজে...(অবশ্য আমাদের মতো অনেকেই ছিলেন সেই রাতে)। এ সময় একজনকে পাওয়া গেল। হাসিমুখে বসে আছে। তার বাড়ি সাভার। কিন্তু যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। একজন চিন্তিত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল—

—কী ব্যাপার হাতে মাত্র দশ মিনিট আছে কার্ফু শুরু হতে আপনি নিশ্চিন্তে বসে আছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও~আমারবই.কম

—কী বলেন? দশ মিনিট? আমার গড়িতে এখনো এক ঘণ্টা সময় হাতে, হেঁটে গেলেও ঠিক পৌঁছে যাব।

— মানে?

—মানে আমার ঘড়ি সব সময় এক ঘণ্টা লেট।

নাহ, শেষ পর্যন্ত এক বৃদ্ধ রিকশাওয়ালার ডাবল ভাড়ার অনুরোধে আমরা কার্যালয়ে চলি খাওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগেই যার যার বাড়িতে পৌঁছতে সমর্থ হই।

**মিথ্যাবাদী।**

আরেকটি মোবাইল কোম্পানি ঢুকল দেশে। ছয় নম্বর মোবাইল কোম্পানি। মূল মালিক আরব আমিরাতের একজন শেখ। পরিচালনার দায়িত্বে আছে সব পাকিস্তানি, তার মানে পাকিস্তানিদের তত্ত্বাবধানে আমাদের আরো কথা বলতে হবে এখন থেকে। মিথ্যা কথা বলাও হয়তো আরো বেড়ে যাবে। 'জ্যামে আটকা পড়েছি' বা 'অফিসে অনেক কাজ, আসতে রাত হবে।' আসলে মোবাইল নিয়ে আপনি যে ঠিক কোথায় সেটা আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না। সুন্দর করে মিথ্যা কথা বলাও আসলে একটা আর্ট। মোবাইল ফোন এসে সেই আর্টকে ধ্বংস করে আমাদের গতানুগতিক মিথ্যাবাদী বানিয়ে চলেছে। কে জানে এত এত মোবাইলের কারণে কি আমরা ক্রমে ক্রমে মিথ্যাবাদী জাতি হয়ে উঠছি? পৃথিবীতে মেক্সিকানদের খুব দুর্নাম, তারা নাকি সবচে বেশি মিথ্যা বলে। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলা যেতে পারে।

একবার এক বাস ভর্তি মেক্সিকান শ্রমিক চলেছে কাজে। রাস্তা দুর্গম। একদিকে খাড়া খাদ আরেকদিকে উঁচু পাহাড়। হঠাৎ বাসটা টার্ন নিতে গিয়ে তাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ে গেল গভীর খাদে। হাজার হাজার ফুট নিচে। খবর চলে গেল শেরিফের কাছে, হেলিকপ্টারে করে ছুটে এল উদ্ধারকারী দল। বেশ কিছুক্ষণ পর স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ছুটে এলেন, এত মানুষের মৃত্যু কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। প্রেসিডেন্টকে দেখে ছুটে এল শেরিফ।

—স্যার, এভরিথিং আন্ডার কন্ট্রোল। সবাইকে সম্মানে কবর দেয়া হয়েছে।

—কেউ কি বেঁচে নেই?

—তিনজন অবশ্য বলছিল তারা বেঁচে আছে...

—তারপর?

—কিন্তু স্যার মেক্সিকানরা কী রকম মিথ্যাবাদী সেটা তো স্যার আপনিও জানেন। আমরা ওদের কথা একবিন্দু বিশ্বাস করি নি। ওদের তিনজনকেও কবর দিয়ে দিয়েছি।

মিথ্যা বলা মহাপাপ। তো সেই রকম এক মহাপাপীকে মৃত্যুর পর নেয়া হল ঈশ্বরের সামনে। তার বিচার হবে। ঈশ্বর ভাবলেন, মিথ্যা বলা মহাপাপ জেনেও ব্যাটা সারা জীবন মিথ্যা বলে গেল কেন, ব্যাপারটা একটু বোঝা দরকার।

—তুমি তা হলে পৃথিবীতে সব সময় মিথ্যা বলতে?

—জি প্রভু।

—তুমি জানতে না মিথ্যা বলা মহাপাপ?

—জি প্রভু জানতাম।

—তারপরও মিথ্যা বলতে?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—জি প্রভু।

—কেন? তোমার শাস্তির ভয় ছিল না?

—জি ছিল প্রভু।

—কী শাস্তি জানতে?

—জি জানতাম। টগবগে ফুটন্ত গরম তেলের কড়াইয়ে আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

—তারপরও ভয় হল না? মিথ্যা বলা চালিয়ে গেলে?

—জি প্রভু।

—কিন্তু কেন?

—আসলে প্রভু আপনি তো জানেন আমাদের পৃথিবীতে বলা হয় 'অর্ধ সত্য' হচ্ছে পুরোপুরি মিথ্যা। আর সেই প্রেক্ষিতে অর্ধ মিথ্যা হচ্ছে পুরোপুরি সত্য, আমি পৃথিবীতে সব সময় অর্ধ মিথ্যা বলেছি প্রকারান্তরে আমি সত্য কথাই বলেছি। ঈশ্বর চিন্তায় পড়লেন। ব্যাটার যুক্তি তো খারাপ না। তিনি বললেন

—তোমার যুক্তি খারাপ না। ঠিক আছে যাও তোমার শাস্তিও অর্ধেক করে দেয়া হল। অর্ধেক ফুটন্ত তেলে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কে আছ কড়াইয়ে অর্ধেক তেল ঢাল, গরমও হবে অর্ধেক। যেই কথা সেই কাজ। কড়াইয়ে তেল ঢালা হল। মিথ্যাবাদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে তৈরি হল। তবু ভালো, শাস্তি তো অর্ধেক। যেই কথা সেই কাজ। কিন্তু একি কড়াইয়ে তেল তো গরম হচ্ছে না। ঈশ্বর বিরক্ত হলেন। হুঙ্কার ছাড়লেন

—কী ব্যাপার তেল গরম হতে এতক্ষণ লাগে?

—প্রভু একটু সমস্যা হয়েছে।

—আবার কী সমস্যা?

—প্রভু কড়াইয়ের তেল গরম হচ্ছে না কারণ চুলা জ্বলছে না। কারণ গ্যাসের সাপ্লাইও যে অর্ধেক।

সবশেষে মিথ্যাচার নিয়ে তিনটি চরম সত্য কোটেশন। প্রথমটি একটি প্রাচীন ইদ্দিশ প্রবাদ—

(এক) 'ব্যাপারটা সত্যি' এই বাক্যটি এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বলা সবচেয়ে নিরাপদ একটি মিথ্যা।

(দুই) একজন মিথ্যাবাদী এবং একজন মৃত ব্যক্তি আসলে একই রকম। মৃত ব্যক্তি কখনো কিছু বলে না। আর মিথ্যাবাদীর কথা কখনো কেউ শোনে না। (ছালাবি)

(তিন) পাপের অনেক যন্ত্রপাতি আছে, তবে মিথ্যাটাই হল তার সবচে বড় যন্ত্র, যা অন্য সবকিছুকে ঘুরানোর জন্য হাতলের মতো কাজ করে। বাক্যটি ডব্লিউ হোলমসের।

**বোমাবাজের দুঃখ**

পুলিশের এসআই—এ পোস্টটাতে যেন আল্লাহর ডাইরেক্ট কোনো বদদোয়া আছে। বলল আমার এক বন্ধু।

—কেন? আমি জানতে চাই।

—আরে পত্রিকা খুললেই কোথাও না কোথাও পুলিশের কোনো এসআই হয় সাসপেন্ড হয়েছে, না হলে ক্লোজ হয়েছে...না হলে অ্যারেস্ট হয়েছে।

—অবশ্য সব এসআই যে খারাপ তোর এ যুক্তি আমি মেনে নিতে পারলাম না। সাইড থেকে আরেক শত্রু (এ আমাদের বন্ধু ছিল একসময় এখন সব কথায় বাগড়া দেয় বলে শত্রু হয়ে গেছে) আওয়াজ দেয়।

—বেশ, একটা উদাহরণ দে তা হলে।

—কেন এসআই টুটুল। আমি তার গানের বিশেষ ভক্ত!

'এসআই' প্রসঙ্গ থাক এবার যাই 'মে আই...' প্রসঙ্গে, মানে এক উচ্চপদস্থ আমলা গেল মাননীয় মন্ত্রীর রুমে। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল

—মে আই কাম ইন স্যার?

—ইয়েস।

আমলা ফাইলপত্র নিয়ে এসে মন্ত্রীর সামনে বিনীত ভঙ্গিতে বসল।

—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার তো স্যার গুরুতর!

—কী রকম?

—মানে স্যার, আপনার মন্ত্রণালয়ের এখনো তো প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা রয়ে গেছে।

—বল কী!

—জি স্যার...বলছিলাম আপনাদের সময় তো প্রায় শেষ হয়ে আসছে...তাই জলদি কোনো প্রকল্পে...টাকাটা সাইজ করতে পারলে...

—গুড আইডিয়া...আচ্ছা কী প্রকল্প দাঁড় করানো যায় বল তো...?

—স্যার যমুনার ওপর একটা ব্রিজ করলে কেমন হয়?

—আরে মাথা খারাপ নাকি। যমুনার ওপর একটা ব্রিজ তো আছে আবার আরেকটা করার দরকার কী, তা ছাড়া...যে টাকা আছে তাতে করে ওরকম আরো দশটা ব্রিজ করা যাবে... আরো বড় কোনো প্রকল্প বের করুন।

—না স্যার, ব্রিজটা তো হবে নদীর উপর আড়াআড়ি না...নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর!

—অ্যাঁ...?? হ্যাঁ হ্যাঁ...তাহলে ঠিক আছে!

অবশ্য সব মন্ত্রীই যে উপরের মন্ত্রীর মতো ধড়িবাজ তা কিন্তু নয়! ভালো মন্ত্রীও আছে। যেমন এক ভালো মন্ত্রীর কাছে লাইন ঘাট করে এক বোমাবাজ খুনি এল দেখা করতে।

—কী ব্যাপার?

—স্যার আমারে বাঁচান...

—কেন, তুমি কী করেছ?

—স্যার মনে নাই ওই যে বোমা ফাটাইলাম...আপনাদের এগেইনস্ট পার্টির মিটিংয়ে...

—ও আচ্ছা আচ্ছা...

—এখন তো স্যার বাটে পড়ছি...জান নিয়া টানাটানি।

—ঘাবড়ায়ো না...চুপচাপ ঘাপটি মাইরা থাক, পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হোক...একটা মার্সি পিটিশন দিয়া যাও, দেখি কী করা যায়। আমি আবার কারো বিপদ-আপদ সহ্য করতে পারি না... সে যে-ই হোক!

—এই জন্যই তো স্যার আপনার কাছে আসা। নিরিবিলিতে বাকি জীবন শান্তিতে কাটায়া দিতে চাই...কোনো ঝুট-ঝামেলায় থাকতে চাই না...



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মন্ত্রী বেল টিপলেন। বোমাবাজ খুনি ভাবল বোধহয় স্যার তাকে এখন চা খাওয়াবেন। কিন্তু ঢুকল পুলিশের এক এসআই (ভালো) সাথে দুই কনস্টেবল (ভালো)। মন্ত্রী বললেন

—ওকে অ্যারেস্ট কর।

—সে কী স্যার!! শেষ পর্যন্ত আপনি বিট্রে করলেন? বোমাবাজ খুনি হতভম্ব হয়ে গেল!

—বাহ্ আমি কী করলাম? তুমি যা চাইলে তাই তো করলাম...তুমি বললে নিরিবিলিতে বাকি জীবন শান্তিতে কাটাযা দিতে চাই...কোনো ঝুট-ঝামেলায় থাকতে চাই না...তো জেলখানা ছাড়া এখন ওই জিনিস আর কোথাও নাই...যাও যাও।

**অভিভাবকহীন দেশ**

দেশটায় যা ঘটছে ইদানীং...তাতে কবে মনে হতে পারে এই দেশের বোধহয় কোনো অভিভাবক নেই। এই যখন অবস্থা তখন কিন্তু স্কুলগুলোতে অভিভাবক নির্বাচন...মানে 'অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন' বেশ জোরেশোরে শুরু হয়েছে বা হচ্ছে ইদানীং। চার রঙের পোস্টার ছাপিয়ে...ঢাকঢোল পিটিয়ে... আসল নির্বাচনও যেন ম্লান হয়ে যাবে, অনেকটাই এমন অবস্থা! কারণটা কী? স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবক প্রতিনিধি থাকলে নিশ্চয়ই মুফতে কোনো সুবিধা আছে! নইলে কেন পোস্টারে লেখা থাকবে...প্রাক্তন ছাত্র, আলহাজ, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী...ইত্যাদি ইত্যাদি... ডাল মে যেন কুছ নেহি, বেশ ভালো রকমেই কালা জাহাঙ্গীর হ্যায়! অবশ্য আমাদের (নাকি আমার) হয়েছে সেই ঘর পোড়া গরু...সিদুর দেখে ভয় পায়...অবস্থা!

যাহোক সামনে ভর্তির সিজন আসছে এমতাবস্থায় স্কুল পাড়ায় গেছে এক অভিভাবক। তিনি তার ছেলে বা মেয়েকে হয়তো কোনো স্কুলে ভর্তি করাবেন সেটা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। আমি যে এলাকার কথা বলছি সেখানে দুটো স্কুল মুখোমুখি। তো ভদ্রলোক এক স্কুলের গেটে এগিয়ে গেলেন। গেটে অনেক অভিভাবক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। যে স্কুলের গেটে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন সেই স্কুলের গেটে ঘটনাচক্রে আমিও দাঁড়ানো। কারণ আমার মেয়েও ওই স্কুলে পড়ে। তো চিন্তিত ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ানো আরেক অভিভাবককে বিনীতভাবে বললেন

—ভাই কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—পারেন।

—এই যে সামনা-সামনি দুটো স্কুল এর মধ্যে কোনটা ভালো?

—কেন?

—আমি আমার মেয়েকে ভর্তি করানোর কথা ভাবছি কিনা...

—সেক্ষেত্রে আমি বলব এই স্কুলটার ব্যবসা ভালো (যেটার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি)।

—ব্যবসা? কী বলছেন? আমি পড়াশোনার ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছি...

—পড়াশোনা? আমার পাশে দাঁড়ানো অভিভাবক মনে হল মীর মহাকাশ স্টেশন থেকে আছড়ে পড়লেন মর্তের মাটিতে! 'ঢাকার কোন স্কুলটায় পড়াশোনা হয় আমাকে বোঝান দেখি...সব ব্যবসা...'।

পরে বোঝা গেল তিনি স্কুলের ব্যবসা ভালো বলতে কী বোঝাচ্ছেন। এখানে নানারকম কোচিং আছে। স্কুলের ক্লাসে স্যার ম্যাডামরা সময় দিতে না পারলেও কোচিংয়ে ঠিকই সময় দিবেন...তা ছাড়া এখানে আছে কলেজ সেকশন, আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইংরেজি বাংলা আলাদা আলাদা মিডিয়াম, যে যেটা পড়তে চায়...আর যদি নির্বাচন করে কোনো রকমে একবার সরকারি দলের অভিভাবক প্রতিনিধি হয়ে যেতে পারেন তা হলে আর পায় কে আপনাকে...পোয়া সাড়ে বারো...। অভিভাবকের বক্তৃতা হয়তো আরো চলত। কিন্তু স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। চিন্তিত অভিভাবক সরে পড়লেন।

এবার আরেক অভিভাবকের গল্প বলি। এই অভিভাবকের পুত্র একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে বলল, 'আচ্ছা বাবা, তুমি কি চোখ বন্ধ করে নিজের নাম সই করতে পার?'

—মনে হয় পারি।

—বেশ তা হলে কর দেখি। বাবা চোখ বন্ধ করে কলম হাতে নিয়ে বললেন, 'কই কোথায় সই করব?'

—এই তো এখানে। ছেলে কোনো কাগজ হয়তো বাড়িয়ে দিল।

বাবা চোখ বন্ধ করে সই করলেন। তারপর চোখ খুলে দেখেন ছেলে উধাও! অভিভাবক বাবা এবার মন খারাপ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে মনে বললেন, 'হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ' তিনিও ছাত্র অত ভালো ছিলেন না। ঠিক এই পদ্ধতিতেই রিপোর্ট কার্ডে বাবার সই নিয়েছিলেন। তাদের সময় এত প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু এখন? এখন ছেলে যদি ভালো করতে না পারে...অভিভাবক পিতা চিন্তিত বোধ করলেন।

অভিভাবক হিসেবে আমিও বেশ চিন্তিত বোধ করছি। বর্তমান সরকার একমুখী শিক্ষার নামে যে নীলনকশা করতে যাচ্ছে তার পরিণাম ভেবে। ইতোমধ্যে এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমি আমার এক বিচক্ষণ সাংবাদিক বন্ধুকে কথাচ্ছলে বললাম

—আচ্ছা এই একমুখী শিক্ষা চালু হলে তো দেশের সর্বনাশ হবে?

—হবে না।

—হবে না মানে?

—হবে না মানে হবে না...সর্বনাশ যা হওয়ার তো অনেক আগেই হয়ে গেছে...নতুন করে আর কী সর্বনাশ হবে শুনি?

বন্ধুর কথাইবা বিশ্বাস করি কীভাবে। সেদিন খবরে দেখি সরকারি দলের কোনো এক সিনিয়র নেতা গলার ত্যাড়া রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে বলছে—'আমরা দেশের সর্বস্তরে উন্নয়নের জোয়ার এনেছি...ইত্যাদি ইত্যাদি' তখন আমার মনে পড়ল টমাস ফুলারের একটা বিখ্যাত কোটেশন। সেটা হচ্ছে—"যে দাবি করে সে সব জায়গায় আছে...সে আসলে কোথাও নেই!"

**শুভঙ্করের ফাঁকি**

আমার এক বন্ধু আছে কথায় কথায় ছি ছি বলা তার মুদ্রাদোষ। যেমন, 'ছি ছি... শুনেছি দেশ তো এবারো দুর্নীতিতে প্রথম!' কিংবা 'ছি ছি...দেখলি আবার আত্মঘাতী বোমা ফাটল!' তবে তার সব ছি ছি বলার সঙ্গে অবশ্য দেশের একটা সমস্যা থাকেই... আর দেশের সমস্যার শেষ নেই বলে তার ছি ছি বলাও বোধ হয় শেষ হচ্ছে না। তো হঠাৎ সেদিন তার সাথে দেখা। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম সে ছি ছি বলছে না একবার!

—কীরে? তোর সমস্যা কী?

—কীসের সমস্যা?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—একবারও ছি ছি বললি না যে?

—ও...এই কথা? সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপর বলল, 'আমার ছি ছি'র স্টক মনে হয় শেষ রে...দেশের সমস্যার সাথে পাল্লা দিয়ে ছি ছি ফুরিয়ে গেছে...'

—বলিস কী? আমি চিন্তিত বোধ করি। কারণ আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে সে 'ছি ছি বজলু' নামে পরিচিত, এখন সমস্যা হচ্ছে বজলু আছে তিনজন। একজন শর্ট বজলু (এভারেজ বাঙালি হাইট থেকে ইঞ্চি দুয়েক ডাউনে আছে বলে...) একজন কুয়েত বজলু (কুয়েতে ছিল কিছু দিন...) আর 'এই ছি ছি বজলু'...এখন ছি ছি বলা বাদ দিলে তাকে আমরা আইডেনটিফাই করব কীভাবে?

—কিন্তু তুই ছি ছি না বললে...আমি কথা শেষ করতে পারি না। ছি ছি বজলু হাত তুলে আমাকে আশ্বস্ত করে।

—ছি ছি না বললেও...সি সি বলছি...ইদানীং।

—মানে?

—মানে আমি একটা 'সি সি তত্ত্ব' বের করেছি!

—কী রকম? ছি ছি'র থেকে সি সিতে প্রমোশন?

—এই পৃথিবীতে তিনটা সি মিলে চতুর্থ একটা সি তৈরি করছে যা পৃথিবী ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট!

—মানে?

—মানে বুঝলি না...কম্পিউটার, ক্রিকেট আর কমার্স এই তিন সি মিলে তৈরি করেছে নতুন একটা সি...ক্র্যাশ...ক্র্যাশ দ্য ওয়ার্ল্ড! বলে ছি ছি বজলু আমাকে ছি ছি বলার সুযোগ না দিয়ে একটা সি মানে সিগারেট ধরিয়ে একটা সিএনজি চড়ে সরে পড়ল।

আমিও তিন সি নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের অফিসের দিকে পা বাড়ালাম।...আসলে দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে এখন সি'র একটা শব্দই যথেষ্ট...সেটা হচ্ছে 'ক্রিটিক্যাল'...দেশটার অবস্থা বড় ক্রিটিক্যাল। ব্রেন ওয়াশ হওয়া জেএমবির আত্মঘাতী কর্মীরা সব বেহেশতের দিকে রওনা দিতে শুরু করেছে!...তারা বেহেশতে যাক তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু দেশটাকে নরক বানিয়ে যাওয়ার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? এর উত্তর কে দেবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না প্রধানমন্ত্রী? অবশ্য প্রধানমন্ত্রী দেখলাম উদ্বোধন নিয়ে ব্যস্ত, হয় হাসপাতাল উদ্বোধন করছেন নয় সেতু। দুটোই সিম্বলিক! হাসপাতাল তো লাগবেই যেভাবে আত্মঘাতী বোমায় আহতদের সংখ্যা বাড়ছে তাতে করে হাসপাতাল বাড়াতে হবে...আর সেতু...? জঙ্গিদের আসতে হবে না? অবশ্য সি-এর আরেকটা শব্দ বর্তমানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বানানটা সি দিয়ে না এস দিয়ে, তারপরও এই লেখার সাথে এর একটা যোগাযোগ আছে...সেটা হচ্ছে সিম কার্ড! জঙ্গি নেতা শায়খ আবদুর রহমানের নাকি ২৫টা সিম কার্ড আছে! এই সিম আছে বলেই বোমাবাজির নেটওয়ার্কিংয়ে কত সুবিধা! ছেলেবেলায় বিতর্ক করতে হত বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, এখন দেখছি...বিজ্ঞানের এই সিম তো পুরোই অভিশাপ! তবে সিমের প্রসঙ্গ যখন এলই তখন একটা ব্যাপারে এই চান্সে জাতির বিবেকের কাছে একটা প্রশ্ন রাখা যায়। সেটা হচ্ছে পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে সিম কার্ডের দাম নামতে নামতে ৯৯ টাকায় নেমে এসেছিল (বাংলালিংক)। তারপর হঠাৎ আমাদের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান রাতারাতি ট্যাক্স বসিয়ে দিলেন ১১০০ টাকা (নাকি ১২০০ টাকা?)। ৯৯ টাকার সিমের দাম এক ধাক্কায় হয়ে গেল ১১৯৯ টাকা (নাকি ১২৯৯ টাকা)। এ নিয়ে লেখালেখি হল অনেক কিন্তু ট্যাক্স কমল না। তারপর অনেক দেনদরবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে সেই ট্যাক্স নেমে এল ৯০০ টাকায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন কিন্তু আবার যেইকে সেই...ট্যাক্স নেই! সিমের দাম আবার নেমে আসছে (অবশ্য কাঁচা বাজারের সিম বাড়ছে) ৩০০... ২০০...তা হলে অর্থমন্ত্রীর ট্যাক্সের ব্যাপারটা গেল কই? এ কোন শুভঙ্করের ফাঁকি?

শুভঙ্কর গেছে বাজারে, দোকানিকে বলল

—এই, ভালো ঘি আছে?

—আছে।

—দাম কত?

—১০০ টাকা।

—এই নাও ৫০০ টাকা, ৪০০ টাকা ফেরত দাও। দোকানি ফেরত দিল, ঘিও দিল। হঠাৎ শুভঙ্করের কী মনে হল—বলল, 'নারে ভাই তোমার ঘি-টা ভালো ঠেকছে না, এই তোমার ঘি ফেরত... আমার ৫০০ টাকা ফেরত দাও।' দোকানি ঘি ফেরত নিয়ে ৫০০ টাকা ফেরত দিল। শুভঙ্কর চলে গেল। দিনের শেষে হিসাব মেলাতে গিয়ে বোকা দোকানদার টের পেল শুভঙ্কর ফাঁকি দিয়ে বেশি না মাত্র ৪০০ টাকা নিয়ে গেছে! দোকানি মনে মনে নিজেকে বাহবা দিল, তাও ভালো যে বিশ টাকা কম মেরেছে, যদি ৪২০ টাকা মারত তা হলে অন্যদের বলত কীভাবে '৪২০ টাকা ধরা খেলাম!'

**শেষ কথা বলে কিছু নেই**

যে হারে চারদিকে নকল ভোটার তৈরি হচ্ছে তাতে করে মনে হচ্ছে আগামী নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে না। চারদিকে ভোটারের ছড়াছড়ি...আসল ভোটার, নকল ভোটার, ভুয়া ভোটার, অদৃশ্য ভোটার, নাবালক ভোটার, সাবালক ভোটার...কতরকম ভোটার চান? ভোটার উন্নয়নে বিএনপি সরকারের এটাও একটা জোয়ার। এই অবস্থাই যদি চলে তা হলে কী ঘটতে পারে আগামী নির্বাচনে? কল্পনা করা যাক না...

এক লোক সাতসকালে গেছে ভোট দিতে। সে খুব তাড়াহুড়ো শুরু করেছে 'ভাই জলদি করেন?'

—কেন আপনার এত সকালে এত তাড়া কীসের?

—ভাই আমাকে আরো দু জায়গায় ভোট দিতে যেতে হবে...তাই বলছি একটু হাত চালান...

—কী বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি, এখানে আমি অরিজিনাল ভোটার। এ ছাড়াও আরো দু জায়গায় আমি ভোটার। এক জায়গায় অদৃশ্য ভোটার, এক জায়গায় নাবালক ভোটার।

—মানে?

—মানে এক জায়গায় আমার অস্তিত্ব আছে কিন্তু ঠিকানা নেই। আরেক জায়গায় আমার বয়স তের...এটাও একটা রেকর্ড, মাত্র তের বছর বয়সে ভোট দিতে পারাটা কম গৌরবের কাজ নয়। ...নেন নেন জলদি ব্যালট পেপারটা বের করেন আর আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগান।

—আরে ভাই ভুলটা তো এখানেই করছেন...আপনাব হাতে এই অমোচনীয় কালি লাগানোর পরে আপনি কি মনে করেন অন্য কোনো ভোট আর দিতে পারবেন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

--আর ভাই আঙুলের অমোচনীয় কালি নিয়ে আপনি এখনো বসে আছেন? এই নয়া তেলেসমাতি ভোটার লিস্ট করে জাতির কপালে যে চুন-কালি লাগল সেটার কথা একবার ভাবেন...

বলে সে হনহন করে ছুটে গেল ব্যালট পেপার নিয়ে ব্যালট বক্সের দিকে। বোধ হয় ভোট দিতেই।

আরেক লোক সেও গেছে ভোট দিতে। তবে এবারে পোলিং এজেন্টরা সতর্ক।

—আপনি ভোটার?

—অবশ্যই, না হলে এখানে এসেছি কেন?

—না মানে বলছি আপনি জেনুইন ভোটার তো? মানে আসল ভোটার তো?

—অবশ্যই।

—কী করে বুঝলেন?

—এবার আমার বাসায় কেউ ভোটার লিস্টের কাগজপত্র নিয়ে আসে নি। তাতেই বুঝলাম আমি আসল ভোটার...। আসল আর নকল ভোটারের ডামাডোলে এক লোক আর ভোট দিতেই গেল না। এগিয়ে গেল এক কৌতূহলী রিপোর্টার।

—কী ভাই সবাই ভোট দিতে গেল আপনি গেলেন না যে?

—কী আর বলব রে ভাই আমি একজন ব্যবসায়ী। এই গত পাঁচ বছরে চৌদ্দ রকম ভ্যাট দিতে দিতে আমি শ্যাষ! ভোট দিতে যাওয়ার আর শক্তি নাই।

এবার আসা যাক প্রার্থীর ক্ষেত্রে। মানে প্রার্থী স্বয়ং যখন ভোটার। যথারীতি প্রার্থী নিজের ভোট দিল। এবং দেখা গেল অচিরেই সে নির্বাচনে বিষ্ঠা হারা হেরেছে।

গণনা করে দেখা গেল ভোট পেয়েছে মাত্র দুটি! খবর শুনে সেই 'জনপ্রিয়' প্রার্থীর স্ত্রী মহা ক্ষেপে গেল। সোজা এসে স্বামীর কলার চেপে ধরল।

—বলি পেয়েছটা কী? একটা ভোট তুমি নিজে দিয়েছ...আরেকটা কে দিল? আমি তোমাকে যে দেই নি এটা নিশ্চিত...তা হলে দ্বিতীয় ভোটটা দিল কে? তলে তলে কার সঙ্গে কী নটঘট শুরু করেছ শুনি? আজ বলতেই হবে...

—আরে না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়।

—তা হলে কে দিল দ্বিতীয় ভোটটা?

—আমিই দিয়েছি।

—মানে?

—বাহ তুমি জান না, এবার নতুন ভোটার লিস্টে প্রত্যেকেই দুটা করে ভোট দিয়েছে একটা আসল একটা নকল।

তবে সব কথার শেষ কথা হচ্ছে আমরা আমাদের দেশে চাই সুস্থ সুন্দর একটি নির্বাচন। ভুয়া ভোটারের নির্বাচন নয়। প্রকৃত ভোটারের প্রকৃত নির্বাচন। মোট কথা আমরা চাই সুস্থ রাজনীতি, শেষে একটি সুস্থ নির্বাচন...কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রাজনীতিতে যে আবার শেষ কথা বলে কিছু নেই...!

## দাড়ি বনাম দাড়া

জোট সরকারের কারণে কিনা কে জানে ইদানীং দাড়ি টুপি বোরকা একটু যেন বেশি দেখা যাচ্ছে পথেঘাটে। তা ছাড়া নতুন একটা ফ্যাশন এসেছে...অতি আধুনিক তরুণরাও থুতনির নিচে বিশেষ এক ধরনের দাড়ি রাখতে শুরু করেছে, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় থুতনির



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিচে বোধ হয় এক চিলতে ছায়া। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় ওটা আসলে দাড়ি। সেদিন হঠাৎ টেলিভিশনে দেখি একটা প্রাইভেট চ্যানেলে বাংলাভাইয়ের মতো বিশাল দাড়ি নিয়ে এক তরুণ স্প্যানিশ গিটার হাতে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে অতি আধুনিক গান গাচ্ছে, সম্ভবত ব্যান্ডের গান। আমাদের আরেক তরুণ (তার থুতনির নিচেও আলো-ছায়ার খেলা শুরু হয়েছে) বলল এটাই এখন লেটেস্ট ফ্যাশন। তার ওপর আরেকটা সর্বনাশ হয়েছে পার্মেন্টস বিদ্রোহের সময় উত্তেজিত শ্রমিকরা একটা ব্লেড ফ্যাক্টরি পুড়িয়ে দিয়েছে... তার মানে কী দাঁড়াল একদিকে আধ্যাত্মিক দাড়ি (রাজনৈতিক দাড়ি তো আছেই), একদিকে ফ্যাশনের দাড়ি...আরেকদিকে ব্লেডের কারখানা পুড়িয়ে ফেলার কারণে দাড়ি কামাতে না পেরে গজিয়ে ওঠা দুর্বিনীত দাড়ি। তার মানে যাকে বলে চারিদিকে দাড়িতে দাড়িময়। বরং দাড়ি নিয়ে একটা ঘটনা বলে এই লেখার দাঁড়ি টানি।

এক পরিবারের বড় ভাই বহু বছর পর বিদেশ থেকে ফিরছে। ছোট তিন ভাই গেছে এয়ারপোর্টে বড় ভাইকে নিয়ে আসতে। যথাসময়ে প্লেন এল। বড় ভাই কাস্টমসের ঝামেলা সেরে বাইরে এসে তার তিন ভাইকে খুঁজে পায় না...। তারা এয়ারপোর্টে থাকবে সেরকমই কথা ছিল। হঠাৎ বড় ভাই দেখে তিনজন লোক তার দিকে হেঁটে আসছে, তাদের তিনজনের দাড়িই ভূমি স্পর্শ করেছে। তারা আরো কাছে আসতেই বড় ভাই বুঝতে পারল এরা তার তিন ভাই।

—তোমাদের একি অবস্থা? বিদেশে থাকতে শুনেছি এ দেশে মৌলবাদীর উত্থান হয়েছে, তবে কি তোমরাও?

—না না।

—তা হলে? নাকি এটাই এখন লেটেস্ট ফ্যাশন?

—তাও না।

—তা হলে?

—বাহ্, তোমার মনে নেই তুমি বিদেশ যাওয়ার সময় আমরা তিন ভাই মিলে তোমাকে কী গিফট করেছিলাম?

—কী গিফট করেছিলে? আমার তো আসলেই মনে নেই।

—সত্যি তুমি আগের মতোই ভুলোমন রয়ে গেছ... এক ভাই বলে।

—ভাইয়াকে মনে করিয়ে দাও না। পাশ থেকে আরেক ভাই বলে ওঠে।

—তা হলে বলি কী গিফট করেছিলাম আমরা...বাসার একমাত্র দাড়ি কামানোর রেজারের সেটটা।

শেষ হইয়াও হইল না শেষ। দাঁড়ি টানতে চাইলেও অনেক সময় জায়গামতো দাঁড়ি টানা সম্ভব হয় না। এটা নিয়ে অবশ্য একটা গল্প আছে। এক স্কুলে এক বাচ্চাকে দেখা গেল যাই লেখে না কেন কখনোই সে দাঁড়ি টানে না। শিক্ষক তাকে ধরলেন, 'এই ছেলে লেখা শেষ হলে দাঁড়ি টান না কেন?' ছেলেটি একটু থেমে ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, একবার নানার দাড়ি টেনেছিলাম, তখন উনি এমন ধোলাই দিয়েছিলেন যে... কী বলব, তখনই বুঝেছিলাম দাড়ি টানা বেয়াদবি...তারপর থেকে আর বেয়াদবি করি না...মানে দাড়ি টানি না।'

আরেকটা ঘটনা। এটাও একটা স্কুলেরই গল্প, তবে একটু উঁচু ক্লাসের। এক স্যার সেই ক্লাসে ঢুকলেন। ঢুকেই তার নজর পড়ল সামনের বেঞ্চে বসা এক ছেলের দিকে, যার নিচের ঠোঁটের নিচে এক গুচ্ছ চুল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ঐ তুই ঠোঁটের নিচে ওটা কী রেখেছিস? দাড়ি?

—না স্যার।

—তা হলে?

—দাড়া।

—মানে?

—স্যার, দাড়ি না দাড়া...

—বেশ...তুই এবার বেঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়া।

বাকি ক্লাস ঐ দাড়াওলাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হল বেঞ্চের ওপর। আর কি! এবার সত্যি সত্যিই দাঁড়ি (।)

**একটি সুসন্তানই যথেষ্ট!**

পরিবার পরিকল্পনার প্রথম বিখ্যাত স্লোগানটা তো সবারই জানা। সেটা ছিল 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট'। তারপর ঢাকা ওয়াসার ট্যাপ দিয়ে বহু পানি গড়িয়েছে, সেই স্লোগান পরিবর্তিত হয়ে এখন হয়েছে—'ছেলে হোক মেয়ে হোক একটি সন্তানই যথেষ্ট'। তারপর পিডিবির বিদ্যুতের তার দিয়ে বহু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে, সেই স্লোগান আরো পরিবর্তিত হয়ে এখন হয়েছে—'ছেলে হোক মেয়ে হোক একটি সুসন্তানই যথেষ্ট'...এই যখন অবস্থা তখন খবর পেলাম আমার এক বন্ধুর বাচ্চা হয়েছে...আগেই তার দুই বাচ্চা ছিল। একটা ছেলে একটা মেয়ে। এখন খবর পেলাম তার আরেকটা বাচ্চা হয়েছে।

শুনে একটু অবাকই হলাম। কারণ বন্ধুটি দেশের জনসংখ্যা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিল। দেখা হলেই প্রথম যে কথাটি বলত সেটা হচ্ছে দেশটার উন্নতি হচ্ছে না তার প্রধান কারণ জনসংখ্যা। সেই বন্ধুর ঘরে তৃতীয় সন্তান? অবাক না হয়ে উপায় কী! ক'দিন বাদেই দেখা হল তার সাথে। ঠাট্টা করে বললাম, 'কীরে ওয়ার্ল্ডকাপ সিজনে ফুটবল টিম নামাচ্ছিস নাকি?'

আমার 'ব্ল্যাক হিউমারে' বন্ধু বিশেষ ক্ষিপ্ত হল বলে মনে হল।

এ প্রসঙ্গে আরেকটা ঘটনা বলা যেতে পারে। দুই বৃদ্ধ পিতার দেখা—

১ম বৃদ্ধ পিতা : আপনার ছেলেরা কেমন আছে?

২য় বৃদ্ধ পিতা : জি ভালো।

১ম বৃদ্ধ পিতা : তারা কে কোথায় আছে?

২য় বৃদ্ধ পিতা : এক সাথেই আছে।

১ম বৃদ্ধ পিতা : এক সাথেই আছে? কোথায়?

২য় বৃদ্ধ পিতা : হ্যাঁ...ওরা এগার জন তো, তাই একটা ফুটবল টিমেই আছে।

আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ সিজন বলে সবকিছুতেই এখন ফুটবল। ঢাকার আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় বোধহয় 'ভিসামুক্ত পৃথিবীর' আন্দোলন সফল হয়েছে...চারিদিকে প্রায় সব দেশের পতাকা উড়ছে। মানে যেসব দেশ খেলছে ওয়ার্ল্ড কাপে।

আমার আরেক পরিচিত বলল

—ভাগ্য ভালো পাকিস্তান ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে নাই।

—কেন, থাকলে কী হত?

—থাকলে কী হত এখনো বুঝতে পারছ না?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—না, কী হত?

—থাকলে নিশ্চয়ই তাদের ফ্ল্যাগও উড়তে দেখা যেত...সেই দৃশ্য দেখার থেকে তো বাঁচলাম।

মোটকথা বিশ্বকাপ ফুটবলের কারণে পৃথিবী যতটা না উত্তপ্ত তার থেকে বেশি গরম হয়ে আছে বাংলাদেশ। সেদিন দেখি ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার দু সাপোর্টার বাসের ভেতর লেগে গেছে। কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান। বাসের ভেতর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। এক পর্যায়ে মনে হল উত্তাপের চোটে আগুনই ধরে যাবে বাসের ভেতর...তার চেয়ে বরং সত্যি আগুনের একটা ঘটনা শোনা যাক...বিষয় ওই ফুটবলই...এক এপার্টমেন্টে আগুন ধরেছে...দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে...সবাই মোটামুটি উদ্ধার পেলেও এক মহিলাকে দেখা গেল এগার তলায় তার বাচ্চাকে নিয়ে চিৎকার করছে 'বাঁচাও বাঁচাও...' নিচ থেকে একজন চিৎকার করল

—আপনার বাচ্চাকে ছুড়ে ফেলুন নিচে।

—অসম্ভব।

—আহ ফেলুন না...আমি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ...ভালো ক্যাচ ধরতে পারি।

উপায় নেই দেখে মহিলা কী করবে। ছুড়ে দিল বাচ্চাটিকে। আর ঠিকই ঝট করে ক্যাচ ধরে ফেলল লোকটা। তারপর মাটিতে একটা ড্রপ দিয়ে হাই কিক মেরে বাচ্চাটাকে ফের ছুড়ে দিল মহিলার কাছে...!

—একি করলেন? পাশ থেকে আরেক লোক জিজ্ঞেস না করে পারল না। অপ্রস্তুত লোকটি বলল, 'মানে ফুটবলে গোলি ছিলাম তো অভ্যাসটা ছাড়তে পারি নি।'

শেষ একটি গল্প দিয়ে এবারের লেখাটাকে লাল কার্ড দেখানো যাক।

গল্প শিব্রাম চক্রবর্তীর...পুজোর সময় তার বোন নতুন ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ি পরে বেরুচ্ছে—শিব্রাম চক্রবর্তীকে বলল

—দাদা, দেখ তো নতুন ব্লাউজটার সঙ্গে এই শাড়িতে আমায় মানিয়েছে কেমন?

শিব্রাম চক্রবর্তী একনজর দেখলেন তারপর বললেন

—দারুণ...ঠিক যেন মোহনবাগান ভার্সেস ইস্ট বেঙ্গল।

**লুক এলাইক!**

চুনোপুঁটি জঙ্গিরা একে একে ধরা পড়ছে। রাঘব বোয়ালরা ধরা পড়ছে না। মাঝখান থেকে বিপদে পড়ছে লুক এলাইকরা মানে যারা দেখতে অনেকটা শায়খ আবদুর রহমান বা বাংলাভাইয়ের মতো তারা। এরকম দু জনকে ধরে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে...বা হচ্ছে। পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কি না জানা যায় নি।

বিদেশে লুক এলাইকের বিরাট ডিমান্ড। বিশেষ করে বিখ্যাত ব্যক্তিদের লুক এলাইকদের। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে যে শহরে জন্মেছেন সেখানে নাকি ষাট জন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আছেন মানে তার মতো দেখতে ষাট জন 'লুক এলাইক' আছেন। তাদের বিরাট ডিমান্ড বিশেষ করে হেমিংওয়ের জন্মদিনে তো কথাই নেই। তাদের নিয়ে রীতিমতো টানাহেঁচড়া শুরু হয়ে যায়।

রাশিয়ার রেড স্কয়ারে নাকি দু-তিন জন লেনিনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সব মহামতি লেনিনের লুক এলাইক। ফরেনরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন। মোট কথা তেমন সেলিব্রেটির লুক এলাইক হতে পারলে লাভ আছে। অবশ্য আমাদের দেশের বর্তমান



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অবস্থা ভিন্ন, এখানে জঙ্গি প্রধানদের লুক এলাইকবা বিরাট বিপদে আছেন। এ প্রসঙ্গে একটা সত্যি গল্প শোনা যেতে পারে—

এক সেলিব্রেটি হেঁটে চলেছেন। (সাধারণত তিনি হেঁটে যান না, গাড়িতেই চলাচল করেন। সেদিন কী মনে করে হেঁটে যাচ্ছেন) এ সময় সেই সেলিব্রেটির কয়েকজন ফ্যান ছুটে এল 'আচ্ছা আপনি উনার (মানে সেই সেলিব্রেটির) কয় নম্বর লুক এলাইক?' শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল সেই সেলিব্রেটির। কড়া গলায় বললেন

—আমি লুক এলাইক না, আমিই...অমুক!

—তাই নাকি? তা হলে উনার বিখ্যাত ওই গানটার প্রথম দুই লাইন গান তো দেখি...ফ্যানদের গলায় টিটকারির সুর। মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল সেলিব্রেটির। 'স্টেজে একেকটা গান করতে আমি কত টাকা নেই তোমাদের জানা আছে?'

—ও অনেক টাকা নেন? নিন, এক ডলার নগদ...সেলিব্রেটি দেখলেন এরা তো মহা ফাজলামো শুরু করেছে তখন তিনি বাধ্য হয়ে পাশ দিয়ে যাওয়া পেট্রল পুলিশের সাহায্য চাইলেন। পেট্রল পুলিশ এল, সব শুনেটুনে বলল, 'তারা প্রকৃত সেলিব্রেটিদের হেল্প করতে রাজি আছে নকলদের নয়, মানে লুক এলাইকদের নয়।' বলে বিদায় নিল। তারপর ফ্যানরা যা করল সেই সেলিব্রেটিকে সেটাকে সাদা বাংলায় বলে স্রেফ 'প্যাঁদানি'...

লুক এলাইক বিড়ম্বনার এই ঘটনাটি আমি দৈনিক পত্রিকাতে পড়েছিলাম বহু বছর আগে। ক'দিন আগে টিভিতে লুক এলাইক নিয়েই একটা বিখ্যাত সিনেমা দেখলাম। পুরস্কারকৃত হিন্দি ছবি। গ্রামের সাধারণ মেয়ের খুব শখ বোম্বে গিয়ে বিখ্যাত সেলিব্রেটি নায়ক শাহরুখ খান বা সঞ্জয় কুমার বা অক্ষয় কুমার এদের সঙ্গে নায়িকার রোল করবে। ওই গ্রামের আরেক ছেলে তাকে সাহায্য করল...টাকা-পয়সা খরচ করে সত্যি সত্যিই লাইন করে ফেলল তারা, বোম্বে এসে...শুধু একজন নায়কের সাথে না চাইলে সে এক ছবিতে সব নায়কের সাথেও অভিনয় করতে পারে...বলিউডে সবই সম্ভব। নায়িকাও রাজি, মন্দ কী? এক ঢিলে একাধিক পাখি মারা গেলে সমস্যা কোথায়? নির্ধারিত দিনে দেখা গেল হ্যাঁ কথা ঠিক, নায়ক প্রায় সবাই হাজির...তবে সবই লুক এলাইক।

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। মানে জঙ্গি প্রসঙ্গে। এখন জঙ্গিরা সব ক্লিন শেভ হয়ে ঘোরাফেরা করছে। ক'দিন আগেও মানুষ দাড়িওলাদের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাত এখন তাকাচ্ছে ক্লিন শেভওয়ালাদের দিকে, ক্লিন শেভ করে বের হলেও যেন বিপদ। এই যখন অবস্থা তখন এক ভদ্র মহিলা খেয়াল করলেন তার গাড়ির ড্রাইভার ঠিকমতো শেভ করছে না। ব্যাপারটা তার পছন্দ হল না। যদিও ড্রাইভারটা অসাধারণ, কাজে-কর্মে নিখুঁত। তিনি কিছুতেই চান না এই ড্রাইভারের মনে আঘাত দিয়ে কিছু বলতে, পাশাপাশি সে যে ইদানীং নিয়মিত শেভ করছে না এটাও তার পছন্দ হচ্ছে না, কী করা যায়? তিনি ঠিক করলেন কায়দা করে তিনি তার শেভ করার প্রসঙ্গটা আনবেন। তো একদিন গাড়িতে যেতে যেতে তিনি খেলাচ্ছলে তার ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলেন

—আচ্ছা মজনু (ধরা যাক তার নাম মজনু) দিনে কবার মানুষের শেভ করা উচিত?

মজনু পেছন ফিরে তার মালিককে একনজর দেখে নিল তারপর বলল, 'ম্যাডাম সত্যি কথা বলতে কি আপনার মতো দাড়ি হলে মাসে দু'বার শেভ করলেই যথেষ্ট।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

[illegible]

## লাল কার্ড

নির্বাচন কমিশনের সিইসিকে নিয়ে সরকারি নাটক এখন ম্যাগাসিরিয়ালে রূপ নিয়েছে! মনে হচ্ছে ভালো কোনো স্পন্সর পেলে যে কোনো চ্যানেল লুফে নেবে এই নাটক। আর মাশাল্লাহ চ্যানেলের তো কোনো কমতি নেই এখন। কে জানে এখন চ্যানেল বেশি বলেই যেন স্বাভাবিক নাটকের পাশাপাশি সরকারি নাটকও মনে হচ্ছে একটু বেশি বেশিই হচ্ছে। সেদিন একজন বলল, 'এ বরং একদিক দিয়ে ভালো। টিভির প্যানপ্যানানি, আমি-তুমি তুমি-আমি...পারমুটেশন কম্বিনেশন টাইপ দ্বিমাত্রিক নাটক দেখতে দেখতে ক্লান্ত এখন বেশ ত্রিমাত্রিক নাটক দেখতে পাচ্ছি আমরা!'

—ত্রিমাত্রিক মানে? আমি জানতে চাই।

—আরে টিভির বাইরে বাস্তবের সব নাটকই তো ত্রিমাত্রিক।

—তা মন্দ বল নি।

বরং এই চান্সে একটা ত্রিমাত্রিক জোক্স শোনা যাক। মানে ত্রিমাত্রিক টিভির জোক আর কি! এক লোকের বাসায় একটি বিশাল থ্রিডি টিভি। তো লোকটি অবশ্য বাসায় নেই। আর এই সময় মানে এই সুযোগে লোকটির সুন্দরী স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক এসে হাজির। তো হালকার ওপর পাতলা পরকীয়া চলছে। এমন সময় বিনা মেঘে 'থান্ডার স্ট্রোম'! অফিস টাইমে অবেলায় স্বামী এসে হাজির। এখন কী করা, চট করে সুন্দরী স্ত্রী তার প্রেমিককে ঠেলে দিল থ্রিডি টিভির পেছনে। ঘাপটি মেরে রইল প্রেমিক। ঘরে ঢুকল স্বামী। ঢুকেই সোজা টিভির সামনে বসে গেল খেলা দেখতে, বোধহয় জমকালো কোনো ফুটবল খেলাই হচ্ছিল সেদিন। মুখ শুকনো করে স্ত্রী বেচারাও বসে রইল তার পাশে।

এদিকে প্রেমিক বেচারা ঘাপটি মেরে বসে থাকতে থাকতে সহ্যের বাইরে চলে গেল। কাঁহাতক আর হাঁটু মুড়ে বসে থাকা যায়! হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল এবং কোনো কথা না বলে সোজা হেঁটে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল। স্ত্রী তো শিউরে উঠল! স্বামী এখন কী বলে। স্বামী অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল স্ত্রীর দিকে তারপর বলল

—আচ্ছা তুমি কি খেয়াল করেছ? রেফারি কি লাল কার্ড দেখাল কোনো প্লেয়ারকে?

—না মানে?

—দেখলে না একজন প্লেয়ার বের হয়ে গেল!

আরেকটা প্রায় লাল কার্ডের ঘটনার মতোই একটা দুর্ঘটনা...এখানে ভেন্যু একটা বাসা, পাত্র-পাত্রী একজন ভেট চিকিৎসক আর বাড়ির গিন্নি। গিন্নি ভেট ডাক্তারকে খবর দিয়ে এনেছেন যে তার বিড়ালটার সমস্যাটা কী দেখতে। ভেট ডাক্তার বিড়ালটা দেখে-টেখে বললেন

—আরে সুখবর আছে আপনার জন্য।

—কী?

—আপনার বিড়াল তো প্রেগনেন্ট।

—কী বলছেন?

—মানে বাচ্চা হবে।

—এসব কী বলছেন আপনি? আমি আমার বিড়ালকে আশপাশের কোনো ছেলে বিড়ালের সঙ্গে মিশতেই দেই না। আর আশপাশে কোনো ছেলে বিড়ালও নেই...আপনি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তো দেখছি কোনো ডাক্তারই না...পালা পশুর সম্মান রেখে কথা বলতে জানেন না। এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান...বলে একরকম লাল কার্ড দেখিয়েই রেগেমেগে মহিলা বের করে দিল ভেট ডাক্তারকে। ভেট চিকিৎসক কী আর করবে, বের হয়ে গেল। কিন্তু বের হয়ে দেখে বাড়ির বারান্দায় এক হুলো বিড়াল বসে! তিনি ফের দরজায় নক করলেন। গিন্নি আবার দরজা খুলল।

—কী হল, আবার কী চান?

—আপনি বললেন আশপাশে কোনো ছেলে বিড়াল নেই...তা হলে ওইটা কী? ভেট হুলো বিড়ালটাকে দেখালেন।

—আশ্চর্য! ওটা তো আমার বিড়ালটার আপন মায়ের পেটের ভাই!

আবার সিইসির ম্যাগাসিরিয়ালে ফিরে আসি। তিনি আসলে জাতির সাথে লুকোচুরি খেলছেন। কখনো অফিসে দরজা বন্ধ করে থাকছেন, কখনো হাসপাতালের কেবিনে...একবার টিভিতে দেখি তিনি একটা ওয়েস্টার্ন হ্যাট পরে বাংলা সিনেমার টিপিক্যাল ভিলেনের মতো হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন। আমার মাথায় আসে না একজন বিচারপতি কীভাবে এ ধরনের একটা হ্যাট পরে নিজের দেশে অফিস করেন! অবশ্য এটা নাটকের ড্রেস হলে অন্য কথা...কেননা এই দুনিয়াটাই একটা নাট্যশালা আর আমরা সব নাটকের ভালো খারাপ পাত্র-পাত্রী...তবে খেয়াল রাখতে হবে একবার দর্শক যদি টমেটো, আলু আর দেশি পচা ডিম মারতে শুরু করে তা হলে কিন্তু আর রক্ষে নেই...অতএব রোগ হওয়ার আগেই রোগ সারাও...তবে হাসপাতালে ঘাপটি মেরো না...আমাদের ওই মান্যবর সিইসির মতো!

**৫০০ ক্যারেট হীরে!**

রোজা শুরু হয়ে গেছে। দুই গরিব লোক কথা বলছে ফুটপাতে বসে

—বুঝলে ভায়া, আমরা গরিবরা সবদিক দিয়াই মরছি!

—এ আর নতুন কথা কী?

—না, রমজান মাস আইলে আবার নতুন কইরা মনে পইড়া যায়।

—যেমন?

—যেমন ধর আমরা না খায়া থাকি বারো মাস, সোয়াব পাই মাত্র এক মাসের! এইডা কোনো বিচার হইল? তুমিই কও?

—ঠিক ঠিক, এই লাইনে তো ভাবি নাই...চল এই নিয়া আমরা আল্লার কাছে ফরিয়াদি করি...

—কিন্তু ক্যামনে করমু?

—চল ভালো কোনো আলেমের কাছে যাই।

—কিন্তু এখন তো আরেক মুশকিল হইছে!

—কী মুশকিল?

—কে যে আলেম আর কে যে বোমাবাজ বোঝা মুশকিল!

তারপরও তারা বহু খুঁজে খুঁজে এক প্রকৃত শিক্ষিত আলেমের কাছে গিয়ে হাজির হল। তাকে তাদের যুক্তির কথা বলল। আলেম শুনলেন তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আল্লাহ কিন্তু ধনীদের চেয়ে গরিবদের বেশি পেয়ার করেন। তাই দেখ না এই পৃথিবীতে গরিবদের তিনি সৃষ্টি করেছেন বেশি বেশি...'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কিন্তু গরিবদের তো পদে পদে বিপদ।

—তিনি তাদের পরীক্ষা করতেছেন।

—কিন্তু পরীক্ষা শুধু গরিবদের দিতে হবে কেন? বড়লোকদের পরীক্ষা নাই?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলেম বললেন 'তাদেরও পরীক্ষা আছে। তবে তাদের পরীক্ষা অন্য কিসিমের...'

—কী রকম?

—টোফেল, জিআরই, স্যাট...

তো দুই গরিব লোক আলেমের প্রশ্ন-উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে ফিরে চলল। হঠাৎ দেখে পথে পড়ে আছে একটা ময়লা পুরোনো ধরনের চেরাগ। হাতে তুলে ঘষা দিয়ে পরিষ্কার করতে যেতেই চেরাগের ভেতর থেকে ভুস ভুস করে ধোঁয়া বের হতে লাগল। তারা দু জন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে এক আলিশান জিন আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে! তাদের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিল

—তোমাদের দু জনকে দুটো বর দিব, কী চাও? জলদি বল?

—কিছু চাই না, রাস্তাডা ছাড়েন বাড়ি যাই।

—তোমার কী চাই? অবাক হয়ে জিন দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করল।

—আমারও একই কথা রাস্তাডা দয়া কইরা ছাড়েন বাড়ি যাই, রোজায় ধরছে... যায়া দেখি বউ ইফতার-টিফতার কিছু ম্যানেজ করছে নাকি...নাকি টানা ডাবল রোজা রাখতে হইব...কে জানে!

জিন হতভম্ব হয়ে গেল। এরা তার কাছে কিছুই চাইল না। এও কি সম্ভব! সে ছুটে গিয়ে বলল, 'দেখ, তোমরা কিছু না চাইলেও আমাকে কিছু দিতেই হবে। নইলে জিন সমাজে আমাকে বেইজ্জতি হতে হবে। এই নাও দু জনের জন্য দুটো করে হীরে, এক একটি ৫০০ ক্যারেট করে, দাম ৫০০ কোটি টাকার উপরে হবে।'

—পাগল না উন্মাদ তুমি? জানো না এ দেশে ২০০ ক্যারেটের বেশি হীরে ঢোকার পারমিশন নেই! পরে ধরা খেয়ে জেলে পচে মরি আর কি!

—হ্যাঁ ঠিক বলেছিস, অলরেডি একজন ধরা খেয়ে জেলে...লবিং করেও কোনো লাভ হচ্ছে না। আর আমাদের তো লবিংয়ের লোকই নেই। চল চল এই পাগল জিন আমাদের মাথা খারাপ করে দেবে। দু জন পা চালিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল। হতভম্ব জিন দু হাতে দুই ৫০০ ক্যারেটের হীরে নিয়ে দাঁড়িয়ে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে রইল!

তো পরে জিন হতাশ হয়ে তাদের কোহকাফ নগরীর কোষাগারে তার দুই হীরে জমা দিতে ফিরে গেল।

—একি, হীরে আবার ফেরত আনলে যে? কোষাগারের দায়িত্বে থাকা জিন জানতে চাইল।

—নিল না।

—নিল না? মানুষ হীরে নিল না? কী বলছ তুমি? ওহে তুমি মানুষদের মতো নেশাটেশা করে আস নি তো? ডাইল-টাইল?

—না।

—আচ্ছা ওটা কোন দেশের ঘটনা বল তো? দেশটার নামটা কী?

—বাংলাদেশ।

—ও, তাই বল...ওটা সব সম্ভবের দেশ! ওই দেশে সবই সম্ভব!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**নতুন বছরে...**

আবার আরেকটি নতুন বছর চলে এল। ২০০৫ বাদ হয়ে ২০০৬। এই নতুন বছরটা কেমন কাটবে এ নিয়ে নানা জনের নানা মত। যেমন তরুণ বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় একজন বলল

—এ বছর আমি হব সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ!

—কী রকম? আরেকজন জানতে চায়।

—এ বছর থেকে আমি আর একটাও মিথ্যা কথা বলব না...প্রমিজ।

—এই তো সর্বনাশটা করলি!

—মানে?

—মানে বছরের শুরুটাই করলি একটা নির্জলা মিথ্যা কথা দিয়ে।

আরেক আড্ডায় সেই একই প্রশ্ন। 'এ বছরটা কেমন কাটবে?'

—আমি এবার সব পত্রিকার রাশিচক্র মিলিয়ে দেখেছি...

—কী দেখলি?

—দেখলাম, যদি বোমায় না মরি, যদি গুলিতে না মরি, যদি কোনো ছিনতাইকারীর হাতে না মরি, যদি এসিডে না ঝলসাই...তা হলে...

—তা হলে তুই এ বছরও বেঁচে থাকবি?

—না, তা হলে বুঝতে হবে হয় আমি বিদেশে আছি...না হলে দেশের কোনো জেলের ভেতরে আছি! তা ছাড়া আর নিরাপত্তা কোথায় বল?

না, এবার বন্ধু-বান্ধবের আড্ডা থেকে ঘরের ভেতরে ঢোকা যাক মানে কোনো স্বামী-স্ত্রীর কাছে যাওয়া যাক। দেখি না তারা কীভাবে ভাবছে নতুন বছরটা নিয়ে!

স্বামী : দেখ এই নতুন বছর থেকে চল আমরা প্রতিজ্ঞা করি আর কখনো ঝগড়া করব না।

স্ত্রী : আশ্চর্য! আমিও ঠিক এ কথাটাই তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম।

স্বামী : বলতে চাচ্ছিলে কিন্তু বলছিলে না...তার মানে কী? ভালো কাজের ক্রেডিটটা তোমার নেয়া চাই।

স্ত্রী : কী? আমি সব সময় ভালো কাজের ক্রেডিট নেই?

স্বামী : অবশ্যই নাও! আইডিয়াটা আমার...আর ফস করে বলে ফেললে ঠিক এটাই তুমি বলতে চাচ্ছিলে...এর মানে কী দাঁড়াল?

স্ত্রী : ওরে আমার আইডিয়াবাজরে...ঝাঁটা মারি তোমার আইডিয়ায়...আর ঝাঁটা মারি এই সংসারে...এই আমি চললাম বাপের বাড়ি আর যদি এই মরার সংসারে ফিরে আসি তো...

তার মানে কী দাঁড়াল?...এখানেও সমস্যা, বরং ছোটরা অনেক বেশি সহনশীল। তারা কী ভাবছে এই নতুন বর্ষ নিয়ে? দেখা যাক না একটু...

দুই বাচ্চা কথা বলছে! 'জানিস, আমার বাবা বলেছে, এবার রেজাল্ট ভালো করলে নতুন বছরে একটা রেসিং সাইকেল কিনে দেবে আমাকে।'

—সেটা তো গত বছরও বলেছিল তোর বাবা।

—বাহ! গত বছর রেজাল্ট খারাপ করলাম না...তাই তো সাইকেলটা পেলাম না।

—তা হলে এ বছর তোর রেজাল্ট ভালো হবে? ভালো পরীক্ষা দিয়েছিস?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—এ বছর আমার পাশে একটা ভালো ছাত্রের সিট পড়েছিল...তাই আশা করছি...

নাহ বরং দেশের আশি শতাংশ মানুষের কাছে যাওয়া যাক। যদিও তারা হিসাব করে বাংলা নববর্ষের...তবু দেখা যাক না কী ভাবছে তারা ইংরেজি নববর্ষ নিয়ে...অ্যালুমিনিয়মের একটা শূন্য থালা নিয়ে রাস্তার ধারে বসে আছে এক বৃদ্ধ ফকির। এই সময় টং করে একটা দু টাকার কয়েন পড়ল তার থালায়। "আল্লায় আপনের হায়াত দরাজ করুক" অভ্যাস বসে বিড়বিড় করে বলল বৃদ্ধ ফকির...। এ সময় কয়েন দেয়া লোকটি ফিরে এল। বলল—এই যে বুড়া মিয়া, গত বছর যে দোয়া করলেন এই বছরও একই দোয়া করলেন, বিষয় কী? দোয়া কি নতুন বছরে একটু আপগ্রেড হবে না... মানে নতুন কিছু বলবেন না?

বৃদ্ধ হাসল যেন। তারপর বিড়বিড় করে বলল—'নতুন বছর আইছে মানলাম... কিন্তু মানুষটা যে আমি আরো এক বছর পুরান হয়া গেছি, নতুন কথা আর কী কমু বাজান?'

শেষ করা যাক চিরন্তন সেই অমোঘ বাণী দিয়ে..."নতুন বছরের নতুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে তোমার এত আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই...মনে রেখ তুমি কিন্তু মৃত্যুর দিকে আরো একটি বছর এগিয়ে গেলে।"

**অন্যরকম বৃষ্টি**

নির্বাচনের এখনো অনেক দেরি আছে তারপরও নানা রকমের প্রোপাগান্ডা শুরু হয়ে গেছে। আর তাই এক ফাঁকে একটা প্রায় নির্বাচনী জোক বলে ফেলি—

এক ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হল। সে কঠিন অপরাধী বলে তাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তো ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বললেন, 'তোমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হল। কিছু বলতে চাইলে বলতে পার'। চারিদিকে তখন লোকজন ভিড় করে আছে। কিন্তু ফাঁসির আসামি বলল

—না, আমার কিছু বলার নেই।

—কিছু বলবে না?

—না।

এদিকে সেই দর্শক সারিতে উপস্থিত ছিল এক নেতা যে ওই এলাকায় নমিনেশন নিয়ে নির্বাচন করার চিন্তাভাবনা করছে। সে দেখল এই একটা চান্স এখানে ভালো লোক সমাবেশ হয়েছে পয়সা ছাড়াই। এই চান্সে এখানে একটা নির্বাচনী বক্তৃতা দিলে কেমন হয়? সে তখন ম্যাজিস্ট্রেটকে গিয়ে বলল, 'ভাই আমি এখানকার এমপি প্রার্থী। ওই আসামি যখন কিছু বলবে না তখন আমি কিছু বলতে চাই।' ম্যাজিস্ট্রেট দেখলেন বিপদ, এরকম বলার নিয়ম নেই, তারপরও চিন্তা করলেন বক্তৃতা দিতে না দিলে ইনকেস এই লোক যদি জিতে পরে এমপি-টেমপি হয়ে যায় তখন তাকে প্যাঁদানি দেবে। বরং এখন দু-চার কথা বলে ফেলুক। তিনি অনুমতি দিলেন।

যথারীতি ভাঙা রেকর্ড চালু করে দিল এমপি...তবে সেই যে পরীক্ষায় 'বাবা-মার প্রতি কর্তব্য' পড়ে আসা ছাত্রের মতো (যে হলে এসে দেখে পরীক্ষায় এসেছে বাবা-মার মৃত্যুর পর কর্তব্য) বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল...ভাইয়েরা আমার এই যে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সে কেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আজ আসামি?...কারণ একটাই এলাকায় সঠিক নেতৃত্বের অভাব... ইত্যাদি ইত্যাদি। বক্তৃতার এক পর্যায়ে আসামি ম্যাজিস্ট্রেটকে কাছে ডেকে বলল, 'ভাই আমি এখানে ফাঁসিতে ঝুলে মরতে এসেছি...শব্দদূষণে নির্যাতিত হয়ে মরতে নয়।'

আরেকটি জোক। এটা প্রায় নয় পুরোটাই নির্বাচন বিষয়ক...দুই বন্ধু, তার মধ্যে একজন রাজনীতি করে। আর একজন রাজনীতি করে না।

রাজনীতি করে বন্ধু : শুনেছিস বোধ হয়, আমি এবারও 'ক দল' থেকে নমিনেশন পেয়েছি, নির্বাচন করতে যাচ্ছি।

রাজনীতি করে না বন্ধু : শুনলাম।

রাজনীতি করে বন্ধু : আশা করছি আমাকে তুই এবং তোর পরিবার ভোট দিবি।

রাজনীতি করে না বন্ধু : তুই গতবার যখন 'ক দল' থেকে জিতলি তখন আমি এবং আমার পরিবার 'খ দল'কে ভোট দিয়েছিলাম। তুই যখন দ্বিতীয়বারও 'ক দল' থেকে জিতলি তখনো আমি এবং আমার পরিবার 'খ দল'কে ভোট দিয়েছিলাম। তবে এবার ভাবছি তোর 'ক দল'কেই ভোট দেব।

রাজনীতি করে বন্ধু : না দোস প্লিজ, আমাকে দিস না। তুই আগের মতো 'খ দল'কেই দে...

রাজনীতি করা বন্ধু রাজনীতি না করা বন্ধুর হাত চেপে ধরে।

ওরা একজন আরেকজনের হাত চেপে ধরে থাকুক এই ফাঁকে অন্যরকম এক বৃষ্টির গল্প হয়ে যাক। এটা আর জোক না। সত্যি গল্প।

আমি আর আমার এক কবি বন্ধু (ভুল বললাম কবি শত্রু। বন্ধুই ছিল কিন্তু বিশেষ কারণে সে এখন আমার ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হয়েছে) হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। ঠাস ঠাস বৃষ্টির পানি পড়ার শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু আমরা ভিজছিলাম না। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম অনেক বড় বড় পানির ফোঁটা পড়ছে! আর একটা ফোঁটা থেকে আরেকটা ফোঁটার দূরত্ব বেশ অনেকটা। ফলে আমরা সেই ফাঁকে ফাঁকে দিব্যি হেঁটে আসছিলাম বলেই বোধ হয় ভিজছিলাম না। এরকম অদ্ভুত বৃষ্টি আগে কখনো দেখি নি, আমি আশ্চর্য হয়ে কবি বন্ধুকে (থুড়ি শত্রু) বললাম

—দেখ দেখ, বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আমরা ভিজছি না।

—ওগুলো বৃষ্টি নয়। গম্ভীর হয়ে বলে আমার কবি বন্ধু (থুড়ি শত্রু)।

—তা হলে কী?

—কানসাটের নিহতদের জন্য প্রকৃতির অশ্রু। কখনো শুনেছিস অশ্রুর জলে কেউ ভেজে? আমি তখনো আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম আমরা কেউই ভিজছি না। বড় বড় বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে হেঁটে চলেছি...না ভিজেই। কে জানে মানুষ না কাঁদলে প্রকৃতি বোধহয় এভাবেই মানুষের জন্য কাঁদে।

**পুঁটিমাছের বুদ্ধি!**

সব এমপিরা নাকি এখন নিজ নিজ এলাকায় টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন করছেন। মানে নিজ নিজ এলাকায় জনসংযোগে নেমে গেছেন। আর জনসংযোগে নামা মানেই হাসিমুখে (টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন করতে দাঁত বের করে যতটা হাসি দরকার) জনতার কাতারে যতটা মেশা যায় আর কি। এই তো সময়। তারপর নির্বাচনের পরে পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত...। ওদিকে না গেলেও চলবে। ব্যাপারটা একটা গল্প দিয়ে বোঝানো যেতে পারে হয়তো...সেই যে এক সাধারণ লোক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মারা গেল তারপর তাকে নেয়া হল পরকালে, এখন সে স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে হিসাবনিকাশ চলছে, তখন জানা গেল সে যাবে নরকে। লোকটি হাউকাউ শুরু করে দিল, কেন আমি নরকে যাব, আমি ছাপোষা মানুষ ছিলাম, কোনো পাপ করি নি। আসলে পাপ করার সুযোগও ছিল না হয়তো। তখন স্বর্গ-নরকের লোকজন বলল, 'আরে ভাই খামাখা প্যাঁচাল করে লাভ নাই, স্বর্গ এখন বড়লোকরা আগেই বুকিং দিয়ে ফেলেছে...সেই দিন আর নাই...নরকে ঢুকলে ঢুকেন নইলে স্বর্গ-নরকের নো ম্যান্স ল্যান্ডে পচতে হবে।' লোকটি দেখল ঝামেলা করে লাভ নাই, নরকেই ঢুকি কী আর করব...চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সে নরকের দিকে হাঁটা দিল। লোকটির অবস্থা দেখে কর্মকর্তাদের কিঞ্চিৎ মায়াই হল। তারা বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি ভালো মানুষ, প্যাঁচে পড়ে নরকে ঢুকছ। ঠিক আছে যাও তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া হল, তুমি নরকের সবগুলো সাজা দেখ তারপর সবচেয়ে সহজ সাজাটা বেছে নিতে পার...'

লোকটি তাই করল সারা নরক ঘুরে দেখল ভয়াবহ সব সাজা...একটা সাজা পাওয়া গেল যেটা তার কাছে কিঞ্চিৎ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল। সাজাটা হচ্ছে—কিছু লোক একটি বিষ্ঠার পুকুরে (কীসের বিষ্ঠা পাঠক অনুমান করে নিন) বুক পর্যন্ত ডুবে...দাঁড়িয়ে গরম চা খাচ্ছে। লোকটি দেখল মন্দ কি নিচের দিকে না তাকালেই হল, চা তো খাওয়া যাচ্ছে। সে বলল, 'ঠিক আছে আমাকে এ শাস্তিটাই দিন'।

—ভেবে বলছ তো?

—হ্যাঁ, ভেবেই বলছি।

—বেশ। ওহে কে আছ একে ঐ বিষ্ঠার পুকুরে উল্টো করে ডুবিয়ে দাও।

—কী? কী বলছেন?

—যা সাজা তাই বলছি...

—কিন্তু ওটা তো চা খাওয়ার...

—আরে বাবা আসলে শাস্তিটা হচ্ছে...বিষ্ঠার পুকুরে উল্টো হয়ে পাঁচ বছর থাকতে হবে তারপর দশ মিনিটের জন্য সোজা করা হবে চা খাওয়ার জন্য...তুমি যখন দেখেছিলে তখন টি ব্রেক চলছিল...

আমাদের অবস্থাও তাই, পাঁচ বছরের জন্য...তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলে দশ মিনিটের টি ব্রেক!

তবে আশার কথা (নাকি দুরাশা?) হচ্ছে সৎ প্রার্থীর আন্দোলন শুরু হয়েছে। সৎ প্রার্থী আসা উচিত এই চিন্তাটা অনেকের মাথায় এসেছে...হইল পাউডার সাদা মনের মানুষ খুঁজছে...ডক্টর ইউনূস সৎ প্রার্থী আন্দোলনের প্রস্তাব করেছেন...ব্যালট পেপারে 'না' অপশন রাখার দাবি উঠেছে। এটা কার্যকর হলে দারুণ হবে। অন্তত খারাপ প্রার্থীরা বুঝবে যে কী পরিমাণ ভোটার তাদের ভোট দেয় নি! মোট কথা আমরা সাধারণ ভোটাররা এখন ক্রমশই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছি যেন...সেই বিখ্যাত বিজ্ঞাপনটি মনে রাখা যেতে পারে 'বুদ্ধিমান হোন ঠিক কাজটি করুন...'

বরং বুদ্ধিমান হওয়ার একটা গল্প দিয়ে শেষ করি...এক বাংলাদেশী আর পাকিস্তানি চলেছে ট্রেনে করে দূরে কোথাও। যেহেতু সহযাত্রী কথাবার্তায় দু জনে বেশ জমে উঠেছে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি বলল 'চলেন বুফে কারে খেয়ে নেই' শুনে বাংলাদেশী আঁতকে উঠল। 'পাগল না মাথা খারাপ আমি বাইরে কিছু খাই না, দেখছেন না চারদিকে ভেজাল...আমি বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসেছি', বলেই সে টিফিন ক্যারিয়ার বের করল। পাকিস্তানি বলল, 'কী দিয়ে খেলেন?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—পুঁটিমাছ আর ভাত।

—পুঁটিমাছ! পাকিস্তানি অবাক। বাসা থেকে আনার আর জিনিস পেলেন না?

—কেন, পুঁটিমাছে সমস্যা কী? আরে আমরা বাংলাদেশীরা পুঁটিমাছ খাই দেখেই আমরা বুদ্ধিমান আর আপনাদের মাথা মোটা...মনে নেই সেই একাত্তরে? পাকিস্তানি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হল। ভাবল সত্যিই কি পুঁটিমাছে বুদ্ধি খোলে? খেয়ে দেখলে হয়। তখন সে সাহস করে বলল, 'আচ্ছা ভাই, পুঁটিমাছ কি সবই খেয়ে ফেলেছেন?'

—না চারটা এনেছিলাম দুটা খেয়েছি আরো দুটা আছে।

—তা হলে দিন না খেয়ে দেখি।

—নারে ভাই সম্ভব না...৫০০ টাকা দিলে চিন্তাভাবনা করে দেখব।

—৫০০ টাকা! পাকিস্তানির মাথায় তখন জেদ চেপে গেছে। যা থাকে কপালে, পুঁটি খেয়ে দেখতে হবে। সে পকেট থেকে ৫০০ টাকা বের করে দিল। বাংলাদেশী দুটো পুঁটি দিয়ে দিল। সাথে ফ্রি একটু ভাতও দিল। খেয়েদেয়ে পাকিস্তানি হঠাৎ টের পেল সে পুঁটি না একটা উঁচু দরের ডজ খেল। তখন সে বলেই ফেলল, 'বাংলাদেশী ভাই, সত্যি কথা বলব একটা?'

—বলেন।

—আপনি আসলে বুদ্ধি বাড়ার কথা বলে ঐ দুটি পুঁটি খাইয়ে আমাকে ডজ দিলেন তাই না?

—তাই...তবে পুঁটি দুইটা খেয়েই কিন্তু ব্যাপারটা আপনি ধরতে পারলেন তাই না? আগে কি পেরেছিলেন? এখন আপনি বুঝুন পুঁটি খেলে বুদ্ধি বাড়ে না কমে!

## নিরাপত্তা বাহিনী

এক দেশের এক রাজা ঠিক করলেন তার দেশের নিরাপত্তা হবে পৃথিবীর সেরা নিরাপত্তা। তিনি হুকুম করলেন দেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভালো অভিজ্ঞতা আছে এমন কাউকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করা হোক।

চব্বিশ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই রাজার সামনে তিনজন লোককে হাজির করা হল। প্রথম জন সম্পর্কে রাজাকে বলা হল, 'ইনি হচ্ছেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। ইনি বিদেশেও ছিলেন...মোট কথা তিনি একজন সেরা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ! তিনি সৎ, তিনি নির্ভীক, তিনি দায়িত্ব সম্পন্ন...'

—পরের জনের কী অবস্থা? রাজা জানতে চান।

—পরের জনও ভালো, তবে...ইনি আপনার খুশিমতো কাজ করবেন!

—মানে?

—মানে আপনি যেমন চাইবেন তেমন...আপনি যদি বলেন, সূর্য দক্ষিণ দিকে উঠাও...তিনি দক্ষিণ দিকে উঠাবেন।

—আর শেষ জন?

—ইনি স্যার নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছুই জানেন না, কোনো অভিজ্ঞতাও নেই...মোট কথা এ ব্যাপারে তিনি 'ব কলম'।

—তা হলে তাকে এখানে আনা হয়েছে কেন?

—জাহাঁপনা, ইনি রাজদরবারের সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ডাইরেক্ট শালা...


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—হুম। রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—তবে জাহাঁপনা শালা হলেও তার একটা ভালো গুণ আছে।

—কী গুণ?

—তিনি একজন ভালো গণক।

—গণকের সাথে নিরাপত্তার সম্পর্ক কী?

—জাহাঁপনা, কখনো কখনো গ্রহ-নক্ষত্র গুনেও দেশের আপাম নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব।

—আচ্ছা।

—জাহাঁপনা, এখন আপনিই ঠিক করুন, কাকে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেবেন।

রাজা সেদিনকার মতো দরবার মুলতবি ঘোষণা করলেন। পরদিন রাজা তার ঘনিষ্ঠ ক'জনকে নিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, তিন জনকেই তার পছন্দ হয়েছে তিন কারণে। এখন তিনি তিন জনের একটা পরীক্ষা নেবেন। যে পরীক্ষায় টিকবে তাকেই দেবে দেশের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব। কিন্তু পরীক্ষাটা কী? পরীক্ষাটা হচ্ছে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১০০ বোমা ফাটানো হবে এবং তারপর ওই তিন জনকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে কে বোমা ফাটিয়েছে। যে বের করতে পারবে সে-ই হবে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান!

পরদিন সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোমা ফাটল! সেই তিন জনকে নামিয়ে দেয়া হল মাঠে—সময় মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা! আর কী আশ্চর্য! সবচেয়ে সেরা লোকটি—ঠিকই চব্বিশ ঘণ্টার আগেই একজন লোককে রাজার সামনে ধরে নিয়ে এলেন।

—এই লোক কি বোমা ফাটিয়েছে? রাজা জানতে চান।

—না হুজুর।

—তা হলে একে ধরে এনেছ কেন?

—কারণ এ বলছে বোমা ফাটিয়ে দেবে।

—বোমা ফাটাবে মানে, বোমা তো ফেটেছেই।

—আজ্ঞে না জাহাঁপনা, সেই বোমা না...আপনাদের ১০০ বোমা ফাটানোর পরিকল্পনার সেই বোম! এই লোকটা জানে...সে বলছে, সেটা জনসমক্ষে ফাটিয়ে দেবে।

এই ঘটনার পরে অবশ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয় রাজ্যে। স্থগিত থাকুক—এই ফাঁকে নিরাপত্তা বিষয়ক আরেকটা গল্প শোনা যাক।

এ আরেক রাজ্যের গল্প। সেই রাজ্যের রাজা তার নিরাপত্তারক্ষীদের হুঁশিয়ার করে দিলেন তার রাজ্যে যেন বাইরের রাজ্যের একটা খড়কুটোও ঢুকতে না পারে।

—ঢুকবে না জাহাঁপনা। আমি যতক্ষণ আছি একটি মাছিও ঢুকতে পারবে না! শুনে রাজা খুশি হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রাজ্যে হইচই লেগে গেল! কী ব্যাপার? পাশের রাজ্যের একটা হাতি ঢুকে গেছে। রাজা শুনে ক্ষেপে গেলেন! ডাকালেন নিরাপত্তা প্রধানকে।

—এটা কী করে হল? তুমি বলেছিলে একটা মাছিও ঢুকবে না...

—মাছি ঢুকতে আমি দেই নি মহারাজা...এই দেখুন প্রমাণ আমার সাথেই আছে। আমার তলোয়ারের মাথায় মাছির মাথাটা লেগে আছে।

—কী বলছ তুমি? এর মানে কী?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—মানে জাহাঁপনা, হাতিটা যখন আমাদের রাজ্যে ঢোকে তখন ওর পিঠে একটা মাছি বসে ছিল, ওটাকে আমি ঢুকতে দেই নি। এই যে ওর খণ্ডিত মাথা আমার তলোয়ারের মাথায় লেগে আছে।

রাজা আর কী করবেন, উত্তর শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার গলা থেকে একটা মুক্তার মালা খুলে মাছি শিকারির গলায় পরিয়ে দিয়ে তাকে কোনোমতে বিদায় করলেন।

**দুর্ভাগা কিশোর।**

আচ্ছা কত কেজিতে এক কোটি?

—অ্যাঁ...পারলাম না!

—সাড়ে সাঁইত্রিশ কেজিতে এক কোটি।

না, এটা আসলে কোনো পাজল বা ধাঁধা নয়। ব্যাংকের লোকজন কোটি টাকার হিসাব নাকি ওজনে করে। যেমন, সাড়ে সাঁইত্রিশ কেজি পাঁচশ টাকার নোট মানে এক কোটি টাকা। (আমি যে আড্ডায় শুনেছি তারা যদি ভুল বলে না থাকেন) এটা অবশ্য পাঁচশ টাকার নতুন নোটের ক্ষেত্রে। আর পুরোনো পাঁচশ টাকার নোট হলে ওজন আরো বাড়বে।

অনেক আগে একবার একটা নিউজ পড়েছিলাম। একদল ডাকাত ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তাদের কাছে যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে দাঁড়িপাল্লাও পাওয়া গেছে। তখন অবাক হয়েছিলাম, বেকুবের দল সাথে দাঁড়িপাল্লা নেয়ার দরকার কী ছিল? এখন বুঝলাম ব্যাটা অতি উচ্চমানের ডাকাত ছিল। কিংবা কে জানে ডাকাতি করার আগে ব্যাংকার ছিল। ডাকাতের প্রসঙ্গই যখন এল তখন এক ডাকাতের গল্প বলা যাক। এক দুর্ধর্ষ ডাকাত গেছে ব্যাংক ডাকাতি করতে। সে এতই দুর্ধর্ষ যে তার নাম শুনলে পুলিশও কাপড় নষ্ট করে ফেলে। তো সেই ডাকাত ব্যাংকে গিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে দাঁড়াল। তাকে দেখে ততক্ষণে ব্যাংক খালি হয়ে গেছে। পাগলা ঘণ্টা বাজানোর কথা যে কর্মচারীর সে ঘণ্টা নিয়ে টয়লেটে আত্মগোপন করেছে। ডাকাত গম্ভীর হয়ে তরুণ ক্যাশিয়ারকে বলল

—আমি অমুক ডাকাত। আশা করি চিনতে পেরেছেন।

—জি জি, আপনাকে কে না চেনে। বলুন কী উপকার করতে পারি আপনার? তার আগে চা দিতে বলি?

—না চা খাওয়ার সময় নেই। আরো দুটো ব্যাংকে ডাকাতি করতে যেতে হবে।

—তা হলে প্লিজ একটা অটোগ্রাফ। তরুণ ক্যাশিয়ার এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দেয়।

—অটোগ্রাফ দিচ্ছি, তুমি চট করে ব্যাংকের সব টাকা একটা ব্যাগে ভরে দাও।

—সব টাকা?

—হ্যাঁ সব।

—কিন্তু স্যার...

—আবার কিন্তু কী?

—না মানে সে ক্ষেত্রে আপনাকে একটা বড়সড় ব্যাগ নিয়ে আসতে হবে। এত টাকা একসঙ্গে দেয়ার মতো ব্যাগ আমাদের ব্যাংকে নেই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেলিব্রেটি বিখ্যাত ডাকাত অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। 'এজন্যই আমি পাবলিক ব্যাংকে ডাকাতি করতে আসতে চাই না। তোমাদের সার্ভিস মোটেই ভালো না।' বলে ডাকাত পকেট থেকে কয়েকটা বড়সড় পলিথিনের ব্যাগ বের করল এবং ক্যাশিয়ারের দিকে এগিয়ে দিল আর ঠিক তখনই পাশ থেকে আওয়াজ এল—'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!'

—মানে? ডাকাত অবাক!

—মানে আপনি অ্যারেস্ট।

—আপনি কি পুলিশ নাকি? ডাকাত জানতে চায়।

—না আমি পরিবেশ অধিদপ্তরের লোক। জানেন না পলিথিন নিষিদ্ধ? পলিথিন ব্যবহারের জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলাম।

ডাকাত তার হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে এবার তার পকেট থেকে পিস্তল বের করল। সে এত উচ্চমানের ডাকাত যে তাকে পিস্তল বের করতেই হয় না। কিন্তু আজ বের করতে হল।

—ওরে অধিদপ্তরের বাচ্চা, এবার তোর ঘিলু উড়িয়ে দেব।

—পারবেন না। ঠাণ্ডা মাথায় বলে পরিবেশ অধিদপ্তরের লোক।

—মানে?

—মানে আমার মাথায় ঘিলু থাকলে তো উড়াবেন। আমি সরকারি সব দপ্তরেই কাজ করে এসেছি না। হেঃ হেঃ।

সেলিব্রেটি ডাকাতের গল্প থাক। একজন সাধারণ চোরের গল্প বলি। এ নব্য চোর। বয়সে কিশোর। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। তারপর সোজা জেলে। সেখানে এক ডাকাত সর্দারের সাথে তার আলাপ-পরিচয় হল।

—তুমি তো খুবই বাচ্চা হে। ডাকাত সর্দার বলে।

—জি আমি স্কুলে ক্লাস টেনে পড়তাম।

—বল কী! তা হঠাৎ ছিঁচকে চুরিতে নামলে কেন?

—আসলে বন্ধুরা সব বড়লোকের ছেলে, দামি দামি মোবাইল ব্যবহার করে, তাই ভাবলাম... যদি বড়লোক হতে পারি...

—আরে বোকা এইসব ছিঁচকা চুরি না করে একেবারে বড় দাঁও মারতে পারলা না? কোনো ব্যাংক ডাকাতি?

—স্কুল ছুটির পর বের হতে হতে সব ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়।

—আরে আজকাল অনেক প্রাইভেট ব্যাংক রাতেও খোলা থাকে।

—কিন্তু রাতে তো আবার কোচিং থাকে আমাদের।

—সত্যি তোমরা বড় দুর্ভাগা। বলে লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাকাত সর্দার।

**দূরত্ব যতই থাকুক**

দুদক চেয়ারম্যান (অব.) লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান মশহুদ তার কমিশনের গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত একটি ফাইল কেন ৩৫ দিন ধরে আটকে আছে জানতে তিনি নিজেই গিয়েছিলেন সচিবালয়ের অর্থ বিভাগে। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করেন, 'অর্থ বিভাগ থেকে মন্ত্রিপরিষদ কত দূর?' পরে জানা যায় এই দূরত্ব মাত্র ৫০ গজ।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখন মনে হচ্ছে বিষয়টি মোবাইলওয়ালাদের জানানো দরকার। কেননা টিভি-পত্রিকা খুললেই দেখি 'দূরত্ব যতই হোক কাছে থাকুন...' এই টাইপের বিজ্ঞাপন। অফিস-আদালতে এই জাতীয় দূরত্ব বিষয়ক জটিলতা কমাতে তারা যদি কিছু করতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট দাম্পত্য ঘটনা। স্বামী-স্ত্রী দু জনেরই বয়স হয়েছে, সেই রোমান্টিকতা আর নেই। রাতে দু জনেই ঘুমাচ্ছে, উপরে ঢিমে তালে সিলিং ফ্যান চলছে, মশারি ভেদ করে বাতাস খুব একটা পৌঁছাচ্ছে বলে মনে হয় না। তার উপর ভ্যাপসা গরম। হঠাৎ স্ত্রীর বিরক্ত গলা শোনা গেল।

—উফ, একটু দূরে সরতে পার না? গায়ের উপর এসে পড়েছ?

স্বামীর ভীষণ প্রেস্টিজে লাগল। তিনি দূরে সরলেন। পরদিন স্বামীকে আর বাসায় পাওয়া গেল না। তার পরদিনও পাওয়া গেল না। তারপর দিনও না...। এক সপ্তাহ পর ফোন এল স্বামীর। ফোন ধরল স্ত্রী।

—আরো দূরে সরব?

—তুমি কোথায়?

—টেকনাফে। স্বামীর উত্তর।

'দূরত্ব যতই হোক কাছে থাকুন...' কিংবা 'চল পালিয়ে যাই দূরে নেটওয়ার্কের বাইরে...' মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপনগুলো সবগুলো সুন্দর হচ্ছে। তারা দূরত্ব কমিয়ে আনছে কথা বলিয়ে বলিয়ে। দেখা যাচ্ছে বাবা ঘরে বসে ফোনে কথা বলছে, আরেক ঘরে মা কথা বলছে, আরেক ঘরে ছেলে কথা বলছে মেয়েও বলছে তার ঘরে। তারা সবাই যার যার ফোনে যার সঙ্গে কথা বলছে তার সঙ্গে দূরত্ব কমছে বটে কিন্তু ঘরের ভিতর কিন্তু দূরত্ব বাড়ছে। কেউ কারো মুখ দেখার সময় নেই। ফোনে কথা বলতে হবে না?

এই রকম এক মোবাইল পরিবারের গল্প শোনা যাক। এই পরিবারের সবারই মোবাইল আছে। দারোয়ানেরও আছে বুয়ারও আছে। অন্যদের তো আছেই! হঠাৎ কর্তার ফোন বেজে উঠল।

—খালু চা দিমু?

—কে?

—আমি আকবরের মা।

—তুমি কোত্থেকে ফোন করলে?

—ক্যা রান্নাঘর থাইকা।

—ফাজলামো কর? রান্নাঘর থেকে আমার ঘর কত দূর?

—ওই যে দূরত্ব যতই থাকুক কাছে থাকুন...টিভিতে অ্যাড দেখেন না? ক্ষুব্ধ গৃহকর্তা ফোন কেটে দিয়ে স্ত্রীকে ফোন করলেন।

—হ্যালো? তুমি কোথায়?

—কেন পাশের ঘরেই তো আছি। কী হয়েছে?

—আকবরের মাকে আজই বিদেয় কর।

—কেন?

—রান্নাঘর থেকে আমাকে ফোন করে বলে 'চা দিমু?'

—অসুবিধা কী ওর ফোনের সঙ্গে তুমি আমি আর ওর দেশের বাড়িতে এফএনএফ করা আছে... খরচ খুবই কম। কর্তা রেগেমেগে ফোন কেটে দিলেন। এর মধ্যে গৃহকর্তার ফোন আবার বেজে উঠল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—হ্যালো কে?

—স্যার আমি ফরিদ গেটের দারোয়ান।

—তুমি কোথায়?

—কেন স্যার গেটে ঘুমাইতেছিলাম।

—গেটে ঘুমাচ্ছ?

—জি স্যার, সারা রাইত মোবাইলে কথা বললাম তো...তাই একটু...

—তাই বলে ডিউটি ফেলে ঘুমাচ্ছিলে?

—জি, একটা লোক এসে ঘুম ভাঙাল, বলল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—তার আগে বল আমাকে মোবাইলে ফোন করলে কোন সাহসে? গেট থেকে এসে আমাকে বললে সমস্যা কী? গেট থেকে আমার ঘর কত দূর?

—ক্যান স্যার, ফোন করলে সমস্যা কী? নেটওয়ার্কের ভিতরই তো আছি। তার উপর স্যার তিন ঘণ্টা টক টাইম ফ্রি বোনাস পাইছি। রাগে অন্ধ হয়ে হাতের মোবাইল ফোনটা ছুড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় ফোনটা ফের বেজে উঠল। তিনি আর ধরলেন না। ফোন বাজতেই থাকল। বাজতেই থাকল। পাশের ঘর থেকে স্ত্রী উঠে এলেন, 'কী হল ফোন করছি ফোন ধরছ না কেন?'

—পাশের ঘর থেকে এই ঘরের দূরত্ব কত?

—দূরত্ব যতই থাকুক...

স্বামী চিৎকার করে উঠলেন, 'কাছে থাকুন...???'

**ভূগোলের ছাত্র**

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে পড়তাম। বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনটা আমাদের আনন্দেই কেটেছে। আমাদের সময় তখন সদ্য সেমিস্টার সিস্টেম চালু হয়েছে। তবে যে সিস্টেমই চালু হোক আমি ছিলাম আমার সিস্টেমে, মানে আমি ছিলাম সিরিয়াস ফাঁকিবাজ। বড় দুই ভাই তখন বিদেশে, বড় দুই বোনও বাইরে। শুধু আমি, ছোট বোন আর মা। কাজেই ওই অর্থে একাডেমিক গার্জেন বলতে কেউ ছিল না। মাঝে মধ্যে মা ধমক দিতেন 'পড়াশোনা করতে তো দেখি না? কী করিস সারা দিন?' আমার উত্তর ছিল, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড ক্লাস পেতে পড়াশোনা করতে হয় না।' আসলেই তাই, আমি দেখেছি যারা ফার্স্ট ক্লাস পেতে চায় আর যারা থার্ড ক্লাস পেতে চায় না তাদেরই কেবল প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। আমি ক্লাস খুব একটা করতাম না। যে ক্লাসগুলো না করলেই নয় সেগুলোতে হাজির থাকতাম। আমার এক পার্টনার ছিল আজাদ, সে ছাত্র ইউনিয়ন করত (এখন যথারীতি পুঁজিবাদী দেশে সুখেই আছে)। সে ছিল আমার চেয়েও এক কাঠি সরেস। সে খবর আনত আজ কোন কোন ক্লাস না করলে চলবে, আর কোন কোন ক্লাস করতে হবে। তো এভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন আমাদের ডিপার্টমেন্টে এক তরুণ অতি স্মার্ট টিচার এলেন ফ্রান্স থেকে ডক্টরেট করে। তিনি আমাদের 'রেজিওনাল জিওগ্রাফি' পড়াবেন। ভাবলাম দেখি নতুন স্যারের ক্লাসটা করি। কী কারণে জানি সেদিন স্যার যা যা পড়ালেন আমি বসে বসে নোট করলাম সুন্দর করে একটা সাদা কাগজে (বলে নেওয়া ভালো আমি পকেটে একটা সাদা কাগজ নিয়ে রেডি থাকতাম, ক্লাস করতে হলে ওটাই হত আমার খাতা)। ক্লাসটা সবারই ভালো লাগল। পরের দিনও ওই স্যারের ক্লাস। আমি এবারো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাজির। আমার পার্টনার আজাদ আমাকে হুঁশিয়ারি দিল, 'এভাবে আমি যদি ক্লাস করে যেতে থাকি তা হলে সে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।'

পরের ক্লাসে সেই স্মার্ট স্যার ঢুকেই বললেন, 'আপনারা গত ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্টটি জমা দিন'। সবাই অবাক, গত ক্লাসে তো কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় নি। স্যার তখন ব্যাখ্যা করলেন গত ক্লাসের নোটটা সুন্দর করে জমা দিলেই হবে। এখন এ কাজটা তো কেউ করে নি। আমি হাত তুললাম। কারণ আমি ক্লাস নোটটা ক্লাসেই সুন্দর করে লিখেছিলাম। স্যার আমার নোটটা গম্ভীর হয়ে হাতে নিলেন। তারপর উচ্চঃস্বরে বললেন, 'আপনারা যারা আনেন নি সবাই ক্লাস থেকে বের হয়ে যান।' আমি হতভম্ব হয়ে দেখি, সবচেয়ে ফাঁকিবাজ ছাত্রটি একা ক্লাসে বসে আছি আর ভালো ছাত্রছাত্রী সব ক্লাসের বাইরে। এ ঘটনার পর যথারীতি আমি আমার ফাঁকিবাজ পার্টনার আজাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করি।

আরেকটা মজার ঘটনা না বললেই নয়। একদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে শুনি আজ ১২টার মধ্যে প্রত্যেক গ্রুপের টার্ম পেপারের সিনোপসিস স্যারের কাছে জমা দিতে হবে। আমার মাথায় বিনা মেঘে না মেঘসহ-ই বজ্রপাত হল। কারণ আমি কিছুই জানি না। সবাই দেখলাম মোটা মোটা খাতায় টাইপ করে স্পাইরাল করে সুন্দর করে সিনোপসিস বানিয়ে এনেছে। এখন উপায়? হাতে সময়ও নেই। তৎক্ষণাৎ একটা কাগজে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব আমার বিষয়টি (বাংলাদেশের পশুসম্পদ) ট্রি চার্ট করে ব্যাখ্যা করলাম। তারপর ভয়ে ভয়ে স্যারের রুমে গেলাম। তখন আমাদের টার্ম পেপারের স্যার হচ্ছেন জাঁদরেল চেয়ারম্যান ড. মনিরুজ্জামান মিয়া। আমরা পাঁচজন স্টুডেন্ট বসে আছি। সবার হাতে স্পাইরাল করা ঝকঝকে খাতা। স্যার একে একে সবারটাই দেখলেন। কোনো মন্তব্য করছেন না শুধু দেখে যাচ্ছেন, সবার শেষে আমার দিকে তাকালেন। আমি লজ্জিত ভঙ্গিতে একটা মাত্র সাদা কাগজ এগিয়ে দিলাম। ভেতরে ভেতরে একটা প্রচণ্ড ধমক খাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি চোখ বন্ধ করে। আর তখনই শুনলাম স্যার বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি ঠিক এ জিনিসটাই চাচ্ছিলাম'। গর্বে আমার বুকটা ফুলে ওঠারই কথা ছিল, সেটা হল না কারণ এমন এক টাইট শার্ট পরে আছি বুক ফুলা তো দূরে থাক, ঠিকভাবে দম নেওয়াই কঠিন। যদ্দূর মনে পড়ে টাইট শার্ট আর ঢিলা প্যান্ট তখন বোধ হয় ফ্যাশন ছিল।

আরেকটা মজার ঘটনা বলা যেতে পারে। আমাদের এক ম্যাডাম ছিলেন খুবই রূপসী আর স্মার্ট। তবে খুবই গম্ভীর, তাকে কেউ হাসতে দেখেছে এমন শোনা যায় নি। লাল শাড়ি পরে লাল একটা গাড়ি চালিয়ে নিজেই আসতেন। তবে তাকে আমি হাসাতে পেরেছিলাম। কীভাবে? আসলে সেদিন আমি যথারীতি তার ক্লাসে যাই নি (পরে বন্ধুদের কাছে শুনেছি)। তিনি নাকি ক্লাসে এসে কোনো একটি টিউটোরিয়ালের খাতা দিচ্ছিলেন। আমার খাতাটা যখন তার হাতে এল তখন তিনি হেসে ফেললেন। বললেন...আপনাদের ক্লাসে একজন কার্টুনিস্ট আছেন তার ম্যাপগুলো একেকটা কার্টুন'।

পরে আমি কার্টুন ফিল্মে কাজ করতে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করি, সেটা হচ্ছে 'কার্টোগ্রাফটুন' (কারটোগ্রাফ+কার্টুন) পৃথিবীর অনেক কার্টুনিস্টই এ ধরনের কার্টুন এঁকেছেন। এটা একটা আলাদা মাধ্যম 'ক্যারিকেচারের' মতো। আসলে পরে দেখেছি জিওগ্রাফিতে সুন্দর করে ম্যাপ আঁকলেও আমি নাম্বার বেশি পেতাম না। কারণ কীভাবে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কীভাবে যেন আমার ম্যাপগুলো একটু 'কার্টুন কার্টুন' হয়ে যেত। আর ম্যাপ হচ্ছে প্রচুর মাপজোকের ব্যাপার।

আজ এত বছর পর যখন পেছনের দিকে তাকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে, তখন একধরনের নস্টালজিয়া বোধ করি। বেশিরভাগ বন্ধুই বিদেশে। আর যারা দেশে আছে তারাও সব বড় বড় পোস্টে সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। কাজী ওবায়েদ, সিরাজ, আনিস, রানা, নির্মল, নয়ন, শাহনাজ, সাবিহা, রোকসানা...কত বন্ধু কত স্মৃতি...। মাঝে মাঝে কেউ কেউ ফোন করে...

—কিরে, খবর কী?

—এই তো দোস আছি।

—চলে আয় আড্ডা দেই।

—কোথায়?

—আনিসের বাসায়।

—আসতেছি...

আমার যাওয়া হয় না। তারাও জানে আমি যাব না। কারণ আমি তো সেই আগের মতোই ফাঁকিবাজ আছি এখনো!

## নবান্নে নতুন ফসল

নতুন ফসল তোলার উৎসবকেই আমরা বলে থাকি 'নবান্ন'। নব অন্ন থেকেই 'নবান্ন' কিনা কে জানে। বাংলা ব্যাকরণ অবশ্য আমার ভালো জানা নেই। সে যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে এবার নবান্ন হচ্ছে অন্যরকম। অন্যরকম ফসল তোলার উৎসব। সেটা হচ্ছে...সামনে নির্বাচন...এবার যদি ভুল ফসল ঘরে তুলে আনি ব্যালটের মাধ্যমে তা হলে আমরা শেষ না, একদম 'শ্যাষ'।

যোগ্য প্রার্থীর বিষয়টি এখন নানাভাবে সবার আলোচনায় চলে এসেছে। যে করেই হোক যোগ্য প্রার্থী খুঁজে বের করে আনতে হবে, নিজেদের স্বার্থেই। কিন্তু যোগ্য প্রার্থী কোথায়?

ধরা যাক একজন যোগ্য প্রার্থী দাঁড়ালেন নির্বাচনে, নিজের উদ্যোগেই। কিন্তু দেখা গেল ভোট পেলেন মাত্র পাঁচশ বত্রিশ জনের। সাংবাদিকরা ছুটে এল তার কাছে।

—আপনি তো নিজেকে একজন সৎ যোগ্য প্রার্থী মনে করে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু হেরেছেন?

—হ্যাঁ।

—মাত্র পাঁচশ বত্রিশটা ভোট পেয়েছেন?

—হ্যাঁ পেয়েছি।

—তা হলে কেন দাঁড়ালেন?

পরাজিত যোগ্য প্রার্থী মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন

—দেখুন আমি তো জেতার জন্য দাঁড়াই নি।

—তা হলে?

—আমি দেখতে চাচ্ছিলাম এই এলাকায় বোকার সংখ্যা ঠিক কত জন। তার একটা হিসাব পাওয়ার জন্য...।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এ তো গেল যোগ্য প্রার্থীর হারা। এবার আসা যাক অযোগ্য প্রার্থীর ভোটে হারার প্রসঙ্গে...। এক অযোগ্য বাজে টাইপের প্রার্থী ভোটে হারল। দেখা গেল সে পেয়েছে মাত্র এক ভোট। সাংবাদিকরা ছুটে এল না। ছুটে এল তার স্ত্রী। এসেই কলার চেপে ধরল।

—কী হল?

—ঐ একটা ভোট কোথায় কে দিল? তোমার মতো বাজে লোককে আমি তো ভোট দেবই না। তুমিও নিজেকে দেবে না...তা হলে ঐ একটা ভোট এল কোথে কে?

—আমি কীভাবে জানব?

—নিশ্চয়ই কোথাও পরকীয়া করছ? বল সে মেয়ে কে??

কিন্তু পরে তদন্তে জানা গেল আসলে সে অযোগ্য লোককে কেউই ভোট দেয় নি। যে একটি মাত্র ভোট পাওয়া গিয়েছিল সেটি গত নির্বাচনের ভোট। ব্যালট বাক্স ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় নি বলে হয়তো একটা ভোট কোনোভাবে রয়ে গিয়েছিল।

যোগ্য অযোগ্যের মাঝখানে আরেক প্রার্থী। তিনিও নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেলেন। ছুটে গেলেন এক গণকের কাছে।

—ভাই আমার রাশিটা গুনে দেখুন–

—কী সমস্যা আপনার?

—আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি আমার চাচার বিরুদ্ধে...জিততে পারব তো?

—তার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

—সত্যি?

—সত্যি।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল ভাতিজা প্রার্থী। গণককে প্রচুর বকশিশ দিয়ে বিদায় হল। কিন্তু পরে দেখা গেল বিপুল ভোটে পরাজয়, ভাতিজার জামানত বাজেয়াপ্ত। সে ফের ছুটে এল গণকের কাছে

—এই ইয়ার্কির মানে কী?

—কোন ইয়ার্কি?

—আমার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

—আমি ঠিকই বলেছি।

—মানে?

—মানে, আমি খবর পেয়েছি চাচার টাকা নিয়ে নির্বাচন করেছেন। আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া মানে চাচার জামানতই বাজেয়াপ্ত হওয়া...টাকা তো চাচারই...নাকি?

মুখ চুন করে ফিরে গেল ভাতিজা।

প্রার্থী বাদ দিয়ে এবার আসা যাক ভোটারদের কাছে। দুই ভোটার কথা বলছে। তার মধ্যে একজন নতুন ভোটার হয়েছে এবার।

পুরাতন ভোটার : এবার কি ভোট দেবে?

নতুন ভোটার : অবশ্যই।

পুরাতন ভোটার : কাকে?

নতুন ভোটার : দেখুন আমি সব সময় বিজয়ীদের দলে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তো?

—তো যারা জিতবে তাদেরকেই ভোট দেব।

—কারা জিতবে তুমি বুঝবে কীভাবে?

—যাদেরকে আমার মতো ভোটাররা ভোট দেবে!!

এবার দুই তরুণী ভোটার।

—কিরে ভোট দিতে যাবি না?

—পাগল।

—সে কী, কেন? ভোট দেয়া আমাদের নাগরিক অধিকার।

—আরে সর্বনাশ! কী বলছিস তুই? ঐ যে অমোচনীয় কালি লাগায়। ওটা লাগবে কোথায়। দেখছিস না দুই হাতে মেন্দি লাগিয়েছি।

আবার ফিরে আসা যাক 'নবান্নে'। হ্যাঁ, আসলে এবার আমাদের একটি অন্যরকম নবান্ন উৎসব করতেই হবে, 'সফল ফসল' ঘুরে তুলতে হবে। ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতেই হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে...ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে, 'ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।'

শেষ একটি বাক্য দিয়ে শেষ করি। রাজনীতিবিদরা প্রায়ই বলে থাকেন—রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ভুল কথা! শেষ কথা একটি আছে সেটা হচ্ছে 'তুমি যদি সাফল্য চাও তা হলে আগে ব্যর্থতা মেনে নেবার মতো সাহস সঞ্চয় কর।' বলাই বাহুল্য এই মূল্যবান বাক্যটি আমার নয়, একজন বিখ্যাত দার্শনিকের।

## উন্মাদনার ইতিহাস

লেবু কচলালে নাকি তিতে হয়ে ওঠে। আমার হয়েছে সেই অবস্থা। প্রায়ই উন্মাদের ইতিহাস লিখতে হয় নানা কারণে। এবং যথারীতি এই ইতিহাস যে ক্রমশ তিতে হয়ে উঠছে আমি তা টের পাচ্ছি। আবার বেশি বেশি ইতিহাস লিখতে লিখতে একঘেয়েমি এসে গেলে ইতিহাস বিকৃত হওয়াও বিচিত্র নয়। সে যাই হোক...আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে সেই ১৯৭৮ সালের মে মাসে প্রথম উন্মাদ বের হয়। দাম ছিল এক টাকা নিরানব্বই পয়সা আর এক পয়সা ছিল 'হাস্য-কর'।

উন্মাদের শুরুটা করেছিল ইস্তেয়াক হোসেন, কাজী খালিদ আশরাফ, সাইফুল হক...এরা মিলে। পরের সংখ্যায় যুক্ত হই আমরা মানে আমি, রেজাউননবী (রনবীর ভাই), নওশাদ নবী, সুলতানুল ইসলাম, ইলিয়াস খানসহ আরো অনেকে। শুরুতেই পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে গেল। হু হু করে সার্কুলেশন বাড়তে লাগল। আর পাঠকও হা-হা করে হাসতে লাগল (অবশ্য আমি আমার সামনে কখনো কাউকে উন্মাদ পড়ে হাসতে দেখি নি)। ব্যস, এভাবেই শুরু হয়ে গেল উন্মাদের অগ্রযাত্রা। তখন আমরা সবাই স্টুডেন্ট। আমি জিওগ্রাফিতে, ইস্তেয়াক ল'তে, খালেদ ও সাইফুল আর্কিটেকচারে...সুলতান আর্ট কলেজে। যতদিন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম, ততদিন তিন মাসের মধ্যে একটা করে উন্মাদ বের হয়েছে। কিন্তু পড়াশোনা সবার শেষ হতেই খালেদ চলে গেল আমেরিকায়। অন্যরাও যে যেদিকে পারে যায় যায় আর ইস্তেয়াক শুরু করে দিল রিয়্যাল এস্টেট প্লাস প্রেসের ব্যবসা। ঘটনাচক্রে আমিও গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরি পেলাম, জীবনের প্রথম চাকরি। মানিকগঞ্জে পোস্টিং। সবাই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলল, যাও যাও জীবনের প্রথম চাকরি, হেলাফেলা করা ঠিক না। চলে যাও। এবং সত্যি সত্যি একদিন বাক্স পেঁটরা নিয়ে চলে গেলাম। মোট কথা, উন্মাদের কবর রচনা সমাপ্ত। উন্মাদ করার এখন আর কেউ রইল না ঢাকায়।

আমার জীবনের প্রথম চাকরিতে এসে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। যে এলাকায় আমার ব্যাংক, জায়গাটার নাম মুলযান। সারা দিন অফিস শেষে মেইন রোডের পাশে আমরা তরুণরা একটা চায়ের দোকানে এসে আড্ডা দিতাম। সেখানে ব্র্যাকের কর্মীরা আসত, আসত আশার কর্মীরাও। আসত বিআরডিবির লোকজন, আসত ফর দৌজ হু হ্যাভ লেসের কর্মীরা। মোট কথা, বেশ একটা আড্ডাই হত। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম, প্রায় পাঁচটা প্রতিষ্ঠান একই এলাকায় কাজ করছে, সবারই লক্ষ্য ভূমিহীনদের দারিদ্র্য বিমোচন। কিন্তু সত্যি সত্যি দারিদ্র্য কি বিমোচিত হয়েছে? ঈশ্বর জানেন। অবশ্য ঈশ্বর নাকি দরিদ্রদের বেশি ভালবাসেন বলেই তাদের বেশি বেশি করে সৃষ্টি করেন।

সে যাই হোক, আমার প্রথম চাকরিতে নিয়ম হচ্ছে স্টেশন লিভ করা যাবে না, শুক্রবারেও না। অবশ্য আমি এক শুক্রবারে স্টেশন লিভ করলাম, একেবারে ফর এভার লিভ। আমার মা খুব বিরক্ত হলেন। বড় ভাইরা সব বিদেশে, বড় বোনরাও বাইরে। এই সময় যা-ও একটা চাকরি পেলাম, ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। সংসার চলে বড় ভাইদের পাঠানো ব্যাংক ড্রাফটে। এভাবে জীবন চলে? এটা কোনো কাজের কথা? তার ওপর আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। আমি মাকে বোঝালাম, আমি উন্মাদ পত্রিকাটা নতুন করে দাঁড় করাব, এই পত্রিকার ব্যবসা ভালো। মা তখন বললেন, 'না বাবা, ব্যাংকের চাকরিটা এখনই ছেড়ো না। আগে বিয়েটা কর। কারণ মেয়ের বাবাকে আমি বলতে পারব না ছেলে উন্মাদ...।' অবশ্য আমি মায়ের কথা রাখি নি। উন্মাদ সম্পাদক হিসেবেই বিয়ে করেছি।

পরবর্তীতে দেখা গেছে উন্মাদে কাজ করা অবস্থায় যারাই বিয়ে করেছে, কেউই সাহস করে উন্মাদে কাজ করার কথা বলে বিয়ে করে নি। হয় বলেছে প্রকাশনার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, নয় বলেছে অন্য কিছু। ওদের আর দোষ কী? জামাই হিসেবে কার্টুনিস্ট বা আইডিয়ালিস্ট তখনো দিল্লিদুরস্ত (এখনো?)।

আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি শুনে সবাই বিরক্ত হলেও খুশি হল ইস্তেয়াক। ইস্তেয়াক হোসেন। সে তখন উন্মাদের সম্পাদক, প্রকাশক। কিন্তু বাজারে উন্মাদ নেই। তো ইস্তেয়াকের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি উন্মাদের দায়িত্ব নিলাম। অফিস টিপু সুলতান রোডের একটা প্রাচীন বাসার দোতলায়। নিচে প্রেস। যাত্রা হল শুরু। আবার বেরুতে লাগল উন্মাদ। কিন্তু হঠাৎ একদিন অফিসে গিয়ে দেখি অফিসময় ভাঙা কাচের টুকরো। ব্যাপার কী! কারা নাকি উন্মাদ অফিসে হামলা করেছে। সেই প্রথম উন্মাদ অফিসে অফিসিয়ালি হামলা। তখন অবশ্য সাহসও বেশিই ছিল আমাদের। অনেককেই সরাসরি খোঁচা মারা হত। বিশেষ করে সিনেমা যারা বানাত, তাদের। পরে বোঝা গেল, এসেছিল সিনেমার লোকজনই। তখন প্রায়ই আমরা সিনেমার ব্যঙ্গ করতাম। সেই প্রথম টিপু সুলতান রোড ছেড়ে চলে এলাম ধানমণ্ডিতে, বিখ্যাত বত্রিশ নম্বর রোডে। বাকি ইতিহাস ঐ ঐতিহাসিক রোডেই। ঐ রোডে থাকা অবস্থাতেই বেশিরভাগ উন্মাদ বের হয়েছে। তারপর উন্মাদের বাথরুমের টেপ দিয়ে বহু পানি গড়িয়েছে। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক থেকে পুরোপুরি সম্পাদক/প্রকাশক...মালিকানা হস্তান্তর...তা প্রায় ত্রিশ বছর। পুরোনোরা সরে গেছে যার যার ব্যবসা নিয়ে। কেননা, প্রকৃত উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব শুধু উন্মাদ নিয়ে পড়ে থাকা। আমার মনে আছে, তখন ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের একটা বিজ্ঞাপন খুব জনপ্রিয় ছিল—'বুদ্ধিমান হোন, ঠিক কাজটি করুন'। তারা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কাজটিই করেছে। আমি এখনো উন্মাদ নিয়েই আছি। তবে কেউ হাসুক আর নাই হাসুক, উন্মাদ এখনো নিয়মিত বের হয়। প্রতি মাসে একটা সংখ্যা।

উন্মাদের পাঠক এখন ফিক্সড। একটা গ্রুপ কিনে পড়ে। তারপর তারা বড় হয়ে যায়, জাগতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যায়। উন্মাদকে হয়তো ভুলেই যায়। বাই দিস টাইম আরেকটা গ্রুপ উন্মাদ পড়া শুরু করে। আমাকে প্রায়ই শুনতে হয় 'ছোটবেলায় আমি উন্মাদ পড়তাম। এখন আমার ছেলে পড়ে।' তো এই প্রক্রিয়াই চলছে বহুদিন ধরে। আবার উন্মাদে যারা কাজ করে তাদের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। তরুণদের একটা গ্রুপ কাজ করে, তারা যখন বড় হয়ে যায় অর্থাৎ অন্য কাজে-কর্মে জড়িয়ে পড়ে, তারা উন্মাদ ছেড়ে চলে যায় (অবশ্য উন্মাদকে ভুলে যায় না)। ফলে আমাকে সব সময়ই একটা তরুণ দলের সঙ্গে কাজ করতে হয়। এই কারণেই আমার স্ত্রীর ধারণা, 'আমার নাকি মানসিক ম্যাচুরিটি এখনো আসে নি। আসারও নাকি কোনো সম্ভাবনা নেই অদূরভবিষ্যতেও।'

নিজেকে আমার মাঝে মাঝে কোনো স্কুলের হেডস্যারের মতো মনে হয়। হেডস্যারদের যেমন মাঝে মাঝেই পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

'স্যার স্লামালাইকুম, চিনতে পেরেছেন?' তিনি মনে করার চেষ্টা করেন, 'তুমি কোন ব্যাচের যেন? নাইনটিন হানড্রেড সিক্সটি সিক্স না?'

—না স্যার, আমি বাহান্নর ব্যাচ।

আমারও সেই অবস্থা। মাঝে মধ্যেই কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

'আহসান ভাই, স্লামালাইকুম। চিনতে পেরেছেন?'

আমি মনে করার চেষ্টা করি।

—তুমি উন্মাদ ১০২ থেকে কাজ করতে না?

—না আমি ১২০ এ...

তো এভাবেই চলছে উন্মাদ। মাঝে মাঝে আমাকে একটা কমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্নটা অবশ্য একটু বয়স্করাই করে।

—আচ্ছা, উন্মাদ তো আগের মতো হাসির হচ্ছে না।

—উন্মাদ তো কখনই হাসির পত্রিকা ছিল না!

—তা হলে??

—উন্মাদ সিরিয়াস টাইপ পত্রিকা—সব সময়ই। আমি বলি।

—কিন্তু কেউ কেউ তো হাসে।

—হ্যাঁ, ঐ কেউ কেউয়ের জন্যই উন্মাদ।

**লিভ মি অ্যালোন!**

আগস্ট শোকের মাস। সবাই বলে শোককে শক্তিকে রূপান্তরিত করতে হবে। কিন্তু শোক কি আসলেই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়? শক্তি তৈরির মানুষটাই যদি না থাকল তা হলে কীভাবে হবে! তারপরেও সময়ের প্রলেপে হয়তো বা শোক ক্রমে ক্রমে শক্তিতে বদলে যায়...কে জানে!

এক লোক, লোক না বলে বিজ্ঞানী বলাই ভালো, তার কাজ শক্তি তৈরি করা। সে সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে শক্তি তৈরি করে, ঘরে ঘরে আলো জ্বালে...তো সেই বিজ্ঞানীর কাছে গেল এক সাংবাদিক।

আপনি তো সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে শক্তি তৈরি করেন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—হ্যাঁ।

—কেন?

—আলো জ্বালাতে।

—আলো জ্বালিয়ে লাভ?

—অন্ধকার দূর হবে।

—অন্ধকার দূর কবে লাভ?

—আমরা সবকিছু দেখতে পাব।

—কী দেখতে পাব?

—কোটি টাকা দুর্নীতি, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা...

এরপর আসা যাক র‍্যাংগস ভবন প্রসঙ্গে। এটি নাকি চরম দুর্নীতির একটি অন্যতম মাইল...থুড়ি কিলোমিটার স্টোন। অবশেষে ভবনটি ভাঙা হচ্ছে। বিশাল সুদৃশ্য একটি স্থাপত্য ভেঙে ফেলা দেখতে ভালো লাগে না। সেই বিখ্যাত ইরানি দার্শনিকের মতো বলতে হয়, 'এই সুন্দর ভবনটি আসলে ভাঙা হচ্ছে না, ও মানুষের কৃতকর্মের লজ্জায় নিজে নিজেই ভেঙে পড়ছে।'

মানুষ আসলে সব সময় ভুল করে। ভুল করার জন্যই যেন মানুষ। সেই আপেল খাওয়া দিয়ে স্বর্গচ্যুত মানুষের ভুলের শুরু...সেই ভুল এখনো চলছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আরেক দার্শনিক একটা মহান বাক্য বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে—"আমাদের জীবনটা আসলে ভুলে ভরা। তার মধ্যেও কিছু কিছু ভুল সুন্দর। আর এসব ভুলগুলোর জন্যই এই অসুন্দর পৃথিবীতে আসা।"

এ প্রসঙ্গে একটা 'আন্তর্জাতিক' মানের জোক্‌স! ওই ভুল প্রসঙ্গেই। এক লোক ভালো মানুষ, জীবনে কখনোই কোনো ভুল করেন নি। কিন্তু একদিন ভুল করলেন, কুসঙ্গে পড়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলেন। দরজা খুলল স্ত্রী। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

পরদিন ঘুম ভাঙল তার, দেখে বিছানার সাইড টেবিলে এক গ্লাস দুধ আর একটা অ্যাসপ্রিন, সাথে একটা চিরকুট, তাতে লেখা, "দুধটা খেয়ে অ্যাসপ্রিন খাও ভালো লাগবে"। স্বামী তো অবাক, এত বাজে একটা কাজ করে ফিরল রাতে আর স্ত্রীর এত ভালো ব্যবহার?

নাস্তার টেবিলে গিয়ে দেখে আরেক বিস্ময়! তার প্রিয় খাবারগুলো তৈরি করে রেখেছে স্ত্রী তার জন্য, সাথে চিরকুট তাতে লেখা, "নাস্তা খেয়ে রেস্ট নাও আজ অফিসে যেও না।"

স্বামীর আর সহ্য হল না, ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল

—আচ্ছা ব্যাপারটা কী বল তো?

—কোন ব্যাপার?

গত রাতে আমি এত বাজে একটা কাজ করলাম, মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলাম, অথচ তোর মা এত মধুর ব্যবহার করছে কেন? কারণটা জানিস?

—জানি।

—কী?

—গত রাতে তোমার মুখ দিয়ে তো ভক ভক মদের গন্ধ বেরুচ্ছিলই, কাপড়চোপড় দিয়েও বাজে গন্ধ বেরুচ্ছিল, মনে হয় তুমি ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলে। তারপর মা তোমার

শার্টটা খুললেন তুমি কিছু বললে না অবশ্য বলার অবস্থাও ছিল না। তারপর মা তোমার প্যান্টটা যেই খুলতে যাবেন তুমি চিৎকার করে উঠলে।

—কী চিৎকার করলাম?

—লিভ মি অ্যালোন, আই অ্যাম ম্যারেড!

**হালিমের রেসিপি**

এক লোককে দেখা গেল রাস্তায় এক নেড়ি কুকুর ধরে তার বাঁকা লেজে একটা লম্বা সোজা মুলিবাঁশ বাঁধছে। এই দৃশ্য দেখে এক কৌতূহলী পথচারী আব ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না। বলল

—ভাই নিশ্চয় কুকুরের বাঁকা লেজটা সোজা করতে চাইছেন?

—না।

—তা হলে বাঁশ বাঁধছেন কেন?

—আমি সোজা বাঁশটা বাঁকা করতে চাইছি।

—কেন??

—আরে ভাই সোজা বাঁশে আজকাল কোনো কাজ হচ্ছে না, সেই দিন আর নাইরে ভাই...তাই বাঁশ বাঁকা করে নিচ্ছি। কেন জানেন না সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না?

এটা অবশ্য নিছকই একটা জোক। বরং ঘি ওঠানো নিয়ে একটা গল্প শোনা যাক। এক লোক দোকান থেকে ভালো দেখে একটা ঘি'র বয়াম কিনে নিয়ে এল। বাসায় এসে প্রথমে চেষ্টা করল সোজা আঙুলে ঘি ওঠাতে, পারল না। পরে আঙুল বাঁকা করে যেই ওঠাতে গেল ঠিকই ঘি উঠে এল কিন্তু একি? ঘির সঙ্গে উঠে এসেছে একটা মরা টিকটিকি। ছি ছি বলে লোকটা টিকটিকি ছুড়ে ফেলে। ছুটল সেই দোকানে।

দোকানে গিয়ে হুঙ্কার দিল—'হোয়াট ইজ দিস?'

—বলুন কী সমস্যা? দোকানি মধুর হাসি হেসে এগিয়ে এল।

—এইটা কী? হোয়াট ইজ দিস?? ঘিয়ের বয়ামটা এগিয়ে দিল। যেটাতে তখনো একটা মরা টিকটিকির লেজ দেখা যাচ্ছে। দোকানদার উঁকি মেরে দেখল, তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল

—স্যার আস্তে কথা বলুন...প্লিজ...

—মানে? আস্তে কথা বলব কেন?

—আর কেউ চাইলে দিতে পারব না।

—কী দিতে পারব না?

—মানে টিকটিকিওলা ঘি ওই একটাই ছিল।

রোজা চলে এসেছে। সিয়ামের মাস। সংযম প্রদর্শনের মাস। কিন্তু ইফতারের আগে আগে ইফতারির দোকানগুলোতে হুড়াহুড়ি দেখলে মনে হয় না আদৌ এটা কোনো সংযমের মাস। সেদিন দেখি আমাদের এলাকায় এক ইফতারির দোকানে লাইন। ব্যাংকে বিদ্যুৎ বিলের লাইনে যেমনটা হয় সেরকম, হাউকাউ চেঁচামেচি পিছনের লোক সামনে যাচ্ছে কেন এরকম বাকবিতণ্ডা চলছে উচ্চ স্বরে! কিন্তু লাইনটা কিসের? পরে দেখি হালিম কেনার লাইন। কিন্তু খুবই উত্তপ্ত লাইন। আমার আর হালিম কেনা হল না।

বরং হালিম খাওয়ার একটা গল্প শোনা যাক। এক লোক ঠিক করল বাজারের ভেজাল হালিম আর সে খাবে না। নিজেই হালিম তৈরি করে খাবে। ভেজালমুক্ত সত্যিকারের এক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নম্বরের হালিম। বহুকষ্টে একটা এক নম্বর হালিমের রেসিপি জোগাড় করল। তারপর হালিম তৈরির সব সরঞ্জাম কিনল বাজার থেকে। তারপর রওনা দিল বাসার দিকে। পথে হঠাৎ হাইজ্যাকার ধরল। কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হালিম তৈরির সরঞ্জামের ঝোলাটা নিয়ে দৌড় দিল। লোকটি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

—কী হল হাসছেন কেন?

—আরে ঐ দেখুন হাইজ্যাকারটা আমার হালিম তৈরির সব সরঞ্জাম নিয়ে ভাগছে।

—তাতে হাসির হলটা কী?

—হাসব না? বেকুব ঐ জিনিস বাসায় নিয়ে কী করবে?

—মানে?

—মানে হালিম বানাবে কীভাবে? হালিমের রেসিপি তো আমার পকেটে। হা হা হা...

**তারকা ননতারকা**

আগে শুধু নায়ক আর গায়করাই তারকা ছিল। টিভি খুললেই তাদের দেখা যেত। এখন সবাই তারকা...সাংবাদিকরা তারকা, রাজনীতিবিদরা তারকা, এমপিরা তারকা, বিচারকরা তারকা, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা তারকা। যে কোনো চ্যানেল খুললেই তাদের দেখা যায়। সবাই তারকা মাঝখানে শুধু সাধারণ জনগণ ননতারকা...তাদেরও টিভিতে দেখা যায়, তবে যে অবস্থায় দেখা যায় তাতে তারকা হওয়া কঠিন। তাদের দেখা যায়...হয় ভ্যানে বসে আমসি মুখে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে! নইলে বাস, সিএনজি বা রিকশার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে মুখ কালো করে! এই হচ্ছে ননস্টার জনতার অবস্থা! কিন্তু এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। জনগণের জন্যই এই দেশ। তারাই হবে আসল তরকা। তাদেরকে কেন্দ্র করেই এই দেশের সবকিছু কিন্তু তারা তারকা না হয়ে উল্টো ব্ল্যাকহোল হয়ে বসে আছে...!!

জনগণ কিছুক্ষণের জন্য ব্ল্যাকহোল হয়ে থাকুক; আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে আসি।

মানুষের মধ্যে যেমন তারকা আছে, প্রাণিকুলেও কিন্তু তারকা আছে। ধরা যাক এই বিষয় নিয়ে একদিন দুই বন্ধুর মধ্যে বিতর্ক লাগল।

—বল তো প্রাণিকুলে তারকা কে?

—জেব্রা।

—কেন, তোর এ ধারণা হল কেন? জেব্রা কেন তারকা প্রাণী হতে যাবে?

—কারণ জেব্রার গায়ের সাদাকালো ডোরাকাটা নিয়ে এই পৃথিবীতে যত গবেষণা হয়েছে আর কোনো প্রাণীকে নিয়ে হয় নি...

—যেমন?

—যেমন ধর জেব্রাকে নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং জরিপ হয়েছিল...পৃথিবীর বহু মানুষের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল জেব্রার গায়ের চামড়া সাদার উপর কালো ডোরাকাটা? নাকি কালোর উপর সাদা ডোরাকাটা??

—উত্তরটা কী ছিল?

—উত্তরটা ছিল...যারা সাদা চামড়ার তারা বলেছে সাদার উপর কালো ডোরাকাটা, আর যারা কালো চামড়ার মানুষ তারা বলেছে কালোর উপর সাদা ডোরাকাটা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—হল না।
—কী হল না?
—তারকা প্রাণী হওয়ার জন্য এই জরিপ কোনো কারণ হতে পারে না।
—তা হলে তুই বল তারকা প্রাণী কে?
—কেন 'স্টার ফিল।'

স্বাধীনতা যুদ্ধে বাবাকে হারিয়েছে এক শিশু। সেই শহীদ বাবার লাশও পাওয়া যায় নি। সেই শিশু যখন তার বাবাকে খুঁজত, মা আকাশের তারা দেখিয়ে বলতেন, 'ওই যে তোমার বাবা আকাশের তারা হয়ে আছেন।' স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পর সেই শিশু এখন পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ। তিনি এখন আকাশের তারাদের মধ্যে আর তার তারা হয়ে যাওয়া না দেখা শহীদ পিতাকে খোঁজেন না বরং না চাইতেও দেখেন বা দেখতে বাধ্য হন তারকা রাজাকারদের টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে।

এই দেশে অন্য যে কেউ তারকা হোক কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু এই স্বাধীন দেশে রাজাকার কেন তারকা হয়ে উঠবে! হায় সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশের রাজনীতি!!

আবার সেই ব্ল্যাকহোল জনতার কাছে ফিরে আসি। জনগণ তারকা হতে না পারলেও যদি ব্ল্যাকহোল হয়ে থাকে তা হলে কিন্তু সাবধান। একটা ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণী শক্তি কেমন তা খেয়াল আছে তো নিশ্চয়ই...এতই ভয়ঙ্কর আকর্ষণ শক্তি যে একটা মানুষ (সে যদি তারকাও হয়) যদি তার পাশ দিয়ে যায় তাকে এত দ্রুত টেনে নেয় যে একটা ছয় ফুট (একটা মানুষ যদি ছয় ফুট লম্বা হয়) লম্বা মানুষকে ৬০০০ ফুট লম্বা সুতার মতো টেনে নেয়। (তখন সেই মানুষ টের পায় লাল সুতা কী বস্তু!) কাজেই ননতারকা পাবলিকের কাছ থেকে কিন্তু সাবধান!!

সবশেষে মহান বিজয় দিবসে একটি মূল্যবান কোটেশন। কোটেশনটি অবশ্য আরেকজন মহান ব্যক্তির 'তুমি বিজয়ের আনন্দে ভুলে যেও না যে একসময় তুমি ছিলে ক্রীতদাস! গলায় হয়তো তোমার শিকলের দাগ নেই কিন্তু খুঁজে দেখ হাতে রয়েছে ভোট দেয়ার চিহ্ন।' প্রিয় পাঠক কী বুঝলেন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# সায়েন্সটুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**আইন-গাইন স্টাইন।**

আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের একশ বছর পূর্ণ হল। এখন এই তত্ত্ব অনেকেই বোঝেন। কিন্তু একটা সময় ছিল, গুটিকয় বিজ্ঞানীই নাকি বুঝতে পারতেন। অন্যেরা হয়তো-বা বোঝার ভান করতেন। তো সেই সময় পৃথিবী জুড়ে আইনস্টাইনের জয়জয়কার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আইনস্টাইন কোনো কোনো দেশে যাচ্ছেন কোনো কোনো দেশে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারছেন না। তবে একদিন তাঁর প্রিয় দেশ আমেরিকায় রওনা হলেন। জাহাজে করে চলেছেন। রাতে ডিনার টেবিলে এক মহিলা, যার আইনস্টাইন সম্পর্কে অত ধারণা নেই। তবে এটুকু অন্তত বুঝেছেন যে, লোকটি এ জাহাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তো সেই মহিলা এগিয়ে গেলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ জমাতে। প্রাথমিক কুশলাদির পর তিনি জানতে চাইলেন—

'আচ্ছা আপনি পড়াশোনা করেছেন কোন বিষয়ে বলুন তো?'

'সত্যি কথা বলতে কি আমি এখনো পদার্থবিদ্যার ছাত্র।'

'বলেন কী? আমি তো সেই কবেই পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছি। আপনি এখনো ছাত্র?'

যা হোক অবশেষে আমেরিকা পৌছানো গেল। জাহাজ থেকে নামামাত্র সাংবাদিকরা সব ঘিরে ধরলেন আইনস্টাইনকে। নানান সব প্রশ্ন করছেন সবাই। একজন জানতে চাইলেন—

'আচ্ছা আপনি কি জানেন আপনি এখন মেয়েদের মধ্যেও প্রচণ্ড জনপ্রিয়?'

'তাই নাকি! জানলাম।'

'আচ্ছা আপনার কী ধারণা আপনি কেন মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয়? এমনটা তো নিশ্চয়ই নয় যে মেয়েরা থিওরি অব রিলেটিভিটি বুঝে গিয়ে আপনার ভক্ত হয়ে উঠেছে।'

মৃদু হাসলেন আইনস্টাইন, বললেন—

'তা হয়তো নয়। তবে আমার ধারণা—মেয়েরা সব সময় ফ্যাশন পছন্দ করে। আর এ বছর ফ্যাশন হচ্ছে থিওরি অব রিলেটিভিটি।'

আইনস্টাইনকে সসম্মানে একটি দামি হোটেলে নেয়া হল। সেখানেও দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরলেন। এক জার্মান সাংবাদিক তাকে এক ফাঁকে আক্রমণ করে বসলেন। 'আপনি কি জানেন আপনার থিওরি অব রিলেটিভিটির বিরুদ্ধে আমাদের দেশের ১০০ জন প্রফেসর বিরোধিতা করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন?'

আইনস্টাইন মুচকি হেসে বললেন, 'তাই নাকি? আমার তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করার জন্য কিন্তু মাত্র একজন প্রফেসরই যথেষ্ট।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরদিন সায়েন্টিফিক আমেরিকা থেকে লোকজন এসে জানাল, 'স্যার, আমরা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি।'

'কী রকম?'

'তিন হাজার শব্দের মধ্যে কে কত সহজ ভাষায় 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' লিখে বোঝাতে পারে?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন আলবার্ট আইনস্টাইন। 'অসম্ভব, আমার পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া সম্ভব নয়। কারণ মাত্র তিন হাজার শব্দে আমি অন্তত এটা ব্যাখ্যা করতে পারব না।' তো একদিন কাউকে না জানিয়ে খেয়ালি এই বিজ্ঞানী একাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন শহরে। এদিক-সেদিক ইচ্ছেমতো ঘুরে ফেরার পথে বাস ধরলেন। কন্ডাক্টর টিকিট চাইলে তিনি এ-পকেট, সে-পকেট হাতড়ে টিকিট আর খুঁজে পান না।

কন্ডাক্টর মৃদু হেসে বলল, 'স্যার, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার টিকিট না হলেও চলবে।'

আইনস্টাইন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার না হলেও হয়তো চলবে কিন্তু আমার চলবে না। ঐ টিকিটের গায়েই যে আমি আমার হোটেলের নাম লিখে রেখেছি।'

তবে হোটেলে পৌঁছাতে তার সমস্যা হয় নি। কারণ হোটেলের নাম আইনস্টাইন ভুলে গেলেও আইনস্টাইনের খ্যাতির কারণে বাসের সেই কন্ডাক্টর ভোলেন নি। কারণ তখন সবাই জানে আইনস্টাইন কোথায় কোন হোটেলে উঠেছেন। হোটেলে পৌঁছে আইনস্টাইন দেখেন তার জন্য এক তরুণ পদার্থবিদ বসা। আইনস্টাইন তাকে সময় দিলেন। নানান কথা হল দুজনে। এক পর্যায়ে আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত পরিচারিকা এক বাটি সুপ দিয়ে গেল। এসময় আইনস্টাইন ফিসফিস করে বললেন, 'আমি কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিরক্ত বোধ করলে সুপের বাটি দেওয়ার পর সেটা সামনে একটু ঠেলে দেই। তখন পরিচারিকা বুঝে যায়। সে এসে অতিথিকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।'

তরুণ পদার্থবিদ ভেতরে ভেতরে খুশি হয়ে উঠলেন, 'যাক তার ক্ষেত্রে অন্তত তিনি সুপের বাটি ঠেলেন নি।' আর ঠিক তখনই আইনস্টাইন তার সুপের বাটিটা আস্তে করে সামনে ঠেলে দিলেন।

এবার আমেরিকা থেকে বিদায়ের পালা। যথারীতি আইনস্টাইনকে জাহাজে তুলে দিতে সবাই ভিড় করেছেন। এক বাবা তার শিশুপুত্রকে ভিড়ের মধ্যে আইনস্টাইনকে দেখাতে দু হাতে উঁচু করে ধরেছেন। শিশুটি তারস্বরে কাঁদছে। এই দৃশ্য দেখে আইনস্টাইন হাসিমুখে বললেন, 'আমার এই এত বছর বয়সে অন্তত একজন আমার সম্পর্কে তার প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করেছে' বলে সস্নেহে শিশুটির গাল টিপে ঢুকে গেলেন জাহাজে তার জন্য রাখা নির্ধারিত কেবিনে।

## মা, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

বলা হয়ে থাকে গত পাঁচ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় দুটি আবিষ্কারের মধ্যে একটা হচ্ছে কোপার্নিকাসের সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরা, অন্যটা ডারউইনের বিবর্তনবাদ। তবুও বেচারা ডারউইন যখন তার 'অরিজিন অব স্পিসিজ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তখন তাকে প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

সেই সময় কার্টুন ব্যাপারটা পৃথিবীতে এভাবে শুরু হয় নি। তখন ছিল ক্যারিক্যাচারের যুগ। ফলে সেই সময়ের বিখ্যাত ক্যারিক্যাচারিস্টরা সব ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডারউইনকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিয়ে। তারা প্রথম যে কাজটি করলেন সেটা হচ্ছে তারা প্রায় সবাই তাদের ক্যারিক্যাচারে ডারউইনের একটা করে লেজ লাগিয়ে দিলেন। বেশিরভাগ ক্যারিক্যাচারেই দেখা গেল ডারউইন বোগলে 'অরিজিন অব স্পিসিজ' বইটি নিয়ে হেঁটে চলেছেন, সঙ্গে চলেছে তার লেজটি। কেউ কেউ অবশ্য শুধু লেজ এঁকেই ক্ষান্ত হন নি—তার মুখটি ছাড়া তাকে পুরোপুরি বানর এঁকে ক্যারিক্যাচার করে নির্মম সব সংলাপ দিয়ে দিলেন তার মুখে। অবশ্য বিষয়টা ডারউইন খুব গুরুত্বের সাথে নেন নি। সেসময় এক ত্যাঁদড় সাংবাদিক নাকি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা জনাব ডারউইন, আপনি তো 'অরিজিন অব স্পিসিজ' বইটি লিখেছেন?'

'মনে হয় লিখেছি।'

'আপনি দয়া করে বলবেন কি আপনি নিজে ঠিক কোন প্রজাতির বানর থেকে বিবর্তিত হয়ে আজকের ডারউইন হয়েছেন?'

প্রশ্ন শুনে ডারউইন হাসলেন। তারপর বললেন, 'সেটা জানার জন্যই তো আমার এ 'অরিজিন অব স্পিসিজ' বইটি লেখা।

তবে এটা স্বীকার করতে হবে—ডারউইনের বিবর্তনবাদ শুধু বিজ্ঞানকেই যে সমৃদ্ধ করেছে তা নয়, রম্যজগৎকেও বাদ দিয়ে যায় নি। যে কোনো জোক্‌সের বই খুললেই পাওয়া যাবে একটা দুটো জোক্‌স, যার পেছনে রয়েছেন আমাদের ডারউইন। যেমন ধরা যাক সেই গল্পটির কথা—ছোট্ট বাচ্চা মার কাছে ছুটে গেল।

'মা, আমাদের পূর্বপুরুষরা নাকি বানর ছিল?'

মা তখন সংসারের কোনো কাজে হয়তো ব্যস্ত ছিলেন। সেই কাজ থামিয়ে একটু ভাবলেন তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার পূর্বপুরুষের দিকে সেরকম কোনো ঘটনা নেই বলেই জানি... তবে তোমার বাবার পক্ষে থাকতে পারে...তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।' ছোট্ট বাচ্চা ছুটল বাবার কাছে, তবে বাবার কাছে প্রশ্নটা একটু ভিন্ন হল—

'বাবা, তোমার পূর্বপুরুষরা নাকি বানর ছিল?'

'কে বলল?'

'মা।'

বাবা সায়েন্সের ছাত্র। ডারউইন তার পড়া আছে। বিবর্তনবাদও তার জানা। ফলে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। একবার ভাবলেন ব্যাপারটা তার বাচ্চাকে বিশদ বুঝিয়ে দেবেন, কিন্তু স্ত্রীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে...তিনি বললেন,

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এখন তুমি মানুষ হলে কী করে?'

'কেন তোমার মাকে বিয়ে করে?'

এরকম অজস্র জোক্‌স পাওয়া যাবে যার পেছনে রয়েছেন ডারউইন। পাঠকের মনে আছে কি না জানি না, একসময় ডারউইনের তত্ত্ব ভুল বলে একটা আওয়াজ উঠেছিল। সেসময় নতুন একটা তত্ত্ব বিজ্ঞান মহলে ঢোকার চেষ্টা করেছিল...বা ওরকম একটা কিছু ঘটেছিল। তো তখন আধুনিক কার্টুনিস্টরা আবার ঝটপট তৎপর হয়ে উঠেছিলেন ডারউইনকে নিয়ে। কেননা কার্টুনের বিষয় হিসেবে ডারউইন সব সময় এক নম্বরে। তখন একটি মজার কার্টুন দেখেছিলাম একটি সায়েন্স জার্নালে। সেটা এরকম—

একটা গাছে দুটি বানর বসে আছে, একজনের হাতে একটা দৈনিক পত্রিকা যেখানে ঐ খবরটা আছে। 'ডারউইনের তত্ত্ব ভুল...?' পত্রিকা হাতে বানরটি বলছে, 'তা হলে নিশ্চয়ই আমরা মানুষ থেকে বিবর্তিত বানর...কি বলো?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শেষ একটি গল্প দিয়ে আমাব এ ডারউইন বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ (!!?) লেখাটি শেষ করি। যথারীতি এ গল্পের পেছনেও রয়েছেন মহান ডারউইন। আগের গল্পটার মতোই ছোট্ট বাচ্চা ছুটে এসেছে মায়ের কাছে।

'মা, একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'পারো।'

'বাবার গায়ে এত লোম...তোমার নেই কেন?'

এবারো সাংসারিক কাজে ব্যস্ত মা কাজ থামিয়ে একটু ভাবলেন। তবে এক্ষেত্রে মা-ও কিন্তু সায়েন্সের ছাত্রী। মা একটু ভেবে সহজভাবে বাচ্চাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

'তুমি তো জানো আমরা মানুষ আগে ছিলাম বনমানুষ। গায়ে গাদা গাদা লোম থাকত, তারপর বিবর্তনের মাধ্যমে সব লোম ঝরে পড়ে আস্তে আস্তে...'

'কিন্তু বাবা...?'

'আমার বিবর্তন শেষ হলেও তোমার বাবার বিবর্তন মনে হয় এখনো চলছে...'

## আপনার সেরা আবিষ্কার কোনটি?

কোনো বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কোনটি?' তা হলে বোধহয় বিজ্ঞানীর পক্ষে উত্তর দেয়া একটু মুশকিল। তবে এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে চমৎকার উত্তরটি দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী স্যার হাম ফ্রে ডেভি। কী উত্তর দিয়েছিলেন, তা শোনার আগে আরেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী সম্পর্কে একটু জানতে হবে।

মাইকেল ফ্যারাডে নামে এক তরুণ বই বাঁধাইয়ের দোকানে বই বাঁধাই করত। যে বইগুলো বাঁধাই করত সেগুলো আবার সে মনোযোগ দিয়ে পড়ত। তো একদিন এক বিদগ্ধ ক্রেতা দেখতে পেলেন এক তরুণ খুব আগ্রহ নিয়ে একটি কঠিন বিদ্যুৎবিষয়ক বই পড়ছে। দৃশ্যটি দেখে বিদগ্ধ ক্রেতা (যিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির একজন সদস্য...) মুগ্ধ হয়ে তাকে চারটি টিকেট উপহার দেন। সেসময় খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্যার হাম ফ্রে ডেভির বক্তৃতা চলছিল কাছাকাছি কোথাও। তারই চারটি টিকেট।

তরুণ বুক বাইন্ডার মাইকেল ফ্যারাডে সেই টিকেট দিয়ে পরপর চারদিন স্যার হাম ফ্রে ডেভির বক্তব্য শোনেন এবং বক্তৃতাগুলো নিজে বিশ্লেষণ করে নোট করে, ছবি এঁকে, সুন্দর করে পাঠিয়ে দেন ডেভির কাছে, সাথে একটা ছোট্ট চিরকুটে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তার সহকারী হিসেবে কাজ করার।

ডেভি তার কঠিন বক্তৃতার এত সহজ বিশ্লেষণ পড়ে মুগ্ধ হন এবং মাইকেল ফ্যারাডেকে তার সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর আর তরুণ বুক বাইন্ডার মাইকেল ফ্যারাডেকে পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। স্যার হাম ফ্রে ডেভিকে সাহায্য করার ফাঁকে ফাঁকে ফ্যারাডে স্বাধীনভাবে গবেষণা শুরু করেন। তড়িৎ-রসায়ন, ধাতুবিদ্যা, তড়িৎবিজ্ঞান প্রভৃতি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা করে তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। এখন পর্যন্ত তাকে বলা হয় 'the greast experimental scientist of all time.'

মরিচাবিহীন ইস্পাত আবিষ্কারের তিনি জনক। তড়িৎচুম্বক আবেশের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে শিল্প ক্ষেত্রে তড়িৎ যুগের সূচনা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। পরবর্তীকালে মাইকেল ফ্যারাডে একজন সামান্য বুক বাইন্ডার থেকে রয়্যাল সোসাইটির অসামান্য অধিকর্তা হন।

এবার মূল ঘটনায় ফিরে আসি, সেই শুরুর প্রশ্ন বিজ্ঞানী হাম ফ্রে ডেভিকে প্রশ্ন করা হল— 'আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কী?'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বৃদ্ধ ডেভি স্মিত হাসলেন, তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'মাইকেল ফ্যারাডে'।

একই প্রশ্ন করা হয়েছিল টমাস আলভা এডিসনকে। তবে উত্তরটা তিনি দিয়েছিলেন একটু অন্যভাবে। তখন তার বিখ্যাত গ্রামোফোন যন্ত্র সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সবাই বলছে, এটাই তার সেরা আবিষ্কার।

—স্যার এটাই কি আপনার সেরা আবিষ্কার?

সংবাদ সম্মেলনে আসা সাংবাদিকরা জানতে চায়।

এই সময় শুরু থেকে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকা এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এটা কী করে সেরা আবিষ্কার হয়, সব সময় কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করেই চলেছে...।'

টমাস আলভা এডিসন তখন মুচকি হেসে বললেন,

—ম্যাডাম আপনি একটু ভুল করলেন।

—কী ভুল করলাম?

—সব সময় কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে যে যন্ত্র, সেটা আবিষ্কার করেছেন ঈশ্বর। আর আমি যেটা আবিষ্কার করেছি, সেটা ইচ্ছে করলেই বন্ধ করা যায়। বলে টুক করে গ্রামোফোন বন্ধ করে দিলেন। ব্যস, দুদিক থেকেই ঘ্যানর ঘ্যানর বন্ধ।

আরেক পরিবেশবাদী বিজ্ঞানীকে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল (তার নামটা মনে পড়ছে না), আইরিশ এই বিজ্ঞানীকে যখন বলা হল—'আপনার জীবনের সেরা আবিষ্কার কোনটি?'

তিনি বললেন, 'সেরা আবিষ্কার কোনটি বলতে পরব না, তবে সবচেয়ে বাজে আবিষ্কারটি বলতে পারি...'

– তা হলে সেটাই বলুন।

– ঐ যে ঐ বস্তুটি টি...

সাংবাদিকরা তার আঙুল বরাবর তাকিয়ে দেখে তার টেবিলের নিচে ছোট্ট একটা বিড়ালের বাচ্চা চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে।

'এ কম করে হলেও আমার ডজনখানেক গবেষণাপত্র খামছে-কামড়ে নষ্ট করেছে,' বলে সস্নেহে তাকে কোলে তুলে নেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। 'একে আমি আবিষ্কার করেছি একটা আবর্জনার স্তূপ থেকে।'

সাংবাদিকরা তাকিয়ে দেখে বিখ্যাত বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর কোলে বসে সেই মার্জার শিশু তখন চোখ বন্ধ করে ঘড়ঘড় করতে শুরু করেছে।

কে জানে সে হয়তো ভাবছে তার বৃদ্ধ মালিক তার প্রশংসা করতেই শুরু করেছেন।

## মি. আম্রেলা

আমি একবার এক পাঙ্কু টাইপ বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বল তো ছাতা আবিষ্কার করেছেন কে?'

বাচ্চাটি কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'মি. আম্রেলা।'

বিজ্ঞানীদের সাথে 'আবিষ্কার' শব্দটি যেন খুবই সম্পূরক একটি শব্দ। বিজ্ঞানী হয়েছেন অথচ আবিষ্কার করেন নি, এটা তো হতে পারে না। অবশ্যই সব আবিষ্কারই যে আবিষ্কারকের জন্য সুখকর তাও কিন্তু নয়। যেমন ধরা যাক, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আবিষ্কারকের কথা। এই আবিষ্কারক তার এই যন্ত্র আবিষ্কার করে একদিন সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন। সাংবাদিকরা এল। তিনি যন্ত্রটি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। তারপর ঘরময় আবর্জনা, ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে যেই-না যন্ত্রটি চালু করলেন।...যন্ত্রটি শুষে নেয়ার পরিবর্তে সজোরে ফুঁ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিতে শুরু করল। ব্যস! মুহূর্তে ঘনময় ধুলো আবর্জনায় অন্ধকারাচ্ছন্ন...এ অন্ধকারে সেবার বিজ্ঞানী পালিয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে বছরখানেক পরই তিনি দ্বিতীয়বার সংবাদ সম্মেলন করে সফল হয়েছিলেন।

টমাস আলভা এডিসনই বোধহয় এমন এক বিজ্ঞানী যিনি একের পর এক শুধু আবিষ্কারই করে গেছেন। প্রায় প্রতিটি আবিষ্কারেই সবাই ধন্য ধন্য করলেও তার এক অবৈজ্ঞানিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু (নামটা অবশ্য এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না) ছিলেন টমাস আলভা এডিসনের কড়া সমালোচক। এডিসনের প্রতিটি আবিষ্কারের পরপর তিনি চেঁচামেচি শুরু করে দিতেন।

'...অ্যাঁ, টমাস? এটা কোনো আবিষ্কার হল? শুধু শুধু পণ্ডশ্রম...এটার পেছনে কে সময় নষ্ট করতে যাবে...।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপরও টমাস তার এই চিল্লানোসোরাস টাইপ বন্ধুটিকে পছন্দ করতেন। তো সেই বন্ধু একবার বিপদে পড়লেন এবং এডিসনের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার করলেন আর তার পরই টমাস আলভা এডিসন 'আবিষ্কার' করলেন (না নতুন কোনো যান্ত্রিক আবিষ্কার নয়) তার চিল্লানোসোরাস বন্ধুকে, তার আবিষ্কারের পর আর আগের মতো চিৎকার করছেন না। বরং মিনমিন করে প্রশংসা করতে শুরু করেছেন।

এবার টমাস আলভা এডিসন ক্ষেপে গেলেন। চিৎকার করে উঠলেন, 'তুমি হয় আগের মতো চেঁচিয়ে বল, এটা কোনো আবিষ্কারই হয় নি, না হলে আমার টাকা ফেরত দাও।'

তার সে বন্ধু অবশ্য শেষ পর্যন্ত কী করেছিলেন জানা যায় নি।

সব আবিষ্কারই যে বিজ্ঞানীরাই করবেন, তার কোনো মানে নেই। বিজ্ঞানীদের স্ত্রীরাও 'আবিষ্কার' করতে পারেন। যেমন—সবচেয়ে মর্মান্তিক আবিষ্কারটি করেছিলেন বোধহয় পানি বিজ্ঞানী পিজি ওয়েলসের স্ত্রী।

পিজি ওয়েলস—বিখ্যাত পানি বিজ্ঞানী, তার গবেষণার সুবিধার জন্য সব সময় দেড় ফুট খানেক লম্বা একটা থার্মোমিটার সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। সুযোগ পেলেই যেখানে-সেখানে...মানে খালে-বিলে-নর্দমায় পানির মধ্যে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে তাপমাত্রা নোট করতেন। তো সেই পানিপাগল তরুণ বিজ্ঞানী একদিন এক রূপসী তরুণীর পাণিপ্রার্থী হলেন এবং সেই সুন্দরীর অনুমতিক্রমে অচিরেই তারা বিয়ে করলেন। তারপর দু'জন চলে গেলেন দূরবর্তী কোনো এক সমুদ্র তীরে, মধুচন্দ্রিমায়।

রূপসী স্ত্রী বিজ্ঞানীর কাঁধে মাথা রেখে গভীর আবেগে চোখ বুজে আছেন, আকাশে পূর্ণচন্দ্র...নিচে সমুদ্রের জল কল্লোল...বিজ্ঞানী এক হাতে জড়িয়ে ধরে আছেন সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে। খুবই রোমান্টিক আবেগ-বিহ্বল মুহূর্ত...পরিবেশটাও মোহনীয়। স্ত্রী চোখ খুললেন। হয়তো ভালবাসার কথা বলতেই...আর তখনই পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মান্তিক 'আবিষ্কারটি' করলেন তিনি।

হ্যাঁ, প্রেমিক বিজ্ঞানী এক হাতে গভীর আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে থাকলেও আরেক হাতে তার দেড় ফুটি থার্মোমিটারটি ধরে আছেন সমুদ্রের পানিতে।

তারপর আর কি? হ্যাঁ,...স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাকে ত্যাগ করেন, আর ফিরে আসেন নি। তবে ইদানীং মিডিয়া যেসব জিনিস আবিষ্কারকদের নিয়ে আবিষ্কার করছে তা যে আরো মর্মান্তিক! এই তো সেদিন পেপারে দেখলাম আলেকজেন্ডার গ্রাহাম বেল আসলে টেলিফোন আবিষ্কার করেন নি। মূল আবিষ্কার (এলিশা গ্রে) থেকে ধারণা চুরি করে নিজের নামে চালিয়েছেন। এজন্য পেটেন্ট অফিসে নাকি তাকে মিথ্যা বলার সময় নার্ভাস দেখাচ্ছিল!! কে জানে হয়তো এ কারণেই আমরা এখন মোবাইলে হরদম মিথ্যা বলি!


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**ইতিহাস আসলে এক দুঃস্বপ্ন...**

সাধারণ মানুষের ছোটবেলা আনন্দময় হলেও বিজ্ঞানী-গবেষকদের ছোটবেলা বোধহয় ততটা আনন্দের নয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পৃথিবীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সাগান তখন কিশোর। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র-তারার প্রতি তার অসম্ভব ঝোঁক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জুতসই কোনো বই পাচ্ছিলেন না পড়ার মতো, যেটা পড়ে এ বিষয়ে তার আগ্রহ কমবে। তখন তার এক বন্ধু বুদ্ধি দিল শহরের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সদস্য হয়ে যেতে। সেখানে তারার ওপর ভালো ভালো বই আছে। আইডিয়াটা কার্ল সাগানের পছন্দ হল। তিনি মেম্বার হয়ে গেলেন। তারপর একদিন গেলেন গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর বই নিতে। বয়স্ক লাইব্রেরিয়ান সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

'কী ধরনের বই চাও তুমি খোকা?'

'তারার ওপর একটা বই চাচ্ছি?'

'সচিত্র?'

'অবশ্যই।'

অনেক ঘেঁটেঘুঁটে একটা মোটাসোটা বই কার্ল সাগানের হাতে ধরিয়ে দিলেন বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান। উত্তেজনায় সাগানের তর সইছিল না, ছুটে বাসায় এসে নিজের ঘরে বই খুলে বসলেন।...কিন্তু একি? এ যে হলিউডের সব চিত্র তারকাদের বই...! সচিত্র!

মুদ্রণযন্ত্রের বিখ্যাত আবিষ্কারক গুটেনবার্গের বাল্যকালও নাকি তেমন সুবিধার যায় নি। তার বাবা ছিলেন বদরাগী। তিনি যখন-তখন একরোখা গুটেনবার্গকে লাঠিপেটা করতেন। কে জানে শিশু গুটেনবার্গের নিজের গায়ের চামড়ায় মুদ্রিত দাগ থেকেই কি তার মাথায় ঐ মুদ্রণযন্ত্রের ভাবনা আসে?? সেই সময় কিন্তু চামড়াতেও ছাপাছাপির কাজ হত। তবে চামড়াটা অবশ্য মানুষের ছিল না।

এরকম আরো উদাহরণ দেয়া যায়...

এডিসনের ডিমে তা দেয়া, নিউটনের মুরগির জন্য দরজার মধ্যে একাধিক ছোট-বড় দরজা তৈরি কিংবা ক্লাসে আইনস্টাইনের ফেল করা...এ সবই বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকদের চর্বিত চর্বণ গল্প। সেদিকে গেলাম না। বরং আমরা এক লাফে বড় হয়ে যাই...।

হ্যালির ধূমকেতুর সেই হ্যালি ছোটবেলায় কেমন ঝুটঝামেলায় পড়েছিলেন, জানা যায় নি (আমি অন্তত জানতে পারি নি।) তবে বড় হয়ে তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির এবং কম কথার মানুষ, সাংবাদিক এড়িয়ে চলতেন। সাংবাদিক দেখলেই বলতেন, 'নো কমেন্ট'। তো একবার তিনি অন্য দেশের এক মানমন্দিরে গেলেন পরিদর্শনে, আমন্ত্রিত হয়ে। সেখানে তখন প্রচুর উল্কাপাত হচ্ছিল। হ্যালি এসেছেন শুনে বাইরে সাংবাদিকরা ভিড় করে আছে। তিনি যখন বের হলেন যথারীতি সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরল। ভাবখানা এমন, আজ শুধু 'নো কমেন্ট' বললে চলবে না, অন্যরকম একটা কিছু বলতেই হবে। হ্যালি অবশ্য বিদেশি সাংবাদিকদের হতাশ করলেন না। অন্যরকম একটা কিছু বললেন। তিনি বললেন—

'নো কমেট (NO COMET)।'

অর্থাৎ, তিনি বলতে চাচ্ছেন তিনি কোনো উল্কা দেখতে পান নি। আরেকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে। তিনি ছিলেন একজন ইহুদি (এই মুহূর্তে তার নামটা মনে করতে পারছি না, প্রিয় পাঠক ক্ষমা করবেন)...তো তাকে নাৎসিরা ধরে নিয়ে গেল এক জার্মান জেনারেলের সামনে। জেনারেলকে অবশ্য জানানো হল, এ বৃদ্ধ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাধারণ কোনো ইহুদি নয়, একজন নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। জেনারেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জ্যোতির্বিদের দিকে, কিছুক্ষণ পর ব্যঙ্গের স্বরে বললেন,

'ও, আপনি তা হলে সেই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ?'

'হুঁম।'

'তা এ পর্যন্ত আকাশের কতগুলো তারা আবিষ্কার করেছেন?'

বৃদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মৃদু হাসলেন। তারপর স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'তোমার দুই কাঁধে যতগুলো তারা আছে তার চেয়েও অনেক বেশি...'

বৃদ্ধের উত্তর শুনে জেনারেল জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাথে 'ইনজেনারেল' কী আচরণ করেছিলেন সেটা অবশ্য জানা যায় নি। সেটা ইতিহাস। আর আমরা তো জানিই—'প্রকৃত ইতিহাস আসলে একটা দুঃস্বপ্ন যেখান থেকে মানুষ সব সময় জেগে উঠতে চায়; কিন্তু কখনই পারে না।'

বলাই বাহুল্য শেষের গুরুগম্ভীর বাক্যটি আমার নিজস্ব নয়, জেমস জয়েসের।

**বিখ্যাতরাও ভুল করেন!**

বিখ্যাতরা যখন ভুল করেন তখন বড় ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে সেটা বুঝতে হলে একটা গল্প বলা জরুরি। বেশ আগের কথা। জীবনের প্রথম ফাইভ স্টার হোটেলে ছিলাম কয়েক রাত। বিদেশ বিভুঁইয়ে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। প্রতিবারই শুতে গিয়ে দেখি বিছানার ওপর সম্বল মোর কম্বল মোটে একটা। এই বিদেশি শীতে একটা কম্বলে শীত যায়? একবার ভাবলাম ফোন করে বলি আরো কম্বল দিতে। আবার ভাবলাম থাক যদি ক্ষ্যাত ভাবে...দরকার কি বরং শীতে কষ্ট করি...পরে দেশে ফিরে এই ঘটনা বিদেশে মাঝে মধ্যেই নিয়মিত ফাইভ স্টার হোটেলে থাকে এমন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে বললে তারা হো হো করে হেসে খুন।

'তুই তো দেখছি আসলেই একটা ক্ষ্যাত।'

'কেন?'

'আরে বেয়াকুফ ঐ সমস্ত হোটেলে বিছানাটা এমনভাবে সাজানো থাকে ঠিক বালিশের নিচ দিয়ে সটান বিছানায় ঢুকে পড়তে হয় বিছানার ভেতরে।

উপরে কম্বলটা তো ফর শো...'

বহু বছর বাদে বিখ্যাত গণিতবিদ রামানুজনের জীবনী পড়তে গিয়ে দেখি একই ভুল তিনিও করেছিলেন। প্রথমবার যখন তাকে ইংল্যান্ডে নেয়া হল তিনিও ঐরকম একটি হোটেলে দিনের পর দিন থেকে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হন এবং ট্র্যাজেডি হচ্ছে পরবর্তীকালে এই ব্যাধিতেই তার মৃত্যু হয়।

এজন্য বলছিলাম, বিখ্যাতদের ভুলের সঙ্গে আমাদের মতো সাধারণদের ভুল যখন মিলে যায় তখন বড় ভালো লাগে। মনে হয়...'উনারাই এই ভুল করেছেন আমরা তো কোন ছার...'

এরকমই আরেকটি ভুল করেছেন বিখ্যাত একজন বাঙালি। তিনি তার ছেলেবেলার একটি বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন এভাবে...'বিকেলে মাঝে মধ্যে বেড়াতে যেতাম স্যার জগদীশ বোসের বাড়িতে। এ বাড়িও আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। সেই আপার সার্কুলার রোডেই।

জগদীশ বোস তখন বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের একজন। গাছের প্রাণ আছে সেটা তিনি আবিষ্কার করেছেন, আর তাঁর জন্য 'স্যার' উপাধি পেয়েছেন...'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভুলটা কী আশা করি বুদ্ধিমান পাঠক ধরে ফেলেছেন। এই ভুল অনেকেই করে। কিন্তু ঐ যে বললাম বিখ্যাতরা ভুল করলে ভালো লাগে, আমরা সাধারণরা একটু স্বস্তি পাই। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেন নি কখনোই। যে জিনিস মাটি ফুঁড়ে আপনাআপনি বের হয়ে আসে তা নিজেই আবিষ্কৃত হয়ে আছে। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন গাছের অনুভূতি। তিনি তাঁর বিখ্যাত রেজোনেন্ট রেকর্ডার দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন গাছের অনুভূতির কথা। আবার তার আরেক বিখ্যাত যন্ত্র ক্রেসকোগ্রাফ দিয়ে একটি গাছের বৃদ্ধির পরিমাপও মেপে বের করেছিলেন তিনি। সেটা হচ্ছে এক মিনিটে এক ইঞ্চির এক লাখ ভাগের মাত্র ৪২ ভাগ। গাছকে আঘাত করলে সেই ৪২ ভাগ বৃদ্ধিও ব্যাহত হতে পারে বা হয়। এই মহান আবিষ্কারের পর চারদিকে যখন তাকে নিয়ে সাধু সাধু রব ওঠে তখন এক সকালে এক বৃদ্ধ সাধু এল তার সাথে দেখা করতে।

'আপনি জগদীশচন্দ্র বসু?'

'আজ্ঞে।'

'আপনি আবিষ্কার করেছেন গাছের অনুভূতি আছে?'

'আজ্ঞে।'

'আপনি নিশ্চিত গাছের অনুভূতি আছে?'

'আমার যন্ত্রগুলো তো তাই বলে।'

'আপনার যন্ত্র ভুল।'

'কেন?'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনার অবিশ্বাসের হেতু?'

'যদি তাই হবে...যদি সত্যিই গাছের অনুভূতি থাকবে তা হলে গাছে ঝুলে আত্মঘাতী হওয়ার সময় আমার একমাত্র ছেলেটাকে কি গাছ বাধা দিত না?'

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু কী বলে সেই পুত্রশোকে কাতর সাধুকে বিদায় করেছিলেন জানা যায় নি। তবে তার আবিষ্কার যে বেশ কিছু কৌতুকেরও জন্ম দিয়েছে তাই-বা অস্বীকার করি কীভাবে? যেমন ধরা যাক সেই কৌতুকটি। স্কুলে বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন স্যার। বিষয়—বোটানি। স্যার একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন—

'গাছের প্রাণ আছে প্রমাণ কর।'

'সেটা তো স্যার বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলই প্রমাণ করে গেছেন...তা না হলে ম্যান্ডেলের থিওরি কি আমরা পড়তাম?'

স্যার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন,

'আচ্ছা বেশ, তা হলে প্রমাণ কর গাছের অনুভূতি আছে।'

'এটা স্যার শওকতকে জিজ্ঞেস করুন। ও অঙ্ক ক্লাসে স্যারের বেতের বাড়ি খায়...বেতও তো একটা গাছ...তাই বলছিলাম অনুভূতির ব্যাপারটা ওই ভালো বলতে পারবে।'

## আগামী সভ্যতার চাবি

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিজ্ঞানী হিসেবে যত-না বিখ্যাত, আনুষঙ্গিক অন্য কারণে বিখ্যাত যেন আরো বেশি। যেমন তাকে বলা হয়ে থাকে পলিটিক্যাল কার্টুনের জনক। তার মানে নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম এই ধারণাটির ধারক-বাহক? যদিও তিনি ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

(বিজ্ঞানী তো বটেই) একজন মানুষ; কিন্তু দেখা গেছে তার ঘরের প্রধান দরজায় একটা ঘোড়ার খুর ঝুলছে। সেই সময় ঐ ঘোড়ার খুর ঝুলিয়ে রাখার অর্থ হচ্ছে, কোনো বালামুসিবত যেন ঐ বাড়িতে ঢুকতে না পারে।

সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করত, 'আপনি এরকম একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হয়ে ঘোড়ার খুরের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন?'

তিনি নাকি বলতেন, 'ছোট্ট এক টুকরো লোহা ঝুলিয়ে রেখে যদি সত্যি কোনো বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাই...ঝুলাতে অসুবিধা কোথায়?'

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একদিন তাকে ধরে বসল—

'আচ্ছা তুমি বিশ্বাস করো এসবে?'

'কী সবে?'

'এই যে মৃত্যুর পর আরেক জগৎ আছে।'

'ধরো, করি।'

'ছি, ছি! তুমি একজন বিজ্ঞানী হয়ে...'

'দেখ ওয়েলস (বন্ধুর নাম) ধরে নিলাম তোমার কথাই ঠিক। মৃত্যুর পর কিছু নেই, নেই স্বর্গ-নরক বলে কিছু। ঈশ্বর নেই..., কিছুই নেই...আমার এই চার্চে যাওয়া প্রার্থনা করা সব বৃথা...কিন্তু...।'

'কিন্তু?'

'কিন্তু যদি থাকে...তুমি কিন্তু ফেঁসে যাবে, আমি না...'

এ ব্যাপারগুলো অবশ্য তিনি বলতেন বা করতেন হাসি-ঠাট্টার ছলে। তার কিছু অদ্ভুত ব্যাপারও ছিল, আমেরিকার জাতীয় মনোগ্রামে যখন ঈগল পাখি ঢোকানো হচ্ছিল তখন তিনি প্রতিবাদ করে বসলেন। কী ব্যাপার? এত বড় বিজ্ঞানী প্রতিবাদ করছে কেন? তার আপত্তি, ঈগলের ওখানে টার্কি বসাতে হবে। ঈগলের পরিবর্তে টার্কি। এমন না যে, টার্কির রোস্ট তার খুব প্রিয় খাদ্য।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার আপত্তি টেকে নি বলাই বাহুল্য।

পলিটিক্যাল কার্টুনের জনক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নিজেও কিন্তু সোশ্যাল কার্টুনের শিকার হয়েছেন বহুবার। তার সেই আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ধরার বিখ্যাত আবিষ্কারের দৃশ্যটি নিয়ে কার্টুনিস্টরা কার্টুন, জোক্ বা কিংবদন্তির গল্প কম তৈরি করেন নি।

একটা ঘটনা অনেকটা এরকম—

তিনি যখন তার কিশোর পুত্রকে নিয়ে এক বৃষ্টিভেজা দিনে আকাশে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন বিদ্যুৎ ধরার জন্য, ঘুড়ির অন্য প্রান্তে ঝুলছে একটা প্রমাণ সাইজের চাবি।

তখন এক সাংবাদিক প্রশ্ন করে বসল—

'জনাব বিদ্যুৎ ধরার জন্য আপনি আকাশে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন ঠিক আছে; কিন্তু নিচে সুতোয় বাঁধা ঐ চাবিটি ঝুলছে কেন?'

'ঐ চাবিটা আমার কফিনের।'

'মানে?'

'মানে, ধরুন কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ, বজ্রপাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে...কফিনের চাবিটা লাগবে...কফিন খোলার জন্য...'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঐ একই প্রশ্ন কিন্তু তার কিশোর পুত্রও করেছিল, সে কিনা ঐ ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক গবেষণায় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গী ছিল সেই সময়। সেক্ষেত্রে তার উত্তর ছিল এরকম—

'বাবা, ঐ চাবিটা আমরা ঝুলিয়েছি কেন?'

'একটা বিশেষ দরজা খোলার জন্য।'

'কোন দরজা?'

'অন্ধকারের দরজা।'

অবশ্য মহামতি এই বিজ্ঞানী একটি নয়, বিজ্ঞানের অজস্র দরজা খুলে দিয়ে গেছেন তার একাধিক জাদুকরী চাবি দিয়ে। শেষ ঘটনাটিও তার সেই ঘুড়ি ওড়ানো সংক্রান্তই।

সেই একই সময় আরেক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এই রকম একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আপনার এই ছোট্ট ছেলেটিকে সাথে রেখেছেন কেন, বলবেন কি? এটা কি বিপজ্জনক নয়?'

স্মিত হেসে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন—

'কাজটা হচ্ছে ঘুড়ি ওড়ানো...এটা কোনো বড়দের কাজ নয়..., বুড়োর ভীমরতি হয়েছে, এটা যেন কেউ ভাবতে না পারে তাই ছেলেকে সাথে রেখেছি, এই আর কি...।'

ছেলে তখন ছুটছে ঘুড়ি নিয়ে দূরে...আকাশে ওড়ানোর জন্য, আর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ধরে রেখেছেন তার সুতোর শেষ প্রান্ত, চাবিসহ...। আগামী সত্যতার চাবিই হয়তো।

## ভুলোমন

বিজ্ঞানীরা ভুলোমন হবেন সেটাই যেন স্বাভাবিক। প্রায় সব বিজ্ঞানীরই ভুলোমন নিয়ে আছে নানা কাহিনী। যেমন—আইনস্টাইন থেকেই শুরু করা যাক, তিনি একদিন কোনো একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে বাসায় ফিরছিলেন। বাসায় ফিরে দরজায় নক করতেই ভেতর থেকে তার স্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'আইনস্টাইন বাড়ি নেই'...ব্যস, চিন্তিত আইনস্টাইন কোনো কথা না বলে ফিরে চললেন!!

নিউটন তো আরেক কাঠি সরেস। তিনি তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দাওয়াত করলেন তার বাসায়। তারপর যথারীতি ভুলে গেলেন। ওদিকে দুপুরে তার বন্ধু নিউটনের বাসায় এসে দেখেন নিউটন নেই। টেবিলে খাবার ঢাকা-দেয়া আছে, তিনি ভাবলেন, নিউটন হয়তো কোনো জরুরি কাজে বাইরে গেছেন। খবর দিয়ে যেতে পারেন নি। তিনি আর দেরি করলেন না। ঢাকা-দেয়া খাবার খেয়ে নিয়ে নিউটনের বিছানায় দিবানিদ্রা দিলেন। এদিকে নিউটন দুপুরে বাসায় এসে দেখেন তার বন্ধু তার বিছানায় ঘুমুচ্ছে। তিনি অবাক হলেন, 'তবে কি তিনি ভুল করে নিজের বাসায় না গিয়ে বন্ধুর বাসায় চলে এলেন?' কিন্তু না, টেবিলে খাবার ঢাকা-দেয়া দেখে বুঝলেন নিজের বাসাতেই আছেন। বলাই বাহুল্য, বন্ধু খেয়ে-দেয়ে খাবার-দাবার যেমনটা ঢাকা-দেয়া ছিল তেমনভাবেই রেখে দিয়েছিলেন। নিউটন খেতে গিয়ে দেখেন সব পাত্র শূন্য...তার মানে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি আগেই খেয়ে নিয়েছেন। হৃষ্ট মনে ফিরে গেলেন নিউটন ফের তার কাজে...।

বিজ্ঞানী রবার্ট ওয়াইনার-বা কম কি। তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন, হঠাৎ পথে তার এক বন্ধুর সাথে দেখা। দু জনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারপর বন্ধু যখন বিদায় নিতে যাবেন হঠাৎ রবার্ট ওয়াইনার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন আমি কোন দিকে হাঁটছিলাম, বল তো?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কেন?'

'আহ! বলই না।'

'কেন ইউনিভার্সিটির দিকে।'

'ওহ! ধন্যবাদ, তা হলে নিশ্চয়ই আমি বাসা থেকে খেয়ে বের হয়েছি।'

তবে ব্যতিক্রম ছিলেন লুই পাস্তুর। তিনি মোটেই ভুলোমন ছিলেন না। কখনোই কোনো কিছু ভুলে যেতেন না। মজার ব্যাপার হচ্ছে তিনি কখনোই কারো সাথে হ্যান্ডশেক করতেন না। কেউ তার দিকে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে আঁতকে উঠতেন। তার ধারণা ছিল, চারদিকে জীবাণু গিজগিজ করছে...কিছু ছুঁলে বা ধরলেই তার হাতে জীবাণু উঠে আসবে। সেই কারণে এই সাবধানতা। আর তার গবেষণাটাও তো ছিল ঐসব নিয়েই; কিন্তু তারপরও বিজ্ঞানী বলে কথা। ভুলোমন না হলেও ভুলোমন হতে কতক্ষণ? একদিন লুই পাস্তুরের সাথে দেখা করতে এলেন সরকারি পর্যায়ের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি। যথারীতি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যান্ডশেক করার জন্য, ভুল করে হ্যান্ডশেক করে ফেললেন পাস্তুর। তারপরই লাফিয়ে উঠলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে লাগলেন। আর গণ্যমান্য সরকারি কর্মকর্তার অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন।

সব শেষে, বিজ্ঞানী কেকুলের ভুলোমনের গল্পটা না বললেই নয়। তিনি তো এক পার্টিতে বন্ধুর পত্নীকে নিজের পত্নী মনে করে চুমু খেয়ে বলেই ফেললেন, 'তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে প্রিয়তম।' বন্ধুর পত্নী অবশ্য মোটেই অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, 'কথাটা আপনার নিজের স্ত্রীকে শুনালেই বরং বেশি ভালো হত!'

তবে সবচে সেরা ভুলটি করেছিলেন এক বিখ্যাত কেমিস্ট। স্ত্রী বলে দিয়েছেন 'বেকিং পাউডার' আনতে তাদের ম্যারেজ ডেতে কেক বানাবেন। কেমিস্ট স্বামী আনলেন 'ব্লিচিং পাউডার'। অবশেষে সেই ব্লিচিং পাউডার কেক খেয়ে স্বামী-স্ত্রী দু জনেই হসপিটালে পাশাপাশি বেডে। ম্যারেজ ডেতে এমন সহাবস্থান খুব একটা দেখা যায় না!!

**জ্ঞানী মানুষ**

এক বিজ্ঞানীর কাছে তার চাকর গিয়ে একটা প্রশ্ন করল। প্রশ্নটি ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক, তবে খুবই সাদামাটা। বিজ্ঞানী ভীষণ রেগে গেলেন। চিৎকার করে উঠলেন, 'ব্যাটা, বেকুব জানোয়ার কোথাকার, জানোয়ারের মতো প্রশ্ন করিস...গায়ে পরে আছিস মানুষের চামড়া।'

বিজ্ঞানীর চাকর খুবই মর্মাহত হল এ ধরনের গালিতে। মনিব জানোয়ার বলেছেন, ঠিক আছে; কিন্তু পরে আছে মানুষের চামড়া? এটা কেমন কথা?...ছি...ছি...

রাগে দুঃখে সেই চাকর জ্ঞান অর্জনে নেমে গেল...দিন যায়, মাস যায়...বছরও যায়...চাকর ক্রমে ক্রমে জ্ঞানী হয়ে উঠতে থাকে।

সে জ্ঞানী হতে থাকুক, এই ফাঁকে আমরা আরেকটা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি।

মহাকাশ নিয়ে লেখা একটি বিখ্যাত বই। লিখেছেন এক বিখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী। সে বই পড়ে এক তরুণী মুগ্ধ হয়ে ছুটে এল লেখকের কাছে। 'আপনার লেখা পড়ে আমি বুঝতে পারলাম এই মহাবিশ্ব কী বিশাল...'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার।'

'কী?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'এই মহাবিশ্ব এত বিশাল সেখানে আমাদের এই ছোট পৃথিবী পড়ে আছে এক কোনায়... তা হলে ঈশ্বর কি আমাদের পৃথিবীর খোঁজ রাখবেন এত বড় মহাবিশ্ব ফেলে?'

মহাকাশ বিজ্ঞানী ছিলেন ভয়ানকরকমের নাস্তিক। তারপরও তিনি স্মিত হেসে বললেন, 'সেটা নির্ভর করবে তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বর কত বড় তার ওপর।'

কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর...কিংবা হতে পারে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু গবেষণায় বহু দূর। অর্থাৎ বিশ্বাস করলে তো ফুরিয়েই গেল; কিন্তু যদি আপনি বিজ্ঞানীদের মতো গবেষণায় নামেন তা হলে খবরই আছে...

এমনি এক গবেষক বাচ্চাকে পাওয়া গেল, যার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে অদূরভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হওয়া। বিজ্ঞানে তার প্রচুর আগ্রহ। সে তার বাবাকে সব প্রশ্ন করে চলেছে...

'আচ্ছা বাবা, মানুষের জীবকোষে ক'টা ক্রোমোজম?'

'ইয়ে, ঠিক জানি না।'

'আচ্ছা বাবা, আমাদের নিকটবর্তী গ্যালাক্সির নাম কী?'

'ইয়ে, ঠিক জানি না।'

'আচ্ছা বাবা, জেব্রা কি সাদার ওপর কালো না কালোর ওপর সাদা?'

'ইয়ে, ঠিক জানি না।'

গবেষক পুত্র কোনো প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

বাবা ডেকে বললেন, 'না না, হতাশ হলে তো চলবে না, কিছু জানতে হলে প্রশ্ন করতে হবে, তুমি প্রশ্ন করে যাও...।'

তখন হতাশ পুত্র তার বাবাকে বলল,

'আচ্ছা বাবা, তুমি কি দাদাকে কখনো আমার মতো এত প্রশ্ন করতে?'

'না তা অবশ্য করা হয় নি!'

'করা উচিত ছিল।'

'কেন?'

'তা হলে হয়তো আজ আমার দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতে!'

এবার আসা যাক সেই চাকরের প্রসঙ্গে, যে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানী হয়ে উঠছিল। সে বহুদিন পর ফের তার মনিবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'কী ব্যাপার?' এবার জ্ঞানী চাকর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল।

প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী। এই প্রশ্ন করতে হলে যে পরিমাণ জ্ঞানী হওয়া দরকার তিনি তাও নন।

'তুমি এই প্রশ্ন কীভাবে করলে? এই প্রশ্নের উত্তর তো আমি জানি না।'

'কিন্তু আমি জানি।'

'তুমি জানো? কীভাবে জানলে?'

'জানোয়ারের মতো দিনরাত পড়েছি...আর তাই আমার গায়ে এখন একজন জ্ঞানী মানুষের চামড়া।'

**অ্যালিয়েন!!**

ঘটনাচক্রে দুই বিজ্ঞানীর স্ত্রীর দেখা।

'আপনার স্বামী তা হলে একজন বিজ্ঞানী?'

'জি।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'আচ্ছা, উনি কী আবিষ্কার করেছেন?'

'উনি যা ভয়ানক একটা বস্তু আবিষ্কার করেছেন যে কী আর বলব...কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আবিষ্কারটা উনি ধরে রাখতে পারলেন না বলে জাতি জানতে পারল না।'

'বলেন কী! তা আবিষ্কারটি কী?'

'মানে উনি এমন একটা ভয়ানক তরল যৌগ আবিষ্কার করেছেন যে...যা সবকিছু গলিয়ে ফেলে... ফলে সেটা কোথাও রাখা যায় না বলে তার আবিষ্কারটি বাদ হয়ে গেল।'

'আর আপনার স্বামী কী আবিষ্কার করেছেন?' প্রথম জন জানতে চান দ্বিতীয় মহিলার কাছে।

'আমার স্বামীর আবিষ্কারটি অবশ্য আপনার স্বামীর আবিষ্কারটির মতো বাদ হয়ে যায় নি। সারা বিশ্বব্যাপী তা প্রচার পেয়েছে। ব্যবহৃত হচ্ছে।'

'কী রকম?'

'উনি যেটা আবিষ্কার করেছেন সেটা হচ্ছে এমন একটা বস্তু যেটা দিয়ে দশ ইঞ্চি দেয়াল ভেদ করে দেখা যায়।'

'বলেন কী, এ তো মারাত্মক আবিষ্কার! তা জিনিসটি কী?'

'জানালা!'

বিজ্ঞানী হলেই যে আবিষ্কার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীতে বহু বিজ্ঞানী আছেন যারা সারা জীবন গবেষণা করে গেছেন কিন্তু আবিষ্কার কিছু করেন নি ঐভাবে। তাদের কাজ হচ্ছে সত্য নিয়ে গবেষণা করা, সত্য উন্মোচন করে প্রকৃতির অপার রহস্য ভেদ করা। তো একবার হল কি, এক লোক পথে তার উকিল বন্ধুকে দেখে আঁতকে উঠল!

'একি তুমি না মারা গেছ?'

'দেখতেই পাচ্ছ বেঁচে আছি।'

'কিন্তু কী করে তোমার কথা বিশ্বাস করি? পেশায় তুমি উকিল, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করাই তোমার কাজ। আর খবরটি যে দিয়েছে সে একজন বিজ্ঞানী, সত্য নিয়েই তার গবেষণা।'

বিজ্ঞানীরা সত্য নিয়ে কাজ করেন। তাই তারা মিথ্যাকে কখনো প্রশ্রয় দেন না। সায়েন্স ফিকশনও তাদের পছন্দ নয়। এমনকি সায়েন্সের একটি 'ফ্রিকশন' থাকলেও না। পিউর সায়েন্স ছাড়া কোনো কথা নেই। তবে এর সামান্য ব্যতিক্রম ছিলেন আমাদের এই উপমহাদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। কারণ তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম সায়েন্স ফিকশনটি লিখেছিলেন বলে শোনা যায় (ফিকশনটির নাম ছিল 'পলাতক তুফান')।

সবশেষে বরং সত্যান্বেষী বিজ্ঞানীদের অপছন্দের একটি বিষয় নিয়ে জোক্। অ্যালিয়েন!!

পৃথিবীর আকাশে হঠাৎ দেখা গেল একটা সসার। সসারের ভেতর দু জন অ্যালিয়েন। তারা এসেছেন পৃথিবীর মানুষের সন্ধানে। রাত বলে রাস্তাঘাটে কোনো মানুষ ছিল না। তারা হঠাৎ দেখতে পেল একটা পেট্রল পাম্প। ওটাকে মানুষ ভেবেই তারা কোনো চিন্তা না করে আক্রমণ চালাল। বিকট বিস্ফোরণে সসারের একাংশ উড়ে গেল। সাথের অ্যালিয়েনটি তখন বলল—

'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে প্রাণী তাদের পেচ্ছাপ করার যন্ত্র কানে পেঁচিয়ে রাখে তারা কিন্তু মোটেই সুবিধার নয়।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আবার পৃথিবীর আকাশে সসার দেখা গেল একদিন!

'মনে হচ্ছে একটা মানুষ।'

'হাত-পা ক'টা?'

'হাত দুটো, পা তিনটা।'

'তিন পা?'

'হ্যাঁ, একটা পা তরল এবং অন্য দুই পায়ের তুলনায় শীর্ণ।'

'অদ্ভুত!'

'হ্যাঁ অদ্ভুতই। তৃতীয় পা-টা গুটিয়ে নিয়েছে মানুষটি! নোট করে নিল সব অ্যালিয়েনরা।

বলাই বাহুল্য সসারটি ল্যান্ড করেছিল বাংলাদেশে, ঢাকায়। খুব সম্ভব মানুষটি রাস্তার ধারে ছোট কাজ সারছিল!!

**অশ্বডিম্ব**

বিজ্ঞানীরা নিরলস গবেষণা করে এক একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন কালে কালে, এই মহান সত্যই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আমার মনে হয় বিজ্ঞানীরা আসলে বেশ খানিকটা অলস। তা না হলে পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের বিখ্যাত তিন সূত্র লোকসমক্ষে প্রকাশ করতে লাগে বিশ বছর? (তাও তার বন্ধু বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হ্যালির ঠেলাঠেলিতে) কিংবা ডারউইন? তার বিখ্যাত বিবর্তনবাদ প্রকাশ করতে তিনিও বছর বিশেক দেরি করেন (এখানেও তার বন্ধুদের ঠেলাঠেলিতে)। কোপার্নিকাস তো মৃত্যুশয্যায় গিয়ে বন্ধুদের ঠেলাঠেলিতে অবশেষে প্রকাশ করেন, 'হ্যাঁ, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সূর্য নয়।' গ্যালিলিও? গ্যালিলিওর ক্ষেত্রেও তাই। মোটকথা পৃথিবী বিখ্যাত সব জাঁদরেল বিজ্ঞানীরা আসলে অলস (নাকি প্রচারবিমুখ?)

বরং এক অলস বিজ্ঞানীর গল্প শুনি। এই বিজ্ঞানী দিনরাত গবেষণা নিয়ে আছেন। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। তো পাড়াপড়শিরা একদিন তাকে ধরল।

'তুমি একটা বিয়ে করলে তো পারো?'

'কেন?'

'বাহ্! বিয়ে করলে তোমার বাচ্চাকাচ্চা হবে, সে বড় হয়ে তোমাকে তোমার গবেষণায় সাহায্য-সহযোগিতা করবে।'

'তা মন্দ বল নি।'

'তা হলে কি তোমার জন্য আমরা পাত্রী দেখব?'

'তা তোমাদের খোঁজে বাচ্চাওয়ালা কোনো পাত্রী আছে?'

এর উত্তরে প্রতিবেশীরা কী বলেছিল জানা যায় নি। তবে এটুকু হয়তো তারা বুঝেছিল এই বিজ্ঞানীকে দিয়ে আর যাহোক বড় কোনো আবিষ্কার হবে না। কারণ বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা যে অনেকখানি। আর তাই দেখা গেছে বিজ্ঞানীরা অন্যকিছু আবিষ্কারের আগে 'যোগ্য স্ত্রী আবিষ্কার' করেছেন সবার আগে।

সব বিজ্ঞানীরাই যে 'যোগ্য স্ত্রী' পেয়েছিলেন এমনটা বলা যাবে না। তবে একজন পেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি পিথাগোরাস। তার স্ত্রী তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ও কতটা যোগ্য বিজ্ঞানী জানি না তবে আমি যে ওর একজন যোগ্য স্ত্রী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কীভাবে?' উৎসুক শ্রোতা জানতে চায়।

'এই যে দেখুন না,...' এই বলে এক গাদা পুরোনো খাম বের করে দিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর বিখ্যাত স্ত্রী। যে সমস্ত খামে করে চিঠিপত্র আসছে পিথাগোরাসের কাছে সেই সব পুরোনো ময়লা খামে বিখ্যাত বিজ্ঞানী তার সব বিখ্যাত সূত্র লিখে রেখেছেন। মানে খসড়া করেছেন। যোগ্য স্ত্রী খামগুলো রেখেছিলেন বলে রক্ষা। নইলে তাকে আমরা পেয়েছি! নইলে তার ভাষায়ই বলতে হত, 'তুমি আমাকে খোঁজ নি তাই পাও নি!'

আবিষ্কার প্রসঙ্গে একটা মজার বাক্য আছে বাংলা ভাষায়—'পেট না কাটলে আবিষ্কার হয় না'। পাঠক কি ধাঁধাটা ধরতে পেরেছেন? আপনি যদি 'স' দিয়ে আবিষ্কার লেখেন সেটা ভুল। 'ষ' দিয়ে আবিষ্কার সঠিক বানান। তাই 'পেট না কাটলে আবিষ্কার হয় না।' অবশ্য বাক্যটি আরেক অর্থে ভুল, ঈশপের সেই বিখ্যাত গল্পটা মনে আছেনিশ্চয়ই? সেই যে এক কৃষক একটা হাঁস পেল। সেই হাঁস প্রতিদিন সোনার ডিম পাড়ে। তারপর একদিন সেই কৃষকের ভীষণ লোভ হল (আমাদের দেশের সাবেক দেশপ্রেমিক মন্ত্রী-সাংসদদের মতো আর কি), ভাবল পেট কেটে একসঙ্গে সব সোনার ডিম 'আবিষ্কার' করলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ, আবিষ্কারের নেশায় পেট কাটল হাঁসের; কিন্তু হা হতোস্মি...!!!

এই গল্পটা যদি এ কালে ঘটত তা হলে কেমন হত? না এ কালের কৃষক এত বোকা না। অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক। সে সোনার ডিম নিয়ে চলে গেল স্যাকরার কাছে, 'দেখুন তো ডিমটা আসল সোনার নাকি?' আগে তো নিশ্চিত হতে হবে।

স্যাকরা 'একটু বসুন' বলে ভেতরে গিয়ে ফোন লাগাল র‍্যাবের কাছে, 'হ্যালো, মনে হচ্ছে দুর্নীতির আরেকটা সূত্র পাওয়া গেছে...জলদি আসুন।'

গ্রেফতার হল ডিমের মালিক। তিনদিনের রিমান্ডে নেয়া হল তাকে। ওদিকে চারদিনের মাথায় ঐ স্বর্ণডিম্ব স্পর্শ করেছে যারা, মানে স্যাকরা, র‍্যাব...ডিমের মালিক সবাই বার্ড ফ্লু আক্রান্ত। ঐ স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হাঁসটি যে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত ছিল। ঐ 'স্বর্ণডিম্ব' প্যাকেজ নাটকের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল বলা মুশকিল...তবে এবারের সায়েন্সটুন যে একটা 'অশ্বডিম্ব' হয়েছে বলাই বাহুল্য!

**তিনপেয়ে মুরগি...**

এক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার মুরগির জিনের ওপর ব্যাপক গবেষণা করে অবশেষে তিনপেয়ে এক মুরগি আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা গিয়ে হাজির হল তার কাছে।

'আচ্ছা আপনি এত প্রাণী থাকতে ঠিক মুরগির জিন নিয়ে কেন কাজ করতে গেলেন?'

'কারণ একমাত্র মুরগিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে পরিচিত পাখি।'

'কিন্তু বার্ড ফ্লু?'

'দেখুন, বার্ড ফ্লু আমার বিষয় না।...আমি নতুন ধরনের একটি মুরগি এই জাতিকে উপহার দিতে চেয়েছি।...'

'কী রকম?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'তিনপেয়ে মুরগি।'

'আচ্ছা, তিনপেয়ে মুরগি কেন তৈরি করতে গেলেন?'

'দেখুন, বাঙালি ভোজনবিলাসী জাতি। খেতে পছন্দ করে। বিশেষ করে মুরগির রান খেতে সবাই পছন্দ করে, রোস্ট হলে তো কথাই নেই। তা ছাড়া ডাক্তাররা মনে করেন মুরগির বুকের মাংস থেকে রান খাওয়া ভালো।'

'কেন, রান খাওয়া ভালো কেন?'

'কারণ মুরগির পা সব সময় দৌড়ের ওপর থাকে বলে ওখানে চর্বি জমে না।'

'তিন পা বানালেন, তিন পাখা নয় কেন?'

'ঐ মুরগির মাথা কি একটাই?'

যাহোক, এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত জিনবিজ্ঞানীকে সবাই শেষ প্রশ্নটা করল—

'এবার বলুন, আপনার এই মুরগির রান খেতে কেমন?'

প্রশ্ন শুনে আবিষ্কারককে একটু বিষণ্ন মনে হল। মিনমিন করে বললেন, 'আমার ধারণা খেতে অসাধারণ হবে।'

'আপনি এখনো খান নি?'

'না।'

'সে কী, কেন?'

'ধরতে পারলাম কই? তিন পা পেয়ে ব্যাটার সাথে দৌড়ে কি পারি, বলেন?'

এই সময় একটা গুঞ্জন উঠল, কেউ কেউ বলল, 'খোদার ওপর খোদকারি করা ঠিক হয় নি; যেখানে দুপেয়ে মুরগিই পাওয়া যাচ্ছে বাজারে হরদম, সেখানে তিনপেয়ে মুরগির দরকার কী?'

কেউ কেউ 'ছি! ছি!' পর্যন্ত করল।

একপর্যায়ে সাংবাদিকরা চলে গেল। মন খারাপ করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার (নাকি বিজ্ঞানী?) গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন। আর ঠিক এই সময় ঢুকল তার ছেলেবেলার বন্ধু। কাঁধে ব্যাগ, সে এইমাত্র বিদেশ থেকে এল।

'কীরে, তোর মন খারাপ?'

তিনপেয়ে মুরগির আবিষ্কারক একটু আগের ঘটনা সব খুলে বললেন। বন্ধু তখন বলে উঠল, 'কী আশ্চর্য, আমিও এটা নিয়েই ভাবছিলাম!'

'কী ভাবছিলি?'

'মানে, আসলে আজকে প্লেনে আসার সময় এক বিদেশি বলছিল—এই যে আমরা প্লেনে করে আকাশে উড়ছি, এটা ঠিক নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া কখনোই ঠিক নয়। আমাদের মানুষের যদি ওড়ার দরকারই হত তা হলে স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের পাখির মতো ডানা লাগিয়ে জন্ম দিতেন। তো লোকটার কথাটা কিন্তু আমার বেশ ভালোই লাগল।...ওটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই তোর বাসায় আসছিলাম...।'

'তা ঐ বিদেশি লোকটা কে ছিল?'

'কে আবার, আমি যে প্লেনে আসছিলাম তার পাইলট।' বিজ্ঞ বন্ধুর উত্তর।

সব শেষে প্লেনের পাইলটদের নিয়ে একটা মজার 'বিজ্ঞানমনস্ক' তথ্য দেয়া যাক। ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের পাইলটদের ওপর জরিপ করে এক মজার তথ্য পাওয়া গেছে। তারা যখন মেঘের উপর উঠে একটানা প্লেন চালাতে থাকে তখন তাদের দুই চোখের সামনে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একই দৃশ্য স্থির হয়ে থাকে। ঘন কালচে নীল একটা একঘেয়ে আকাশ। যেমনটা ঘুমুলে পরে মানুষের চোখ দেখে! ব্রেন তখন ভাবে মানুষটা ঘুমিয়ে গেছে! তখন ব্রেন তাকে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। ঘুমুলে পরে যেমনটা হয় আর কি! আর এভাবেই পাইলটরা জেগে থেকেই দিবা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে!!

**সেই তিমি...**

এই তো ক'দিন আগে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে এসেছিল একটি তিমি। ব্লু-হোয়েল মানে নীল তিমি। বিশাল তার সাইজ। কেন এসেছিল সে? একজন বলল, 'সে আসলে এসেছিল স্লিম হতে।'

'মানে?'

'মানে দেশের জিনিসপত্রের যে দাম। সামান্য কাঁচা মরিচের কেজি দুইশ চল্লিশ টাকা। আমরা তো রাষ্ট্রীয়ভাবে ডায়েটিংয়ের দিকে যাচ্ছি। সেই খবর বোধহয় সে পেয়েছিল।'

'কিংবা হতে পারে তারা বুঝতে পেরেছে, 'তিমির অন্ধকারের' দিকে এ জাতি ধাবমান, তাই এই তিমির...আগমন।'

'কিংবা হতে পারে 'তিমির পেটে তিন দিন' গ্রন্থের রয়্যালিটি আদায় করতে তার এই স্থলে আসা।'

অবশ্য এ সমস্তই ঠাট্টার কথা। যারা বিজ্ঞানমনস্ক, বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন; তারা এই তিমির আগমন নিয়ে খুবই সিরিয়াস। আসলে তিমিটা ভেসে উঠেছিল। মরেই ভেসে উঠেছিল বলা যায়। তারপর ভাসতে ভাসতে...আমাদের জলসীমায়। কিন্তু কেন সে মরল? (তার পেটে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল।) নাকি সে সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরীর মতো মরিয়া (এবং ভাসিয়া) প্রমাণ করিল যে, সে বিশাল আকারের একটি তিমি হিসেবে বাঁচিয়া ছিল? বিজ্ঞানীরা বলছেন বা বলা যায় বিজ্ঞানীদের কাছে যতটা শুনেছি—মানুষের পর নাকি তিমিই সবচে বুদ্ধি রাখে তার মাথায়। তারা গান গাইতে পারে। তারা আরো অনেক কিছুই পারে, পারে না শুধু তার ঐ বিশাল শরীরটা নিয়ে পানি থেকে উঠে আসতে স্থলে। অথচ তারা এক সময় নাকি স্থলেই ছিল। বরং একটা গল্প শোনা যাক।

এক বিশাল তিমি আর বিশাল হাতির মধ্যে একবার বন্ধুত্ব হল—

তিমি : ওহে হাতি ভায়া, জলে নেমে আসো! তোমার ঐ বিশাল বপুটা নিয়ে হাঁটতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়?

হাতি : তা হয়।

তিমি : তা হলে আর দেরি কেন? অনেক দিন তো স্থলে থাকলে।

হাতি : নারে ভাই সম্ভব না।

তিমি : কেন সম্ভব না? আমরা তো সাত কোটি বছর আগে নেমে এসেছি। এখন তো দেখছ দিব্যি আছি জলে। তা ছাড়া তোমাদের স্থলে অনেক সমস্যা। আত্মধ্বংসী মানুষ মনে করো পৃথিবীটাকে পৃথিবী রাখবে? নরক বানিয়ে ছাড়বে। জলে এসব কিছু নেই...। চলে এস বরং।

হাতি : কিন্তু শুনেছি সাবমেরিন কেবল তো গেছে ঐ সমুদ্রের তল দিয়েই।

তিমি : তাতে তোমার সমস্যা কী?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাতি : ঐ কেবল দিয়ে নাকি বিলিয়ন ট্রিলিয়ন তথ্য যায়।

তিমি : তা যাক না, তাতে তোমার সমস্যাটা কোথায়?

হাতি : আমি—আমি সাঁতাব জানি না যে। এই তথ্যটা জেনে যাক কেউ, সেটা চাই না। আরেকটা গল্প। এ গল্পে অবশ্য তিমি আছে; কিন্তু হাতি নেই। হাতির বদলে একটা পুঁটি। মানে পুঁটি মাছ। পুঁটি মাছকে দেখে অট্টহাস্য দিয়ে উঠল তিমি।

তিমি : তুমিই তা হলে পুঁটি? মানে পুঁটি মাছ? হা... হা... হা...।

পুঁটি : না।

গম্ভীর গলায় জানাল পুঁটি।

তিমি : না মানে?

পুঁটি : না মানে, না।

তিমি : তা হলে তুমি কি?

পুঁটি : আমি পুঁটি মাছ নই। আমিও একটা তিমিই ছিলাম (দীর্ঘশ্বাস)।

তিমি : তা হলে পুঁটি মাছ হলে কী করে শুনি...?

পুঁটি : সেই দুঃখের কথা কী আর বলব ভাই। আমি ছিলাম এক সমাজতান্ত্রিক দেশের সমুদ্রসীমায়।

তিমি : তারপর?

পুঁটি : তারপর ভাবলাম সমাজতন্ত্র তো দেখা হল গণতন্ত্রটা দেখে আসি।

তিমি : তারপর?

পুঁটি : তারপর সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের দিকে সাঁতরে আসতে আসতে...কখন যে পুঁটি মাছ হয়ে গেলাম!

**কম্পিউটারের মাউস**

পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কি বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন? খুবই অদ্ভুত প্রশ্ন! পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী যিনি আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ছিনিয়ে এনেছিলেন তিনি কী করে বিজ্ঞানমনস্ক হবেন না? আসলে এই প্রশ্ন উদ্ভাবনের কারণ তিনি নিজেই। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যখন একজন সেলিব্রেটি বিজ্ঞানী হিসেবে সবার মনোযোগের কেন্দ্রে তখন হঠাৎ করে দেখা গেল তার বাসার দরজায় একটা হর্স নেল ঝুলছে। ব্যাপার কী? এত বড় বিজ্ঞানী কি তবে বিজ্ঞানমনস্ক নন? কুসংস্কারাচ্ছন্ন? তখন ঘরের প্রধান দরজায় ঘোড়ার খুর ঝোলানো মানে হচ্ছে বিপদ-আপদ দূরে থাকে। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আগেও বলেছি। এক তরুণ সাংবাদিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে ধরে বসল,

'জনাব আপনি দেখছি সাধারণ মানুষের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন?'

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন জবাব দিলেন না। মুচকি হাসলেন। ইশারায় তরুণ সাংবাদিককে কাছে ডাকলেন। তরুণ সাংবাদিক আরো কাছে এগিয়ে এল। ফ্রাঙ্কলিন এবার গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন—

'বিয়ে করেছ?'

'জি না।'

'বিয়ে কর। অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।'

আসলে সব স্ত্রীদের কাছেই তাদের স্বামীরা সব সময় গুরুত্বহীন। সে যতই বিখ্যাত স্বামী হোক-না কেন। হোক-না পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী। এমনি এক পৃথিবীবিখ্যাত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিজ্ঞানী যাবেন এক সেমিনারে বক্তৃতা দিতে। আয়োজকরা বিশাল গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। সময় হাতে খুব বেশি নেই। বিখ্যাত বৃদ্ধ বিজ্ঞানী হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। গাড়ি ছুটল সেমিনার হলের দিকে যেখানে অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছে। হঠাৎ বিজ্ঞানী চেঁচিয়ে উঠলেন,

'এই তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

'কেন স্যার, সেমিনার হলে—যেখানে আজ আপনার বিখ্যাত বক্তৃতা শুনবে সবাই।'

'জলদি গাড়ি ঘোরাও।'

'মানে?'

'আগে কাঁচাবাজারে চল। বাজার করে না দিয়ে গেলে সারা রাত নিজের বাসায় আমাকেই বক্তৃতা শুনতে হবে।'

তারপর যথারীতি গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে (বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মতো) জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ে করেছ?'

অবশ্য সব বিজ্ঞানীই যে স্ত্রীর কাছে গুরুত্ব পান নি তা ঠিক নয়। একজন পেয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম ইঁদুর মারার কল আবিষ্কারক। কারণ সেই আবিষ্কারককে একরকম বাধ্য হয়েই এ জিনিসটি আবিষ্কার করতে হয়েছিল, কারণ তার বাসায় ইঁদুরের অভাব ছিল না।

সবশেষে সেই কল নিয়ে একটা জোক্। তবে জোক্টা অবশ্য এই যুগের। এক ছোট ছেলে তার নিজস্ব কম্পিউটারের মাউসটা খুঁজে পাচ্ছে না।

'মা আমার কম্পিউটারের মাউসটা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখেছ তুমি?'

'না। সব জায়গায় খুঁজে দেখেছ?'

'দেখেছি, নেই কোথাও।'

'ইঁদুর মারার কলে দেখেছ?' মার প্রশ্ন।

'না, ওখানেও নেই।'

'তা হলে আর কী করবে, তোমার বন্ধু রনির মাউসটা ধার করে কাজ চালাও।'

কিন্তু রনির বাসায় গিয়ে দেখা গেল তার মাউসও নিখোঁজ! ব্যাপার কী? তা হলে কি হ্যামিলনের সেই বংশীবাদক এসে বাঁশি বাজিয়ে সব ইঁদুর নিয়ে গেছে! সাথে কম্পিউটারের সব মাউসও নিয়ে গেছে?!

বরং কল্পনা করা যাক না দৃশ্যটা—

হ্যামিলনের বাঁশিবাদক বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। পিছন পিছন চলেছে অজস্র ইঁদুর। তার মধ্যে দু-একটা কম্পিউটারের মাউসও আছে! ইঁদুর আর মাউসের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হল :

ইঁদুর : তোমার লেজ তো বেশ লম্বা দেখছি।

মাউস : আমরা হাইটেক ইঁদুর না!

ইঁদুর : লম্বা লেজে কোনো বিশেষ সুবিধা আছে কি?

মাউস : আছে, লেজে খেলানো যায়।

ইঁদুর : তাই যদি যায় তা হলে আমাদের সঙ্গে চলেছ কেন?

মাউস : আসলে মাউস উঠে যাচ্ছে। কি-বোর্ডই মাউসের কাজ করছে আজকাল। আমরা 'এন্টিক' হয়ে যাব খুব শিগগির। তারপর হয়তো কোনো একদিন জাদুঘরের বন্ধ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রকোষ্ঠে আটকে থাকতে হবে। সেটাও চলে, কিন্তু পাচার হয়ে ফ্রান্সের গিয়ে জাদুঘরে পাচার হওয়া...অসম্ভব! বরং ঐ বংশীবাদকের পিছনেই...

**বিজ্ঞানীদের চাকর...**

টমাস আলভা এডিসন যখন ট্যাংস্টেন তারে পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক বাল্বটি আবিষ্কার করেন তখন তার ল্যাবে ভীষণ ভিড়ভাট্টা। সাংবাদিক, বন্ধুবান্ধব গিজগিজ করছে। বাল্বটি যখন প্রথমবারের মতো জ্বলে উঠল তখন সবাই আনন্দে হইহই করে উঠল।

এবার এডিসন সাবধানে বাল্বটি খুলে তার চাকরের হাতে দিয়ে বললেন, 'সাবধানে পাশের ঘরে রেখে আসো।'

ঐ 'সাবধানে' বলার কারণেই কিনা এডিসনের বেকুব চাকর পৃথিবীর প্রথম বাল্বটি তৎক্ষণাৎ হাত থেকে ফেলে ভেঙে চুরমার করে দিল। আশপাশের সবাই হায় হায় করে উঠল। সিঁটিয়ে গেল চাকরটি, শুধু এডিসন কিছু বললেন না।

এর কিছুদিন পর দ্বিতীয়বারের মতো এডিসন বাল্বটি তৈরি করলেন। বলা যায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বাল্ব। এবারো তার ল্যাবে ভিড় আগের মতোই। এবারো বাল্বটি জ্বলে উঠল। সবাই আনন্দে হইহই করে উঠল এবং এবারো এডিসন বাল্বটি 'সাবধানে' পাশের ঘরে রেখে আসার জন্য তার চাকরকে ডাকলেন। সবাই আঁতকে উঠল,

'ছি ছি কী করছেন!'

'ঐ গাধাটা আবার বাল্বটা ভাঙবে।'

'আপনি নিজ হাতে রেখে আসুন, নইলে আমাদের কারো হাতে দিন।'

এডিসন স্মিত হেসে বললেন, 'ও যদি এবারো বাল্বটা ভাঙে সেটা আমি আবার তৈরি করতে পারব কারণ এর ম্যাকানিজমটা আমার মাথায় আছে; কিন্তু প্রথম বাল্বটা ভাঙার পর আমার চাকরের আত্মবিশ্বাস ভেঙে যে চুরমার হয়েছে সেটা জোড়া লাগাতে বাল্বটা এবারো তার হাতেই দিতে হবে।'

না, এরপর আর বোকা চাকর বাল্বটি না বেঙে যথাস্থানে রেখে আসতে সমর্থ হয়। এডিসন তার চাকরকে যতটা প্রশ্রয় দিতেন পৃথিবীর প্রথম টেলিফোন আবিষ্কারক আলেকজেন্ডার গ্রাহাম বেল ছিলেন তার উল্টো। শোনা যায় তার চাকর তার অনুপস্থিতিতে একবার পৃথিবীর প্রথম ফোনে কথা বলার চেষ্টা করলে তিনি রেগে গিয়ে তার এক মাসের বেতন কর্তন করেন। এতে চাকর জানতে চায় বেতন কাটার কারণ।

'মনিব আমার অপরাধ?'

'তুমি সীমা অতিক্রম করেছ।'

'কিসের সীমা?'

'কথা বলার সীমা।'

বেচারা সেই চাকর যদি এই যুগে জন্মাত, মানে এই মোবাইল ফোনের যুগে, তা হলে টিভি খুললেই শুনত '...কত কথা বলেরে!' তার নিশ্চয়ই আপশোস থাকত না!

আরেক বিজ্ঞানীর কোনো চাকরই ছিল না। মানে তার কাছে কোনো চাকরই টিকত না। তার বন্ধুরা তার কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে তাকে ধরে বসল—

'তোমার চাকর থাকে না কেন?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'আমি যে শেয়ার করতে যাই।'

'কী শেয়ার করতে যাও?'

'খাবারদাবার, কাপড়চোপড় সবই শেয়ার করি...'

'তা হলে ভাগবে কেন?'

'কিন্তু যখন আমার গবেষণার বিষয় শেয়ার করতে যাই তখনই ব্যাটারা বিগড়ে যায়!'

সবশেষে আলেকজেন্ডার গ্রাহাম বেলকে নিয়ে একটা মিনি কুইজ।

'আলেকজেন্ডার গ্রাহাম বেল প্রথম কী কথাটা বলেছিলেন?'

'Goo! Goo!!'

**বিলিভ ইট অর নট!!!**

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতগুলো রহস্য আছে তার মধ্যে নাকি 'ডার্ক ম্যাটার' রহস্য হচ্ছে এখন অন্যতম। বিষয়টা আছে; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই 'আছে কিন্তু নাই' (মানে আমরা দেখতে পাচ্ছ না) জিনিসটার পরিমাণ এই মহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত? বেশি না মাত্র (!) শতকরা সাতানব্বই ভাগ। মানে মাত্র সাত শতাংশ দৃশ্যমান বস্তু নিয়ে আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঝুলে আছি, বিলিভ ইট অর নট!!!

এই যখন অবস্থা তখন এক পাগলাটে 'ডার্ক ম্যাটার' বিজ্ঞানীকে পাওয়া গেল। মানে যিনি ডার্ক ম্যাটার, এন্টি ম্যাটার...সব নিয়েই গবেষণা করে চলেছেন নিরন্তর। ধরা যাক, তার অন্ধকার ঘরে (নাকি ল্যাবরেটরিতে) সায়েন্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকার জনৈক রিপোর্টার একদিন গিয়ে হানা দিল...।

'জনাব, আপনি কী নিয়ে গবেষণা করছেন, জানতে পারি কি?'

'পারেন।'

'কী?'

'গবেষণা শেষ, এখন আবিষ্কারের পর্যায়ে আছি।'

'কিন্তু সেটা কী?'

'বাল্ব।'

'বাল্ব?'

'হ্যাঁ, বৈদ্যুতিক বাল্ব।'

'কিন্তু সে তো বহু বছর আগে টমাস আলভা এডিসন নামে আরেক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে গেছেন।'

'তা গেছেন।'

'তা হলে?'

'তিনি যে বাল্ব আবিষ্কার করে গেছেন তারটা থেকে আলো বের হত, আমারটা দিয়ে তা হবে না।'

'তার মানে আপনারটা ফিউজ বাল্ব?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'ফিউজ বাল্ব দিয়ে হবেটা কী?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কেন সবাই ডার্ক রুমে লাগাবে।'

ডার্ক ম্যাটার থেকে আসা যাক ইয়েলো ম্যাটারে। মানে হলুদ পদার্থে আরো পরিষ্কার করে বললে বলা যায় মগজে।

মগজ সম্পর্কে আলবার্ট আইনস্টাইন মজার একটা উক্তি করেছিলেন। সেটা অনেকটা এরকম, 'এ পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষকে ঈশ্বর শুধু স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পাঠালেই পারতেন, মগজের দরকার ছিল না।' বাক্যটি সাধারণ মানুষের জন্য মর্মান্তিক কিন্তু অনেকাংশে সত্য। তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে যদি প্রশ্ন করা হয়....

'কোন প্রাণীর ইয়েলো ম্যাটার মানে বুদ্ধি সবচেয়ে উঁচুতে? তখন উত্তরটা কী হবে?'

তারপরও জানি পাঠকরা বলবেন, 'কেন অতি অবশ্যই মা-নু-ষ?' কিন্তু না উত্তরটা কিন্তু তা নয়! উত্তরটা হবে 'জি-রা-ফ'!

বরং বিষয়টি প্রাণীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। জঙ্গলে মিটিং বসেছে কে সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

'অবশ্যই আমরা।' গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, জিরাফ।

'কীভাবে?' অন্যরা জানতে চায়।

'বাহ্ আমাদের মাথাই সবচে উঁচুতে।'

'ঠিক ঠিক।' অন্যরা মেনে নিল।

'উচ্চতাই যদি বুদ্ধির মাপকাঠি হয় তা হলে সবচে বুদ্ধিমান আমরা...'

'কে, কে কথাটা বলল?' সবাই এদিক-ওদিক তাকায়। দেখা গেল গাছের মগডালে বসে আছে এক শিম্পাঞ্জি! কোন শিম্পাঞ্জি প্রিয় পাঠক বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই! হ্যাঁ, শিম্পাঞ্জি যার হাত দেখে সেই যে এক গণক বলেছিল, 'দুই মিলিয়ন বছর পর তুমি মানুষ হবে!'

সবশেষে আলো আর অন্ধকার নিয়ে দু জন বিজ্ঞানীর অন্তিম উক্তি শোনা যাক—

টমাস আলভা এডিসন তার মৃত্যুশয্যায় নাকি বলেছিলেন, 'এত অন্ধকার কেন, জানালাগুলো সব খুলে দাও।' আর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন—'উফ এত আলো?'

দু জনই একই বিষয়ে ঐকমত্যে কাজ করলেও কথা বলেছেন ভিন্ন ধরনের...অবশ্য মৃত্যুশয্যায়।

এরকম দ্বিমত পোষণ করেছেন আরো দুই বিজ্ঞানী (অবশ্য তারা এ বাক্য দুটি মৃত্যুশয্যায় বলেন নি।)

ঈশ্বর নিয়ে পিথাগোরাস বলেছেন, 'তুমি আমাকে খোঁজ নি তাই পাও নি।'

আর দ্বিতীয় জন (টমাস ফুলার) বলেছেন, 'যে দাবি করে সে সব জায়গায় আছে, সে আসলে কোথাও নেই।'

**চল চল মহাশূন্যে চল...**

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং মহাশূন্যের ওজনহীনতা অনুভব করে এসেছেন। তাও একবার দুবার নয় পরপর আটবার। কখনো চন্দ্রের ওজনহীনতা কখনো মঙ্গলের ওজনহীনতা কখনো-বা শুক্রের...। এই ব্যাপারটির আয়োজন করেছে জিরো গ্রাভিটি করপোরেশন নামের একটি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রতিষ্ঠান। তারা সমস্ত যাত্রীর কাছ থেকে নিয়েছেন সাড়ে তিন হাজার ডলার করে। শুধু স্টিফেন হকিংয়ের ক্ষেত্রে মাফ। মানে স্টিফেন হকিং ছিলেন ঐ বিশেষ প্লেনের বিনা টিকিটের যাত্রী।

সাড়ে তিন হাজার ডলার মানে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় আড়াই লাখ টাকা। আড়াই লাখ টাকা খুব বেশি না। আর আমাদের বর্তমান অন্তঃপুরবাসী রাজনীতিবিদদের হিসেবে তা নস্যি। তারা যদি বিদেশে টাকা পাচার না করে এরকমভাবে মহাশূন্যের অভিজ্ঞতাও নিয়ে আসতেন তা হলেও দেশের একটা সুনাম হত। আমাদের দেশের একজন মহাশূন্যে ঘুরে এসেছেন, হোক না দুর্নীতি করে উপার্জন করা টাকায়। অবশ্য এখন তারা মহাশূন্যতায়ই পড়েছেন...। সেই কাহিনী এখানে বলা বৈজ্ঞানিক হবে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্টিফেন হকিং মহাশূন্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে পৃথিবীবাসীকে নাকি আহ্বান করেছেন সবাই যেন মহাশূন্য ভ্রমণে যায়। কারণ এই পৃথিবী নানা কারণে ক্রমে ক্রমে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। কাজেই আলটিমেটলি মানুষকে ছুটিতে হবে মহাশূন্যের দিকেই। অতএব এখন থেকেই প্র্যাকটিস রাখা দরকার। তাই চল, চল, মহাশূন্যে চল...।

স্টিফেন হকিংয়ের আহ্বানের কারণেই কিনা কে জানে, একদিন দুই অভিযাত্রী এক মহাকাশযানে করে রওনা দিল মহাশূন্যের দিকে। মহাশূন্যে পৌঁছে একজনের শখ হল, মহাকাশযান থেকে বের হয়ে বাইরে মানে আক্ষরিক অর্থে মহাশূন্যে একটু হাত-পা নেড়ে আসা যাক।

যেই কথা সেই কাজ, বাইরে কিছুক্ষণ হাত-পা নেড়ে ঘুরেফিরে সময় কাটিয়ে ফের ফিরে এল মহাকাশযানের কাছে, দরজা নক করল মহাকাশযানের।

—ঠক ঠক।

'কে?' ভেতর থেকে আওয়াজ এল। ঘটনাটা এটুকুই। তবে এটা আরেকটু এক্সটেনশন করা যায়, এভাবে—

—ঠক ঠক।

'কে?'

'আমি।'

'আমি কে?'

'তুমি কে? তুমিও আমার মতোই একজন মহাকাশযাত্রী।' বিরক্ত মহাকাশযাত্রীর উত্তর।

আরেকটি পরিবার তারাও স্টিফেন হকিংয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে চলল মহাকাশে। তারা স্বামী-স্ত্রী, সাথে অতি দুষ্টু দুই বাচ্চাও আছে। মহাশূন্যে পৌঁছে ভালো কাটছিল তাদের। কিন্তু ক'দিন পর তাদের বাচ্চারা ফের দুষ্টুমি শুরু করল, পৃথিবীতে যেমনটা করত। মা একদিন রেগেমেগে বলল, 'দেখ, তোমরা যদি ফের এমনটা কর তো আমি তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দেব...!'

আরেকটি পরিবারও স্টিফেন হকিংয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে চলল মহাকাশে। তারাও স্বামী-স্ত্রী তবে পার্থক্যটা বুদ্ধিগত। তারা ঠিক কাজটিই করেছে, দুটি নয় একটি সুসন্তান যথেষ্ট...এই নীতিতে বিশ্বাসী এবং সেই সুসন্তানকে রেখে এসেছে পৃথিবীতে। ভালোই কাটছিল দিনকাল; কিন্তু একদিন বেধে গেল দাম্পত্যকলহ। স্ত্রী রেগেমেগে (পৃথিবীতে যেমনটা করত) বলল, '...এই রইল তোমার মরার সংসার, আমি বাপের বাড়ি চললাম।' বলে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে মনে হল আরে এটা তো স্পেসশিপ, তারা মাসখানেক ধরে মহাশূন্যে। বাধ্য হয়ে ফিরে এল স্ত্রী। স্বামী মিটিমিটি হেসে বলল,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কী হল ফিরে এলে যে?'

'বাইরে গ্রহাণু বৃষ্টি হচ্ছে।' বুদ্ধিমান স্ত্রীর গম্ভীর উত্তর।

সবশেষে একটা রিয়্যাল লাইফ জোক্। এক বাচ্চা প্রথম বিজ্ঞান পরীক্ষার খাতা নিয়ে ফিরেছে স্কুল থেকে। মা জিগ্যেস করলেন—

'বাবা, কত পেয়েছ বিজ্ঞানে?'

'ভালোই, তবে ঐ একটা প্রশ্নের উত্তরে একটু সমস্যা হয়েছে।'

'কী সমস্যা?'

'ঐ মহাশূন্যের প্রশ্নটার উত্তরে।'

'কেন কত পেয়েছ মহাশূন্যের প্রশ্নের উত্তরে?'

'শূন্য।'

**ব্যাঙের লাফ...**

বিজ্ঞান মানেই বিজ্ঞানী আর বিজ্ঞানী মানেই ল্যাব...। মানে ল্যাবরেটরি। তো এক বিজ্ঞানী তার ল্যাবরেটরিতে ব্যাঙ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। জটিল গবেষণা। প্রথম তিন মাস তিনি ব্যাঙটাকে ট্রেনিং দিলেন।

'কথা শোনা' ট্রেনিং। তিনি যখন বলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও' ব্যাঙ সাথে সাথে লাফ দেয়। এবার তিনি মূল গবেষণায় নামলেন। ব্যাঙকে একটা লম্বা স্কেল টানা জায়গায় স্টার্ট লাইনে দাঁড় করালেন। তারপর হুকুম করলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও।'

ব্যাঙ লাফ দিল। তিনি দেখলেন ব্যাঙ এক লাফে দু ফুট গেল। তিনি তার খাতায় নোট লিখলেন 'ব্যাঙ চার পায়ে এক লাফে দু ফুট যায়'।

এর পরদিন তিনি ব্যাঙের একটি পা কেটে দিলেন। তারপর হুকুম করলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও।'

ব্যাঙ লাফ দিল। তিনি দেখলেন ব্যাঙ এক লাফে দেড় ফুট গেল। তিনি তার খাতায় নোট লিখলেন, 'ব্যাঙ তিন পায়ে এক লাফে দেড় ফুট যায়।'

পরদিন তিনি আরেকটি পা কাটলেন। তারপর হুকুম করলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও।'

ব্যাঙ লাফ দিল। তিনি দেখলেন ব্যাঙ এক লাফে এক ফুট গেল। তিনি তার খাতায় নোট লিখলেন, 'ব্যাঙ দু পায়ে এক লাফে এক ফুট যায়।'

পরদিন তিনি ব্যাঙের আরেকটি পা কাটলেন। তারপর হুকুম করলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও।'

ব্যাঙ লাফ দিল। তিনি দেখলেন ব্যাঙ এক লাফে আধা ফুট গেল। তিনি তার খাতায় নোট লিখলেন, 'ব্যাঙ এক পায়ে এক লাফে আধা ফুট বা ছয় ইঞ্চি যায়।'

পরদিন তিনি ব্যাঙের আরেকটি পা মানে শেষ পাটি কাটলেন। তারপর হুকুম করলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও।'

ব্যাঙ এবার লাফ দিল না।

তিনি আবার হুকুম করলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও।'

ব্যাঙ এবারো লাফ দিল না।

তিনি আবারো হুকুম করলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও।'

ব্যাঙ এবারো লাফ দিল না।

তিনি আবারো বাজখাঁই গলায় হুকুম করলেন, 'ব্যাঙ লাফ দাও।'

ব্যাঙ এবারো লাফ দিল না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি এবারো তার খাতায় লিখলেন—

'চার পা কেটে ফেললে ব্যাঙ আর কানে শুনতে পায় না।'

বায়োলজি ল্যাবের গল্প শুনলাম, এবার যাওয়া যাক কেমিস্ট্রির ল্যাবে। এখানেও এক বিজ্ঞানী জটিল গবেষণায় ব্যস্ত। তবে তিনি গবেষণাটা করাচ্ছেন তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে। তিনি আছেন সুপারভাইজারের দায়িত্বে। তার অ্যাসিস্ট্যান্ট তারই নির্দেশে একটা দ্রবণ তৈরি করছিল। তিনি এগিয়ে গেলেন।

'দ্রবণটা তৈরি করেছ?'

'জ্বি স্যার।'

'এবার পটাশিয়াম মেশাও।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট পটাশিয়াম মেশাতে যাবে তখন বিজ্ঞানী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দাঁড়াও...দাঁড়াও'।

অ্যাসিস্ট্যান্ট থামল। 'পটাশিয়াম মেশানোর আগে পাঁচ মিনিট দ্রবণটাকে নাড়তে হবে।...।'

'কিন্তু স্যার...' অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্বিধান্বিত স্বরে বলে, 'মানে স্যার দ্রবণ নাড়ার তো কোনো দরকার নেই।'

'দরকার আছে।'

'কেন স্যার?'

'ঐ পাঁচ মিনিটে আমি অন্তত ল্যাব থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারব নিশ্চিন্তে।' বলে প্রফেসর বেরিয়ে গেলেন পেছনে হতভম্ব অ্যাসিস্ট্যান্টকে রেখে। আর তার পাঁচ মিনিট পর ঐ ল্যাবে ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ হল। আর প্রফেসর পকেট থেকে নোট বই বের করে দুটো পয়েন্ট লিখলেন।

এক. ঐ দ্রবণে পটাশিয়াম মেশানো একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

দুই. আমার একজন নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে।

সবশেষে পদার্থবিজ্ঞানীর ল্যাবে—

এক পদার্থবিজ্ঞানী তার ল্যাবে ঢুকলেন। দিনটা ছিল ৩১ ডিসেম্বর। বিজ্ঞানী ঠিক করলেন বাই হুক অর কুক তার গবেষণা রাত ১২টার মধ্যে শেষ করবেনই।

শেষ প্রায় করেই এনেছিলেন তার গবেষণা। তার গবেষণার বিষয় 'মহাবিশ্বের সময় প্রসারণ' বিষয়ক একটা জটিল কিছু। গবেষণা প্রায় শেষ করে এনেছেন তিনি আর ৫ মিনিট...আর ৪ মিনিট...আর ৩ মিনিট...তার পরই শুরু হবে নতুন বছর!

আর ১ মিনিট...৫০ সেকেন্ড...৩০ সেকেন্ড...তিনি দ্রুত অঙ্ক করে চলেছেন...প্রায় শেষের দিকে...১০ সেকেন্ড...৫ সেকেন্ড...ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল একটা। বিজ্ঞানী হতভম্ব হয়ে দেখেন ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে '32.12.2007'।

**ইউরেকা... ইউরেকা...!!**

আর্কিমিডিসের সেই বিখ্যাত গল্প তো আমাদের সবার জানা। সেই যে তিনি নগ্ন হয়ে ছুটছেন রাজদরবারের দিকে আর চেঁচাচ্ছেন 'ইউরেকা...ইউরেকা...' আসলে গল্পটি কিন্তু তা নয়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সিসিলিতে সেই বিখ্যাত দিনটিতে তিনি আসলে রাজার সোনার মুকুটটি হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে পায়চারি করছিলেন নিজের বাসায়। কিছুতেই সমাধানটা তার মাথায় আসছে না। কী করে বের করবেন এতে খাদ আছে কি না। তখন স্ত্রী হুঙ্কার দিলেন (স্ত্রীরা যেমনটা দেন আর কি।) 'ঝাঁটা মারি ঐ রাজার মুকুটে, জলদি স্নান ঘরে ঢোকো বলছি...' বলে একরকম ধাক্কা দিয়ে তাকে পানি ভরা চৌবাচ্চায় ফেললেন। ব্যস সাথে সাথে তার মাথায় বুদ্ধির বাল্ব জ্বলে উঠল। তিনি চৌবাচ্চা থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং চেঁচিয়ে উঠলেন 'ইউরেকা...ইউরেকা...' কিন্তু না, তিনি আসলে ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে ওঠেন নি। তিনি চেঁচিয়ে তার স্ত্রীকে ডেকেছিলেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল 'যুরেকা'।

আসলে বিখ্যাত ব্যক্তিদের গল্প আমরা যেভাবে জানি আসল ঘটনা সেভাবে নয়। যেমন নিউটনের সেই আপেল পতনের গল্পটি। বিষয়টি তিনি ২০ বছর আগে আবিষ্কার করে বসে আছেন আর আপেলের গল্প ফাঁদলেন ২০ বছর পর। অনেকটা বিরক্ত হয়েই। বারবার তার অনুরাগীদের একই প্রশ্ন, 'কীভাবে আপনি মহাকর্ষ বলের সূত্রটি পেলেন?'

শেষমেশ বিরক্ত হয়ে নিউটন বলতে শুরু করলেন, 'আপেল পড়েছিল মাথায় তাতেই...'

আসল বিজ্ঞানীদের নিয়ে গল্পের শেষ নেই। বেশিরভাগই বানোয়াট গল্প। তবে তাদের আবিষ্কারগুলো সবই সত্য। এই যেমন ধরা যাক টমাস আলভা এডিসনের গল্পটা....তিনি বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করে তখন জগদ্বিখ্যাত। একদিন এক বাচ্চা তাকে ধরল—

'তুমি কীভাবে ঐ আলোর বাল্বটা আবিষ্কার করলে?'

'ভেবে ভেবে বের করেছি।'

'কিন্তু সেই বাল্বটা কীভাবে হল?' বাচ্চা ফের জানতে চায়।

'আসলে বাল্বটা নিয়ে ভাবছিলাম হঠাৎ...'

'হঠাৎ?' বাচ্চা নাছোড়বান্দা যেন।

'হঠাৎ মাথার মধ্যে আসলে ঐ বাল্বটাই জ্বলে উঠল। ওটাই নামিয়ে আনলাম।'

বিষয়টি মজার। কার্টুনে আইডিয়া আসার প্রসঙ্গ আসলেই পৃথিবীর তাবৎ কার্টুনিস্টরা কার্টুন চরিত্রের মাথার ওপর ভাবনার একটা বাল্ব আঁকেন। এডিসনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। আর সেই বাল্বটাই তিনি বাস্তবে নামিয়ে আনেন। অবশ্য এডিসনের এই গল্পটিও যে বানোয়াট নয় তাই বা কে জানে, আর বিখ্যাত লোকদের নিয়ে গল্প বানাতে কার না ভালো লাগে। অবশেষে একটি গল্প, এটি অবশ্য বানানো নয় মোটেই।

বিজ্ঞানীর নাম থমাস হাক্সলি। তিনি প্রায় বলতেন, 'সব জানার দরকার নেই, একটি নির্দিষ্ট বিষয় ভালো জানলেই হয়।' তার এই মুদ্রাদোষের কথা সবাই জানত। তো তিনি একদিন জরুরি একটি বিজ্ঞান সম্মেলনে যাচ্ছেন। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। একটা ট্যাক্সি ক্যাব ডেকে বললেন 'জলদি চল...যত দ্রুত সম্ভব।' ক্যাব ড্রাইভার বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে চিনত সে আর দেরি করল না। ঝড়ের বেগে গাড়ি ছোটাল। গাড়ি ছুটছে, হঠাৎ হাক্সলির মনে হল তিনি কোথায় যাবেন তা তো ড্রাইভারকে বলেন নি। তিনি বললেন—

'অ্যাই, তুমি কোথায় যাবে তা জান?'

'সব জানার দরকার নেই, একটি নির্দিষ্ট বিষয় ভালো জানলেই হল...নির্দিষ্ট বিষয়টা হল আমাদের দ্রুত যেতে হবে।' বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার তার গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরেকজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি বলতেন, 'কম জানো কিন্তু গভীরভাবে জানো...'

'সেটা কী করে সম্ভব?'

'এই যে গভীরভাবে কম জানা?'

'হ্যাঁ।'

'সম্ভব।'

'একটা উদাহরণ দিতে পারেন এই রকম একজন বিজ্ঞানীর?'

'পারি।'

'দিন।'

'জন ডালটন।'

'কীভাবে?'

'পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা 'এটম'-কে চিনিয়েছেন তিনিই প্রথম...!! কত ক্ষুদ্র 'জানা' কিন্তু গভীরতাটা...?!'

**বেশি জানলেই বিপদ!**

বিজ্ঞানীদের খামখেয়ালির যেন শেষ নেই। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী নিলস বোরের কথাই ধরা যাক। তিনি তখন ছাত্র। পদার্থবিজ্ঞানের এক পরীক্ষায় প্রশ্ন এল, 'ব্যারোমিটারের সাহায্যে একটি ভবনের উচ্চতা তুমি কীভাবে মাপবে?'

তিনি উত্তর লিখলেন, 'ঐ ভবনের ছাদে গিয়ে ব্যারোমিটারে দড়ি বেঁধে নিচে ছেড়ে দেব, তারপর ঐ ব্যারোমিটার ভূমি স্পর্শ করলে ঐ দড়ির দৈর্ঘ্য মেপে এর উচ্চতা বের করব।'

শিক্ষক জানতেন নিলস বোর খুব মেধাবী ছাত্র, তিনি তাকে আবার সুযোগ দিলেন। ঐ একই প্রশ্ন।

এবার নিলস বোর লিখলেন, 'আমি ঐ ভবনের নিচে দারোয়ানকে বা অ্যাটেন্ডেন্টকে বলব এই ভবনের সঠিক উচ্চতা বললে এই ব্যারোমিটারটা তাকে উপহার দেব। সে তখন ব্যারোমিটার নিয়ে আমাকে সঠিক উচ্চতাটি বলে দেবে।'

শিক্ষক এবার সত্যিই বিরক্ত হলেন। বললেন—

'তুমি কি সত্যিই এর সঠিক উত্তরটি জানো না?'

'জানি স্যার।'

'তা হলে সঠিক উত্তরটা লিখছ না কেন?'

'স্যার, এর আসলে অনেকগুলো উত্তর হয়, আমি কোনটা লিখব সেটাই বুঝতে পারছি না...।'

বেশি জানলেই বিপদ। বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সব সময় তাই হয়। তারা ভাবে সবাই বোধহয় তাদের মতোই জ্ঞানী। রাশিয়ার এক বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী একবার তার এক সাধারণ বুলগেরিয়ান ফ্রেন্ডকে অনেকক্ষণ ধরে সদ্য আবিষ্কৃত তার একটি জটিল সমীকরণ বোঝালেন, তারপর আগ্রহ নিয়ে বললেন—

'দেখলে তোমাকে কত সহজ করে বুঝিয়ে দিলাম, বুঝেছ তো?'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুলগেরিয়ান বন্ধু মাথা নাড়ল। তারপর এক সংবাদ সম্মেলনে যখন তাকে তার বিখ্যাত সমীকরণটি ব্যাখ্যা করতে বলা হল তখন তিনি গর্বের সাথে বললেন 'আমার বলার দরকার নেই। আমার বুলগেরিয়ান বন্ধুই এটা ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

বুলগেরিয়ান বন্ধু অবাক হয়ে বললেন—

'আমি ব্যাখ্যা করব মানে? আমি কি বুঝেছি?'

'বাহ্। সেদিন তোমাকে যখন বোঝালাম তুমি তো মাথা নাড়লে।'

বুলগেরিয়ান বন্ধু হেসে উঠল, 'তুমি কি ভুলে গেছ বুলগেরিয়ানরা 'না' বলতে 'হ্যাঁ'-বোধক মাথা নাড়ে।'

সবশেষে বিজ্ঞানী নিলস বোরের আরেকটি ঘটনা। এটা তার আরো ছেলেবেলার ঘটনা। স্কুলে তখন তার বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। মা জিজ্ঞেস করলেন—

'কী বাছা পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?'

'ভালো।'

'কেমন ভালো?'

ক্ষুদে বিজ্ঞানী এবার আর কোনো মন্তব্য করল না; কিন্তু পরদিন ফের মা যখন তাকে ঐ একই প্রশ্ন করলেন, তখন সে ব্যাগ থেকে খাতা বের করল।

'এটা কী?'

'পরীক্ষার খাতা।'

'মানে?'

'তুমি প্রতিদিন জানতে চাও পরীক্ষা কেমন হল, তাই এবার খাতাই নিয়ে এসেছি।'

ক্ষুদে বিজ্ঞানীর মায়ের অবস্থাটা একবার ভাবুন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে পরবর্তী সময়ে আমি একজন শিশুকে পেয়েছিলাম, যার মা তাকে প্রায়ই বলত বাবা পরীক্ষা কেমন হল? তো একদিন ছেলে বিরক্ত হয়ে নিলস বোরের মতো বাসায় খাতা নিয়ে হাজির।

'ওটা কী?'

'পরীক্ষার খাতা।'

'পরীক্ষার খাতা বাসায় এনেছ?!'

'বাহ্ তুমিই না প্রতিদিন জানতে চাও পরীক্ষা কেমন হল। তাই খাতা নিয়ে চলে এসেছি। ভয় নেই স্যার দেখে নি!'

আমি অপেক্ষায় আছি এই শিশুটি হয়তো নিলস বোরের মতোই বিখ্যাত বিজ্ঞানী হবে কোনো একদিন!

**নিউটনের হ্যান্ডরাইটিং...**

এই তো গত জানুয়ারি মাসে (২০০৭) প্যারেড স্কোয়ারে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত 'ঢাকা বইমেলা' হয়ে গেল। বিরাট মেলা কিন্তু মোটেই প্রচার পেল না মেলাটা। মিডিয়ার লোকজনেরও রহস্যময় কারণে এখানে খুব একটা আগ্রহ নেই বলে মনে হল। একুশের মেলায় যেমন ভি. জে. দের অত্যাচারে পা ফেলা যায় না এখানে তার উল্টোটা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু এই মেলায় বিরাট একটা ব্যাপার ছিল সেটা হচ্ছে সবকারি আর্কাইভের খুব অবহেলায় তৈরি করা একটি সিঙ্গেল স্টলে খুব মূল্যবান একটি জিনিস ছিল। সেটা হচ্ছে মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের সহস্তে লিখিত একটা পাণ্ডুলিপি। আমি যতবার এই মেলায় গিয়েছি, ঐ স্টলে গিয়ে নিউটনের হাতের লেখাটা আগ্রহ ভরে দেখেছি। ঐ লেখার, ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই তার চেয়েও বড় কথা অসাধারণ সুন্দর হাতের লেখা, ইটালিক ফন্টের মতো টানা হাতের লেখা (খুব সম্ভব ককক্রুইল নিবে লেখা)। মানুষের হাতের লেখা এত সুন্দর হয়, না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। ঐ একই মেলাতে হ্যান্ডরাইটিং একাডেমি নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান প্রায় ৫০ রকমের বাংলা-ইংরেজি (বেশিও হতে পারে) হাতের লেখা নিয়ে বসে আছে, তার কোনোটাই কিন্তু নিউটনের হাতের লেখার ধারেকাছেও নেই (আমি ইংরেজি হাতের লেখার কথা বলছি)। নিউটন আসলেই এক বিস্ময়! বরং এই বিস্ময়কর প্রতিভার মহাকর্ষ সূত্র নিয়ে একটা গল্প...

স্ত্রী রান্নার বই থেকে শিখে একটা চমৎকার রান্না করেছে। স্বামী অফিস থেকে ফেরামাত্র পরিবেশন করল।

'এটা কী?'

'খুবই বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টিকর একটা খাবার তৈরি করেছি তোমার জন্য। খেয়ে দেখ তো...'

'তাই নাকি?' স্বামী আগ্রহ ভরেই খেল বা খাওয়ার চেষ্টা করল।

'কেমন হয়েছে?' স্ত্রীর চোখে প্রচণ্ড কৌতূহল!

'অ্যাঁ... পুষ্টিকর হতে পারে তবে...'

'তবে??'

'তবে বিজ্ঞানসম্মত বলা যাবে না!'

'কেন?'

'কারণ তোমার এই খাবার নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র মানছে না!'

'মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'মানে গলা দিয়ে নিচে নামছে না!'

আবার নিউটনের হাতের লেখার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সব ডাক্তারের হাতের লেখা যেমন খারাপ (বলা হয়ে থাকে যে যত বিখ্যাত ডাক্তার তার হাতের লেখা তত খারাপ)। সেরকম আমি দেখেছি সব বিজ্ঞানীদের হাতের লেখা সুন্দর। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী ছিলেন যার হাতের লেখা ছিল খুব খারাপ। তিনি আবার ছিলেন ভীষণ বদরাগী শিক্ষক। একদিন তিনি ছাত্রদের স্বহস্তে লিখিত নোট দিলেন। বললেন পড়ে আসতে হবে আগামীকাল তিনি পরীক্ষা নেবেন।

পরদিন যথারীতি তিনি পরীক্ষা নিলেন। অর্ধেকের বেশি ছাত্রই ফেল!

'ব্যাপার কী?' তিনি হুঙ্কার দিলেন। সব ছাত্র চুপ। তারা তো আর বলতে পারছে না, 'স্যার আপনের হাতের লেখা এতই খারাপ যে ঐ নোট থেকে কোনো কিছুই উদ্ধার করতে পারি নি আমরা! পরীক্ষা দেব কীভাবে?' তারপরও একজন সাহস করে উঠে দাঁড়াল, বলল—

'স্যার।'

'বল কী বলতে চাও!' দ্বিতীয়বার হুঙ্কার দিলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'আসলে স্যার আপনার হাতের লেখার ক্যালিগ্রাফিতে আমরা এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে ওটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ভিতরের সারবস্তু মাথায় ঢুকছিল না।'

ছাত্রের কথায় বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর মাথা ঠাণ্ডা হল কি না বোঝা গেল না। তবে তিনি বাকি ছাত্রদেরও ফেল করিয়ে দিলেন! যাকে বলে 'পণফেল' আর কি!!

আরেক বিজ্ঞানী। তিনি বাঁহাতি। লেখালেখি করেন বাঁ হাতে। কিন্তু চমৎকার হাতের লেখা। এক বাচ্চা ভক্ত তাঁর অটোগ্রাফ নিতে এল।

'আপনার বাঁ হাতের লেখা এত সুন্দর। ডান হাতের লেখা নিশ্চয়ই আরো সুন্দর। আমি ডান হাতের অটোগ্রাফ চাই।'

'বেশ।' বিজ্ঞানী সম্মত হলেন। তিনি বাচ্চাটার বাড়িয়ে দেয়া কাগজে একটা ফুলস্টপ বসিয়ে দিলেন।

'একি?'

'ফুলস্টপ।'

'শুধু ফুলস্টপ??'

'হ্যাঁ, ডান হাতে ঐ ফুলস্টপটাই আমি সুন্দর করে লিখতে পারি!'



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

# আঁতেঘালেকচুয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**বাংলাদেশ ডুবছে...**

বাংলাদেশ নাকি অচিরেই পানির তলায় তলিয়ে যাবে। গবেষকরা এমনই বলছেন। এমন শোনা গেছে ২০২২ সাল নাগাদ বাংলাদেশ আন্ডার ওয়াটার কান্ট্রি হিসেবে বিশ্ব দরবারে নাম লেখাবে। কারণ হচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে অ্যান্টার্কটিকার সব গ্লেসিয়ার গলতে শুরু করেছে (পৃথিবীর সব গ্লেসিয়ার গলে গেলে সমুদ্রের উচ্চতা নাকি মাত্র ৭০ মিটার বেড়ে যাবে)। তা ছাড়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কারণে সমুদ্রের পানিও ফুলে-ফেঁপে উঠতে শুরু করেছে। মানে পানির ভলিউম বাড়তে শুরু করেছে। তার উপর আছে সমুদ্রতলের ভূকম্পন। মোটকথা বাংলাদেশ ডুবতে যাচ্ছে। অবশ্য রাজনৈতিক কারণেও বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই ৩৬ বছর ধরে শুধু ডুবছেই...উঠতে আর পারছে না। এখন কথা হচ্ছে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর ইউনূস আবার বলেছেন... ২০৩০ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য মিউজিয়ামে চলে যাবে। ফলে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত একটি রাষ্ট্র। এখন কথা হচ্ছে ২০২২ সালে বাংলাদেশ তলিয়ে গেলে ২০৩০ সালের উন্নয়নটা হবে কোথায় আন্ডার ওয়াটারে? আন্ডার ওয়াটার উন্নয়ন বিপ্লব? অ্যাকোয়া রেভ্যুলেশন?

বিপ্লবের প্রসঙ্গই যখন এল একটা বিপ্লবী জোক শোনা যাক। সারা জীবন বাম রাজনীতি করেছেন এক নেতা। তিনি এখন মৃত্যুশয্যায়। তরুণ বাম রাজনীতিবিদদের কিছু বাণী দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন।

—দেখ আমার যাবার সময় হয়েছে। তাই কিছু বলে যেতে চাই।

—জি বলুন।

—আমরা একটা আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করেছি। সেটা হচ্ছে এই পৃথিবীতে ধনীরা থাকবে না।

—জি আমাদেরও তো সেই একই আদর্শ।

—কী রকম?

—দারিদ্র্য থাকবে না!

এরপর প্রবীণ বাম রাজনীতিবিদ শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে আর দেরি করলেন না।

আবার আন্ডার ওয়াটার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আসলে পানি বেড়ে গেলে শুধু বাংলাদেশ কেন পৃথিবীই ডুবে যাবে। তখন কী হবে? এই আলোচনা করছিল কিছু বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ।

—তখন কী হবে?

—তখন মানুষকে অন্য গ্রহে আবাস গড়ে তুলতে হবে।

—সেটা কি সম্ভব?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—অবশ্যই সম্ভব। কেন দেখছ না মঙ্গলে জমাট বরফের সন্ধান পাওয়া গেছে। তা ছাড়া শালগম, শিম জাতীয় উদ্ভিদ চাষের উপযোগী আবহাওয়াও পাওয়া গেছে ওখানে।

—কিন্তু চাঁদ ছাড়া মানুষ কি এখন পর্যন্ত অন্য কোনো গ্রহ বা উপগ্রহে পা ফেলতে পেরেছে?

—অবশ্যই পেরেছে।

—কোথায়?

—কেন পৃথিবীতে।

সবশেষে একটা ডাকাতির গল্প শোনা যাক। এক বাড়িতে দিনেদুপুরে ডাকাতি হয়েছে। সব নিয়ে গেছে। বাসায় ছিল এক তরুণ একা। ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর সবাই ছুটে এল খবর নিতে।

—সব নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ সব।

—কিছুই রক্ষা করতে পার নি?

—পেরেছি। সবচে দামি জিনিসটাই রক্ষা করতে পেরেছি। ওটা নিতে দেই নি। জীবন বাজি রেখে রক্ষা করেছি। ডাকাতদের চোখ এড়িয়ে ওটা অ্যাকুরিয়ামে ফেলে দিয়েছিলাম। ওরা বুঝতে পারে নি।

—কী সেটা?

—এই যে। সবাই অবাক হয়ে দেখল। তরুণ অ্যাকুরিয়াম থেকে বের করে আনল একটা গ্লোব। বিড়বিড় করে বলল, 'আমাদের একটাই প্রিয় পৃথিবী।'

**বাজেট কেন বাজেট?**

এবারের বাজেটে গাড়ির দাম বেড়েছে তবে মাইক্রো বাসের দাম নাকি কমেছে। মানে কমবে! কিন্তু হঠাৎ মাইক্রো বাসের দাম কমল কেন? একজন বলল, 'পুলিশ ঐ গাড়িটাই রিকুইজিশন করে বেশি তো তাই বোধ হয়...'

আরেকজন বলল, 'আরে না মাইক্রো ক্রেডিটে সরকার জোর দেবে তাই সব ধরনের মাইক্রোতে...'

সে যাই হোক। প্রতি বাজেটেই জনগণের সামনে একটা অস্পষ্ট মুলা কোলে সেই মুলা অবশ্য আদতে জনগণের কোনো কাজে লাগে না।

মুলা ঝোলা বলতেই আমাদের সামনে একটা কমন ছবি ভেসে ওঠে—গাধার পিঠে বসে আছে একজন একটা বাঁশ ধরে আর সেই বাঁশের মাথায় মুলা ঝুলছে আর গাধা সেই মুলা খেতে এগিয়ে যাচ্ছে। এই রকম প্রায় একটি দৃশ্য দেখে এক বাবা তার ছোট্ট ছেলেকে বলল

—বাবা ঐ দেখ গাধা।

—বাবা গাধা কোনটা উপরেরটা না নিচেরটা? ছোট্ট ছেলে জানতে চাইল।

—আগে হলে বলতাম নিচেরটা, এখন মনে হচ্ছে উপরেরটা।

—কেন?

—দেখছ না ও একটা মুলা ধরে রেখেছে।

—সেটাই তো নিয়ম বলে শুনেছি।

—হ্যাঁ সেটাই নিয়ম যদি লোকটা মুলাটা সঠিকভাবে ধরত। তুমি দেখ লোকটা মুলাটা ধরেছে গাধার লেজের দিকে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তা হলে গাধা এগুলো কেন?

—কারণ গাধা বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী সে জানে পৃথিবী গোল আর সে সোজা হেঁটে গেলে ঐ মুলাটাকে একদিন না একদিন ধরতে পারবে...এটাই তার বিশ্বাস!

জ্ঞানীরা বলেন বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। এখন অবশ্য দিনকাল বদলেছে। অনেকের অনেক বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। যেমন—সেদিন দেখি এক বাসের হেল্পার বাসের হ্যান্ডেল ধরে ওয়াক ওয়াক করে বমি করছে। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। বমি করে সাধারণত বাসের যাত্রীরা, হেল্পার কেন করবে? যে চব্বিশ ঘণ্টা বাসে থাকে। ব্যাঙের যেমন সর্দি হয় না বা হওয়া উচিত না সেরকম বাসের হেল্পারের কি বমি হওয়া উচিত? কিন্তু হল।

সেরকম একবার দেখা গেল এক ব্যাঙের বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি হয়েছে। সব ব্যাঙ অবাক! একি কাণ্ড!! ব্যাঙের সর্দি!!!

—তোমার সর্দি হল কী করে?

—তুমি তো ব্যাঙদের মানইজ্জত সব ডুবালে দেখছি।

—ছি ছি তুমি ব্যাঙকুলের কলঙ্ক।

এরকম নানা ব্যাঙ নানা মন্তব্য করতে লাগল। সর্দি আক্রান্ত ব্যাঙ মিনমিন করে বলল, 'কিন্তু আমি তো ব্যাঙ না।'

—ব্যাঙ না?

—না।

—তুমি তা হলে কী?

—আমি রাজপুত্র।

—বল কী! সেই রাজপুত্র যাকে চুমু খেলেই...

—হুঁ।

—তা হলে এখন তোমাকে কেউ চুমু খেয়ে উদ্ধার করছে না কেন?

—এখন সবার মুখ তো একটা কাজেই ব্যস্ত।

—কোন কাজে?

—মোবাইলে কথা বলায়...চুমু খাওয়ার সময় কোথায়?

সবশেষে বাজেট নিয়ে একজন আমজনতার মন্তব্য—'বাজেট কেন বাজেট?...কারণ বাজেটের পর সবকিছুর মূল্য জেটের গতিতে বেড়ে যায় যে তাই...!'

**বাম বনাম ডান**

প্লাস্টিক সার্জনের কাছে গেছে এক সুন্দরী মহিলা।

—আমি আমার মুখে একটু পরিবর্তন আনতে চাই।

—কী রকম?

—আমার ডান গালের আঁচিলটা বাম গালে আনতে চাই।

—কিন্তু...। আপত্তি জানায় প্লাস্টিক সার্জন। 'আপনাকে তো ডান গালেই ঐ আঁচিলটা চমৎকার দেখাচ্ছে। ছোট্ট আঁচিলটা তো বিউটি স্পটের মতো আপনার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ। বিউটি স্পট কিন্তু ঐ গালেই মানায়।

—কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আপনি পারবেন কি না বলুন?

—তা পারব।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তা হলে করে দিন।

প্লাস্টিক সার্জন ডান গালের বিউটি স্পট সার্জারি করে বাম গালে এনে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল।

'কিছু যদি মনে না করেন জানতে পারি কেন এমনটা করলেন?'

'আমার স্বামী বাম রাজনীতি করেন যে।'

ঐ বাম রাজনীতি নিয়ে আরেকটা ঘটনা। প্রবীণ বাম রাজনীতিবিদ মৃত্যুশয্যায়। সবাই ছুটে এসেছে শেষ বেলায় তাকে বিদায় জানাতে। বোঝা-ই যাচ্ছে তিনি মারা যাচ্ছেন...শেষ মুহূর্তে সমাজতন্ত্র নিয়ে কোনো দুর্লভ বাণী যদি দিয়ে যান। সাংবাদিকরাও ভিড় করেছেন। এই সময় প্রবীণ বাম রাজনীতিবিদ ফিসফিস করে বললেন—'আমি দল বদল করতে চাই' সবাই আঁতকে উঠল 'কী বলছেন?'

—আমি যেকোনো ডান দলে যোগ দিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাই।

—সে কী! কেন? সারা জীবন বাম রাজনীতি করে জীবন উৎসর্গ করে এখন শেষ বেলায় এসে ডিগবাজি? এ কেমন কথা! কর্মীরা হতাশ!

—যা বলছি কর। জলদি কোনো ডান দলে অফিসিয়ালি যোগদানের ব্যবস্থা কর। দৃঢ়তার সাথে প্রবীণ নেতা বলেন। কী আর করা হতবুদ্ধি হতাশ বাম কর্মীরা তাই করল। তাকে তার শেষ শয্যায় ডিগবাজি খাওয়াল। যেহেতু তিনি ডিগবাজি খেতেই চাচ্ছেন। বাম থেকে ডানে ডিগবাজি।

'কিন্তু কেন আপনি এই কাজটি করলেন?' আরেক প্রবীণ নেতা জানতে চাইলেন বিষয়টা মৃত্যুপথযাত্রী নেতার কাছে। 'জানতে চাও কেন?' মুচকি হাসলেন মৃত্যুপথযাত্রী বাম...থুড়ি ডান নেতা। 'আমি মরার সময় অন্তত একজন ডানপন্থীকে মেরে গেলাম!' বলে চোখ বুজলেন কট্টর প্রবীণ এক্স বাম নেতা।

বাম নেতা নিয়ে আরেকটি গল্প। রাস্তায় প্রচুর জ্যাম। জ্যাম থাকবে রাস্তায় এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকে জ্যামটার কারণ অদ্ভুত। একটি গাড়ি কিছুতেই ডান দিকে টার্ন নিচ্ছে না! কিন্তু কেন? কারণ আর কিছু নয় ঐ গাড়িতে বসে আছেন কোনো বিখ্যাত বাম নেতা। তিনি কিছুতেই তার ড্রাইভারকে ডানে টার্ন নিতে দিচ্ছেন না। কিছুতেই না। নেতার!

বাম নেতা নিয়ে অনেক হল। এবার ডান নেতা নিয়ে একটি শেষ গল্প। এক প্রবীণ ডানপন্থী নেতা সারা জীবন এক কলমও নিজের হাতে কিছু লেখেন নি। কেন? জানতে চায় তার সেক্রেটারি।

—স্যার আপনি সব সময় অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছেন। নিজে কখনো কলম ধরেন নি এর কারণটা কী জানতে পারি?

—পার।

—কী কারণ?

—কাউকে বল না যেন। ফিসফিস করে বলেন ডানপন্থী নেতা 'আমি যে আসলে বাঁহাতি!'

**মামু আর মামু!**

হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে দেশটা মামা-ভাগ্নেতে ভরে গেছে। সব জায়গায় মামা। সবাই সবাইকে মামা ডাকে। ছাত্ররা সিএনজিওয়ালাকে বলে 'মামু যাইবেন?' রিকশাওয়ালা বলে যাত্রীকে 'মামু এইডা কী ভাড়া দিলেন?' আর বাসের কন্ডাক্টর তো সেই ব্রিটিশ যুগ থেকেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বোধ হয় মামু হয়েই আছে... 'মামা আগে বাড়েন' কমন ডায়ালগ। এই তো কিছু দিন আগে আমি টানা ভ্রমণ করেছি বান্দরবান-কক্সবাজার-মহেশখালি-নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ-ময়মনসিংহ। সব জায়গায় দেখি মামা মামা আর মামা...মামাময় সর্বত্র! কিন্তু কেন? চাচা নয় কেন? ভাই নয় কেন? কেন মামা? অবশ্য মামা ডাকটায় এক ধরনের আন্তরিকতা আছে। তারপরও কেন সর্বত্র মামা? এ প্রসঙ্গে একজন 'মামা বিশেষজ্ঞ' আমাকে একটা অদ্ভুত তথ্য দিলেন। সেটা হচ্ছে—

—আমরা আসলে মামু বলে ডাকি না...গালি দেই।

—মানে?

—শালা বলে গালি দিতে চাই (মায়ের ভাই বাবার শালা) বলতে পারি না বলেই মামা বলি! কী অদ্ভুত তথ্য! আরেক...'মামু বিশেষজ্ঞ' বললেন—

—ছোটবেলায় আমরা কাউকে কাউকে 'মামু' বানাতাম...একটা খেলা আর কি!

—মামু বানাতাম মানে?

—মানে যাকে বোকা বানানোর ইচ্ছা তাকেই 'মামু' বানানো হত।

প্রিয় পাঠক আপনারা আবার ভাববেন না আমি 'মামা' ডাকটাকে ছোট করার চেষ্টা করছি। মামা ডাক আমারও ভীষণ প্রিয়। আমার নিজের আপন মামারা সবাই এক একজন অসাধারণ মানুষ। সবচে যে ছোট মামা আমারই বয়সী সে আমার এখনো সেরা বন্ধু। আমি শুধু একটু বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছি সবাই মামা কেন? মূল মামারা তো ম্লান হয়ে যাচ্ছে...লাইম লাইটে চলে আসছে রাস্তাঘাটের নকল মামারা? হোয়াই? (অবশ্য তারা লাইম লাইটে চলে আসলেও আমার কোনো আপত্তি নাই!)

সে যাই হোক মামা সব সময়ই মামাই! মায়ের চেয়েও মামার গুরুত্ব বেশি! কারণ মামা হচ্ছে ডাবল মা (মা + মা=মামা) বরং মামা-ভাগ্নের একটি বাস্তব গল্প দিয়ে শেষ করি। বন্ধুদের মধ্যে আড্ডা হচ্ছে কার মামা কেমন। সবার মামাই ভালো সবার মামারাই চমৎকার মানুষ। শুধু একজন বিষণ্ন বদনে চুপ করে রইল। বন্ধুরা চেপে ধরল—

—কীরে তুই কিছু বলছিস না যে? বন্ধু বলল—

—আমার মামাও ভীষণ ভালো কিন্তু...

—কিন্তু? অন্যরা উদগ্রীব হয়।

—কিন্তু তিনি প্রতিবন্ধী...

—তাতে সমস্যা কী? প্রতিবন্ধী তো হতেই পারে...এর জন্য মন খারাপ করার কিছু নেই। অন্যরাও সায় দিল।

'ঠিক কথা।'

—আচ্ছা উনি কী রকম প্রতিবন্ধী? আরেকজন জানতে চায়।

—উনি আমাদের সব ভাইবোনকে মানে উনার সব ভাগ্নে-ভাগ্নিকে এক চোখে দেখেন।

## রম্য পত্রিকার ভবিষ্যৎ

রম্য পত্রিকার ভবিষ্যৎ কী? অন্য পত্রিকার ভবিষ্যৎ যদি অন্ধকার হয় তবে রম্য পত্রিকার ভবিষ্যৎ ধূসর। ধূসর আমি পজিটিভ অর্থেই বলছি। আসলে আমি নিজে যেহেতু একটি রম্য পত্রিকা (উন্মাদ) চালাচ্ছি দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে, কাজেই ধরে নেওয়া যায় আমি এর পক্ষেই বলব।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রকৃতপক্ষে বাঙালি হিউমারাস জাতি। আমাদের পেটে ভাত না থাকলেও মুখে হাসি কিন্তু আছেই। এক ব্রিটিশ কার্টুনিস্টের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে আমাকে খুব আপশোস করে বলেছিল তার দেশে সে তার ছেলেকে প্রায় প্রতিদিন একটা খেলনা কিনে দেয় তবু তার মুখে হাসি নেই। আর তোমার দেশে রাস্তায় খালি পায়ে খালি গায়ের ছেলেমেয়েরা দিব্যি হাসছে, তাদের হাতে কোনো খেলনাও দেখি না কখনো।

শুধু তাই না। আমি নিজেও দেখেছি। সিডর-বন্যা বড় বড় দুর্যোগে টিভিতে মাইক্রোফোন হাতে সাংবাদিকদের কাছে আক্রান্ত মানুষেরা হাসিমুখে মন্তব্য করে। সিডর ঝড়ের পরদিন একজনকে কোনো এক টিভি চ্যানেলে দেখলাম হাসিমুখে বলতে, 'অবস্থা তো পুরা ডাইল খিচুরি'। আড়ালে হয়তো তার সব হারানোর গভীর বেদনা আছে কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে। মোট কথা আমরা হাসতে পছন্দ করি। একসময় চীন দেশে নাকি হাসিটাকে প্রচণ্ড বেয়াদবি, মূর্খামি হিসেবে ধরা হত। জাতি হিসেবে আমরা ঠিক তার উল্টো।

কাজেই এই দেশে রম্য ম্যাগাজিন কেন চলবে না? রম্য ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ কেন উজ্জ্বল হবে না?

দৈনিক পত্রিকাগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে সবার একটা করে মিনি ফান ম্যাগাজিন আছে। কেন? সম্পাদকরা বুঝে গেছেন। শুধু এডিটোরিয়াল কার্টুন বা কোনায় একটা সিঙ্গেল ব্লক কার্টুন বা মাঝখানে একটা দেশী-বিদেশী কার্টুন স্ট্রিপ থাকলেই চলবে না। একটা আলাদা ফান ম্যাগাজিন করতে হবে। কারণ তার একটা আলাদা পাঠকগোষ্ঠী আছে। সেই পাঠকের সংখ্যাও কিন্তু কম না।

অবশ্য রম্য পত্রিকা করার সমস্যাও আছে। আমাকে প্রায়ই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, খুবই গুরুগম্ভীর প্রশ্ন।

—এই পত্রিকা দিয়ে আপনি জাতিকে কী দিচ্ছেন?

অ্যাজ ইফ অন্য পত্রিকাগুলো জাতিকে কিছু না দিলেও চলবে কিন্তু রম্য ম্যাগাজিনকে জাতিকে কিছু দিতেই হবে। তো এইরকম একটি গুরুগম্ভীর প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম—'কিছু না' এতে প্রশ্নকর্তা আঁতকে উঠলেন—কিছু না? জাতিকে কিচ্ছু দিচ্ছেন না? জাতির কোনো উপকারেই আসছে না আপনার কাগজ?

—তা আসছে।

—কীভাবে?

—এই যে দেশের টনকে টন নিউজপ্রিন্ট কিনে দেশীয় নিউজপ্রিন্ট শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামে আমিও যুক্ত আছি। বাজার থেকে নিয়মিত নিউজপ্রিন্ট কিনছি। (অবশ্য এখন দেশী নিউজপ্রিন্টের নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে!!)

সাংবাদিক ভাই মনে হল আমার উত্তরে বিশেষ বিরক্ত হলেন।

আবার কিছুদিন পর সেই একই প্রশ্ন। এবার অন্য পত্রিকা থেকে তবে এবার একটু ঘুরিয়ে...

—আপনার কাগজ (উন্মাদ) পড়ে পাঠক হাসে (সত্যি সত্যিই হাসে কি না আমি অবশ্য ঠিক সিওর না!)। আপনি কি মনে করেন জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে হাসি খুব জরুরি?

এই কঠিন প্রশ্নের আমি কী উত্তর দিয়েছিলাম এখন আর মনে নেই। তবে প্রশ্নকর্তা যে হাসিমুখে অফিস ত্যাগ করেন নি এটা বেশ মনে আছে।

আসলে শুধু রম্য ম্যাগাজিনই যে বাঙালির হাসির ক্ষুধা দূর করতে পারে তাও কিন্তু ঠিক না। সাধারণ নিউজে বা ছবিতেও আমাদের সে ক্ষুধা দূর হতে পারে বা হয়ে থাকে। একবার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে আছে খুব সম্ভবত ইত্তেফাকে একটি ছবি বের হয়েছিল, বহু বছর আগে। ছবিটা কুষ্টিয়ার কোনো এক অর্ধসমাপ্ত কসাইখানার। নিচে ক্যাপশনে লেখা—

"মোগল সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল তৈরি করিতে বাইশ বছর লাগিয়াছিল। সেল বছরে কুষ্টিয়ার সরকারি কসাইখানাও কম আগায় নাই!"

আমি বোধ হয় 'রম্য ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ কী?' এই প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। তবে কথা একটাই। এর ভবিষ্যৎ ভালো, বেশ ভালো। একসময় তো মনে আছে 'কার্টুন (সম্পাদক : হারুনুর রশীদ), আঙ্গুল (সম্পাদক : জাকির হাসান সেলিম), ব্যাং GO (সম্পাদক : মামুন রিয়াজী), লোকজন কার্টুন (সম্পাদক : রেজাউন্নবী) এবং উন্মাদ...এই এতগুলো পত্রিকা একসঙ্গে বেরুত এই ঢাকা শহর থেকেই এবং একসঙ্গে চলেছে বেশ কিছু দিন। সম্ভবত বাংলাদেশের রম্য ম্যাগাজিনের ইতিহাসের রেনেসাঁ যুগ গেছে সেটা। পরে অবশ্য একে একে নিভেছে...দেউটি, সেটা অবশ্য অন্য কারণে সেই সময় এত রম্য পত্রিকার ভিড়ে রম্য পত্রিকার পাঠকপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল বলে নয়।

পাশের দেশ ভারতেও একসময় সরস কার্টুন (বাংলা), দিওয়ানা (ইংরেজি), ওয়াইজ ক্র্যাক (ইংরেজি) তিন তিনটা কার্টুন ম্যাগাজিন বের হত...সব বন্ধ হয়ে গেছে। সেটারও পাঠকপ্রিয়তা নেই বলে বন্ধ হয় নি। কারণ মারিওমিরান্ডা, সুধীর ধর, কুট্টির মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কার্টুনিস্টরা সব ঐ দেশে বাস করেন, কাজেই বন্ধ হওয়ার কারণ অন্য—ব্যবসা নেই ভবিষ্যৎ নেই এটা ঠিক কথা নয়। (তবে এখন আবার নতুন একটা ইংরেজি কার্টুন পত্রিকা বেরুচ্ছে নাম 'কার্টুন ওয়াচ', সম্পাদক ট্রিমবাক শর্মা।)

তবে আমি মনে করি আরো রম্য ম্যাগাজিন দেশে থাকা উচিত। আমার কাছে প্রায়শই মাঝে মাঝে কিছু তরুণ এসে হাজির হয়।

—কী ব্যাপার?

—হাবীব ভাই আমরা একটা ফান ম্যাগাজিন বের করার পরিকল্পনা করেছি।

—ভেরি গুড। বের কর।

—আপনার দোয়া নিতে এসেছি।

—দোয়া না বদদোয়া?

তারা হকচকিয়ে যায়। বদদোয়া কেন বলছেন?

আমি বলি, 'দোয়া করলে দেখা যাবে পত্রিকা আর বেরুচ্ছে না। যদি বদদোয়া করি তখন তোমরা আমার উপর রেগে-মেগে ঠিকই বের করবে।'

তবে দোয়া বদদোয়া কোনোটা করার আগেই দেখা যায় তরুণদের দল তাদের সিদ্ধান্ত বদলে নায়ক-নায়িকার ছবি দিয়ে বিনোদন টাইপের ম্যাগাজিন করে। কে জানে হয়তো ঐ পত্রিকায় ব্যবসা ভালো, তাদের তাই ধারণা।

সবশেষে একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। এক রম্য পত্রিকার সম্পাদকের (আমি না কিন্তু) ইন্টারভ্যু নিতে এল আরেক সাংবাদিক।

—আচ্ছা আপনার রম্য কাগজটি কেমন চলে?

—হু হু করে চলে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ অবশ্যই আপনি হকার্স ইউনিয়নে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

সাংবাদিক সত্যি সত্যিই হকার্স ইউনিয়নে গিয়ে খোঁজ নিল এবং ফের এল সেই সম্পাদকের কাছে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

...আপনার পত্রিকার ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম হকার্স ইউনিয়নে।

- তারপর তারা কী বলল?

..তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কাগজটা হু হু করে চলে কি না?

তারা কী বলল?

--তারা হো হো করে হাসল।

তারপরও বলব বাংলাদেশে রম্য ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ এখনো ভালো। এই রকম একটা ম্যাগাজিন এখনো অ্যাড ছাড়াও টিকে থাকা সম্ভব। যদি ঠিকমতো করা যায়।

**ইঁদুরে রম্য।**

দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে। সেরকমই সবাই বলছে। এরকম সময় এক ফকির গেল ভিক্ষা চাইতে।

—আম্মাগো ভিক্ষা দেন। বাড়ির কর্ত্রীর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কারণ চাল জোগাড় করতে তারও জান পহেচান অবস্থান। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'মাফ কর মাফ কর...চাল দেয়া যাবে না।'

—চাল চাই না আম্মা।

—তা হলে কী চাও?

—ইঁদুর মারার অষুধ থাকলে দ্যান।

—ইঁদুর মারার ওষুধ?

—জি আম্মা।

—কেন? তোমার বাসায় কি ইঁদুর বেশি হয়েছে?

—কী যে কন আম্মা আমগো কি বাড়িঘর আছে যে ইঁদুর থাকব? গাছতলায় থাকি!

—তা হলে ইঁদুর মারার ওষুধ চাইছ কেন?

—খামু।

—কী ফাজলামো পেয়েছ আমার বাসার দরজায় আত্মহত্যা করে আমাকে ফাঁসাতে চাও? গেট আউট...আভি নিকালো...খেপে গিয়ে নিয়মিত জি টিভির সিরিয়াল দেখা গিন্নির মুখ দিয়ে হিন্দি বেরুতে লাগল!

—ছি ছি খালাম্মা কী যে কন আমি কি নিজে মরতে ইঁদুর মারার ওষুধ খামু?

—তা হলে?

—তিন দিন ধইরা না খায়া আছি। পেডের ভিতর যে ইঁদুর দৌড়াইতাছে ঐগুলারে মারতে হইব না?

সেই মহিলা শেষ পর্যন্ত ফকিরকে ইঁদুর মারার ওষুধ দিয়েছিলেন কি না তা অবশ্য জানা যায় নি। তবে ইঁদুর সংক্রান্ত আরেকটি মজার গল্প আছে।

এক স্টেশনের ঘটনা। এক যাত্রী ট্রেন ধরবে হন্তদন্ত হয়ে স্টেশনের পাশে এক দোকানে ছুটে গেল।

—ভাই জলদি একটা ইঁদুর ধরার কল দেন তো।

—দেই...

—দেই না ভাই জলদি দেন।

—আপনার এত তাড়া কেন? ইঁদুর তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—আরে ভাই জলদি করেন ট্রেন ধরব।
—মাফ করবেন... জানে না।
—মানে?
—মানে আমার কাছে ট্রেন ধরা যাবে না। অন্য দোকানে খোঁজ নেন।
লোকটি অবশ্য অন্য দোকানে না গিয়ে কল ভাড়াই ট্রেন ধরতে ছুটল...!
আমেরিকা তখন সবেমাত্র বাকেটে করে চাঁদে ইঁদুর পাঠিয়েছে। সেই নিয়ে জমজমাট-আলোচনা চলছে...এক আড্ডায়।
—শুনেছিস আমেরিকা বাকেটে করে চাঁদে ইঁদুর পাঠিয়েছে!
—ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?
—মানে ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচতে ইঁদুর মারার কলই যথেষ্ট। বাকেটে করে চাঁদে পাঠানো টু মাচ!!

নাহ ইঁদুর নিয়ে আমার এই লেখাটাও বোধ হয় টু মাচ নয়, থ্রি মাচ হয়ে যাচ্ছে। বরং সব শেষে জ্ঞানের কথা দিয়ে শেষ করি। অস্ট্রেলিয়ার প্রাণিবিজ্ঞানীরা নাকি অতি সম্প্রতি গবেষণা করে বের করেছে যে পৃথিবীতে ইঁদুরই একমাত্র প্রাণী যাদের কাতুকুতু দিলে তারা হাসে। অবশ্য কাতুকুতুটা বিড়াল যদি দেয় তা হলেও ইঁদুর হাসবে কি না এ নিয়ে ইঁদুর মহলে মনে হয় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে!!

## কার্টুন প্রদর্শনী : উন্মাদ

ধানমণ্ডির দৃক গ্যালারির পাশের এক টেবিলিয়ান চায়ের দোকানে (ইটালিয়ান চায়ের দোকান হয় না, টেবিলে চা সাজিয়ে বিক্রি করছিল তাই এই নামকরণ) দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম, এসময় 'রস+আলোর' সীমু নাসের মাথায় একখণ্ড মেঘ নিয়ে হাজির (তাকে যারা দেখেছেন খেয়াল করবেন তার মাথার সামনের দিকে চুলের এক অংশে এক ঠুকরো সফেদ মেঘের মতো চুল। তাকে এতে বেশ ভালোই লাগে। সে অবশ্য দাবি করে এটা এমনি এমনি হয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা একটা হাইলি ইন্টেলেকচুয়াল স্টাইল!!)। সীমু বলল, 'আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে'। তার কথার ধরনে আমি বুঝলাম সে এখন বলবে 'আপনাকে আর রস-আলোতে লিখতে হবে না।' যেমনটা কিছু দিন আগে বিচিত্রার একজন আমাকে বলেছিল ঠিক একই স্টাইলে—

—আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।
—কী কথা?
—আপনাকে আর বিচিত্রায় লিখতে হবে না। বিচিত্রা বন্ধ হয়ে গেছে!

কিন্তু সীমু বলল 'উন্মাদ কার্টুন প্রদর্শনী নিয়ে লিখতে হবে...' তবে কার্টুন প্রদর্শনী নিয়ে লেখার আগে বিদ্যুৎ নিয়ে একটু লেখার দরকার আছে। [কারণ ঘটনাচক্রে প্রদর্শনীতে বেশিরভাগ কার্টুন বিদ্যুৎ নিয়ে। আগে বলা হত (মানে বেশ আগে) 'বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে যায়' তারপর বলা হতে লাগল 'বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে আসে' আর এখন বলা হচ্ছে 'লোডশেডিং মাঝে মাঝে যায়!']

উন্মাদ কার্টুন প্রদর্শনী-২০০৮ নিয়ে লিখতে গিয়ে বিদ্যুৎ নিয়ে কেন লিখলাম? আসলে এবারের কার্টুন প্রদর্শনী দারুণভাবে বিদ্যুৎ কর্তৃক বিঘ্নিত!! প্রদর্শনী চলছে এর মধ্যে দু-তিনবার করে কারেন্ট যাচ্ছে গ্যালারিতে জেনারেটর থাকলেও এসি কাজ করছে না। দর্শকরা


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘামতে থাকে তারপরও দর্শকরা অপেক্ষা করে কখন কারেন্ট আসবে। কার্টুনের প্রতি দর্শকদের ভালবাসা দেখে আমি চমৎকৃত হই।

আবার যখন কারেন্ট চলে আসে তখন খুব দ্রুতই গ্যালারি ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। মোটাসোটা নাদুসনুদুস যে দর্শকটি একটু আগেও দরদর করে ঘামছিল তাকে দেখি তার স্লিম ফ্রেন্ড বলছে 'কী রে তুই দেখি শুকিয়ে গেছিস!' বলাই বাহুল্য এই শুকানো কিন্তু সেই শুকানো নয় এই শুকানো হচ্ছে ঘাম শুকানো।

বরং কার্টুন প্রদর্শনী প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এবারের প্রদর্শনী উন্মাদের অষ্টম কার্টুন প্রদর্শনী। দৃকে তৃতীয় প্রদর্শনী। ১০০টি কার্টুন এঁকেছে প্রায় ত্রিশ জন কার্টুনিস্ট। অবশ্য সব কার্টুনই আঁকা হয় নি কিছু কিছু কার্টুন তৈরি করা হয়েছে। সেটা করেছে উন্মাদের আইডিয়ানিস্টরা (কার্টুনিস্ট নয়) থ্রিডি কার্টুন বলা যায়। সে যাই হোক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল। একটা চিকন কাঠের তক্তা (যেখানে লেখা আছে ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা) প্রমাণসাইজের একটা করাত দিয়ে কেটে গ্যালারিতে কার্টুন প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

অবশ্য আমরা উদ্বোধনের ব্যাপারটিতে সব সময়ই মজা করার চেষ্টা করি। একবার বিশাল এক বেলুন (এনামুল করিম নির্ঝরের যোজন গ্যালারিতে) ফুটিয়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল। (শব্দে দুজন পুলিশ পর্যন্ত ছুটে এসেছিল)। একবার শিকলের তালা খুলে গ্যালারিতে ঢোকা হয়েছিল। একবার নকল কাগজের দরজা ভেঙে ঢোকা হয়েছিল... ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রদর্শনীতে এবার তিনজন কার্টুনিস্টকে 'উন্মাদ কার্টুনিস্ট পদক ২০০৮' দেওয়া হয়েছে। যুগ্মভাবে মানিক-রতন (একটা ক্রেস্ট আর ১০,০০০ টাকা), এককভাবে মেহেদী হক (একটা ক্রেস্ট আর ১০,০০০ টাকা) এবং শেষ দিনে প্রদর্শনীর 'সেরা কার্টুন পদক' পেয়েছে কার্টুনিস্ট সাদিয়া।

তবে আমার অভিজ্ঞতায় যতটুকু দেখেছি। আমাদের কার্টুন প্রদর্শনীর প্রতিটিতেই প্রচুর দর্শক সমাবেশ ঘটে। যথারীতি এবারো প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছে। বিখ্যাত আর্টিস্টদের বিমূর্ত পেইন্টিং প্রদর্শনীতে এতটা ভিড় হয় না। কারণ ঐ সমস্ত ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে সমঝদারের মতো 'ছবিটা বুঝতে পেরেছি' এমন একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু কার্টুনের ক্ষেত্রে সে সমস্যা নেই। কার্টুনটা বুঝতে পারলে হেসে ফেলুন নো প্রবলেম, কেউ কিছু মনে করবে না। এই প্রসঙ্গে একটা 'জে-ও-কে-ই' না বললেই নয়। এক বিখ্যাত গ্যালারিতে বিখ্যাত শিল্পীর অতি উচ্চ মার্গের বিমূর্ত চিত্রপ্রদর্শনী চলছে। কিন্তু কোনো দর্শক নেই। তো এক সাংবাদিক রিপোর্ট করতে এল। এসে তো হতভম্ব! কোনো দর্শক নেই। শুধু বিদগ্ধ শিল্পী ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

—একটা কাকপক্ষীও দেখছি না গ্যালারিতে!

—না না আপনি ঠিক বলছেন না। কাক আছে।

—কোথায়?

—আমার চতুর্থ ছবিটাতে একটা দাঁড়কাক আছে!

সবশেষে বলতে চাই কার্টুন খুবই ক্ষণস্থায়ী একটা মাধ্যম। আজকের পলিটিক্যাল কার্টুন কালকেই মূল্যহীন। তখন শুধু তার গ্রাফিক্যাল প্রাইসটাই থাকে। তারপরও বলব পাঁচ দিনব্যাপী আমাদের এই প্রদর্শনী বেশ ভালোই হয়েছে। সবাই আগ্রহ করে এসেছেন। কার্টুন কিনেছে কেউ কেউ। কমেন্ট বুকে নানান মজার কথা লিখেছে। যেমন একজন লিখেছেন "কার্টুন প্রদর্শনীতে এসে অনেক হাসলাম কিন্তু বাসায় গিয়ে কাঁদতে হবে। কারণ যথারীতি বাসায় কারেন্ট নেই... গরম।"



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রিয় পাঠক খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই এই লেখাটায় বহুল ব্র্যাকেট। এই ফাঁকে ব্র্যাকেটে বলে নেই এইরকম না রিপোর্টিং না রম্য লেখার জন্য দুঃখিত। এটাকে এবারের মতো 'রিপোরম্য' বলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে ভালো হয়।

**লোডশেডিং এবং...**

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে গোদের উপর বেশ বড়সড় বিষফোঁড়ার মতো নন-স্টপ লোডশেডিং। ছিট স্ট্রোকে মৃত্যু সংবাদও কাগজে আসছে। এইরকম হিটস্ট্রোকে মারা যাওয়া এক লোক স্বর্গে গিয়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে ধরলেন।

—আপনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন?

—হ্যাঁ।

—আপনিই যত নষ্টের মূলে।

—মানে?

—মানে আপনি আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ধরে এখন পৃথিবীর বারটা বাজিয়েছেন বিশেষ করে বাংলাদেশের...এখন লোডশেডিঙের গরমে আমাকে অকালে মরতে হল। এর জন্য আপনাকে ড্যামারেজ দিতে হবে।

ফ্রাঙ্কলিন ঘাবড়ে গেলেন। 'দেখুন বিদ্যুৎ নিয়ে তো আমি একা গবেষণা করিনি। আরো অনেকেই করেছেন। আমি না হয় আকাশ থেকে এনেছি কিন্তু গ্যালভানি তো আমার আগেই মর্তেই মানে ব্যাঙের পায়েই বিদ্যুতের সন্ধান পেয়েছেন। তাকে ধরছেন না কেন?

—বেশ তা হলে তাকেই আগে ধরি। গেল গ্যালভানির কাছে।

—আপনি গ্যালভানি?

—হ্যাঁ।

—আপনিই যত নষ্টের মূলে।

—মানে?

—মানে আপনি মর্তেই বিদ্যুতের সন্ধান পেয়েছেন...তারপর সেই বিদ্যুৎ...লোডশেডিং...ইত্যাদি ইত্যাদি...

—দেখুন আপনি ভুল করছেন। বেটার আপনি টমাস আলভা এডিসনকে ধরুন। ও-ই তো বাল্ব জ্বালিয়ে প্রথম কমার্শিয়াল বিদ্যুতের বিষয়টা জনসম্মুখে আনল।

—বেশ তার কাছেই যাই তা হলে! গেল টমাস আলভা এডিসনের কাছে!

—আপনি টমাস আলভা এডিসন?

—হ্যাঁ।

—আপনিই যত নষ্টের মূলে।

—মানে?

—মানে আপনিই তো বিদ্যুতের বাল্ব আবিষ্কার করে...

এ পর্যায়ে টমাস আলভা এডিসন বিষণ্ন হয়ে গেলেন। মিনমিন করে বললেন 'আমি সত্যিই অপরাধী...এজন্যই...'

—এজন্যই?

—এজন্যই আমি একটি বিকল্প আবিষ্কার করতে বসেছি পৃথিবীর জন্য...

—তা আবিষ্কারটা কী?

—ফিউজ বাল্ব, যে বাল্বে আলো জ্বলবে না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ধুৎ মিয়া আপনেকে তো বড় বিজ্ঞানীই জানতাম কিন্তু স্বর্গে এসে তো মনে হচ্ছে আপনার মাথার ফিউজ শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে...

—কী বলছেন?

—ঠিকই বলছি ফিউজ বাল্ব আবার আবিষ্কার করতে হয় নাকি? ভালো বাল্ব জোরে ঝাঁকি দিলেই ফিউজ হয়ে যায়।

—না না আমি যেটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডার্ক বাল্ব...কারণ আলোর বাল্ব জ্বালিয়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে আপনাদের দেশে যে সর্বনাশ ডেকে এনেছি...এটা তারই একটা প্রতীকী প্রতিবাদী আবিষ্কার।

—সে ক্ষেত্রে আপনার আবিষ্কারের গবেষণা এখনই বন্ধ করুন।

—কেন?

—কারণ এই বাল্ব এখন বাংলার ঘরে ঘরে জ্বলছে!!

সব শেষে ঈশ্বরের সেই অমোঘ বাণী একটু আপগ্রেড ভার্সনে... "গড সেইড লাইন...দ্যান নিউটন ওয়াজ বর্ন, গড সেইড মোর লাইট...দ্যান আইনস্টাইন ওয়াজ বর্ন...সাডেনলি গড সেইড...দ্য ইভল ডার্কনেস...(তারপরে কী হল বা ঘটল তা প্রিয় পাঠকরা ভেবে নিন!)

**বস-সেক্রেটারি**

এক বড়সড় অফিসের পুরুষ সেক্রেটারি ছুটে এল বসের কাছে। সেক্রেটারি—স্যার আপনার জন্য একটা ভালো সংবাদ আর একটা খারাপ সংবাদ আছে।

বস—ভালো সংবাদটাই আগে শুনি।

সেক্রেটারি—স্যার আমাদের সুদর্শন মার্কেটিং ম্যানেজার আজ দুপুরে কোর্ট ম্যারেজ করে বউ নিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে গেছে।

বস—আর খারাপ খবর?

সেক্রেটারি—আর খারাপ খবর হচ্ছে আপনার স্ত্রী সিঙ্গাপুর যাওয়ার আগে আপনাকে ডিভোর্স করে গেছেন।

গল্পটা কমন, তবে এ গল্পটাই একটু অন্যভাবে শোনা যাক—

আরেক অফিসের পুরুষ সেক্রেটারি ছুটে এল বসের কাছে।

সেক্রেটারি—স্যার আপনার জন্য একটা ভালো সংবাদ আর একটা খারাপ সংবাদ আছে।

বস—ভালো সংবাদটাই আগে শুনি।

সেক্রেটারি—স্যার আমাদের তরুণ সুদর্শন মার্কেটিং ম্যানেজার আজ দুপুরে কোর্ট ম্যারেজ করে বউ নিয়ে সিঙ্গাপুরে চলে গেছে।

বস—আর খারাপ খবর...ও বুঝেছি আর বলতে হবে না। কিন্তু খারাপ খবর হবে কেন? আমার জন্য এটাই ভালো খবর।

সেক্রেটারি—না স্যার খবর খারাপ।

বস—মানে? তুমি কী বলতে চাও?

সেক্রেটারি—আপনি যা ভাবছেন শেষ পর্যন্ত তা ঘটে নি।

বস—তুমি কী বলতে চাচ্ছ?

সেক্রেটারি—মার্কেটিং ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত রিসেপশনিস্টকে বিয়ে করেছে!


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবার আসা যাক উচ্চাভিলাষী তরুণী সেক্রেটারি আর বসের গল্পে। বস আর তরুণী সেক্রেটারি দেশের বাইরে একটা হোটেলে এল অফিসের জরুরি কাজে। কিন্তু হোটেলে একটাই মাত্র রুম পাওয়া গেল। মানে একটাই রুম একটাই বাট, যাকে বলে সিঙ্গেল রুম আর কি। এখন ধরা যাক বয়স্ক বসের নাম মি. সুরুরীদ আর তরুণী উচ্চাভিলাষী সেক্রেটারির নাম মলি। মিস মলি। বস তখন বললেন—

—মিস মলি কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলতে পারি?

—অবশ্যই স্যার বলুন...

—যেহেতু আমরা সিঙ্গেল রুমে উঠেছি। তো এক রাতের জন্য কি তুমি মিসেস সুরুরীদ হতে পার না?

—অবশ্যই পারি স্যার।

—সেক্ষেত্রে...বলে বস একটু থামলেন। তারপর তার এটাচি কেস খুলে একটা তালপাতার পাখা বের করে সেক্রেটারির দিকে এগিয়ে দিলেন। 'আমি ভাবছি তুমি বাতাস কর।'

বাকি রাত সুন্দরী সেক্রেটারিকে বসের বিছানার পাশে বসে বসকে বাতাস করতে হল। আর বস নাক ডেকে নিশ্চিন্তে ঘুমালেন...ঘররর...ঘররর...ঘররররর...।

সবশেষে সেই চির পুরাতন জোক সেক্রেটারি-বসকে নিয়ে একটু অন্য অ্যাঙ্গেলে। দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কথা বলছে—

—আমার মনে হচ্ছে আমার সাহেব তার সেক্রেটারির সঙ্গে প্রেম করছে।

—কেন তার কোটে চুল পাচ্ছিস?

—না।

—তা হলে?

—বাহ টেকো সেক্রেটারি হতে পারে না! আজকাল কত রকমের ফ্যাশন হচ্ছে মাথায়...!!

## বড় ব্যবসায়ী বনাম ছোট ব্যবসায়ী।

প্লেন চলছে জাপানের উদ্দেশে। ইকোনমি ক্লাসে বসেছে দুই ব্যবসায়ী। একজন বিরাট ব্যবসায়ী আর অন্যজন ছোটখাটো ব্যবসায়ী। ছোটখাটো ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ীকে বলল—

—আচ্ছা কিছু যদি মনে না করেন একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—পারেন।

—আচ্ছা আপনি তো অনেক বড় ব্যবসায়ী।

—আপনাদের দোয়ায়।

—আচ্ছা তা হলে আপনি কেন ইকোনমি ক্লাসে যান সব সময়? বিজনেস ক্লাসে যান না কেন? বড় ব্যবসায়ী একটু ভাবল। তারপর বলল 'আপনার কী ধারণা এই প্লেনের বিজনেস ক্লাস কি ইকোনমি ক্লাসের আগে জাপান পৌছাবে?' ছোট ব্যবসায়ী অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল 'না তা না...'

—এরকম প্রশ্ন আপনার মাথায় আসে বলেই আপনি এখনো ছোট ব্যবসায়ী আর আমি বড় ব্যবসায়ী।

আবার বড় ব্যবসায়ী আর ছোট ব্যবসায়ী। ছোট ব্যবসায়ী বলল

—আচ্ছা আপনি তো অনেক বড় ব্যবসায়ী।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তা আপনাদের দোয়ায়।

—আচ্ছা আপনি কী করে এত বড় ব্যবসায়ী হলেন? আপনি কি অনেক টাকাপয়সা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন?

—না।

—তা হলে কাহিনীটা একটু বলবেন? শিখে যদি আপনার মতো বড় ব্যবসায়ী হতে পারি।

—আসলে শুরুতে আমার কোনো টাকাপয়সাই ছিল না তবে আমার ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা আর আমার এক পার্টনার ছিল তার ছিল প্রচুর টাকা। তারপর দুজনে মিলে ব্যবসায় নামলাম।

—তারপর?

—তারপর আমার পার্টনারের হল প্রচুর অভিজ্ঞতা আর আমার হল প্রচুর টাকা।

দান দান তিন দান। আবাবো বড় ব্যবসায়ী আর ছোট ব্যবসায়ী। ছোট ব্যবসায়ী বলল

—আচ্ছা আপনি তো অনেক বড় ব্যবসায়ী?

—তা আপনাদের দোয়ায়।

—আচ্ছা আপনি কী করে এত বড় ব্যবসায়ী হলেন? আপনি কি অনেক টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন?

—না। আমি এই শহরে যখন প্রথম ঢুকেছিলাম তখন আমার পকেটে ছিল মাত্র দুই টাকা।

—বলেন কী? মাত্র দুই টাকা??

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর ঐ দুই টাকা খরচ করে আমার বড়লোক বাবাকে একটা পোস্টকার্ড লিখলাম।

—পোস্টকার্ডে কী লিখলেন?

—দশ লাখ টাকা পাঠাতে!

## বাবা নাকি ফাদার?

মা দিবস চলে গেল বাবা দিবস আসছে। তো বাবা দিবসে এক বাচ্চা তার বাবার জন্য একটা গিফট নিয়ে এল।

—বাবা, তোমার জন্য একটা গিফট।

—হঠাৎ? বাবা অবাক!

—আজ বাবা দিবস না?

—ও থ্যাংকস...বাবা খুশি হন। 'কিন্তু তোমার মন খারাপ কেন?' ছেলের মন মরা ভাব দেখে বাবা বলেন।

—আচ্ছা বাবা তোমার নিজের চেহারাটা মনে আছে তো?

—মানে?

—মানে নিজের মুখটা ভালো করে মুখস্থ করে রেখেছ তো? বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'তা তো আছেই কিন্তু কেন?'


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—না মানে তোমার জন্য যে উপহারটা এনেছিলাম সেটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে তো তাই। বলে বাচ্চা উপহারটা বাবার হাতে দিয়ে চলে গেল। বাবা উপহার খুলে দেখেন ওটা একটা ছোট্ট শেভিং আয়না! তবে আয়নাটা ভাঙা। এবার বাবা টের পেলেন তার নিজের চেহারা মুখস্থ রাখার মাজেজা!!

বাবা দিবসের আরেক কাহিনী। বাবা দিবসে কয়েকটা বাচ্চাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে কার বাবা কত ভালো। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাবার গুণগান গাইতে লাগল। সব শেষে সবচে ছোট যে ছেলেটি সে এবার মুখ খুলল—

—আমার মনে হয় আমার বাবাই সবার সেরা!

—কেন?

—কারণ আমার বাবার মতো ভদ্রলোক আর হয় না।

—একটা প্রমাণ দে। অন্যেরা চেপে ধরল।

—আমার বাবা এতই ভদ্রলোক যে তার ভদ্র আচরণের জন্য জেলখানার জেলার তার সাত বছরের কারাদণ্ড থেকে তিন মাস মওকুফ করে দিয়েছেন গত মাসে।

আবারো বাবা বিষয়ক একটা ঘটনা। তবে এ অন্য বাবা এবং এটাই এই রচনার শেষ বাবা।

এক বাবা ইনি অবশ্য ফাদার, মানে চার্চের ফাদার। তো সেই ফাদার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ এক মাতাল তার রাস্তা আগলে দাঁড়াল।

—কী ব্যাপার তুমি আমার পথ রোধ করে কেন দাঁড়ালে? কী চাও? প্রশ্ন করলেন ফাদার।

—কিছু চাই না একটা কৌতূহল।

—কী কৌতূহল?

—ফাদার আপনার জামার বোতাম পেছনে কেন?

আমি ফাদার তো, ফাদারদের জামার বোতাম সব সময় পেছনেই থাকে। এটাই নিয়ম।

—আমিও তো বাবা মানে ফাদার। আমার চার চারটে ছেলেমেয়ে, তা হলে আমার জামার বোতাম সামনে কেন?

—কিন্তু আমি তো অনেক অনেক সন্তানের ফাদার তাই আমার জামার বোতাম পেছনে।

হুম! মাতাল চিন্তিত হওয়ার ভঙ্গি করে। তারপর ফাদারকে আগাগোড়া আরেকবার পর্যবেক্ষণ করে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। ফাদার অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন?

—বৎস তুমি কী খুঁজছ? তোমার কৌতূহল কি মেটে নি?

—না একটু বাকি আছে।

—মানে?

—মানে আমি দেখতে চাচ্ছিলাম আপনার প্যান্টের বোতামগুলো কোন দিকে সামনে না পেছনে?

## বিশ্ব পরিবেশ দিবসে একদিন

বিশাল একটা নারিকেল গাছ। সেই গাছের নিচে বিশাল প্রান্তর, সেই প্রান্তরে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উপর বেশ বড়সড় একটা অনুষ্ঠানের মতো হচ্ছে। আর সেই বিশাল নারিকেল গাছটায় ঝুলছে দুটো মাত্র ডাব। দুই তরুণ ডাবই বলা যায়। তারা কথা বলছিল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—মানুষদের কারবারটা দেখেছিস?

—কী কারবার?

—এই যে আমাদের নিচে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে তারা অনুষ্ঠানটা করছে তাদের মূল স্লোগান হচ্ছে 'পরিবেশন দূষণমুক্ত পৃথিবী চাই।' অথচ দেখ তারা নিচের জায়গাটায় কতগুলো গাছ কেটেছে অনুষ্ঠানের জায়গাটা করার জন্য...

—ঠিক তো!

—তারপর দেখ পরিবেশ দূষণমুক্ত পৃথিবী তারা চায় অথচ শব্দদূষণ কী পরিমাণে করছে।

—শব্দদূষণ মানে?

—আরে শুনছিস না? মাইক লাগিয়ে কী প্যাঁচাল শুরু করেছে।

—আরে তাই তো! ভালো কথা বলেছিস!

—তারপর দেখ তারা কিন্তু দৃষ্টিদূষণও করছে।

—মানে এটা আবার কী?

—আরে বোকা দেখছিস না ওরা যেভাবে ওদের মঞ্চ সাজিয়েছে, যেভাবে পোস্টারিং করেছে এটা কিছু হল? কোনো ছিরিছাঁদ আছে? কোনো শিল্প আছে? এটাই হচ্ছে দৃষ্টিদূষণ।

—বা বা বা তুই তো অনেক খেয়াল করিস রে। তার মানে পরিবেশ দূষণমুক্ত পৃথিবী চাইতে গিয়ে তারা তিন তিনটা দূষণ নিজেরাই করছে?

—শুধু কি তাই? ভালো করে তাকিয়ে দেখ কেউ কেউ সিগারেট খেয়ে ফেলছে কেউ চিপস খেয়ে ফেলছে কেউ পানির বোতল ফেলছে এখানে সেখানে। ওরা যখন চলে যাবে দেখবি জায়গাটা কী বিশ্রী হয়ে থাকবে।...এটাও তো একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ দূষণ।

—ঠিক ঠিক। তোর প্রতিটি কথাই গুরুত্বপূর্ণ।

—সবচে গুরুত্বপূর্ণ কথা কী জানিস?

—কী?

—ওদের বক্তৃতাগুলো খেয়াল করে দেখ ওরা কিন্তু দু ধরনের কথা বলছে মানে এখানে তারা একসঙ্গে অনুষ্ঠান করতে এলেও তারা দু দলে বিভক্ত। তার মানে দলাদলি। মানুষের সব জায়গায় দেখবি দুটো দল। ঐক্য নেই। এবং এজন্যই...ডাব মুচকি হাসে।

—এজন্য কী?

—এজন্যই দেখবি একদিন মানুষরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে!

—তারপর কী হবে?

—তারপর আমরা টিকে থাকব।

—আমরা টিকে থাকব? মানে??

—আমরা মানে নারিকেল গাছরা টিকে থাকব। দেখছিস না আমরা কত উঁচুতে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কত শক্ত আমাদের শিকড়। কখনো শুনেছিস ঝড়ে নারিকেল গাছ উপড়ে পড়েছে? তখন আমরা মানুষহীন পৃথিবীকে শাসন করব!

—বলিস কী? সত্যি??

—অবশ্যই।

—কিন্তু একটা কথা...অন্য ডাবটি ইতস্তত করে!

—আবার এর মধ্যে কিন্তু কী?

—না মানে বলছিলাম আমরা যে পৃথিবী শাসন করব, ঠিক কারা শাসন করব? মানে নারিকেলরা না ডাবরা??



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

**সমুদ্রং ভ্রমণং মরণং...**

সমুদ্র ভ্রমণে যাচ্ছে একটি দল। দলের নেতা মোটামুটি বয়স্ক সাথে একপাল ছেলেপেলে। ছেলেপেলের গার্জেনরা চিন্তিত সমুদ্রে নামবে একা একা ওরা, সাঁতার-টাতার জানে না।

—আঙ্কেল আপনারা ভাববেন না, আমি আছি না। দলের নেতা বলে।

—দেখ বাবা তোমার ভরসায় ওদের ছাড়লাম, ওরা কেউ সাঁতার জানে না।

—চিন্তা নেই আমি সাঁতার জানি। দু বার মেঘনা নদী সাঁতারে পার হয়েছি।

যাহোক দল রওনা হয়ে পড়ল। একসময় পৌঁছেও গেল। কিন্তু তারপর আর খবর নেই। এক চিন্তিত গার্জেন ফোন করল।

—হ্যালো?

—জি আঙ্কেল বলেন।

—আমি সজিবের বাবা বলছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন।

—তোমরা এখন কোথায়?

—আমরা সমুদ্রে নেমেছি।

—ওরা কেমন আছে? মানে আমার সজিব?

—আচ্ছা সজিব দম রাখতে পারে কতক্ষণ? দল নেতা হঠাৎ জানতে চায়।

—মানে?

—মানে কত মিনিট দম রাখতে পারে?

—এসব বলছ কেন??

—না না ভাববেন না একজন ডুবুরি অল রেডি নেমে গেছে ওকে খুঁজতে তাই বলছিলাম...ও ঠিক কতক্ষণ দম আটকে রাখতে পারে?

—কী সব বলছ? ও তো এক মিনিটও দাম রাখতে পারে না!

—এহ হে তা হলে এক কাজ করুন। আপনার আরেক ছেলে আছে না? তাকে আজই সাঁতারে ভর্তি করিয়ে দিন। ওপাশে গার্জেনের আর্তনাদ শোনা গেল একটা। প্রিয় পাঠক এটা নিছকই একটা ক্রুড ফান বা জোক যাই বলেন না কেন। বরং এবার ভ্রমণ নিয়ে একটা সেমি ক্রুড জোক...

ভ্রমণে গেছে আরেক লোক। সমুদ্র ভ্রমণে। সমুদ্রে নামতে যাবে। তখন কোস্টগার্ড জানাল 'এদিকটায় নামবেন না।'

—কেন?

—গতকাল হাঙর দেখা গেছে।

—ধুৎ...যতসব বাজে কথা।

—না স্যার হাঙর বড় ভয়ানক প্রাণী। ওদের দাঁতের ধার ভয়ানক, কামড় দিলে টেরও পাবেন না।

—বাজে কথা!

সাহসী পর্যটক লাফিয়ে নামল সমুদ্রে। ঝাঁপাঝাঁপি করল ইচ্ছামতো। কোথায় হাঙর-কোথায় কী? তারপর দিব্যি হোটেলে ফিরে এল। স্যান্ডেল পরতে গিয়ে দেখে তার দুই পায়ের পাতা নেই!!

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দান দান তিন দান...আরেক লোক সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে, চিৎকার করল 'বাঁচাও বাঁচাও...' লাইফ গার্ড ছুটে গেল। লোকটি চেঁচিয়ে উঠল 'কী হল আমাকে উদ্ধার করছেন না কেন?' সমুদ্রের লোনা জলে হাবুডুবু খেতে খেতে কোনোরকমে বলে ডুবন্ত অসহায় লোকটি। লাইফ গার্ড লোকটির আশপাশে সাঁতরাতে সাঁতরাতে হাতের ঘড়ি দেখে বলে 'আর দশ মিনিট পর আপনাকে উদ্ধার করব।'

—কিন্তু আমি তো আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডুবে যাব।

—জীবিত লোক উদ্ধার করলে আমরা পাই দু শ টাকা আর মৃত লোক উদ্ধার করলে পাই পাঁচ শ টাকা! লাইফ গার্ডের নির্বিকার উত্তর।

**ইতিহাস থেকে শিক্ষা**

ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে বলে শোনা যাচ্ছে। সেদিন টিভিতে প্রধান উপদেষ্টা সেরকমই আওয়াজ দিলেন। সঠিক লিডারকে বেছে বের করতে হবে আমাদের। নইলে আবার ধরা! তার আগে আমরা বরং ইতিহাস থেকে তিন জন লিডারকে নির্বাচন করি না কেন? তারপর তাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক কে প্রকৃত নেতা হওয়ার যোগ্য? মানে যোগ্য ছিলেন? এবং সেখান থেকে কোনো শিক্ষা আমরা নিতে পারি কি না! যেমন ধরা যাক—

**প্রথম নেতা :**

ইনি সব সময় দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। মদ্যপান করেন প্রচুর, ধূমপান করেন তুমুল, জাতীয় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে জ্যোতিষীদের সাহায্যে নিয়ে থাকেন।

**দ্বিতীয় নেতা :**

ইনি তার প্রথম জীবনের চাকরি থেকে দুই দুইবার বরখাস্ত হন বাজে কোনো কারণে। মধ্যপান ধূমপান তো করেনই। তার অতিরিক্ত গুণ (?) তিনি দুপুর পর্যন্ত ঘুমাতে পছন্দ করেন (নাসিকা ধ্বনিসহ)।

**তৃতীয় নেতা :**

ইনি প্রথমত একজন 'ওয়ার হিরো' হিসেবে স্বীকৃত, ধূমপান খুব একটা করেন না। মদ্যপান একেবারেই করেন না। কোনো পার্টিতে বন্ধুবান্ধবীদের জোরাজুরিতে বড়জোর এক-আধটা বিয়ার পান করেন। স্ত্রী বা প্রেমিকাকে ভালবাসেন ভীষণ।

এখন যদি পাঠককে বলা হয় উপরের ঐ তিন জন নেতার মধ্যে সেরা কে? কাকে আপনি নির্বাচন করবেন? তা হলে নিশ্চয়ই সবাই এক বাক্যে বলবেন 'দ্য থার্ড ওয়ান'...তৃতীয় জন...এর মতো ভালো মানুষ আর হয় না। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। ইতিহাস বলে... প্রথম জন হচ্ছেন আমেরিকার অন্যতম সফল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। দ্বিতীয় জন ইংল্যান্ডের অন্যতম সফল প্রধানমন্ত্রী চার্চিল। আর তৃতীয় জন? তৃতীয় জন আর কেউ নন...সেই তিনি যিনি একজন শিল্পীও বটে...তিনি অ্যাডলফ হিটলার!!

সবাই বলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইতিহাস থেকে সত্যিই কি শিক্ষা নেওয়া যায়, না কেউ নেয়? বরং ইতিহাস থেকে অন্য এক শিক্ষা নেওয়া যাক। এক ছাত্র বাসায় ফিরেছে মুখ গোঁজ করে। মা ধরলেন?

—কীরে কী হয়েছে?

—কিছু হয় নি।

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। মার খেয়েছিস? ছেলে এবার হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়ে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কেন মার খেলি? নিশ্চয়ই অঙ্ক পারিস নি?
—অঙ্ক না ইতিহাস ক্লাসে...
—ইতিহাস ক্লাসে মার খেলি? কেন??
—সম্রাট শাহজাহানের মোবাইল নাম্বার বলেছিলাম বলে।
—সম্রাট শাহজাহানের মোবাইল নাম্বার মানে ?? মা হতভম্ব!
—আমার কী দোষ? সম্রাট শাহজাহানের জন্ম মৃত্যু সাল যে একেবারে বাংলাদিংকের নাম্বারের মতো, আমি ভাবলাম...

তার মানে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা না নিলেও ইতিহাস ক্লাস থেকে শিক্ষা নিতে কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য স্যারের হালকা মারধর খেতে হতে পারে। তাতে কি 'শিক্ষাং মারনং যথাঃ...' (প্রিয় পাঠক আমার স্বরচিত সংস্কৃতং-এর জন্য ক্ষমা করবেন!)

## মাই মাদার!

মা দিবসে মাকে নিয়ে লেখার অনুরোধ এসেছে। অনুরোধটা করেছে যুগান্তরের শুচি সৈয়দ। সে আমার খুবই ঘনিষ্ঠজন। তার অনুরোধ ফেলি কী করে? আমার মা আমার সঙ্গেই থাকেন। ভুল বললাম। বাড়িটা আমার মায়ের, সেই বাড়িতে ছোট ছেলে হিসেবে আমি আশ্রিত। বহু বছর ধরে। আমার মা আসলে খুবই বিপ্লবী একজন মহিলা। অসম্ভব তার সাহস। আমাকে একবার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিল আপনার দৃষ্টিতে সাহসী কে? আমি উত্তরে বলেছিলাম 'কর্নেল তাহের আর আমার মা।' (এই প্রসঙ্গে বলে রাখি কর্নেল তাহের আমার অসম্ভব প্রিয় একজন মানুষ। যদিও তাকে স্বচক্ষে কখনো দেখি নি) মাকে নিয়ে আর কী লিখব? তার এখন অনেক বয়স। ভালো করে হাঁটতে পারেন না। চোখে দেখতে সমস্যা হয়। তারপরও মাঝে মাঝে দেখি টুকটুক করে তিনি কাজ করছেন। হয় সেলাই করছেন। না হয় কোরান শরিফ পড়ছেন। না হয় বাসার কোনো না কোনো কাজ করছেন। কাজের মধ্যেই আছেন। অতি সম্প্রতি তিনি একটি বই লিখে সেলিব্রেটি হয়ে উঠেছেন। তার এই বইটি অবশ্য তিনি আমেরিকা বসে লিখেছিলেন ১৫/১৬ বছর আগে। সেখানে আমার মেঝো ভাই তাকে কম্পিউটার শিখিয়ে দিয়েছিল। তিনি নিজেই টুকটুক করে কম্পিউটারে কম্পোজ করে বইটা লিখে ফেলেন। অবশ্য বই লেখার ক্রেডিট মেঝো ভাবি ইয়াসমিন হকের। তিনি আম্মাকে লিখতে উৎসাহিত করেন। সেই বই গত একুশের মেলায় পাঁচটি এডিশন বিক্রি হয়। সেই বইয়ের সূত্র ধরে এখন আমার বাসায়...মানে মায়ের বাসায় প্রায় প্রতিদিনই একজন না একজন আসছেই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। শুধু তাই না পত্রিকার লোকজনও আসছে। মা ইন্টারভ্যু দিতে দিতে ক্লান্ত।

মার নাতিরা ধরেছে তাদের নিয়ে বই লিখতে হবে। যেহেতু এ বইয়ে তাদের প্রসঙ্গ নেই। কাজেই তাদের নিয়ে একটা বই লিখতেই হবে। সেদিন দেখি একটা রোল করা খাতায় টুকটুক করে তিনি লিখছেন। (বলাই বাহুল্য কম্পিউটার ব্যবহার তিনি ভুলে গেছেন সেই কবেই) 'কী লিখেন?' আমি জিজ্ঞেস করি। তিনি গম্ভীর হয়ে জানালেন 'নাতিদের নিয়ে লিখছি...ওরা বড্ড বিরক্ত করছে। না লিখলে...।' কথা শেষ করেন না আবার লেখায় মনোযোগ দেন। একটা লাইন লিখতে তার অনেকক্ষণ লাগে তারপরও তিনি লিখছেন।

আমার মার সবচে বড় গুণ হচ্ছে তিনি যখন যে সিদ্ধান্ত নেন সেটা করেনই সেটা যেভাবেই হোক। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাকে সেদিন বললেন তাকে ব্যাংকে নিয়ে যেতে হবে পেনশনের টাকা উঠাবেন। আমি অলস টাইপের, একটু গাইগুই করলাম। 'ক'দিন পরে যান এখন একটু ব্যস্ত আছি।' মা কিছু বললেন না। আমি একটু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাইবে গিয়েছিলাম এসে দেখি তিনি নেই। আম্মা কই গেলেন? পরে শুনি তিনি নিজেই একটা ট্যাক্সি ক্যাব ডেকে চলে গেছেন পুরান ঢাকায় কোর্ট কাচারিতে (ওখানেই পেনশন তোলেন)। পরে দেখি একা একা পেনশন তুলে দিব্যি ফিরেও এসেছেন। আমি লজ্জায় পড়ি। অবশ্য মায়ের একটা সুবিধা আছে তিনি যেখানেই যান কি ব্যাংকে কি পেনশন তুলতে যে কোনো অফিসে। সোজা গিয়ে ম্যানেজার কিংবা কর্মকর্তার রুমে ঢুকে যান। গিয়ে বলেন 'আমি হুমায়ূন আহমেদের মা।' ব্যস আর কিছু করতে হয় না তাকে। বাকি কাজ তারাই করেন। হুমায়ূন আহমেদের ভক্ত কোথায় নেই!

শেষ একটা গল্প দিয়ে মার লেখাটা শেষ করি। মার কূটনৈতিক বুদ্ধি চমৎকার। যেমন বড় ভাইয়ের কাছে গাড়ি চেয়ে পাঠালেন মেয়েদের বাসায় বেড়াতে যাবেন। বড় ভাই গাড়ি পাঠিয়ে দিল। নতুন ড্রাইভার মাকে ঠিক চিনে উঠতে পারে নি। গাড়ি কিছুদূর যাওয়ার পরই ড্রাইভার বলল 'খালাম্মা তেল নিতে হইব' আম্মা বলল গাড়ি দাঁড় করাও। গাড়ি দাঁড়াল আম্মা বলল একটা রিকশা ডাক। ড্রাইভার হতভম্ব 'রিকশা কেন?'

—ছেলের বাসায় রিকশা দিয়ে যাব তারপর তাকে জিজ্ঞেস করব তেল ছাড়া গাড়ি কেন আমাকে পাঠাল। তারপর তো ড্রাইভারের অবস্থা পুরা জেট ফুয়েল! মার হাতে পায়ে ধরে বলল ভুল হয়ে গেছে আর কখনো... ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই হচ্ছেন আমার মা। ছোট্টখাট্ট একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ভীষণ কঠিন আবার একই সঙ্গে প্রচণ্ড মানবিক। তার একমাত্র বইয়ের রয়্যালটির পুরো টাকাই দান করে দিয়েছেন গ্রামের একটি স্কুলে। আর তার পেনশনের টাকা তো সব সময়ই দান করেন। কেউ তার কাছে টাকা ধার চাইলে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন। প্রায়ই বলেন, 'কেউ টাকা ধার চাইলে ফিরিয়ে দিবি না, টাকা ধারের কষ্ট কী আমি জানি।' কতজনকে যে মা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তারও কোনো হিসেব নেই। ছোট্টখাট্ট আমার মা এখন আর আগের মতো হাঁটতে পারেন না। তার প্রিয় চেয়ারটায় চুপচাপ একা একা বসে থাকেন। আমার কাছে লাগে এক বিশাল মহীরুহ...যার ছায়ায় আমরা বড় হয়েছি এখনো হচ্ছি...।

## আলু বনাম লেবু

বিএনপি আমলে পত্রিকা খুললেই দেখতাম ফালু। ফালুর হাসিমুখ। তার নানান সৃজনশীল কর্মকাণ্ড (!) আর এখন পত্রিকা খুললেই দেখি আলু...আলুর নানান কর্মকাণ্ড...আলুই এখন সবচে চালু বিষয়! আলু দিয়ে কত কিছু হয়। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অতি সম্প্রতি বিদেশ থেকে বেড়াতে এসেছে। এসেই আলুর গুণগানের মধ্যে পড়েছে। সে ঠিক করল ফ্রাঞ্চ ফ্রাইয়ের ব্যবসা করবে। এই জাতিকে ফ্রাঞ্চ ফ্রাই খাইয়ে ছাড়বে। ঘরে ঘরে ফ্রাঞ্চ ফ্রাই পৌঁছে দেবে...ইত্যাদি ইত্যাদি। কয়েক টন আলুও কেনা শেষ। কিন্তু যেই শুনল তেলের লিটার ৫০০ টাকা পরের দিনই সে চাট্টিবাট্টি গোল করে ব্যাক টু দ্য প্যাভেলিয়ন। আমি আসলে আলুর বদনাম করতে বসি নি। আলু আমারও প্রিয় সবজি। আলু ভর্তা না খেলে খাওয়াই হয় না। শুধু আমি কেন সব বাঙালিরই আলু ভর্তা প্রিয় খাদ্য বলেই আমার ধারণা (সাথে সরষের তেলের মিশেল থাকলে তো কথাই নেই)।

আসলে এবার যে শুধু আলুর ফলন ভালো হয়েছে তা কিন্তু নয় লেবুও প্রচুর হয়েছে। তা না হলে পথেঘাটে মানুষকে নেটের ব্যাগে এক গাদা লেবু নিয়ে বেচতে দেখি কেন আর দামও সস্তা...মাত্র দশ টাকা। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে লেবু আলুর মতো লাইম লাইটে আসতে পারছে না। আলু মেলা হল লেবু মেলা হল না। অথচ লেবুরও কত গুণ।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা বরং আলু নিয়ে একটা ধাঁধা শুনি। 'সাতটি আলু দুজনের মধ্যে সমান ভাগ করে দিতে হবে।' কীভাবে? প্রিয় পাঠক আলুর গুণের কারণে এটা কোনো জটিল বিষয় না। আপনাকে পাটিগণিত না জানলেও চলবে। কিছু না সাতটি আলু সিদ্ধ করতে হবে তারপর ভর্তা বানিয়ে সমান দু ভাগ।

আলু নিয়ে আরেকটি মজার ঘটনা আছে। ঘটনাটা আমাদের গ্রামের। গ্রামের বাড়িতে একবার এক বিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। আমার সাথে যিনি তিনি অতিশয় রসিক লোক। সম্পর্কে আমাদের কেমন ভাই হতেন। তার নাম ছিল 'কেরানি'। যদিও তিনি জীবনে কখনো কোনো অফিসের কেরানি ছিলেন না। কিন্তু রহস্যময় কারণে তার নাম ছিল কেরানি। তো আমরা দুজন খেতে বসেছি। খাওয়ার মেনু মোটা চালের ভাত আর গরুর গোস্ত আর সালাদ। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাদের পাতে শুধু আলুই পড়ছে গোস্ত আর পড়ছে না। মহাজ্বালা। দুএকবার বলা হল 'ভাই এদিকে একটু গোস্ত দিন।' গোস্ত আর পড়ে না শুধু আলু আলু আলু...। শেষমেশ সেই কেরানি ভাই ওদের একজনকে ডেকে বললেন 'পেঁয়াজ মরিচ আর সরষের তেল দিন তো জলদি।'

—কেন?

—আলু ভর্তা বানাব দেখছেন না আমাদের প্লেটের অবস্থা!

তারপর অবশ্য গোস্ত আসতে আর দেরি হল না।

আলু নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা বললাম। এবার লেবু নিয়ে বলি। গল্পটা অবশ্য মোল্লা নাসিরুদ্দীন হোজ্জার থেকে ধার করা। মোল্লার নাতি এসেছে অঙ্ক নিয়ে। ১২টা লেবু ছিল চারটা পচে গেছে আর কয়টা আছে। হোজ্জা দেখল বিপদ। কারণ সে আবার অঙ্কের শুধু জাহাজ না টাইটানিক জাহাজ। সে তখন বলল

—নাতি আমাদের সময় লেবু পচত না। কাজেই এই অঙ্ক...

সবশেষে একটা কথাই বলব 'বেশি বেশি আলু খান ভাতের উপর চাপ কমান (তবে সাথে লেবুটাও রাখবেন। কারণ দেশে কিন্তু লেবুর ফলনও প্রচুর হয়েছে এবার!)।'

## ডিবেট বেবি!

একবার এক বাচ্চা ছেলে উত্তেজিত হয়ে স্কুল থেকে বাসায় এসে বাবাকে জানাল—

—বাবা আজ স্কুল ডিবেটে আমি শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছি।

—গুড। ভেরি গুড। বাবা খুশি হলেন। তা কী বিষয়ে বলেছিলে? বাবা জানতে চান।

—কিছুই বলতে হয় নি আমাকে।

—কিছুই বলতে হয় নি তোমাকে??

—না।

—মানে?

—মানে সবাই এত বাজে বক্তব্য রেখেছে যে আমি কিছুই বলি নি দেখেই শ্রেষ্ঠ বক্তা হয়েছি।

আরেক ছেলে সেও আগের ছেলেটির মতো উত্তেজিত হয়ে ঘরে ফিরল। বাবার কাছে নয় ছুটে গেল মার কাছে।

—মা মা, আজ স্কুল বিতর্কে আমরা সেকেন্ড হয়েছি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—গুড। মা খুশি হলেন। তারপরই মার মনে হল আরে ডিবেটে তো সেকেন্ড বলে কিছু নেই। একদল জিতবে একদল হারবে, এই তো নিয়ম। মা বিষয়টা পরিষ্কার হতে ছেলের কাছে জানতে চাইলেন। এবার ছোট ছেলে মহাবিরক্ত হল। বলল—

—দেখ মা এ নিয়ে আমি কোনো বিতর্ক করতে চাই না তোমার সাথে... প্লিজ...

যেকোনো ডিবেটেই একজন বিচারক থাকেন। একবার এক ডিবেট কন্টেস্টে বিচারক বিষয়ের পক্ষের দলের বক্তব্য শুনে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, 'তোমরা চমৎকার বলেছ। তোমাদের মতামতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।' সাধারণত বিচারকরাই কারণে অকারণে 'বিব্রত' বোধ করেন। কিন্তু এই বিচারকের হঠাৎ বক্তব্য শুনে উপস্থিত আয়োজকরা 'বিব্রত' বোধ করলেন। এবার দ্বিতীয় দল বক্তব্য রাখল। এবারও বিচারক হাততালি দিয়ে বললেন—'তোমরা চমৎকার বলেছ। তোমাদের মতামতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।' তখন আয়োজকদের একজন উঠে এসে বিচারককে চুপে চুপে বললেন, 'স্যার বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করুন। ডিবেট কন্টেস্টে আপনি বিচারক হিসেবে যেকোনো একটি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন, দু দলই সঠিক বললে হবে না।' বিচারক ঠাণ্ডা মাথায় তার বক্তব্য শুনলেন। তারপর হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন—'আপনিও চমৎকার বলছেন আপনার মতামতের সাথেও আমি সম্পূর্ণ একমত।'

একজন সেরা ডিবেটারের ইন্টারভ্যু নিতে এল এক পত্রিকার রিপোর্টার। 'তুমি এত ভালো ডিবেট কোথা থেকে শিখলে?'

—আমার বাবা-মা।

—তারা তা হলে তোমাকে নিয়মিত এ নিয়ে চর্চা করতে উৎসাহিত করেছেন?

—ঠিক তা নয়।

—তা হলে?

—তারা নিজেরাই প্রতিদিন ডিবেট করতেন।

—ওহ্ তাই? তা তাদের ডিবেটের বিষয় কী থাকত?

—ঐ যে চাল ডাল টাকা পয়সা শাড়ি গয়না...দৈনন্দিন সব বিষয়েই তারা ডিবেট করতেন।

**বেগুনি**

আবার বেগুনির দিন আসছে! কিন্তু বেগুনি আসছে না পেগুনি আসছে, সে নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে কি? এর আগে বুঝতে হবে, 'হোয়াট ইজ পেগুনি?' পাঠকের মনে আছে নিশ্চয়ই, গত বছর রমজান মাসে (কিংবা এর আগের বছরের রমজান মাসেও হতে পারে) হঠাৎ করে বেগুন সর্বগুণে গুণান্বিত হয়ে ঢাকার বাজার থেকে 'দ্য ফিউজিটিভ' হয়ে গিয়েছিল, বাজারে বেগুন নেই! কিন্তু রমজান মাসে বাজারে বেগুনি থাকবে না, তা কি হয় নাকি?

অবশেষে বাজারে ফের আসতে লাগল বেগুনি। বাজারে বেগুন নেই, কিন্তু বেগুনি আসছে কী করে? ইফতার করতে গিয়ে রোজাদাররা অচিরেই আবিষ্কার করলেন, এটি আসলে 'বেগুনি' নয়, 'পেগুনি'!

পেগুনি মানে পেঁপে থেকে পেগুনি। পেঁপে স্লাইস করে কেটে বেসন দিয়ে ভেজে বেগুনি...বুড়ি পেগুনি। তো তখন কিন্তু পেগুনি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কেননা, উপায় নেই গোলাম হোসেন। বেগুনি ছাড়া ইফতার চিন্তা করাই যায় না। তবে গুণাগুণের দিক থেকে বিবেচনা করলে বেগুনির চেয়ে পেগুনি নাকি বেশি উপকারী। কারণ বেগুনের চেয়ে পেঁপের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। বেগুনে অনেকের অ্যালার্জি আছে, কিন্তু পেঁপে সেদিক থেকে উত্তম সবজি (নাকি ফল?)।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা বরং বেগুনি বনাম পেগুনির একটি ডিবেট প্রত্যক্ষ করি না কেন। এখন চারদিকে ডিবেট হচ্ছে, কাজেই পেগুনি-বেগুনির ডিবেট হতে দোষ কী?

বেগুনি : দেখ পেগুনি, ইমিডিয়েট তোমরা চাট্টিবাট্টি গোল করে ইফতারের বাজার থেকে বিদায় হও, নইলে...

পেগুনি : নইলে?

বেগুনি : নইলে আমরা অ্যাকশনে যাব...র‍্যাব দিয়ে তোমাদের ক্রসফায়ারে ফেলব।

পেগুনি : কেন?

বেগুনি : কারণ রমজান মাস মানেই বেগুনি। বেগুনি ছাড়া যেন ইফতারই কমপ্লিট হয় না। এটা তোমার জানা উচিত।

পেগুনি : কিন্তু সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট...যে টিকে থাকবে সে-ই...

বেগুনি : আরে রাখো তোমার ফিটেস্ট-তত্ত্ব। আমরা সেই আদি যুগ থেকেই টিকে আছি...বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাসে আমরা সেলিব্রেটি আইটেম, তা জানো?

পেগুনি : আরে তোমার নামেই তো বলে তুমি বেগুন, মানে বে-গুণ...যার কোনো গুণ নেই।

বেগুনি : ও তাই, না? তা হলে যখন কেউ কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয় তখন? বিশেষ অজ্ঞ? তার মানে কি সে অজ্ঞ? মিয়া বাংলা ভাষার কারণে আমাদের নামটায় একটু ইয়ে আছে, কিন্তু আমাদের গুণের শেষ নেই। যেকোনো বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

পেগুনি : এর চেয়ে এক কাজ করলে হয় না?

বেগুনি : কী কাজ?

পেগুনি : তোমরাও বাজারে থাক, আমরাও থাকি। দুই ভাই মিলেমিশে বেশ ব্যবসা হবে...এ ছাড়া...

বেগুনি : এ ছাড়া?

পেগুনি : এখন মুক্তবাজারের যুগ। এই সময়ে তুমি আমাদের বাধা দিতে পার না।

বেগুনি : রাখো তোমার মুক্তবাজার...ওদের এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত কোনো সেলেটমেন্টে আসতে পেরেছিল কি না জানা যায় নি। তবে এলেও আমরা জানি না, এই রমজানে আমরা বেগুনি খাব, না পেগুনি খাব?

## সত্য বনাম মিথ্যা

এক সুখী দম্পতি। কিন্তু তাদের একটা আফসোস, মন খুলে উচ্চৈঃস্বরে গলা ফাটিয়ে তারা কখনো ঝগড়া করতে পারে না। না পারার কারণ, তাদের এক পাশের রুমে থাকে তাদের টিনএজ মেয়ে, আরেক পাশের রুমে থাকেন শ্বশুর-শাশুড়ি। মাঝখানে স্যান্ডউইচ স্বামী-স্ত্রী। তো তারা ঠিক করল, যে করেই হোক, তারা একদিন মনের সুখে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করবে, কয় দিনই বা আর বাঁচবে, একটা সফল ঝগড়া না হলে...

চল আমরা হোটেলের কোনো রুম ভাড়া করে...

বুদ্ধি খারাপ না। স্বামী সায় দেন।

সাউন্ডপ্রুফ রুম হলে আরো ভালো হয়।

কিন্তু হোটেলের রুম কি আর সাউন্ডপ্রুফ হবে?

খুঁজে দেখ, আজকাল ঢাকা শহরে কত রকমের হোটেল হয়েছে।

আচ্ছা দেখি।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরে স্বামী আবিষ্কার করলেন ঢাকার কোনো হোটেলে সাউন্ডপ্রুফ রুম নেই। রুম আছে তবে সেটা অডিও রেকর্ডিং স্টুডিওতে। শেষমেশ স্বামী বুদ্ধি করে এক অডিও রেকর্ডিং সেন্টারের একটি রুম এক শিফটের জন্য বুকিং দিলেন।

স্যার, আপনাদের কি মিউজিক হ্যান্ডস লাগবে না? রেকর্ডিং সেন্টারের ম্যানেজার জানতে চান। স্বামী-স্ত্রী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। 'মানে? মিউজিক হ্যান্ডস কেন?'

বাহ! আপনারা ডুয়েট গান রেকর্ডিং করবেন না?

তা তা...স্বামী-স্ত্রী আমতা আমতা করে।

শেষমেশ ঠিক হল কি-বোর্ডের হালকা মিউজিক থাকতে পারে। তারপর এক মাহেন্দ্রক্ষণে শুরু হল সেই ঐতিহাসিক ঝগড়া।

শুরু কর।

কী শুরু করব? স্ত্রী জানতে চায়।

কেন, ঝগড়া।

কী, আমি ঝগড়া শুরু করব? আমি ঝগড়াটে বউ?? এত বছরে আমাকে এই চিনলে??? স্ত্রীর গলা চড়তে থাকে। স্বামীর গলাও পাল্লা দিয়ে চড়তে থাকে। সঙ্গে কি-বোর্ডে জ্যাজ মিউজিকের সুর...

বিকেলের দিকে তারা যখন বিল ক্লিয়ার করতে যাচ্ছিলেন তখন স্টুডিওর মালিক ৫০ হাজার টাকার একটি চেক বাড়িয়ে ধরেন।

কী ব্যাপার!!

আপনাদের ডুয়েট র‍্যাপ সংগীতটি অসাধারণ...এককথায় ফিউবুলাস...আমরা এটাকে সিডি করে বাজারে ছাড়তে চাই। এই নিন ইন অ্যাডভান্স ৫০ হাজার টাকা...আর এখানে সই করুন। ডিডটা এগিয়ে দেন রেকর্ডিং সেন্টারের মালিক।

প্রিয় পাঠক, ওপরের গল্পটি কিন্তু পুরোটাই মিথ্যা নয়। অর্ধেকটা মিথ্যা বাকি অর্ধেক ১০০% সত্যি। কিন্তু কথা হচ্ছে 'অর্ধসত্য' মানে কিন্তু পুরোটাই মিথ্যা। বরং সত্য-মিথ্যা নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। যেকোনো বাক্যে সত্য-মিথ্যা থাকে। সেখানে মিথ্যার অংশ নাকি সব সময় ১০০% খাঁটি কিন্তু সত্যের অংশে ৫০% মিথ্যা। তার মানে কী দাঁড়াল একটি বাক্যে ঠিক কতটা সত্যতা থাকে? বরং সত্য-মিথ্যা নিয়ে দুই বন্ধুর কথা শোনা যাক—

১ম বন্ধু : আমি একজনকে চিনি যে এত মিথ্যা বলে যে সে যখন সত্য বলে সেটাতেও মিথ্যা ভরা থাকে।

২য় বন্ধু : আমি একজনকে চিনি যে জীবনে কখনো মিথ্যা বলে নি, এক বর্ণও নয়।

১ম বন্ধু : বলিস কী?

২য় বন্ধু : কিন্তু...

১ম বন্ধু : এর মধ্যে আবার কিন্তু কী?

২য় বন্ধু : তুই যে আবার এক বর্ণও সত্য বলিস না, সেটাই সমস্যা।

**অজ্ঞান পার্টি**

ফ্রান্সের এক নাগরিক বাংলাদেশে বেড়াতে এসে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে ১৪ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন, অবশ্যই সর্বস্ব খুইয়ে! তবে মন্দের ভালো তিনি জানে বেঁচে গেছেন। এই যখন অবস্থা তখন বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ধরা যাক ধরা হয়েছে অজ্ঞান পার্টির গডফাদারকে।

—তুমিই তা হলে সেই লোক যে কৌশলে অজ্ঞান কর মানুষদের অর্থাৎ ঘুম পাড়িয়ে দাও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—জি জনাব।

—আচ্ছা দৈনিক কত জনকে ঘুম পাড়াও?

—তা ধরেন দিনে দশ বার জন হবে।

—আচ্ছা বাংলাদেশের সবাইকে ঘুম পাড়াতে পারবে?

—এ্যাঁ...পারব।

—কত সময় লাগবে?

—তা ধরেন মাস খানেক। পনের কোটি মানুষ...বেশি কইরা লোক লাগাইতে হইব খর্চাও কম না...মাল ম্যাটেরিয়ালস্ লাগব ম্যালা...

—ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি কাজে লেগে পড়।

—কিন্তু স্যার একটা কথা।

—কী কথা?

—পুরা জাতিকে ঘুম পাড়াইতে চাচ্ছেন কেন?

—যে জাতির ৩৬ বছরেও কিছু হল না। তার জেগে থাকার দরকার কী?

—তা অবশ্য ঠিক। গডফাদার স্বীকার করে। অজ্ঞান পার্টির গডফাদার কাজে লেগে পড়ল। বিশাল প্রজেক্ট। তবে সে কথা রাখল মাস খানেকের মধ্যে প্রায় পনের কোটি মানুষকে অজ্ঞান করে ঘুম পাড়িয়ে দিল। কিন্তু...

—স্যার একটু সমস্যা হইছে।

—আবার কী সমস্যা?

—একজনরে কিছুতেই অজ্ঞান করতে পারতাছি না।

—কে সে?

—আপনার স্ত্রী।

—আমার স্ত্রী???...ওকেই তো সবার আগে অজ্ঞান করা দরকার। ওর মতো হালকা-পাতলা মেয়েকে তুমি অজ্ঞান করতে পারছ না??!

—স্যার যখনই উনাকে অজ্ঞান করতে যাই তখনই...

—তখনই...?

—তখনই উনি গায়ের সব গহনা খুইলা ফেলেন।

—মানে গহনা খুললে কী হয়?

—উনি হালকা হয়ে উপরে উঠে যান। আর আমার লোকেরা গ্যাস মারতে পারে না।

যাহোক।...এ সব নিছকই ফান! এই লড়াকু বাঙালি জাতিকে ঘুম পাড়ানো এত সহজ কাজ না। ফিনিক্স পাখির মতো পড়া গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠছে...হয়তো সময় লাগছে...সময় তো একটু লাগবেই! বরং সময় নিয়ে একটা গল্প—এক লোকের ছাগলের ফার্ম আছে। ফার্ম থেকে দুই মাইল দূরে আপেলের বাগান। লোকটা প্রতিদিন তার ছাগলদের চরিয়ে ঐ বাগান পর্যন্ত আনে আপেল খাওয়ানোর জন্য। যখনই ছাগলগুলো আপেল খেতে চায় তখনই নিয়ে আসে। তা দেখে এক লোক তাকে বলল—'সকালে একবারে আপেল নিয়ে ফার্মে রেখে দিলেই তো পারেন। এভাবে বারবার আসলে তো অনেক সময় নষ্ট।'

ফার্মের মালিক বলল—

'ছাগলের আবার সময় নষ্ট'।

**লটারির পুরস্কার আর আমার আবিষ্কার!!!**

সেদিন পেপারে দেখি এক ডাক্তার (একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল সমর্থিত ড্যাব নেতা) শিশু হাসপাতালের লটারির প্রথম পুরস্কার যোগসাজশ করে হাতিয়ে নিয়েছে। পড়ে আমি হতস্তম্ভিতমূঢ় (হতভম্ব + স্তম্ভিত + বিমূঢ় ত্রিযুক্ত সন্ধি। এটা আমি ইদানীং প্রায়ই হচ্ছি।) একটা মানুষ কতটা নীচ হলে এই কাজটা করতে পারে! কতটা জানোয়ার হলে কতটা পশুসুলভ লোভ...ভুল বললাম পশুদেব সঙ্গে আসলে কোনো কিছুর তুলনা করা উচিত নয়। পশুদের একটা নিজস্ব এথিক্স আছে। তারা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। তাদেরকে লোভী বলা যায় না। কারণ উদরপূর্তি হলে তারা আর কাউকে বিরক্ত করে না। কিন্তু মানুষ বিশেষ করে ঐ লোকটি...!

পশুর প্রসঙ্গই যখন এল। তখন আরেকটি জরুরি বিষয়ে আলোচনা করা যাক। অতি সম্প্রতি আমি একটি মহান আবিষ্কার করেছি!! আমি এটাকে আবিষ্কারই বলব। খুবই গবেষণালব্ধ আবিষ্কার। (পশু গবেষণায় কোনো আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার থাকলে আমি পেয়েও যেতে পারি কে জানে।) আবিষ্কারটি হচ্ছে বিড়াল প্রসঙ্গে। 'বিড়াল বিশেষ করে মা বিড়াল তিন পর্যন্ত গুনতে পারে'। কিছু দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার কোনো এক গবেষণাগারে এক গবেষণায় বেরিয়েছে, ইঁদুরকে কাতুকুত দিলে নাকি তারা হাসে। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটির মতোই আমার আবিষ্কারটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলাই বাহুল্য। কিন্তু কীভাবে এটা আমি আবিষ্কার করলাম সেটা বলা যাক। আমি বিড়ালপ্রেমিক। বিড়াল আমার খুবই প্রিয় প্রাণী। আমার বাসায় এখন এগারটা বিড়াল। তো আমি দেখেছি বিড়াল যখন বাচ্চা দেয়, তখন সে তার বাচ্চা নিয়ে সাতবার জায়গা বদল করে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম বিড়াল তার জায়গা বদলের সময় তার তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে জায়গা বদল করে চতুর্থ ও পঞ্চম বাচ্চাটিকে আমি নিজ হাতে মায়ের কাছে পৌঁছে দেই। এটি আমার দীর্ঘ গবেষণার ফল। পাঠক নিশ্চয়ই বিড়াল নিয়ে এই বিরল আলোচনায় ইতোমধ্যেই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন বরং আমি আবার লটারি প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

আমি সব সময়ই লটারির টিকিট কিনি অবশ্য আমার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে আমি টিকিটটি কিনেই ছিঁড়ে ফেলি। কারণ কিনে যদি রেখেই দিলাম তার মানে আমার ভিতরও একটা চিকন লোভ কাজ করে হয়তো ঐ লটারির প্রথম পুরস্কারটি আমিও পেতেও পারি...এই লোভ। তার মানে স্বার্থ ত্যাগ করে আমি দশটা টাকাও ঐ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করলাম না। এই হচ্ছে আমার নিজস্ব পলিসি। জাতীয় বড় বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য তো কিছু করতে পারলাম না বরং স্বার্থ ত্যাগ করে না হয় মাত্র দশটা টাকাই সহযোগিতা করলাম! এবার লটারি নিয়ে সেই চিরাচরিত গল্পটি বলা যায়। সেই এক অসুস্থ হার্টের রোগী হঠাৎ লটারিতে ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার পেল। এখন তার ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন ভয় পাচ্ছে এত বড় খবরটা কীভাবে জানানো যায়। তারা ঠিক করল ডাক্তারকে দিয়েই খবরটা দেওয়াবে। ডাক্তার প্রথমে দশ হাজার দিয়ে শুরু করল। তারপর আস্তে আস্তে বাড়িয়ে বলল 'আপনি ৫০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন লটারিতে।' রোগী বলল 'ডাক্তার ঠিক আছে যাও ৫০ লাখ টাকা পেলে তোমাকেই দিয়ে দিব'। মূল জোকসে এই পর্যায়ে ডাক্তার হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায়। কিন্তু আমার এই গল্পে তেমনটা হল না। ডাক্তার হার্ট অ্যাটাক হল না। ডাক্তার বাইরে এল। বাইরে রোগীর ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা করছিল। তারা এগিয়ে এল খুবই উদ্বিগ্ন!!

—বাবাকে বলেছেন?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—বলেছি।

—তিনি ঠিক আছেন? হার্ট অ্যাটাক হয় নি তো??

—না। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

—তিনি কী বললেন?

—তিনি পুরো টাকাই আমায় দিয়ে দিলেন।

তারপর যেটা ঘটল সেটা সত্যিই মর্মান্তিক। গিনেস বুক অফ রেকর্ডে দেওয়ার মতো অপেক্ষমাণ সব আত্মীয়স্বজনের একসঙ্গে হার্ট অ্যাটাক হল! যাকে বলে সিরিয়াল হার্ট অ্যাটাক!!

**হাইজ্যাক!!**

প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে। এক দেশ থেকে হাইজ্যাক হয়ে প্লেন নেমেছে আরেক দেশে। সশস্ত্র হাইজ্যাকারদের নেতা হঠাৎ এক মহিলা যাত্রীকে প্রশ্ন করল

—আপনার নাম?

—জুলেখা।

'জুলেখা?' হাইজ্যাকারদের নেতা যেন আবেগাপ্লুত হয়ে গেল। বলল, 'আমার মায়ের নামও জুলেখা...। ঠিক আছে, যান, আপনি সসম্মানে মুক্ত।' তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। নেতা এবার দ্বিতীয় যাত্রীকে ধরল—

—আপনার নাম?

—আমার নাম আব্দুল ওহাব। তবে সবাই আদর করে জুলেখা ডাকে।

হাইজ্যাকারদের নেতা দ্বিতীয় জুলেখাকে ছেড়ে দিয়েছিল কি না জানা যায় নি। তবে ছেড়ে দেওয়ার আরেকটা ঘটনা আছে। এটাও প্লেন হাইজ্যাক কেস।

এখানেও হাইজ্যাকারদের নেতা এক যাত্রীকে প্রশ্ন করল—

—এই, তুমি প্লেনে একা?

—জি।

—তোমার পরিবারের কেউ নেই সঙ্গে?

—না।

—তোমার পরিবারের সদস্য কয়জন?

—আপনারা আমাকে ছেড়ে দিলে চারজন হবে।

বলা বাহুল্য, নেতা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

তবে প্লেন হাইজ্যাকের সবচেয়ে মজার এবং চালু ঘটনা হচ্ছে সেই গল্পটা—(হয়তো আগেও বলে থাকতে পারি) এক যাত্রী প্লেনে পিস্তল ধরল পাইলটের মাথায়; বলল, সোজা লন্ডন চল।

—আমরা তো লন্ডনই যাচ্ছি। এটা ঢাকা-লন্ডন ফ্লাইট।

—ওসব বুঝি না...

এর আগে দু বার লন্ডন যাওয়ার জন্য প্লেনে উঠেছিলাম। প্লেন হাইজ্যাক করে একবার নিয়ে গেল সাইপ্রাস, আরেকবার ভুটান... কিন্তু আমি টিকিট কেটেছি লন্ডনের। আমি এবার লন্ডন যেতে চাই-ই-ই-ই...দেখি কোন শালা অন্যদিকে নেয়!

এবার আকাশ থেকে মাটিতে আসি। মানে প্লেন হাইজ্যাক থেকে কার হাইজ্যাকে। চালকের মাথায় পিস্তল ধরে বলল, চল কুমিল্লা...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চালক কাম মালিক বলল...দেখুন, আপনি ভুল করছেন, আমার গাড়ি হাইজ্যাক করছেন, আমার কিন্তু আর্মি, পুলিশ, বিডিআর সব জায়গায় 'হাই-জ্যাক' আছে, ওরা জানতে পারলে আপনি বিপদে পড়বেন।...

—আরে ভাই, আমার হাই-জ্যাক কি কম আছে নাকি? দেশের এই 'জরুরি অবস্থায়' হাই-জ্যাক লাগিয়েই তো এই ল্যুগার পিস্তলটা জোগাড় করেছি।

সবশেষে আবার সেই প্লেন হাইজ্যাক প্রসঙ্গেই...। এক লোকের খুব শখ বিদেশ যাওয়ার। এক পামিস্টকে হাত দেখাল।

—ভাই, দেখেন তো বিদেশ যাত্রা আছে কি না?

—নাই।

—তা হলে দেখেন তো প্লেন হাইজ্যাকে পড়ব কি না?

**এসএমএস...এসওএস**

যুগটা এখন এসএমএসের। নানা কায়দায় নানাভাবে মোবাইল ফোনের কোম্পানিগুলো তাদের গ্রাহকদের রাতদিন এসএমএস করিয়ে করিয়ে 'তরল' দোহন করে নিচ্ছে। আবালবৃদ্ধ নেতা-বারবনিতা সবাই এই এসএমএসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মোবাইলওয়ালাও নিত্যনতুন বুদ্ধি বের করছে এসএমএস করার। যেমন ধরা যাক হঠাৎ একদিন একটি দৈনিকে দেখা গেল বিজ্ঞাপন 'এসএমএসে মিথ্যা বলার প্রতিযোগিতা'!

ব্যাপার কী? একটা নির্দিষ্ট নম্বরে মিথ্যা এসএমএস করতে হবে—যে সেরা মিথ্যা এসএমএস করতে পারবে, সে-ই পাবে বড় অঙ্কের পুরস্কার। ব্যস, শুরু হয়ে গেল মিথ্যা এসএমএস পাঠানোর প্রতিযোগিতা। হাজার হাজার, লাখ লাখ এসএমএস আসতে শুরু করল। আয়োজকরা হিমশিম খেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তারা লটারি করতে বাধ্য হল। লটারি করে তিনটা সেরা মিথ্যা এসএমএস সংগ্রহ করল। এর মধ্যে একটাকে সেরা মিথ্যা এসএমএস পুরস্কার দেওয়া হবে। এবার জুরি বোর্ড বসানো হল। একটা মিথ্যা এসএমএস এরকম—'সেদিন মোবাইলে একটা জরুরি ফোন করতে যাব, দেখি ফোন যায় না। কী ব্যাপার, মোবাইল খুলে দেখি, ভেতরে সিম নেই। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, নিশ্চয়ই আমার ফাজিল ছোট ভাইয়ের কাজ! এখন কী করি, খুব জরুরি ফোন করতে হবে। হঠাৎ দেখি, মাথায় করে সবজি নিয়ে চলেছে এক ফেরিওয়ালা। তাকেই ডাকলাম। তার কাছ থেকে একটা শিম নিয়ে মোবাইলে ভরে রিঙ দিলাম, ঠিকই চলে গেল ফোন, কথাবার্তা বললাম...'

আরেকটা মিথ্যা এসএমএস এরকম—'সেদিন ফোন করছি... হঠাৎ ফোন চলে গেল নরকে। ধরল আমার এক বদ ফ্রেন্ড, সন্ত্রাসী ছিল, বিপক্ষের কোপ খেয়ে মারা গিয়েছিল। বলল, নরকে সে ভালোই আছে। ওদের ওখানে নাকি মোবাইলে আমাদের থেকে বেশি অপশন আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ফোনে কথা বললাম। হঠাৎ মনে হল হায় হায়, লং ডিসটেন্স কল না জানি কত বিল উঠেছে! খোঁজ নেওয়ার জন্য বিল সেকশনে ফোন দিলাম। ওরা বলল, সমস্যা নেই, এটা নাকি লোকাল কল!'

তৃতীয় এসএমএসটা অবশ্য খুবই সিরিয়াস টাইপের—'আমি মোবাইল ফোন, মোবাইল ফোনে কথা বলা ঘৃণা করি। এসএমএস করাকে আরো বেশি ঘৃণা করি...' তবে জুরি বোর্ড তৃতীয় এসএমএসটাকে সেরা মিথ্যা এসএমএস বলে পুরস্কৃত করল।

মোবাইল নিয়েই আরেকটা ঘটনা। বাস চলছে। হঠাৎ একটা হকার উঠল, হাতে এক গাদা পত্রিকা। সে চিৎকার করে বলছে, 'ঢাকায় বিরাট জালিয়াতির ঘটনা...ঢাকায় বিরাট


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জালিয়াতির ঘটনা...মোবাইল কোম্পানি দেউলিয়া...ঢাকায় বিরাট জালিয়াতির ঘটনা...' এক যাত্রী একটা কপি কিনল। হকার নেমে গেল চিৎকার করতে করতে। কিন্তু যাত্রী পত্রিকা পড়ে দেখে কিসের জালিয়াতি। জালিয়াতির কোনো খবরই নেই। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ বাস থেকে নেমে গেল ওই হকারকে ধরার জন্য। দাঁড়াও, তোমার খিস্যা বলা বের করছি। হকার বেশি দূর যায় নি, পেছনের একটা বাসে উঠে আরেক যাত্রীকে একটা পত্রিকা গছিয়ে চেঁচাচ্ছে ওই একই কথা বলে, 'ঢাকায় বিরাট জালিয়াতির ঘটনা...ঢাকায় বিরাট জালিয়াতির ঘটনা...মোবাইল কোম্পানি দেউলিয়া...ঢাকায় বিরাট জালিয়াতির ঘটনা...আরো একজন এইমাত্র জালিয়াতির শিকার হলেন।'

## বিদায় পৃথিবী

আজ মঙ্গলবার এই লেখাটা লিখছি। আগামী কাল বুধবার ১১ সেপ্টেম্বর। আগামী কাল পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কথা। কিছু পত্র-পত্রিকায় এরকম একটা খবর বের হয়েছে। কিছু কিছু মানমন্দির এমনটাই ঘোষণা দিয়েছে। অবশ্য খবরটা যিনি আমাকে এসএমএস করে পাঠিয়েছেন তিনি এই পৃথিবীর ওপর বিশেষ রকম 'ব্র্যাক্ত' (বিরক্ত বেশি হলে সেটা হয় 'ব্র্যাক্ত'!!) কাজেই তিনি চান পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক। তিনিও বাঁচেন। আমি তাকেই ফোন দিলাম।

—আলমগীর ভাই পৃথিবী নাকি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ সেরকমই তো দেখলাম পত্রিকায়...

—কোন পত্রিকায় লিখেছে?

—অনেক পত্রিকাতেই লিখেছে কেন দেখেন নি?

—না তো খেয়াল করি নি।

—তা করবেন কেন? আপনারা তো চান পৃথিবী টিকে থাকুক... আমি চাই না, তাই ঐ খবরটা আমার চোখেই পড়েছে। ঠিক আছে খোদা হাফেজ...পরকালে দেখা হবে।

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ বাড়িওয়ালা (অফিসের) খবর পাঠাল ভাড়ার জন্য। আমি ভাবলাম ভাড়ার এতগুলো টাকা আজকে দেওয়া ঠিক হবে? কাল যেখানে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে... পুরো টাকাটাই তো লস হয়ে যাবে...। আমি ফোন দিলাম আমার এক শত্রুকে (সে দীর্ঘদিন আমার বন্ধু ছিল এখন কোনো কারণে ঘোরতর শত্রু হয়ে গেছে। তারপরও মাঝে মধ্যে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য তাকে ফোন দেই। কারণ একটা বিখ্যাত বাক্য আছে বোকা বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রু উত্তম। আমার বন্ধুটি যতদিন বন্ধু ছিল ততদিন খেয়াল করেছি বোকার মতো আচরণ করত। যখন ওকে শত্রু বলে ঘোষণা দিলাম তখন দেখি সে জ্ঞানীর মতো আচরণ শুরু করেছে!)

—হ্যালো?

—কী বলবি জলদি বল (জ্ঞানী শত্রুর রাগ)।

—পৃথিবী নাকি ধ্বংস হচ্ছে?

—পেপারে দেখেছি তাতে তোর কী?

—না আমার কিছু না, একটা ব্যাপারে তোর পরামর্শ চাচ্ছিলাম...

—কী পরামর্শ?

—কাল পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে আজ কি বাড়ি ভাড়া দেওয়া ঠিক হবে? সত্যি সত্যি যদি ধ্বংস হয় পুরো টাকাটাই তো লস হয়ে যাবে।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—সেক্ষেত্রে না দেওয়াই ভালো। বরং আমাকে ধার দে।

আমি ফোন কেটে দিলাম। কেটে দিয়ে ভাবলাম সত্যি সত্যি যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়েই যায় তা হলে আমিই বা অফিস ভাড়ার টাকা দিয়ে কী করব? আরেকজন বলল, "রেখেই দেন বলা যায় না হয়তো ঐ সময় কোনো রকেট বা ঐ জাতীয় কিছু বের হয়ে যাবে...যারা চেঁচাবে 'আয়া পড়েন আয়া পড়েন মঙ্গল গ্রহ মাত্র ১০,০০০ টাকা...' তখন টিকিট কেটে উঠে পড়বেন। মঙ্গল গ্রহে তো শুনেছি বাসযোগ্য পরিবেশ পাওয়া গেছে।"

শেষমেশ ভাড়া দিয়েই দিলাম। কে জানে পরকালে যদি ঐ এক মাসের ভাড়ার জন্য ধরে তখন বেইজ্জতি হতে হবে। প্রিয় পাঠক, আগামী কাল (১১/৯/০৮) যদি সত্যি সত্যিই পৃথিবী ধ্বংস হয় তা হলে সম্ভবত আমার এটাই শেষ লেখা (একটা আফসোস রয়ে গেল লেখার বিলগুলো পেলাম না তার আগেই...)।

**ছবি ছাপার গল্প**

এই তো কিছু আগেই এসএসসির রেজাল্ট হল। সব পত্রিকায় জিপিএ-৫ পাওয়া উল্লসিত ছাত্রছাত্রীদের ছবি ছাপা হল। তাদের উল্লাস আমাদেরও স্পর্শ করেছে। আনন্দ দেখতে কার না ভালো লাগে। কিন্তু মুশকিল হল সব স্কুলের ছবিই ছাপা হল কিনা আমার মেয়ের স্কুলের উল্লসিত ছাত্রীদের কোনো ছবি কোনো পত্রিকাওলারা ছাপল না। আমার মেয়ের মন খারাপ, তাদের আনন্দঘন ছবি ছাপা হল না কোনো পত্রিকায়। তার বান্ধবীরাও ক্রুদ্ধ। তারাও গোল্ডেন ৫ পেয়েছে। তাদের স্কুল মিরপুর আইডিয়াল ল্যাবরেটরি গার্লস ইনস্টিটিউট। মিরপুরের একটি বিখ্যাত স্কুল (কাম কলেজ) কিন্তু কোনো পত্রিকায় কোনো ছবি নেই। আমি ভাবলাম মেয়েকে ভালো রেজাল্টের জন্য কোনো গিফট দেই নি এখন পর্যন্ত বরং একটা সারপ্রাইজ গিফট দেওয়া যাক। তাদের আনন্দঘন একটা ছবি ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি কোনো দৈনিকে। সব দৈনিকেই পরিচিত ছেলেপেলে আছে অতএব সমস্যা কী? তিনটি বিখ্যাত পত্রিকার তিন তরুণ সাংবাদিককে দায়িত্ব দিলাম। তাদের উল্লাস করা একটা ছবিও মেইল করে দিলাম।

—একজন বলল

—বস এটা কোনো বিষয় না। আপনার মেয়ের ছবি ছাপবে না মানে? ফাজলামো নাকি। আমি এখনই ব্যবস্থা করছি। দরকার হলে আপনার মেয়ের আলাদা করে একটা ইন্টারভ্যু করি? আমি বলি, না তার দরকার নেই ওদের সব বান্ধবীদের উল্লসিত হওয়া একটা ছবি ছাপলেই হবে। নিচে ক্যাপশনে স্কুলের নাম দিলেই চলবে।

—কোনো ব্যাপার না আপনি কালকের পেপার খুলে দেখবেন (পত্রিকার নাম দিলাম না)। কালকের পেপার কিনে খুলে দেখি কিছু নেই। (ভাগ্যিস মেয়ে বা তার বান্ধবীদের আগে থেকে কিছু বলি নি) সেই তরুণ সাংবাদিককে ফোন দিলাম 'কী হে ছবি কই?' সে আমতা আমতা করে।

—না মানে...হয়েছে কী সবই ঠিক ছিল স্পেসও ছিল কিন্তু হঠাৎ করে...

—হঠাৎ করে?

—মানে হঠাৎ করে একটা মোবাইলের বিজ্ঞাপন এসে পুরো জায়গাটা খেয়ে ফেলল, বুঝেন তো পত্রিকা চলে বিজ্ঞাপনে...মানে...

—নো প্রবলেম। আমি ফোন রেখে দেই। এবার আসা যাক দ্বিতীয় জনের কাছে ছবি মেইল করার সময় সে একই সুরে বলেছিল 'বস কোনো বিষয় না আপনার মেয়ের ছবি ছাপবে না মানে...ইয়ার্কি নাকি?' কালকের পেপার দেখেন আমি এখনই পেস্টিং করে দিচ্ছি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কালকের পেপার কিনলাম। কোথায় কী? আরো দুটো স্কুলের আনন্দ-উল্লাসের ছবি ছেপেছে। কিন্তু আমার মেয়ের স্কুলের কোনো ছবি নেই। আমি তরুণ সাংবাদিককে ফোন দিলাম 'কীহে ছবি কই?' সেও আগের জনের মতো আমতা-আমতা করে...'না মানে পেস্টিং হয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত তারপর হঠাৎ...'

—হঠাৎ?

—ফিচার এডিটর ডেকে বলল স্কুল-কলেজের ঢাকঢোল পিটানো বন্ধ কর।

কী আর করা ঠিক করলাম নিজের ঢোল নিজেই পিটাই (কথায় বলে নিজের ঢোল নিজে পিটাও কোনো রিস্ক নেই অন্যকে দিলে ফাটিয়ে ফেলতে পারে। এখন অবশ্য এই বাক্যটি আরেকটু আপগ্রেড হয়েছে...নিজের ঢোল অবশ্যই নিজে পিটাও অন্যকে দিলে ঢোল গায়েব করে দিতে পারে। আর আজকাল ঢোলের চামড়ার যে দাম!)।

আমার উন্মাদেই ছেপে দেই না কেন। তারা তো আমার উন্মাদও পড়ে। আমি যখন উন্মাদে ছাপার ব্যবস্থা করছি তখন ফোন এল দান দান তিন দান...তৃতীয় তরুণ সাংবাদিক ফোন করেছে। সেও আমতা-আমতা করছে...

—আহসান ভাই...আপনার মেয়ের স্কুলের ছবিটা...

—বুঝতে পেরেছি পেস্টিং হয়ে যাওয়ার পরও কোনো একটি সমস্যা হয়েছে এই তো...

—জি মানে...

—ঠিক আছে। নো প্রবলেম। তুমি চেষ্টা করেছ এতেই আমি খুশি।

—জি মানে রঙিন পৃষ্ঠায় পেস্টিং হয়েছিল...তারপর...

—আহা সমস্যা নেই...ঠিক আছে।

—না মানে...তারপর সাদাকালো পৃষ্ঠায়...ভালো ট্রিটমেন্ট দিতে পারি নাই।

তার মানে সাদাকালো পৃষ্ঠায় সেই দৈনিকে আমার মেয়ের স্কুলের ছবি ছাপা হয়েছে। আমি তো মহাখুশি যাক অবশেষে ছাপা তো হয়েছে কোনো দৈনিকে। আমার মেয়ে খুশি, মেয়ের বান্ধবীরা খুশি। স্কুল পর্যন্ত খুশি। আমি অবাক হয়ে ভাবি মানুষ কত অল্পে খুশি হয়। আর সেই খুশিটা আমরা সবাই মিলে শেয়ার করতে পারি।

(বলাই বাহুল্য এই লেখাটা যারা ছাপিয়েছিল তারাও ঐ ছবিটা আবার ছেপেছিল।)

## বইয়ের ভূমিকা

সব জায়গায় সংস্কার চলছে। দৈনিক যুগান্তরের ফান সাপ্লিমেন্ট বিচ্ছু কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল তারাও তাদের কাগজে ব্যাপক সংস্কার আনবে। যাকে বলে নিউ স্টার্ট...নিউ লাইফ...। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা জিনিস ১০০ পার্সেন্ট ভালো হয়ে গেলে আবার সমস্যা! ডাল মে কুচ 'কালা' না থাকলে আবার জমে না। তাই বিচ্ছু কর্তৃপক্ষ আমার কাছে এল একটা 'বাজে' কিছু যদি দেই। এখানে বলে নেওয়া ভালো বিচ্ছুর এই তরুণরা আমার যথেষ্ট স্নেহভাজন। তাদেরকে না বলতে পারি না। আর এটাও সবার জানা পৃথিবীতে সবচে বড় শেখাই হচ্ছে 'না' বলতে শেখা। এই জীবনে যে যত বেশি না বলতে পেরেছে তারাই নাকি জীবনে তত বেশি উন্নতি করেছে (তবে তাদের ক্ষেত্রে এই থিওরি প্রযোজ্য নয়)। তবে ফানের ব্যাপারে না বলতে পারি না কখনো। তাই এই লেখার পাঁয়তারা বা ভূমিকা।

এবার আসা যাক লেখায়। ঐ ভূমিকা প্রসঙ্গেই...বইমেলা চলছে। যথারীতি আমার কিছু ট্র্যাশ বই বের হয়েছে। এক তরুণ এল আমার কাছে—

—আমি আপনার ভক্ত।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাই?...শুনে ভালো লাগল।

—এই মেলায় বের হওয়া আপনার সবগুলো বই কিনেছি।

—গুড! পড়েছ?

—ইয়ে মানে হ্যাঁ পড়েছি...তবে...

—তবে?

—সত্যি কথা বলতে কী আসলে আপনার বইয়ের ভূমিকাটাই পড়ি ঐটাই আমার ভালো লাগে। হে হে...

এই ঘটনার পর আমি ভূমিকা লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন বইয়ে ভূমিকা লিখি না...লিখি 'মুখবন্ধ' মানে মুখ একদম বন্ধ। কিছু লেখার দরকার নেই।

ভূমিকা নিয়ে আরেকটা ঘটনা আছে। এটা অবশ্য এক বিখ্যাত লেখকের ঘটনা। তিনি আড়াই শ পৃষ্ঠার এক উপন্যাস লিখেছেন। প্রকাশক মহাখুশি। যাক এবার ব্যবসা ঠেকায় কে? জনপ্রিয় লেখক বলে কথা। কিন্তু লেখক ভূমিকা দিচ্ছেন না। মানে লেখকের ভূমিকা লেখার মুড আসছে না। প্রকাশক ঘন ঘন হানা দিচ্ছে।

—স্যার ভূমিকাটা?

—লিখব লিখব...মুড আসছে না। ক'দিন পরে আস।

—ক'দিন পরে প্রকাশক আবার গেল 'স্যার ভূমিকাটা?'

—না এখনো লিখে উঠতে পারি নি।

—স্যার তবে কি ভূমিকাটা আমিই লিখে ফেলব?

—তুমি লিখবে মানে?

—জি আপনি যেহেতু সময় পাচ্ছেন না...আপনার হয়ে...

—কিন্তু সেক্ষেত্রে আড়াই শ পৃষ্ঠার সাদা খাতা কে কিনবে?

—মানে? কী বলছেন স্যার? সাদা খাতা??

—তুমি ভূমিকা লিখলে কি মনে কর ঐ বইয়ে আমি আমার আড়াই শ পৃষ্ঠার উপন্যাস ছাপার অনুমতি দিব?

ভূমিকা নিয়ে আরেকটি বাস্তব ঘটনা। বইমেলায় এক তরুণের প্রেমের উপন্যাস বের হয়েছে। কিন্তু নতুন বই হাতে পেয়েও তার মেজাজ ভীষণ খারাপ। বন্ধুরা বলল 'কীরে বই বের হল তারপরও তোর মেজাজ এত খারাপ কেন?'

—শালার প্রকাশক ভূমিকায় গোলমাল করেছে!

—কী গোলমাল?

—ফর্মায় গোলমাল করে আরেক বইয়ের ভূমিকা আমার বইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—বলিস কী? কোন বইয়ের ভূমিকা?

—তাও যদি কোনো ভালো লেখক হত।

—তা লেখকটা কে??

প্রিয় পাঠক বুঝতেই পারছেন সেই তরুণ কোন লেখকের কথা বলেছে। এই লেখার শুরুতেই সেই লেখকের নাম দেওয়া আছে। (দীর্ঘশ্বাস!)

**ভবিষ্যতের পৃথিবীতে একদিন**

বিখ্যাত আমেরিকান আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসন চিকিৎসকদের নিয়ে একটি ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। সেটা হচ্ছে 'ভবিষ্যতের ডাক্তাররা রুগিকে কখনো ওষুধ দেবে না।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারা শেখাবে কীভাবে শরীরের যত্ন নেওয়া যায় এবং সঠিক খাদ্য নির্বাচন করা যায়।'
আসলেই কি তাই হবে? আমরা বরং ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করি না কেন?

বাংলাদেশ থেকে এক লোক ধরা যাক ভবিষ্যতের দিকে রওনা হল। ওয়ান ওয়ে জার্নি। মুহূর্তে সে পৌঁছে গেল ১০০০ বছর পরে। কিন্তু মাথাব্যথা নিয়ে নামল সে। এদিক-ওদিক তাকাল যদি একটা ফার্মেসি-টার্মেসি পাওয়া যায়। একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিলেই হবে। অবশ্য ১০০০ বছর পর প্যারাসিটামল আছে তো হয়তো নাম বদলেছে। এসময় তার নজর গেল একটা যোগ চিহ্নের দিকে। নিশ্চয় ডাক্তারখানা। সে এগিয়ে গেল।

—এটা ডাক্তারখানা?

—হ্যাঁ।

—জলদি একটা প্যারাসিটামল...মানে মাথাব্যথার ওষুধ দিন।

—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

—২০০৮ সালের পৃথিবী থেকে।

—এজন্যই...

—মানে?

—মানে এখন ৩০০৮ সাল। এই পৃথিবীতে ওষুধের নাম মুখেও আনবেন না।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বুঝবেন কী করে...আপনারা তো খাওয়ার জন্য বাঁচতেন এখন আমরা এই পৃথিবীতে বাঁচার জন্য খাই।

—কিন্তু আমার মাথাব্যথার কী হবে?

—সরি আপনার মাথাব্যথা সারবে না। কারণ এই পৃথিবীতে কারো মাথাব্যথা নেই শারীরিক কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমরা সঠিক খাদ্য নির্বাচন করে খেয়ে থাকি। ফলে কোনো রোগশোক নেই। শারীরিক সমস্যা নেই...

—হায় হায় তা হলে আমার কী হবে? মাথাব্যথা কমবে না?

—একটাই উপায় আছে!

—কী?

—মাথা ফেলে দিন। মাথা নেই মাথাব্যথাও নেই।

—কী বলছেন আপনারা? মাথা না থাকলে আমি বাঁচব কীভাবে?

—আপনার বেঁচে থাকা কি খুব জরুরি? পৃথিবীকে কিছু দিয়েছেন? আমাদের এই পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় মানুষের কোনো প্রয়োজন নেই। ইজ ইট ক্লিয়ার?

২০০৮ সালের মানুষটি এবার হাউমাউখাউ কান্না শুরু করল। এখন কী হবে। ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। এই অবস্থায় ৩০০৮ সালের লোকদের একটু মায়া হল। হাজার হোক তারাও মানুষ।

—আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি।

—কী? আগ্রহী হয়ে ওঠে ২০০৮-এর মানুষটি।

—আপনি 'দ্য অ্যানসিয়েন্ট ডিজিজ মিউজিয়ামে' চলে যান।

—ওখানে গেলে মাথাব্যথা কমবে?

—তা জানি না, তবে আপনার একটা গতি হবে।

ঠিকানা নিয়ে ২০০৮ সালের লোকটি রওনা দিল দ্য অ্যানসিয়েন্ট ডিজিজ মিউজিয়ামের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'দ্য অ্যানসিয়েন্ট ডিজিজ মিউজিয়ামে' লোকটির জন্য অপেক্ষা করছিল গুড নিউজ আর ব্যাড নিউজ। গুড নিউজ হচ্ছে ওখানে সে তার দেশের আরো অনেক পরিচিত লোক পেল, যারা এ বছরেই তার মতো করে চলে এসেছে এই আধুনিক পৃথিবীতে। আর ব্যাড নিউজ হচ্ছে কেউই সুস্থ নয়। কারো পেটে ব্যথা, কারো কোমর ব্যথা, কারো গেঁটে বাত, কারো বুকে ব্যথা কিন্তু কোনো ব্যথাই সারছে না। সারা সম্ভবও নয় কারণ এই পৃথিবীতে কোনো ওষুধ নেই। খুব শীঘ্রই ২০০৮ সাল থেকে মাথাব্যথা নিয়ে সদ্য আসা লোকটিকে একটি সেলে ঢুকানো হল। সেলের একদিকে খোলা কাচ নিয়ে ঢাকা। বাইরে বড় করে লেখা 'হেডেক প্যাশেন্ট।' আরো আশ্চর্যজনক হচ্ছে প্রতিদিন বিকেল তিনটের পরে আধুনিক পৃথিবীর মানুষেরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দেখতে আসে এইসব প্যাশেন্টদের। নানারকম প্রশ্নও করে...পৃথিবীতে তারা কী খেত কেন খেত এইসব। আমাদের হেডেক হিরো অবশ্য কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না। মাথা চেপে ধরে বসে থাকে। ব্যথাটা যেন দিন দিনই আরো বাড়ছে।

**আঁতেঘালেকচুয়াল**

দেশে বিদ্যুতের অবস্থা কেরোসিন। কিন্তু 'দেশপ্রেমিক' নেতাদের জামিন হচ্ছে বিদ্যুৎ গতিতে! এইসব দেখেটেখে মনে হচ্ছে আমাদের পুরো দেশটাই একটা নাট্যশালা! আর এই নাট্যমঞ্চে একের পর এক মঞ্চস্থ হচ্ছে প্যাকেজ নাটক। সর্বশেষ নাটকটির নাম 'পর্বতের মূষিক প্রসব'।

পর্বত কি কখনো আদৌ মূষিক প্রসব করে? সত্যিকার পর্বত আসলে কখনই মূষিক কেন কোনো কিছুই প্রসব করে না, মাঝে মধ্যে ৯ মাত্রার রিখটার স্কেলের ভূকম্পে ছোটখাটো টিলা প্রসব করলেও করতে পারে...। তারপরও গল্পের খাতিরে (বা বাংলা ব্যাকরণের খাতিরে) ধরে নিলাম একদা এক পর্বত মূষিক প্রসব করিল...।

দূরের এক গাছে বসে এক জ্ঞানী প্যাঁচা তা দেখল, সে তার সঙ্গীকে বলল

—দেখলে তো কাণ্ডটা?

—দেখলাম। কিন্তু পর্বত কি আসলেই মূষিক প্রসব করে?

—ওটা মূষিক নয় শূকর।

—কিন্তু মূষিকের মতো ক্ষুদ্র।

—ওটা শূকর লজ্জায় কুঁকড়েমুকড়ে ছোট হয়ে গেছে বলে তাকে দূর থেকে মূষিক বোধ হচ্ছে।

—কেন লজ্জা পেল? কীসের লজ্জা তার?

—পর্বতের ঔরসে মূষিক হবার লজ্জা। সে তো তার প্রজাতির প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয় নি। জন্মই তার আজন্ম পাপ...

প্যাঁচাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চলতে থাকুক ওদিকে আমরা দেখি পর্বত আর মূষিকের কী অবস্থা...

—ওহে মূষিক তোকে আমি প্রসব করলেও মনে রাখিস তুই কিন্তু আমার সন্তান নোস।

—কী বলছ মা? তুমি প্রসব করলে তুমিই তো আমার মা।

—ছাগলের মতো ম্যাঁ ম্যাঁ করবি না...এইটা রাজনৈতিক কারণে মাঝে মধ্যে আমাদের করতে হয়...তাই বলে প্রসব করলেই সন্তান?

—তা হলে?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—কবি-সাহিত্যিকরা গল্প-কবিতা প্রসব করে সেগুলো তাদের সন্তান?

—সন্তান না হলেও সন্তানতুল্য তো বটে।

—সন্তান আর সন্তানতুল্য এক কথা নয়...সে যাই হোক তুমি এখন দূর হও...

মনের দুঃখে মূষিক চলল একা একা। তবে খুব শীঘ্র পথে আরো দুয়েকজন ইঁদুরকে পেল। দেখা গেল তারাও পর্বত প্রসবিত সন্তান! যুগে যুগে বহু পর্বত বহু ঘটনায় বহুবার মূষিক প্রসব করেছে। কাজেই আশপাশে মূষিকের অভাব নেই।

তো পর্বতের আশপাশে ভাসমান মূষিকুল ঠিক করল তারা একজোট হবে।

—চল আমরা একটা সংগঠন করি।

—ঠিক, কারণ আমরা অবহেলিত।

—আমরা শোষিত।

—আমরা সময়ের ব্যর্থ বাই প্রোডাক্ট।

—আমরা অধিকার চাই।

—আমরা গণতন্ত্র চাই!

এই রকম নানা মত নানা চিন্তায় তারা একটা ঐকমত্যে পৌছল। এ খবর চলে গেল পর্বতদের কাছে। শুনে তারা এই প্রথমবারের মতো ভূমিকম্প ছাড়াই কম্পিত হল।

—আমাদের কী হবে? ওরা একজোট হয়েছে।

—ওরা তো মনে হয় ফিরে আসছে!

—ওরা কারা?

—কেন আমাদের অবহেলিত সন্তানরা... মূষিকরা...

—ওরা সংখ্যায় হাজার হাজার।

—ওরা ক্ষুদ্র কিন্তু সচল...এবং অস্থির।

—আমরা বিশাল...কিন্তু স্থির।

এবার শুরু হল স্থির আর অস্থিরের লড়াই। এ সেই পুরোনো লড়াই...আছে আর নাইয়ের লড়াই...হ্যাঁ আর না'র লড়াই... পৃথিবীতে এ লড়াই চলছে চলবে।

তবে পর্বতরা ইতোমধ্যে গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা আর মূষিক প্রসব করবে না। আর মূষিকরাও গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা পাহাড় পর্বত আর মাটির কাছাকাছি থাকবে না চলে যাবে মানুষের টেবিলে টেবিলে...পিসির মাউস হয়ে। কারণ ঐ কম্পিউটার একদিন মানুষকে ধ্বংস করবে যে মানুষ সমস্ত প্রসবের কারণ!

## পূজার গল্প

পূজার ধুমধাম আমার এখনো ভালো লাগে। ছোটবেলায় আরো ভালো লাগত। মনে আছে তখন আমরা কুমিল্লায় ঠাকুরপাড়ায় থাকতাম। আমি খুবই ছোট্ট, তিন বন্ধু মিলে গেলাম পূজায়। কাছেই তখন পূজা হত। বিশাল প্যান্ডেলে দেবীকে নিয়ে আনন্দ-উৎসব চলছে। আমাদের নজর 'প্রসাদের' (খাদ্যবস্তু) দিকে। পাশাপাশি তিনটা প্যান্ডেল। তিন জায়গা থেকেই প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে। একটার প্রসাদ আমার অসাধারণ লাগল। আমি একা একাই চার-পাঁচবার নিয়ে খেয়ে ফেললাম। কিন্তু পঞ্চমবারে লোকটা আমাকে চিনে ফেলল।

—এই ছেলে তুমি ক'বার নিলে? আমি ঘাবড়ে গেলাম।

—এ-একবার।

—মিথ্যে বলবে না। দেবী কিন্তু সব বুঝতে পারেন দেখতে পারেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি দেখলাম দেবীর মুখটা আপাতত একটা বিশাল পিলারের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তিনি এই অবস্থায় কী করে দেখবেন আমার ছোট্ট মাথায় খেলল না। তবে ভগবান দেবী এদের পক্ষে সবই সম্ভব। তাই ভয়ে ভয়ে শেষবারের প্রসাদটা খেয়ে ফেললাম। (সম্ভবত সেটা একটা সুস্বাদু নারকেলের সন্দেশ ছিল) কিন্তু মনে হল সন্দেশটা গলায় আটকে গেল। মিথ্যা বলায় কি দেবী আমাকে শাস্তি দিলেন? ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরে বড় বোনকে ঘটনা খুলে বললাম। আমার যাবতীয় সমস্যা তার কাছেই বলতাম। বড় বোন অবশ্য অভয় দিল বলল—

আল্লাহ ভগবান বা দেবী এদের কাছে ছোটদের পাপ কোনো পাপই না। অতএব ভয়ের কিছু নেই। আমার ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। গলায় আটকে যাওয়া সন্দেশটাও মনে হল টুপ করে পাকস্থলীতে গিয়ে পড়ল।

এ তো গেল ছোটবেলার পূজার গল্প। বড়বেলায় আমার মেয়েকে নিয়ে (মেয়েও তখন আমার সেই ছোটবেলাকার মতো ছোট্ট) গেলাম পুরান ঢাকায় পূজা দেখতে। গিয়ে তো আমি মুগ্ধ। নীল কাপড় দিয়ে সমুদ্র তৈরি করা হয়েছে, নিচ থেকে ফ্যানের বাতাস দিয়ে আসল সমুদ্রের মতো ঢেউ তোলা হয়েছে। আর উপরে একটা দ্বীপের মতো মঞ্চ। তার উপর মা দুর্গা। আমার মেয়ে প্রথমবার পূজা দেখতে এসেছে। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে।

—পরী! পরী!!

—পরী না দেবী।

—না না উনি পরী।

—ঠিক আছে পরী।

আমার মেয়ের কাছে তখন সৌন্দর্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরী। পরে তাকে বোঝালাম দেবীরা সব সময় পরীর মতোই সুন্দর। তাদের দূর থেকে পরীর মতোই লাগে। তবে আসলে তারা দেবী।

ভাবলাম মেয়েকে প্রসাদ খাওয়াই। ছোটবেলায় আমরা যেমনটা খেতাম।

—চল প্রসাদ খাবে।

—কেন আমি কি রাক্ষস যে প্রসাদ খাব।

—মানে? রাক্ষস হবে কেন?

—প্রসাদ কি মানুষ খেতে পারে? পরে বুঝলাম সামান্য আকারের (!) গোলমাল! সে ভেবেছে আমরা রূপকথার রাজা-রানীর সেই আস্ত প্রসাদ খেতে চলেছি। আমি তখন তাকে বোঝালাম এই প্রসাদ সেই প্রসাদ নয়, এ হচ্ছে খাদ্যবস্তু...দেবীর প্রসাদ। কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় প্রসাদদাতার ধারে-কাছে যেতে পারলাম না। তবে পূজামণ্ডপের বাইরে নানান ধরনের খাদ্যবস্তু বিক্রি হচ্ছিল সেগুলো কিনে বাসার পথে রওনা দিলাম। মেয়ে জানতে চাইল দেবীর কাছে কিছু চাইলে পাওয়া যায় কি না?

—অবশ্যই যায়।

—তা হলে চল আবার যাই...

—কী চাইবে তুমি?

—স্টিকার।

—ধুর বোকা স্টিকার তো দোকানেই পাওয়া যায়। দেবীর কাছে চাইতে হয় নাকি? দেবীর কাছে চাইতে হয় অন্য কিছু ভালো কিছু... সেই যাত্রা অবশ্য দেবীর কাছে কিছু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চাইবার সুযোগ আমার মেয়ের হল না। কারণ তখন স্কুটারে উঠে পড়েছি আমরা। ঢ্যার ঢ্যার করে স্টার্ট নিয়ে ফেলেছে স্কুটার।

তবে সবশেষে দেবীর কাছে বর চাওয়া নিয়ে একটা কৌতুক শোনা যেতে পারে। তিন বন্ধু একবার গভীর রাতে দেবীর কাছে হত্যা দিয়ে পড়ল...

—মা আমাদের রক্ষা কর।

—কী চাস তোরা?

—আমাকে বুদ্ধি দাও। আমার যা বুদ্ধি আছে তার দ্বিগুণ করে দাও। বুদ্ধির দোষে কিছু করতে পারছি না।

—বেশ যা...তোর বুদ্ধি দ্বিগুণ করে দিলাম। হাসিমুখে দ্বিগুণ বুদ্ধি নিয়ে ফিরে গেল প্রথম বন্ধু। এবার এগিয়ে গেল দ্বিতীয় বন্ধু।

—তোর কী চাই?

—আমার ওদের মতো শুধু বুদ্ধি হলে চলবে না...সব চাই।

—মানে?

—মানে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সবকিছু চারগুণ করে দাও...। দেবী মনে হল একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। তারপর বললেন

—ঠিক আছে...তোর আশাও পূর্ণ করলাম। যা...

কিছুক্ষণ বাদে তৃতীয় বন্ধু দেখল সে মধ্যবয়স্ক এক মহিলায় রূপান্তরিত হয়েছে!!!

## দেশ চালানো

এক বড়সড় অফিসে ড্রাইভার নেওয়া হবে। ভালো বেতন। তারই ইন্টারভ্যু চলছে...

—তুমি গাড়ি চালানোর সময় মবিলের লেভেল চেক কর?

—না।

—রেডিয়েটারের পানি চেক কর?

—না।

—গাড়ির চাকা চেক কর?

—না।

—হিটারের কাঁটা লক্ষ্য কর?

—না।

—এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার কর?

—না।

—রেডিয়েটার পরিষ্কার কর?

—না।

—গাড়ি দাঁড়ানো অবস্থায় ফার্স্ট গিয়ারে রাখ?

—জানি না।

—তুমি তো মিয়া কোনো ড্রাইভারই না।

—জি না, সত্যি কথাই আমি ড্রাইভার না। গাড়ি চালাইতে জানি না।

—মানে ফাজলামো করতে এইখানে আসছ?

—জি না ভাবলাম...

—কী ভাবলা?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ভাবলাম এত বছর হইল দেশটা কত জনে চালাইছে... চালাইতে কি পারছে? চালাইতে পারলে দেশের আজ এই অবস্থা হয়?...তাই ভাবলাম আমিও বোধহয় গাড়ি চালাইতে পারুম।

এটা অবশ্য নেহাতই একটা জোক। তবে দেশ চালানো নিয়ে সব দেশেই এই ধরনের জোক থাকে। এ ধরনের জোক বেশি বেশি থাকে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এমনি আরেকটি জোক...দুই দেশের দুজন কথা বলছে। তারা পাশাপাশি রাষ্ট্রের দেশ।

—আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট লোকটা সুবিধার না। ভালো দেশ চালাচ্ছে না। তবে লোকটার একটা গুণ আছে।

—কী গুণ?

—আমরা প্রকাশ্যে গালাগালি করলেও তিনি কিছু মনে করেন না। যেন ধরে নেন এটাই তার প্রাপ্য। তোমাদের দেশের প্রেসিডেন্টের কী অবস্থা?

—আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট লোকটা সুবিধার না। মোটেই ভালো দেশ চালাচ্ছে না। তার ছেলেমেয়ে দেশটাকে লুটপাট করে শেষ করে দিচ্ছে...ওর ছেলেমেয়ের কারণেই দেশের অর্থনীতি একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌছেছে। তারপরও আমি বলব লোকটার একটা ভালো গুণ আছে।

—কী গুণ?

—লোকটা তার ছেলেমেয়েকে খুব ভালোবাসে...কোনো ব্যাপারে কখনো না বলে না।

এবার আসা যাক প্রেসিডেন্ট প্রসঙ্গে। দুই দেশের দুই প্রেসিডেন্ট গেছে অবকাশ যাপনে। সেখানেই কথা বলছে তারা।

—আচ্ছা আপনার দেশের জনগণ আপনাকে পছন্দ করছে কি না এটা আপনি কীভাবে বোঝেন?

—সোজা।

—কী রকম?

—আমি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার পর সিটি করপোরেশনে ফোন দেই।

—কেন?

—সারা দেশে গারবেজে কতগুলো ভাঙা টিভি সেট পড়ল জানার জন্য।

—বাহ ভালো বুদ্ধি।

—তা আপনি কীভাবে বোঝার চেষ্টা করেন?

—আমিও প্রায় আপনার মতোই।

—কী রকম?

—আমি অবশ্য জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিব এই ঘোষণা প্রচারিত হবার পরপরই টিভির সেলস সেন্টারগুলোতে ফোন দেই... কে কয়টা সেট ফেরত দিল বুঝতে...।

**অলিম্পিকে দৌড়!**

এক স্কুলের ড্রিল স্যারকে দেখা গেল স্কুল ছুটির পর মাঠে একা একাই পোল ভোল্ট প্র্যাকটিস করছেন। ছাত্ররা অবাক!

—স্যার আপনি একা একা পোলভোল্ট প্র্যাকটিস করছেন?

—হ্যাঁ করছি।

—কেন স্যার?



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—অলিম্পিকে যাব তাই।

—স্যার আপনি অলিম্পিকে যাবেন বাংলাদেশ থেকে?

—হ্যাঁ। ছাত্ররা হতবাক! 'কিন্তু স্যার পত্র-পত্রিকায় তো সেরকম কিছু দেখলাম না।'

—কী করে দেখবে। বিষয়টা নির্ভর করছে আমার উপর। পোল ভোল্ট করে কতটা উপরে উঠে টপকাতে পারি তার উপর...

—স্যার কিছুই বুঝলাম না।

—আরে আমি আসলে ঠিক অলিম্পিকে কোনো ইভেন্টে কম্পিটিশন করতে যাচ্ছি না।

—তা হলে?

—আমার অনেক দিনের শখ বিশ্ব অলিম্পিক দেখব। বহু কষ্টে বেইজিং যাওয়ার ভাড়া জোগাড় করেছি। কিন্তু...

—কিন্তু কী স্যার?

—কিন্তু বিশ্ব অলিম্পিকের স্টেডিয়ামে ঢোকার টিকিট কেনার পয়সা নেই। তাই ভাবছি পোল ভোল্ট করে টপকে ঢুকব স্টেডিয়ামে। সেই প্র্যাকটিসই করছি! বুঝলে? এখন তোমরা যাও...যাও... আমার প্র্যাকটিসে ডিসটার্ব হচ্ছে! স্যার আবার লম্বা লগি বাঁশ দিয়ে জাম্প দেওয়া শুরু করলেন।

'তবে সত্যি সত্যিই কি কোনো দিন বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিকে যোগ দিতে যাবে না?'

দুই বন্ধু আলাপ করছিল!

'অবশ্যই যাবে সেই দিন আর খুব বেশি দূরে নেই হে...।' এক বন্ধু বলে।

'কিন্তু যাবে কোন ইভেন্টে?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস দৌড়ে'।

'হঠাৎ করে দৌড়ে কেন?'

'আমার ধারণা দেশের সব মিনি বাস ড্রাইভারদের আমরা অচিরেই দৌড় ইভেন্টে বিশ্ব অলিম্পিকে পাঠাতে পারি অনায়াসে!'

'এরকম ধারণার কারণ কী? তারাই বা কেন ভালো করবে?'

'কেন খবরের কাগজ পড় না?'

'পড়ি তো'।

'তা হলে তোমার বোঝা উচিত...মিনি বাসওয়ালারা অ্যাকসিডেন্ট করে মানুষ মেরে মুহূর্তে চক্ষের পলকে উধাও! আজ পর্যন্ত শুনেছ কোনো ঘাতক বাস ড্রাইভার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে?'

'না তা অবশ্য শুনি নি'।

'তা হলে বুঝতে পার তাদের দৌড়ের দক্ষতা কতটুকু?'

'আইডিয়া খারাপ না। তা হলে তাদের কোচ হিসেবে যাবে কে?'

'আর কে সেটাও ভেবে রেখেছি'।

'কে?'

'কেন এক্স এমপি দৌড় সালাহউদ্দীন!'

## দেশ কোন দিকে যাচ্ছে?

—আমাদের দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে?

—উত্তর দিকে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—মানে? উত্তর দিকে কেন? উত্তর দিকে কী আছে?

—সৌরজগতের অ্যাঙ্গেলে দেখলে আছে চৌদ্দটা পালসারের কোনো একটা (বিষয়টা অবশ্য জটিল কারণ সৌরজগতের বাইরে উত্তর-দক্ষিণ বলে কিছু নেই), পৃথিবীর অ্যাঙ্গেলে দেখলে আছে হিম শীতল অ্যান্টার্কটিকা আর বাংলাদেশের অ্যাঙ্গেলে দেখলে উত্তরবঙ্গ...।

—আর ঢাকা অ্যাঙ্গেলে?

—(মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন)।

এ সবই ভাবের কথা! কিন্তু সত্যি সত্যি দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে? এই প্রশ্ন একজন বিচক্ষণ সুশীল বুদ্ধিপরজীবীকে করেছিলাম। তিনি অনেক ভেবে বললেন 'মালয়েশিয়া'।

—মানে?

—মানে দেশ মালয়েশিয়ার দিকে যাচ্ছে...

—পরিষ্কার করে বলুন।

—কেন দেখছেন না দেশের ওয়ান্টেড ব্যবসায়ী, ভূতপূর্ব দেশপ্রেমিক নেতারা, সুধীজনরা সবাই এখন ওখানে 'সুইট সেকেন্ড হোম'-এর সুযোগে কোটি কোটি ডলার দিয়ে কিনছে মালয়েশিয়া সরকারের কাছ থেকে। দুই নম্বরি পয়সায় এক নম্বরি হোটেল-রেস্তোরাঁ খুলে দিব্যি আছে...!

আরেক জন অবশ্য দ্বিমত পোষণ করলেন। 'না মালয়েশিয়া যাচ্ছে না...'

—তা হলে কোথায় যাচ্ছে?

—সিঙ্গাপুরের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে।

—ওখানে কেন?

—চিকিৎসার নামে ওখানে দেশ উদ্ধারের শলাপরামর্শের অন্তর্জাল রচনায় ব্যস্ত তারা...

আরেক জন বলল, 'আরে না... দেশ ওসব জায়গায় যাচ্ছে না।'

—তা হলে কোথায় যাচ্ছে?

—দেশ যাচ্ছে বিশ্ব অলিম্পিকে!

—কী রকম?

—কারণ দেশে এখন নানান খেলা চলছে... ভেতরে বাইরে... বাইরে ভেতরে... উপরে নিচে... গেম ইনসাইড গেম... তাই মনে হচ্ছে বিশ্ব অলিম্পিকের দিকেই যাচ্ছে দেশটা!

—কিন্তু আমার যেটা মনে হয়... ইরানের সেই বিখ্যাত দার্শনিকের মুড নিল আরেক জন।

—কী মনে হয়?

—মনে হয় দেশ কোথাও যাচ্ছে না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়।

—কেন দাঁড়িয়ে আছে?

—আসলে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছে।

—কিসের অপেক্ষা?

—দেশ অপেক্ষা করছে রিখটার স্কেল ৮.৯ মাত্রার বা ঐরকম একটা ভূমিকম্পের... ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে সোনার বাংলা... তারপর...

—তারপর?

—তারপর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো নতুন করে... এ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই গোলাম হোসেন।

ভূমিকম্প হোক আর না হোক (না হলেই ভালো) ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো নতুন করেই শুরু হোক সবকিছু।

ফিনিক্স পাখি উড়তে থাকুক এই ফাঁকে অন্য একটি গল্প শোনা যাক।

দেশের যারা শাসক। তারা আসলে আপেলের পোকার মতো আপেলের স্বাদ টের পায় না। তারা মনে হয় ঐ টিপিক্যাল প্রশ্নটা সহ্য করতে পারে না। 'দেশ কোন দিকে যাচ্ছে?' তারা বিরক্ত হয় এই প্রশ্নে... সে যে দেশের শাসকই হোন না কেন। তো ধরা যাক এক দেশের এক বিচক্ষণ শাসক (সব শাসকই নিজেদের বিচক্ষণ ভাবতে হয়তো পছন্দ করে) খুবই বিরক্ত দেশের সাংবাদিকদের ওপর। তিনি তার নিজস্ব যে সরকারি রুমটিতে বসে যতগুলো প্রেস কনফারেন্স করেছেন কোনোটাই সুবিধার হয় নি। পরদিনই পত্রপত্রিকায় আজেবাজে কথা লিখেছে তাকে নিয়ে, তার দেশ পরিচালনা নিয়ে। তিনি ভাবলেন ঐ রুমটিই বোধহয় কুফা। তিনি ঠিক করলেন এরপর তিনি প্রটোকল ভেঙে এমন এক জায়গায় প্রেস কনফারেন্স করবেন যেন... সাংবাদিকরা টাসকি খেয়ে যায়। তার আশপাশের সরকারি সুশীল কর্মকর্তারা বাহবা দিয়ে উঠল।

—দারুণ আইডিয়া স্যার।

—স্যার এটা আপনি অমুক ব্রিজের নিচে করতে পারেন।

—ব্রিজের নিচে কেন?

—স্যার তা হলে মাথার উপর একটা শেল্টার হবে। আপনি নিরাপদ। মৌলবাদীদের বিশ্বাস কি যদি উপর থেকে বোমা কি টোমা...

—আর নিচে স্বচ্ছ পানির উপর মঞ্চ করব।

—না কোনো মঞ্চের দরকার নেই। প্রেসিডেন্ট বলেন।

—ঠিক ঠিক মঞ্চের দরকার নেই। স্বচ্ছ পানিতে দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রেসিডেন্ট একটা স্বচ্ছ কনফারেন্স করবেন খোলামেলা জায়গায় খোলামেলা আলোচনা হবে।

—ঐ নদীতে আপনার সুশাসনের কারণে পানিও বেশি নেই হাঁটু পানি...

—ঠিক ঠিক,... হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে... ঐতিহাসিক একটা প্রেস কনফারেন্স হবে।

শেষমেশ তাই হল। সত্যি সত্যি প্রেসিডেন্ট প্রটোকল ভেঙে খোলামেলা ব্রিজের নিচে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে প্রেস কনফারেন্স করলেন, শুধু দাঁড়িয়েই থাকলেন তাও নয় তিনি হাঁটু পানির নদীতে পায়চারি করতে করতে কখনো কখনো এপার থেকে ওপারে চলে গেলেন। যে যা প্রশ্ন করল তার উত্তর দিলেন। আশ্চর্যজনক হচ্ছে কেউ 'দেশ কোন দিকে যাচ্ছে' এই প্রশ্নটির ধার দিয়েও গেল না।

পরদিন মি. প্রেসিডেন্ট সব পত্রিকা খুলে বসলেন। দেখা যাক এবার তারা কী লিখেছে। আশ্চর্য সব পত্রিকায় বড় বড় করে একই হেডিং... **'দেশ কোন দিকে যাচ্ছে? : দেশের প্রেসিডেন্ট টোল না দিয়ে একাধিক বার ব্রিজের তল দিয়ে নদী পারাপার করেছেন!!'**

## ভবিষ্যৎ বলার গল্প

টোকন ঠাকুরের এক টিভি সিরিয়ালে আমাকে একটি বিশেষ দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে (!)। শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তাকে জানালাম আমি অভিনয় করব মানে? আমি কি অভিনয় পারি নাকি? কী বল এসব?

—কেন আপনি তো অভিনয় করেছেন... আজিজ সুপারমার্কেট সিরিয়ালে। আমি ফেঁসে গেলাম তাই তো একটা সিরিয়ালে তো সত্যি সত্যি অভিনয় করেছি। তার অবশ্য



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটা কারণও আছে। সেদিন কী কারণে যেন উন্মাদের দলবল নিয়ে গিয়েছিলাম আর্ট কলেজের সামনে চা খেতে। গিয়ে দেখি কী একটা শুটিং হচ্ছে। তো আমরা একপাশে বসে চা খাচ্ছি তখন ঐ বসা অবস্থাতেই জায়গা না ছেড়ে শুটিং সমাপ্তকরণ শর্তে একটা সিকোয়েন্সে অভিনয় করেছি। অভিনয় মানে উপস্থিত তারকাদের কিছু তাৎক্ষণিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি—সেই আমাব টিভিতে প্রথম অভিনয়। যাই হোক আমি টোকন ঠাকুরকে...হুঁ হাঁ করে অস্পষ্ট জবাব দিয়ে কোনোমতে রক্ষা পেলাম। তবে আমায় ধান্দা হচ্ছে শুটিং তারিখে ভেগে যাব অন্য কোথাও। আমাকে আর টোকন ঠাকুর খুঁজে পাবে না।

কিন্তু আমি ভাবি এক বিধাতা হিসাব করেন অন্য। এক সকালে দেখি আমার বাসার সামনে একটা মাইক্রোবাস। মাইক্রোবাসের ভেতর বসে আছেন বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ, নিউমোরোলজিস্ট কাওসার আহমেদ চৌধুরী। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন 'শাহীন উঠে আস।'

বুঝলাম কাওসার ভাইও কট।

মাইক্রোবাস ভেড়িবাঁধ দিয়ে গিয়ে অনেক ভেতরে আমাদের নিয়ে কোথায় যেন ছুটল। বহু ভেতরে বিশাল এক হসপিটালের কম্পাউন্ডে নামানো হল। এটাই হচ্ছে টোকন ঠাকুরের 'সেন্ট্রাল মেন্টাল হসপিটাল' টিভি সিরিয়ালের শুটিং স্পট। আমাদের বসানো হল হাসপাতালের বিশাল এক ক্যান্টিনে। সময় হলেই আমাদের ডাকা হবে। কাওসার ভাই সাথে থাকায় সাহস পেলাম। কাওসার ভাই অবশ্য আমার খুব প্রিয় মানুষ। তিনি একসময় উন্মাদের ৩২ নম্বর অফিসে মাঝে মাঝে আসতেন। আমার উন্মাদে কার্টুন এঁকেছেন, প্যারোডি লিখেছেন অনেক (অনেকেই হয়তো জানেন না তিনি একজন দারুণ আর্টিস্টও বটে এবং দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন)। আমাদের সময় আর কাটে না। আমি প্রস্তাব করলাম 'আপনার হাত দেখি?'

—দেখ। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হাত দেখে কী বলেছিলাম এখন আর মনে নেই তবে তিনি আমার চাপাবাজি শুনে মৃদু মৃদু হাসছিলেন (এখানে ব্র্যাকেটে বলে রাখি আমার বাবা একজন নামকরা পামিস্ট ছিলেন, অ্যাস্ট্রোলজিও জানতেন। সেই সূত্রে আমরাও পারিবারিকভাবে সবাই অল্পবিস্তর পামিস্ট)। তো আমি কাওসার ভাইকে বললাম, 'কাওসার ভাই আপনি তো মাঝে মাঝে কিছু কিছু লোককে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে বেশ চমকে দেন বলে শুনেছি... আজ একটা বাণী দেন।'

—কী শুনেন?

—একবার এক লোক তার প্রিয় ডালমেশিয়ান কুকুর হারিয়ে আপনার কাছে গিয়েছিল। আপনি নাকি তাকে দেখামাত্র বলেছিলেন 'কুকুর পেয়েছ?' সেই লোক আপনার ক্ষমতায় হতভম্ব! এটা কীভাবে বললেন?

তিনি মৃদু হাসলেন কিছু বললেন না। বলা সম্ভবও ছিল না কারণ আমাদের অভিনয়ের ডাক এসেছে। তবে সুবিধা হচ্ছে কাওসার ভাইকে যে কাজটা করতে হবে তা হচ্ছে কিছু মেন্টাল প্যাশেন্টের হাত দেখতে হবে... বা ভবিষ্যদ্বাণী দিতে হবে আর আমাকে প্যাশেন্টদের উদ্দেশে একটা বক্তব্য রাখতে হবে। যাহোক দুজনেই সাফল্যের সাথে অভিনয় সমাপ্ত করলাম। পরিচালক টোকন ঠাকুর আমাদের অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে আমাদের দ্রুত একটা মাইক্রোতে তুলে দিল। এই মাইক্রো আমাদের দুজনকে যার যার বাসায় পৌঁছে দেবে। পরিচালকের সহকারী ছুটে এসে আমাদের হাতে দুটো খামও ধরিয়ে দিল। অভিনয় করে সেই প্রথম ইনকাম। আমি যখন ভাবতে শুরু করেছি কার্টুন আঁকা ছেড়ে তবে অভিনয়ে নেমে যাব কি না তখন কাওসার ভাই মুখ খুললেন।


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তুমি আমাকে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলেছিলেন না?

—জি।

—এখন আমি একটা ভবিষ্যদ্বাণী করব।

—কী?

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। তিনি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'দেখ এই মাইক্রোর ড্রাইভার শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বাসায় নামিয়ে দেবে না।'

আর কী আশ্চর্য! সত্যি সত্যি গাড়ি মেইন রোডে উঠে কিছুক্ষণ বিদঘুটে শব্দ করে রাস্তার এক পাশে থেমে গেল। প্রিয় পাঠক আমি 'অটোলাইন' নামে একটি গাড়ির পত্রিকার সম্পাদকও বটে। কাজেই গাড়ি সম্পর্কে কিছু হলেও আমি জানি। আমি বুঝতে পারলাম কোনো কারণে ড্রাইভার আমাদের ঢাকায় নিয়ে যেতে ইচ্ছুক নয়। সে এমন ভাব করল যে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে... এ গাড়ি যাবে না! কাওসার ভাই আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু ভঙ্গি করলেন যার অর্থ 'কী দেখলে তো?'

আসলে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারাটা মানে আগাম কিছু বলতে পারাটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার (যদি মিলে যায়)। যারা পামিস্ট্রি, অ্যাস্ট্রোলজি এসব জানেন তারা কাজটা সফলভাবে করতে পারেন। অবশ্য আমি একবার করেছিলাম। গল্পটা ইন্টারেস্টিং... বলি...

আগেই বলেছি আমি শখের পামিস্ট। নিউমোরলজি খুবই অল্প জানি। একবার এক লোক আমার কাছে এল। আমি তার হাতে দেখেটেখে বললাম।

—আপনার হাতে বিপজ্জনক ড্রাগ লাইন আছে... আর আপনার জন্ম এপ্রিল মাসে।

—এর মানে কী?

—এর মানে আপনাকে সব ধরনের ড্রাগ খাওয়া কমাতে হবে।

ওষুধপত্র যত কম খাবেন ততই মঙ্গল।

—স্মোকিং করতে পারব?

—না স্মোকিং দিয়েই মাদকের শুরু। এটা বাদ দিন... নইলে আপনি খুব দ্রুত এডিক্ট হয়ে যাবেন। আর যেহেতু এপ্রিলে জন্মেছেন... এই মাদকের কারণে আপনার অপঘাতে মৃত্যু হতে পারে... যা আপনার পরিবারকেও প্রভাবিত করবে।

শুনে-টুনে লোক ঘাবড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তার পকেটে থাকা এক প্যাকেট বেনসন আমাকে দান করে দিল। লোকটি বিদায় নেওয়ার পর সবেমাত্র আমি বোধহয় তার প্যাকেট থেকে তৃতীয় বেনসনটি ধরিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকের ফোন—

—ভাইজান সর্বনাশ হয়েছে! আমাকে বাঁচান!

—কী হয়েছে?

—আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলতে শুরু করেছে।

—মানে?

—আপনি বললেন না, মাদক আমার পরিবারকে পর্যন্ত প্রভাবিত করবে, তাই হয়েছে... বলে হাউ-মাউ-খাউ কান্না। আমি তো অবাক। 'কী হয়েছে? খুলে বলুন।'

তিনি খুলে যা বললেন তা হচ্ছে মোটামুটি এইরকম—তিনি বাসায় ফিরে দেখেন তার স্ত্রী বাসায় নেই, দুই মেয়েকে নিয়ে নাকি স্মোকিং করতে গিয়েছেন। এই তথ্য দিয়েছে বাসার দারোয়ান। আমিও অবাক, বিষয়টা কী? কেউ ঘোষণা দিয়ে স্মোকিং করতে যায় নাকি?!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—তাই আমার কী হবে, আমার দুই বাচ্চা মেয়ে... তারা স্মোকিং শুরু করে দিয়েছে মায়ের সঙ্গে... মা-ও তো স্মোক করত না। ইইই... ইইই (কান্না)।

কী জ্বালা!! আমি বললাম, 'দেখুন' কিছু একটা ভুল হয়েছে। অপেক্ষা করুন...।

কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য রহস্য উদ্ধার হল। তার স্ত্রী আর দুই কন্যা একগাদা সেলাই করা কাপড়চোপড় নিয়ে ফিরল। বিষয় হচ্ছে কাপড় ভাঁজ করে সেলাই করে একধরনের ডিজাইন করাকে 'স্মোকিং করা' বলে... জটিল এক সূচিকর্ম... (যাকে সেলাইয়ের ভাষায় 'স্মোকিং করা' বলে) সেটাই তারা শিখতে গিয়েছিল কোথাও। সে যাত্রায় কোনোমতে রক্ষা পেলাম আমি।

আরেকবার এক তরুণ এল আমার কাছে। তার আসল ডেট অব বার্থ সে জানে না। সার্টিফিকেটের ডেট অব বার্থ একটা আছে তবে সেটা ভুয়া। তার জন্মের সময় কিছু একটা জটিলতা হয়েছিল বলে তার সঠিক জন্ম তারিখটা কেউ লিখে রাখে নি। এখন তার একটা সঠিক জন্ম তারিখ দরকার...

—সার্টিফিকেটে যেটা আছে সেটাতে সমস্যা কী?

—ঐ তারিখটা আমার পছন্দ না।

—ভালো অ্যাসট্রোলোজাররা অবশ্য সঠিক তারিখ বের করতে পারে, আমি তো পারি না। আমি বলি।

—তবু আপনি আমাকে একটি তারিখ বলুন যেদিন আমি ধুমধাম করে জন্মদিন করব। হোক না ফলস ডেট, কিন্তু সুন্দর তারিখ বলুন একটা...

—সেক্ষেত্রে ২৯ ফেব্রুয়ারি কর।

—কেন?

—চার বছরে একবার আসবে। তোমার খরচ বাঁচবে।

—বুদ্ধি খারাপ না। সে খুশি হয়।

এবং খুব শিগগিরই ২৯ ফেব্রুয়ারি চলে আসে। আমিও দাওয়াত পেয়ে যাই। ভাবলাম যাওয়া যাক। দেখি পাগল কী আয়োজন করেছে।

গিয়ে দেখি বিশাল কেক। তখনো খোলা হয় নি। যথাসময়ে কেক খোলা হল... মানে কেকের ঢাকনি খোলা হল। কিন্তু একি! জন্মদিনের মানুষটির মুখ মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। কী হল? কী আর হবে, কেকের উপর বড় বড় করে লেখা ৩২শে ফেব্রুয়ারি!!

## ঠেলার নাম বাবাজি!

জামাতের নেতা মুজাহিদ এখন আসামি। কোনো একটি রাষ্ট্রীয় কেসে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। পুলিশ বলেছে তিনি পলাতক বলে ধরা যাচ্ছে না। কিন্তু তাকে দেখা গেছে সরকারের একজন উপদেষ্টার সঙ্গে প্রেস কনফারেন্স করছেন, সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছে উপদেষ্টাকে 'পুলিশ বলছে তিনি পলাতক কিন্তু তিনি আপনার পাশে বসে প্রেস কনফারেন্স করছেন, এখন কোনটা সঠিক বলে ধরে নেব আমরা?' উত্তরে উপদেষ্টা কিছু না বলে মাইক্রোফোনটা ঠেলে দিলেন মুজাহিদের দিকে, মুজাহিদও মাইক্রোফোন ঠেলে দিলেন তার ল'ইয়ারের দিকে... ল'ইয়ার কী বলেছেন সেটা আমার লেখার বিষয় নয়, আমার বিষয় হচ্ছে 'ঠেলা'... দেশটা আসলে ঠেলতে ঠেলতেই এই পর্যন্ত এসেছে, আরো যে কত ঠেলতে হবে কে জানে! বরং ঠেলা নিয়ে একটা চর্বিত চর্বণ জোক বলি আগে... এক লোককে দেখা গেল একটা গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর মুখে বলছে, 'ছয়... ছয়... ছয়...' আরেক লোক কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল—

—তখন থেকে দেখছি ছয়... ছয়... ছয়... বলছেন, কারণটা কী?

লোকটি প্রশ্নকর্তাকে গর্তে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল... 'সাত... সাত... সাত...'

জোকটা সবারই জানা এই জোকটা আবার রিপ্লে করা যাক একটু আপগ্রেড ভার্সনে...

এক লোককে দেখা গেল একটা গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর মুখে বলছে, 'ছয়... ছয়... ছয়...' আরেক লোক যার কোলে একটা বাচ্চা আছে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল... প্রশ্ন করল।

—তখন থেকে দেখছি ছয়... ছয়... ছয়... বলছেন, কারণটা কী?

লোকটি প্রশ্নকর্তাকে বাচ্চাসহ গর্তে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল... সাড়ে সাত... সাড়ে সাত... সাড়ে সাত...!

বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে 'ঠেলার নাম বাবাজি', কিন্তু কথা হচ্ছে ঠেলার নাম কিন্তু সব সময় বাবাজি নয়। এক বাবাজি কোনো জরুরি কাজে ফোন করতে ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে ঢুকবে জরুরি ফ্যাক্স করতে কিন্তু এই যে দরজা ঠেলছে কিছুতেই দরজা খুলছে না। ঠেলতে ঠেলতে পেরেশান হয়ে সে ফিরে এল।

—ফ্যাক্স করতে পেরেছিলে?

—না।

—কেন?

—এই যে দরজা ঠেললাম, দরজা খুললই না।

—দরজায় কী লেখা ছিল?

—যা লেখা থাকে 'পুল'।

আসলে হঠাৎ করে 'ঠেলা' বিষয়টি নিয়ে লিখছি কারণ হচ্ছে আমাকে ইদানীং সব লেখাই ঠেলেঠুলে বড় করতে হচ্ছে। আর পত্রিকাগুলো আজকাল এমন সব ছোট ছোট ফন্টে ছাপে যে যত বড় লেখাই লিখি না কেন লেখা আর কিছুতেই বড় হয় না। সে যাই হোক, সবশেষে একটা ট্রাফিক টিপ্‌স দিয়ে লেখার ঠেলাঠেলি শেষ করে দেই। সেটা হচ্ছে—রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে গিয়ে আর যেই গাড়ির নিচেই পড়েন না কেন, ঠেলাগাড়ির নিচে পড়বেন না। কারণ ঠেলাগাড়ির নিচে পড়লে নাকি উল্টো আপনাকেই আড়াইশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। অতএব সাবধান!

## ঈশ্বরের চোখ

হাবল টেলিস্কোপে অতিসম্প্রতি নাকি ধরা পড়েছে একটা নীহারিকার ছবি, যা দেখতে একটা চোখের মতো। সবাই বলছে 'গডস আই' ঈশ্বরের চোখ। এখন কথা হচ্ছে ঈশ্বরের চোখ একটা কেন? কেউ কেউ বলছে ঈশ্বর যে একচোখা... তাই। সে যাই হোক, আসলে ঐ নীহারিকা কিন্তু আঠারশ শতকেই আবিষ্কৃত হয়েছে, তার নাম 'হেলিক্স নেবুলা'। পশ্চিমা মৌলবাদীরা এর নাম দিয়েছে 'গডস আই'।

বরং আমরা ঈশ্বরকে নিয়ে একটা গল্প শুনি...

—একবার হল কী, স্বর্গ-নরকের মাঝখানের দেয়াল ভেঙে পড়েছে (স্বর্গবাসীর ধারণা এটা নরকবাসীর কাজ)। স্বর্গবাসীরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন করল—

হে ঈশ্বর আমরা তো বাটে আছি। স্বর্গ-নরকের মাঝখানের দেয়ালটা ভেঙে পড়েছে... নরকের লোকজন ডিসটার্ব শুরু করেছে।

—'দেখ'। ঈশ্বর বললেন, 'আমি একটু ঝামেলায় আছি, শুনেছ বোধ হয়, আমার চোখ নিয়ে পৃথিবীতে কী সব হচ্ছে... এসব নিয়ে ব্যস্ত আছি। এক কাজ কর তোমরাই দেয়ালটা তৈরি করে নাও এবার।'

স্বর্গবাসীরা তাই করল। তারা নিজেরাই চাঁদা তুলে দেয়াল তৈরি করল।

কিন্তু কিছুদিন বাদে নরকবাসীরা দেয়াল ভেঙে ফেলল। কারণ তারা স্বর্গের মজা পেয়ে গেছে। স্বর্গবাসীরা আবার গেল ঈশ্বরের কাছে।

—হে ঈশ্বর নরকবাসীরা আবার দেয়াল ভেঙে ফেলেছে।

—হোয়াট? ডাক ওদের। ওদের ডাকা হল।

—কী, তোমরা নাকি দেয়াল ভেঙেছ?

—জি।

—দেখ, স্বর্গবাসীরা কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে। নরকবাসী শুনে মুচকি হাসে।

—হাসলে কেন?

—মামলা করবেন, উকিল পাবেন কোথায়?

—মানে?

—মানে উকিল তো সব আমাদের সাইডে! হে হে...

তবে ঈশ্বর নরকবাসীকে শায়েস্তা করলেন অন্যভাবে। স্বর্গ-নরকে খাবার চামচের দৈর্ঘ্য তিন ফুট করে দিলেন। আর নিয়ম করে দিলেন—নরকবাসী যার যার চামচে নিজেরা খাবে, আর স্বর্গবাসী একে অন্যকে খাইয়ে দেবে। ব্যস গোলমাল লেগে গেল। তিনফুটি চামচে পাশাপাশি বসে নরকবাসীর খাওয়া সম্ভব নয়। ঠেলার নাম বাবাজি। তারা দেয়াল তৈরি করতে বাধ্য হল অবশেষে। ল'ইয়ার তাদের সাইডে থেকেও লাভ হল না।

সবশেষে ল'ইয়ার নিয়ে একটা জোক।

—আমি একজন ক্রিমিনাল ল'ইয়ার।

—ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ কেন?

—সরল স্বীকারোক্তির জন্য।

**চামড়া তুলে নেব আমরা...**

সোলায়মান সাহেব গত কোরবানি ঈদে তার চামড়া বেচতে পারেন নি। অবশ্য নিজের চামড়া নয়, তার কোরবানি গরুর চামড়া। প্রথম দিকে চামড়া ক্রেতারা যে দাম বলছিল সোলায়মান সাহেব বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। কারণ তিনি জানেন, প্রথম দিকে চামড়া ব্যবসায়ীরা দাম অল্পই হাঁকে পরে বাড়তে থাকে। তাই তিনি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিকেলে একটা ঘুম দিয়ে উঠে তিনি বুঝতে পারলেন দেরি হয়ে গেছে! আর কোনো চামড়া ক্রেতাই আসছে না। তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন... তাহলে কি চামড়াটা এবার বেচতে পারলেন না?

সন্ধ্যার দিকে সোলায়মান সাহেব পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তার চামড়া বিক্রি করা হল না। তিনি নিজেকে 'গরু' বলে গালি দিতে গিয়েও দিলেন না। ভালোই হল বরং চামড়াটা মাদ্রাসায় দিয়ে এলেই তো হয়, মাদ্রাসার ওরা এসেও ছিল সকালে, তখন কী মনে করে দেন নি। এখন দেয়া যাক। সোয়াবের কাজও হবে। তিনি একটা রিকশা ডেকে চামড়া নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজেই রওনা হলেন। সোয়াবের কাজ নিজে করাই উত্তম। মাদ্রাসাটা কাছে ধারেই। যেতে যেতে সোলায়মান সাহেব বেশ একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করলেন। চামড়াটার জন্য ওরা সকালে এসেছিল তখন দেন নি, এখন পেয়ে নিশ্চয়ই খুশি হয়ে উঠবে। ব্যাপারটা ভেবে চামড়া না বিক্রি করতে পারার লজ্জা সোলায়মান সাহেব গিলে ফেললেন।

কিন্তু সোলায়মান সাহেবের জন্য আরো চমক অপেক্ষা করছিল। মাদ্রাসার ছেলেরা চামড়াটা নেড়েচেড়ে বলল—

: এ চামড়া চলবে না, গন্ধ বেরিয়ে গেছে...

: মানে? প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন যেন সোলায়মান সাহেব। 'কী বলে এরা?'

: এ চামড়ায় তো পচন ধরে গেছে, গন্ধ পাচ্ছেন না? যে গরম পড়েছে...

বলে মাদ্রাসার ছেলেরা বিদায় নিল। সোলায়মান সাহেব দ্বিতীয়বারের মতো বোকা বনে গেলেন। এবার নিজেকে 'গরু' নয় 'বলদ' বলে গালি দিতে আর দেরি করলেন না। এবং এবার তিনি সত্যি সত্যি তার চামড়া থেকে বিশ্রী একটা গন্ধ পেলেন যেন, মানে তার গরুর চামড়া থেকে...

তার পরের ইতিহাস রীতিমতো এক যুদ্ধের ইতিহাস, নতুন এক সম্ভাবনার ইতিহাস। ক্ষিপ্ত সোলায়মান সাহেব নিজেই সেই কোরবানি গরুর চামড়া 'টেন' করলেন। নিয়মিত টেনারিতে যাতায়াত করে বই পড়ে বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে অবশেষে সেই চামড়া তিনি নিজেই টেন করলেন, যা এখন তার ড্রইংরুমে দিব্যি শোভা পাচ্ছে।

বন্ধু-বান্ধবরা আড়ালে হাসাহাসি করলেও তিনি একটা জিনিস বুঝেছেন, চামড়া এক বিরাট সম্পদ, সেটা যদি নিজের চামড়াও হয় ক্ষতি নেই!

কিন্তু গরুর চামড়া নষ্ট করা মানে দেশের সম্পদ ধ্বংস করা। আচ্ছা, মানুষের চামড়া হলে কেমন হয়? ব্যাপারটা সোলায়মান সাহেব চিন্তাভাবনা করেই বের করেছেন... দেশের বিশেষ এক শ্রেণীর, মানে মানুষ গোত্রীয় এক শ্রেণীর চামড়া প্রায়ই আমরা উঠিয়ে ফেলি, মানে উঠিয়ে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অবশ্য ঐ শ্রেণীটির চামড়ার টিস্যু আবার অতীব উর্বর বিধায় তোলামাত্রই ফের গজিয়ে যেতে দেরি হয় নয়...!

সোলায়মান সাহেব ঐ বিশেষ শ্রেণীর চামড়া নিয়ে আশাবাদী... সামনে নির্বাচন আসছে, চামড়ার অভাব হবে না...!!

## সাহস যখন বদলে দেয়...

ধানমণ্ডিতে সেদিন গিয়েছিলাম কী একটা কাজে। হঠাৎ আমার এক বেকার বাল্যবন্ধুর সাথে দেখা। এই বয়সে বেকার বন্ধু থাকার কথা নয়, কিন্তু আমার এই বন্ধুটি শখের বেকার। বউ যেহেতু একটা এনজিওতে বিরাট বেতনের চাকরি করে, কাজেই মাঝে মধ্যেই সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়ায়। তারপর আবার কিছুদিন পর ফের একটা চাকরি ধরে ফেলে (অবশ্য চাকরি ছাড়া এবং চাকরি ধরায় ইতোমধ্যে সে রেকর্ড করে ফেলেছে। অন্য বন্ধুরা তাকে গিনেস বুক অফ রেকর্ডে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে বা দিয়ে যাচ্ছে!)। সে যাই হোক, তো... তার সাথে যখন দেখা তখন সে সদ্য আবাব বেকার হয়েছে। ধানমণ্ডি এলাকায় গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াচ্ছে।

—আরে দোস খাওয়া!

—কী খাবি?

—একটা কিছু খাওয়া। অ্যাদ্দিন পর তোর সাথে দেখা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ধানমণ্ডি এলাকা খাওয়াদাওয়ার জন্য রিস্কি। আমি বলি।

—বার্গার খাওয়া... তা হলেই চলবে। আমি রাজি হলাম, হাজার হোক পুরোনো বন্ধু। বার্গার খাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় খাব। হঠাৎ দেখি একটা বিজ্ঞাপন 'সাহস বদলে দেয় সবকিছু'—ঠিক কিসের বিজ্ঞাপন ধরতে পারলাম না। অবশ্য আজকাল বিজ্ঞাপন দেখে বোঝা মুশকিল কোনটা কিসের বিজ্ঞাপন। যেমন সেদিন টিভিতে দেখি এক লোক ভুঁড়ি কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমি যখন ধরে নিচ্ছি বিজ্ঞাপনটি বোধহয় ভুঁড়ি কমানোর কোনো যন্ত্রের হবে, তখন দেখা গেল, না, বিজ্ঞাপনটি আসলে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ব্যবহারকারী সুন্দরী তরুণীকে আকৃষ্ট করতে সে ভুঁড়ি কমাচ্ছে। সে যাই হোক... আমরা দেখলাম সেই বিজ্ঞাপনের (সাহস বদলে দেয় সবকিছু) পাশ দিয়েই একটা ফাস্টফুডের দোকান দেখা যাচ্ছে। বেশ পশ দোকান। সাহস করে ঢুকে পড়লাম। যা থাকে কপালে, বার্গারই তো খাব। দুটো বার্গার অর্ডার দেয়া হল সাথে দুটো ড্রিঙ্কস।

খেয়েদেয়ে ঢেঁকুর তুলতে যাব, বিল এসে হাজির। ঢেঁকুর আর তোলা হল না (ঢেঁকুর তোলার মতো অবস্থায় ঢেঁকুর আচমকা গিলে ফেলা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজ, আমি টের পেলাম সেই প্রথম!) দুটো বার্গার আর দুটো ড্রিঙ্কসের বিল এসেছে একুনে পাঁচশ আটান্ন টাকা (+ ভেট, টিপ্‌স তো আছেই)!! আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখি সে উদাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে গভীর মনোযোগে (যদিও সেখানে দৃশ্য দেখার মতো কোনো জানালা ছিল না)। জীবন বাজি রেখে কোনোমতে বিল দিয়ে বাইরে এসে আবার নজর পড়ল সেই বিজ্ঞাপনটির দিকে... 'সাহস বদলে দেয় সবকিছু!!' এবার আমি বিজ্ঞাপনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। আমাদের সাহস আমার মানিব্যাগকে বদলে দিয়েছে নিদারুণভাবে।

ফাস্টফুডের দোকানের বাইরে এসে বন্ধুকে বললাম।

—আমাকে এখন ঘাড়ে করে বাসায় পৌঁছে দিবি তুই।

—কেন?

আমি মানিব্যাগ খুলে দেখালাম সেখানে গোটাকয়েক ভিজিটিং কার্ড আর একটা দু টাকার কয়েন ঠনঠন করছে। বেকার বন্ধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল 'ঠিক আছে ওঠ। তুই ঘাড়ে উঠতে পারলে আমি তোকে নিয়ে যেতে পারব আশা করি... তোর ওজন আর কত হবে।'

না, শেষ পর্যন্ত বন্ধুর ঘাড়ে করে বাসায় না পৌঁছে হেঁটেই রওনা দিলাম। অন্তত পায়ের ব্যায়াম হোক। এবং হাঁটতে হাঁটতে সাহসের ওপর চমৎকার একটা কোটেশন মনে পড়ল—'তুমি তখনই সাহসী যখন তোমার আশপাশের মানুষগুলো প্রচণ্ড রকম ভিতু।' কোটেশনটি ফ্রেড গেটিংসের। ফ্রেড গেটিংস একজন দার্শনিক ছিলেন আবার একজন বিখ্যাত পামিস্টও ছিলেন। তবে তিনি সাহসী ছিলেন নিঃসন্দেহে।

**জ্যামের মন্ত্র**

ঢাকা শহরে যথারীতি প্রতিদিনকার মতো প্রচণ্ড জ্যাম লেগেছে। রাস্তা একরকম বন্ধই বলা যায়। এ সময় ফুটপাতে দেখা গেল এক লোক কিছু বইপত্র নিয়ে বসে আছে আর চিৎকার করে বলছে, 'জ্যাম ছুটার মন্ত্র! জ্যাম ছুটার মন্ত্র!!' এক গাড়িঅলা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে।

—জ্যাম ছুটার মন্ত্র মানে?


দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—এই যে বইটা দেখছেন এখানে ১০১টা মন্ত্র আছে, একেকটা একেক কাজের।

—কিন্তু জ্যাম ছুটার মন্ত্র, ব্যাপারটা কী?

—৩৭ নম্বর মন্ত্রটা হচ্ছে জ্যাম ছুটার মন্ত্র।

—মানে?

—মানে জ্যামে পড়লে ৩৭নং মন্ত্রটা তিনবার পড়বেন, জ্যাম ছুটে যাবে।

—সত্যি?

—সত্যি মানে একদম পরীক্ষিত।

লোকটি একটি বই কিনে ফেলল। দাম বেশি না মাত্র ৫০ টাকা। গাড়িতে বসে ৩৭ নম্বর মন্ত্রটা পড়তে শুরু করল... তিনবার পড়ার পর... কী আশ্চর্য, সত্যি সত্যি জ্যাম ছুটে গেল!!

অবশ্য ছুটবে না–ইবা কেন? চার ফর্মার বাইরে ঐ মন্ত্র তিন ফর্মা (৪৮ পৃষ্ঠা)। তিনবার বানান করে পড়তে লাগে পাক্কা তিন ঘণ্টা। আর ঢাকার জ্যাম...

সে যাই হোক, জ্যাম থেকে মুক্তির আরেক বুদ্ধি বের করেছে আমার পরিচিত এক মহিলা। তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে অফিস করেন।

—কী পদ্ধতি আপনার? আমি জানতে চাই।

—একদম সোজা।

—কী রকম?

—সকালে নাস্তা না করে বের হই।

—তারপর?

—গাড়িতে পাউরুটি নিয়ে উঠি। জ্যামে পড়লেই জেলি বের করে (জেলি গাড়িতেই থাকে) পাউরুটিতে লাগিয়ে খেতে শুরু করি, দিব্যি সময় কেটে যায়।

আরেকজনকে চিনি যে এখন রীতিমতো লেখক হয়ে উঠেছে। গাড়ির ভিতর একটা মিনি লাইব্রেরি বানিয়েছে। আর ল্যাপটপ তো আছেই। জ্যামে পড়লেই বই পড়ে। ইংরেজি সাহিত্য শেষ করে এখন বাংলা সাহিত্য ধরেছে... গত কোনো একটা ঈদ সংখ্যায় তার একটা গল্পও নাকি ছাপা হয়েছে। সে জ্যামের ওপর মহাখুশি। সে গোপনে আমাকে জানিয়েছে, এভাবে যদি জ্যাম বাড়তে থাকে তাহলে তার জন্য বুকার পুরস্কার ছিনিয়ে আনা কোনো বিষয় না।

তবে এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি টয়লেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। অনেক বড় বড় দার্শনিক চিন্তা টয়লেট থেকে এসেছে, কিন্তু জ্যামে বসে থেকে কেউ কিছু আবিষ্কার করেছেন এমনটা শোনা যায়নি বা এখনো যাচ্ছে না। এর কারণটা কী?

এটা নিয়ে আমি ভাবছি।

প্রিয় পাঠক আপনারাও ভাবুন...।

---

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম